সীরাতে সরওয়ারে আলম

৩য় ও ৪র্থ খন্ড

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী

সীরাতে
সরওয়ারে আলম (সঃ)

৩য় ও ৪র্থ খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আব্বাস আলী খান

শতাব্দী প্রকাশনী

বাংলা তৃতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ সীরাতে সরওয়ারে আলম দ্বিতীয় খন্ডকে আমরা বাংলা ভাষায় তিন খন্ডে অর্থাৎ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খন্ডে প্রকাশ করে আসছিলাম। পাঠকগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এখন থেকে আমরা বাংলা ৩য় ও ৪র্থ খন্ডকে এক ভলিউমে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এ সংস্করণ থেকে সেভাবেই প্রকাশ হলো।

বাংলা প্রথম খন্ডে মূলত নবুওয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় খন্ডে আলোচিত হয়েছে অতীত জাতিগুলোর ধ্বংসের ইতিহাস। তৃতীয় খন্ড থেকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সীরাতের ইতিহাস আলোচনা শুরু হয়েছে।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানার সবগুলো গ্রন্থই বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে দ্রুত পেশ করার পরিকল্পনা করেছে। ইতোমধ্যে আল হামদুলিল্লাহ তাঁর সবগুলো গ্রন্থই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান। তাঁর অনুবাদ কাজের পারদর্শীতা, শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা এবং ভাষার বলিষ্ঠতা সম্পর্কে সুধী পাঠকগণকে নতুন করে বলার আছে বলে আমরা মনে করি না।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। এ গ্রন্থের সকল পাঠককে তিনি নবুওয়তের প্রকৃত মিশন উপলব্ধির তৌফিক দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক — ১৯.১০.২০০০ইং
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী।

☆

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনের নাম যা এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসের ওপর মানব জীবনের গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এ আন্দোলন অতি প্রাচীনকাল থেকে একই ভিত্তির ওপর এবং একই পদ্ধতিতে চলে আসছে। এর নেতৃত্ব তাঁরা দিয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালার নবী রসূল বলা হয়। আমাদেরকে যদি এ আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়, তাহলে অনিবার্যরূপে সেসব নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। কারণ এছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতি এ বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে না আছে আর না হতে পারে। এ সম্পর্কে যখন আমরা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর পদাংক অনুসন্ধানের চেষ্টা করি, তখন আমরা বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হই। প্রাচীনকালে যেসব নবী তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা বেশী কিছু জানতে পারি না। কোরআনে কিছু সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তার থেকে গোটা পরিকল্পনা উদ্ধার করা যায়না। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে হযরত ঈসা (আঃ) এর কিছু অনির্ভরযোগ্য বাণী পাওয়া যায় যা কিছু পরিমাণে একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে এবং তা হলো এই যে, ইসলামী আন্দোলন তার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কিভাবে পরিচালনা করা যায় এবং কি কি সমস্যার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) কে পরবর্তী পর্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়নি এবং সে সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটিমাত্র স্থান থেকে আমরা সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ পথ নির্দেশ পাই এবং তা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) এর জীবন। তাঁর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন তাঁর প্রতি আমাদের শুধু শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ পথের চড়াই উৎরাই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আমরা বাধ্য। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধু নবী মুহাম্মদ (সা)ই একমাত্র নেতা যাঁর জীবনে আমরা এ আন্দোলনের প্রাথমিক দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং অতঃপর রাষ্ট্রের কাঠামো, সংবিধান, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত এক একটি পর্যায় ও এক একটি দিকের পূর্ণ বিবরণ এবং অতি নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা জানতে পারি।

☆

ভূমিকা

আমার বিভিন্ন রচনায় রিসালাত ও সীরাতে পাক সম্পর্কিত আলোচনাসমূহকে চমৎকারভাবে একত্রে সংকলিত করে জনাব নঈম সিদ্দীকী ও জনাব আবদুল ওয়াকীল আলভী এ গ্রন্থের প্রথম খন্ড (বাংলায় ১ম ও ২য় খন্ড) তৈরী করেন। সেখানে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের তেমন প্রয়োজন অনুভব করিনি।

কিন্তু এ খন্ডের জন্যে তাঁরা আমার যেসব লেখা সংকলন করেছেন, সেগুলোতে মাঝে মাঝে শূন্যতা রয়ে গেছে। এসব শূন্যতা নিয়ে কিছুতেই একটি সীরাত গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে না। তাই, এতে আমি ব্যাপকহারে সংযোজন ও পরিবর্ধন করেছি। এখন এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক সীরাত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

এই (মূল) দ্বিতীয় খন্ড হিজরতের বর্ণনায় এসে সমাপ্ত হয়েছে। এরপরই শুরু হবে মাদানী অধ্যায়। সে অধ্যায় মূলত অকূল সমুদ্র সম। মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে এ গ্রন্থটি পূর্ণ করার শক্তি ও তৌফিক দান করেন এবং এটিকে যেন তাঁর বান্দাদের জন্যে কল্যাণময় করেন।

আবুল আ'লা

৩য় খন্ড

❑ ষষ্ঠ অধ্যায়

❊ পঞ্চম অনুচ্ছেদ

❊ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

চিত্রসূচী

—●—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

কুরআন তার বাহককে কোন্ মর্যাদায় উপস্থাপিত করে

দুনিয়াতে মানুষের হেদায়েত ও পথ নির্দেশনার জন্যে সর্বদা এমন সব পুণ্যপূত মনীষী জন্ম গ্রহণ করতে থাকেন যাঁরা তাঁদের কথা ও কাজের দ্বারা মানুষকে সত্য ও সততার সরল সহজ পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু মানুষ অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁদের এ অনুগ্রহ–শুভেচ্ছার বদলা জুলুম–অত্যাচারের আকারে দিতে থাকে। তাঁদের উপর জুলুম তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরাই করেনি যে তারা তাঁদের বাণীর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছে, তাঁদের সত্যতা অস্বীকার করেছে, তাঁদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাঁদেরকে দুঃখকষ্ট দিয়ে সত্যপথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা করেছে, বরঞ্চ তাঁদের উপর জুলুম তাঁদের ভক্ত অনুরক্তগণও করেছে, এভাবে যে তাঁদের চলে যাওয়ার পর তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা বিকৃত করেছে, তাঁদের হেদায়েত পরিবর্তন করে দিয়েছে। তাঁদের আনীত গ্রন্থাবলীর কদর্থ করেছে এবং স্বয়ং তাঁদের ব্যক্তিত্বকে কৌতূহলের খেলনা বানিয়ে তার মধ্যে খোদায়ীর রঙের প্রলেপ দিয়েছে। প্রথম ধরনের জুলুম ত ঐসব পূত–পবিত্র মনীষীদের জীবদ্দশায় অথবা বড়োজোর তাঁদের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত সীমিত ছিল। কিন্তু এ দ্বিতীয় প্রকারের জুলুম তাঁদের তিরোধানের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত চলতে থাকে এবং অনেকের সাথে এখন পর্যন্ত এ জুলুম করা হচ্ছে।

দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত যতো সত্যের আহ্বানকারী প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই ঐসব মিথ্যা খোদার খোদায়ী নির্মূল করার কাজেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন, যাদেরকে মানুষ এক খোদাকে বাদ দিয়ে খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সর্বদা এটাই হতে থাকে যে তাঁদের ইহলোক ত্যাগ করার পর তাঁদের অনুসারীগণ জাহেলী আকীদাহ বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বয়ং তাঁদেরকেই খোদা অথবা খোদার শরীক বানিয়ে নিয়েছে। তাঁদেরকেও সেসব প্রতিমার মধ্যে শামিল করে নিয়েছে যেসব চূর্ণ করার জন্যে তাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবনের শ্রম–সাধনা নিয়োজিত করেছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে মানুষ কিছুটা এমন সংশয় সন্দেহে ভুগছে যে, মানবতার মধ্যে পবিত্রতা ও ফেরেশতাসুলভ গুণাবলীর সম্ভাবনা ও অস্তিত্বের প্রতি তার বিশ্বাস খুব কমই রয়েছে। সে নিজেকে নিছক দুর্বলতা ও হীনমন্যতার সমষ্টিই মনে করে। তার মন এ মহাসত্যের জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত থাকে যে, মহান স্রষ্টা তার মাটির দেহে এমন সব শক্তিসামর্থ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা তাকে মানুষ এবং মানবীয় গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র উর্ধজগতের আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদের অপেক্ষাও উচ্চতর মর্যাদায় ভূষিত করতে পারে। এ কারণেই, দুনিয়াতে যখন কোন মানুষ নিজেকে খোদার প্রতিনিধি হিসাবে পেশ করেছে, তখন তার স্বজাতির লোকেরা তাকে তাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষরূপে দেখে তাকে খোদা প্রেরিত বলে মেনে নিতে একেবারে অস্বীকার করেছে। অবশেষে যখন তাঁর সত্তার মধ্যে অসাধারণ মহৎ

গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ দেখে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছে, তখন মন্তব্য করেছে, যে ব্যক্তি এমন অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হন তিনি কখনো মানুষ হতে পারেন না। অতঃপর কোন দল তাঁকে খোদা বানিয়ে দিল, কেউ দেহান্তরের ধারণা আবিষ্কার করে বিশ্বাস করে বসলো যে খোদা তাঁর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কেউ আবার তাঁর মধ্যে খোদায়ী গুণাবলী ও খোদাসুলভ এখতিয়ার–অধিকারের ধারণা পোষণ করলো। আবার কেউ ঘোষণা করলো যে তিনি খোদার পুত্র। (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আম্মা ইয়াসেফুন)–।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের–তাঁদের ধর্মপ্রবর্তক সম্পর্কে ধারণা

দুনিয়ার যে কোন ধর্মীয় নেতার জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর উপরে সব চেয়ে বেশী জুলুম করেছে তাঁর ভক্ত অনুরক্তগণ। তারা তাঁর উপরে অসার কল্পনা ও কুসংস্কারের এতো মোটা আবরণ চড়িয়ে দিয়েছে যে, তাঁর প্রকৃত আকার আকৃতি ও অবয়ব দৃষ্টিগোচর হওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় যে তাদের বিকৃত ও পরিবর্তিত গ্রন্থাবলী থেকে এ কথা জানা সুকঠিন হয়ে পড়েছে যে, তাঁর প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা কি ছিল, বরঞ্চ আমরা সেসব থেকে এ কথাও জানতে পারি না যে, তিনি স্বয়ং কি ছিলেন। তাঁর জন্ম, শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য সবই চরম বিস্ময়তায় আচ্ছন্ন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে বিস্ময় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট। মোটকথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই একটা কল্পিত কাহিনীই মনে হয়। তাঁকে এমন আকার আকৃতিতে উপস্থাপিত করা হয় যেন তিনি স্বয়ং খোদা ছিলেন অথবা খোদার পুত্র। অথবা খোদা তাঁর রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অথবা নিদেনপক্ষে তিনি খোদায়ীর গুণাবলীতে কিছু পরিমাণে শরীক ছিলেন।

বুদ্ধ

গৌতম বুদ্ধের কথাই ধরা যাক। বৌদ্ধধর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর এতোটুকু অনুমান করা যায় যে, এ স্থিরসংকল্প ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যবাদের বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করেছিলেন এবং বিশেষ করে ঐসব অগণিত সত্তার খোদায়ী খন্ডন করেন–যাদেরকে সে যুগের মানুষ তাদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর শতাব্দী কাল অতিবাহিত হতে না হতেই বৈশালী সম্মেলনে তাঁর অনুসারীগণ তাঁর সকল শিক্ষাদীক্ষা পরিবর্তন করে ফেলে এবং মূল সূত্রের স্থানে নতুন সূত্র প্রণয়ন করে মূল এবং শাখা প্রশাখায় আপন প্রবৃত্তি ও চিন্তাধারা অনুযায়ী যেমন খুশী তেমন পরিবর্তন পরিবর্ধন করে ফেল্লো। একদিকে তারা বুদ্ধের নামে নিজেদের ধর্মের এমন সব আকীদাহ বিশ্বাস স্থিরীকৃত করলো যার মধ্যে খোদার কোন অস্তিত্বই স্বীকৃত ছিলনা এবং অপরদিকে বুদ্ধকে সর্ববোধি, বিশ্বনিয়ন্তা এবং এমন এক সত্তা নির্ণীত করে যে, সর্বযুগে দুনিয়ায় সংস্কারের জন্যে বুদ্ধের রূপ ধারণ করে আগমন করে থাকেন। তাঁর জন্ম, জীবন এবং বিগত ও ভবিষ্যৎ জন্ম সম্পর্কে এমন এমন উদ্ভট কাহিনী রচনা করা হয়েছে যা পাঠ করার পর অধ্যাপক উইলসনের মতো অনুসন্ধান বিশারদ পন্ডিত ব্যক্তি বিস্ময়ের সাথে মন্তব্য করেছেন যে, ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিন চার শতকের মধ্যে এ সব অলীক কাহিনী বুদ্ধকে খোদায়ীর রঙে রঞ্জিত করেছে। কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও নেতৃত্বের এক সম্মেলন কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যে বুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে ভগবানের আধিভৌতিক বা দৈহিক বহিঃপ্রকাশ। অন্য কথায় ভগবান বুদ্ধের দেহে আত্মপ্রকাশ করেন।

রাম

এ ধরনের আচরণ রামচন্দ্রের সাথেও করা হয়। রামায়ণ পাঠে একথা সুস্পষ্ট হয় যে রাজা রামচন্দ্র একজন মানুষ মাত্র ছিলেন। মহানুভবতা, সুবিচার, বীরত্ব, উদারতা, বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও ত্যাগের গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন বটে। কিন্তু খোদায়ী বা ঈশ্বরত্বের লেশমাত্র বিদ্যমান তার মধ্যে ছিলনা। কিন্তু মনুষত্ব ও এ ধরনের গুণাবলীর একত্র সমাবেশ এমন এক প্রহেলিকার রূপ ধারণ করে যে, ভারতবাসীর বিবেকবুদ্ধি তার সমাধানে ব্যর্থ হয়। অতএব রামচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুকাল পর এ বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে তার মধ্যে বিষ্ণু (১) রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর তিনি ঐসব সত্তার মধ্যে একজন যাদের আকৃতিতে বিষ্ণু মানব সংসারের সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন।

কৃষ্ণ

এ ব্যাপারে উপরোক্ত দুজনের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর মজলুম। ভগবত গীতা বার বার বিকৃত ও কাটাছেঁড়া বা অংগহানীর পর যে আকারে আমাদের কাছে পৌছেছে, তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর অন্ততঃ এতোটুকু জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং তিনি এ কথাই প্রচার করতেন যে মহান স্রষ্টা এক সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান সত্তা। কিন্তু মহাভারত, বিষ্ণু পুরান, ভগবৎপুরাণ গ্রন্থাবলী এবং স্বয়ং গীতা তাঁকে এভাবে উপস্থাপিত করে যে, একদিকে তাঁকে বিষ্ণুর দৈহিক প্রকাশ, সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বলে মনে হয় এবং অপর দিকে এমন সব দুর্বলতা তাঁর প্রতি আরোপিত হয় যে, খোদা ত দূরের কথা একজন পূত চরিত্র মানুষ বলে স্বীকার করাও সুকঠিন হয়ে পড়ে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত বাণীসমূহ পাওয়া যায় ঃ-

আমিই এ জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা। যা কিছু জ্ঞেয় এবং পবিত্র বস্তু তা আমি। আমি ব্রহ্মবাচক, ওংকার, আমিই ঋক, সামু ও যজুর্বেদ। আমিই প্রাণীর পরাগতি ও পরিচালক। আমি প্রভু, সকল প্রাণীর নিবাস, তাদের শুভাশুভের দ্রষ্টা। আমিই রক্ষক এবং হিতকারী। আমিই স্রষ্টা এবং সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয়স্থান। আর আমিই জগতের অবিনাশী কারণ। (সূর্যরূপে) আমিই তাপ বিকিরণ করি এবং জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি। আমি (দেবগণের) অমৃত ও (মর্তগণের) মৃত্যু। আমি অবিনাশী আত্মা। আমিই নশ্বর জগত। (গীতা– ৯ ঃ ১৭–১৯ দ্রঃ)।

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেউ আমার উৎপত্তির তত্ত্ব জানেনা। কেননা আমি সর্বপ্রকারের দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি কারণ। যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মহীন এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানেন। মনুষ্য মধ্যে তিনিই মোহশূন্য হয়ে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হন–(গীতা, ১০ ঃ ২–৩)

হে জিতেন্দ্রিয় অর্জুন। আমিই সব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত চৈতন্যময় আত্মা এবং প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহার স্বরূপ, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি উজ্জ্বল সূর্য। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি মরীচি এবং আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। (গীতা, ১০ঃ ২০–২১)

---

(১) হিন্দুদের বর্তমান ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী বিষ্ণু বিশ্বের প্রতিপালক ভগবান বা দেবতা বলে অভিহিত। সম্ভবতঃ এ ছিল মূলে আল্লাহ তায়ালার রবুবিয়াতের ধারণা যাকে পরবর্তীকালে একটি স্থায়ী ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে প্রতিমাপূজার সূচনা এভাবে হয় যে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর প্রতিটিকে তার মূলসত্তা থেকে পৃথক করে এক একটি খোদা বা দেবতা বলে অভিহিত করা হয় –গ্রন্থকার।

আমি নাগগণের মধ্যে নাগরাজ। অনন্ত জলচরগণের মধ্যে রাজা বরুন ---আমি এই সমগ্র বিশ্ব মাত্র একাংশে ধারণ করে আছি। (গীতা, ১০ঃ ২৯-৪৪)

গীতার কৃষ্ণ এসব বাণীর দ্বারা ভগবান হওয়ার দাবী করেছেন। * কিন্তু অপর দিকে ভগবৎপুরাণ এই শ্রীকৃষ্ণকে এমন রূপে উপস্থাপিত করছে যে, তিনি স্নানের সময় গোপীনীদের পরিধেয় বস্ত্র লুকিয়ে রাখছেন। তাদের যৌনউপভোগ করার জন্যে যতো গোপিনী ততো দেহ ধারণ করছেন। রাজা পুরক্ষিত যখন শুকদেবকে জিজ্ঞেস করেন, "ভগবান ত অবতার রূপে এজন্যে আত্মপ্রকাশ করেন যে তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করবেন। কিন্তু তিনি কেমন ভগবান যে, ধর্মের সকল মূলনীতি লংঘন করে পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করছেন?"

এ অভিযোগ খন্ডন করার জন্যে ঋষিকে এ কৌশল অবলম্বন করতে হয় যে স্বয়ং দেবতাগণও কোন কোন ক্ষেত্রে পূণ্যপথ থেকে সরে পড়েন। কিন্তু তাঁদের পাপ তাঁদের ব্যক্তিসত্তার উপর কোন ছাপ রাখেনা যেমন ধারা আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাকে অভিযুক্ত করা যায় না।

কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করতে পারেননা যে, কোন উচ্চমানের ধর্মগুরুর জীবন এমন অপবিত্র হতে পারে। তিনি এমন ধারণাও করতে পারেননা যে, কোন সত্যিকার ধর্মীয় নেতা প্রকৃতপক্ষে নিজেকে মানুষ ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রভু হিসাবে পেশ করে থাকতে পারেন। কিন্তু কুরআন ও বাইবেলের তুলনামূলক অধ্যায় থেকে এ বিষয়টি আমাদের নিকটে সুস্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে, বিভিন্ন জাতি তাদের মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন কালে কিভাবে দুনিয়ার পুণ্যপূত চরিত্র মনীষীদের জীবন চরিতকে অতি জঘন্য করে চিত্রিত করেছে যাতে করে তাদের নিজেদের দুর্বলতার জন্যে বৈধতার কারণ নির্ণয় করতে পারে এবং অপরদিকে তাঁদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কত অলীক কাহিনী রচনা করেছে। এ জন্যে আমরা মনে করি যে, এ ব্যক্তিত্বকে যেভাবে পেশ করা হয়েছে, তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব তার থেকে ভিন্ন ধরনের হয়েথাকবে।

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম

যে সব মনীষীদের নবুয়ত সর্বজনবিদিত ও সর্বস্বীকৃত তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মজলুম সাইয়েদুনা ঈসা আলায়হিস্সালাম। সকল মানুষের মতো হযরত ঈসাও একজন মানুষ ছিলেন। মনুষ্যত্বের সকল বৈশিষ্টই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল যেমন অন্যান্য মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিকমত, নবুয়ত ও অলৌকিক শক্তি দান করে একটি অধঃপতিত জাতির সংস্কারের জন্যে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে ত তাঁর জাতি তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করলো এবং পুরো তিনটি বছরও তার ভাগ্যবান অস্তিত্ব তারা বরদাশ্‌ত করলোনা। এমন কি তাঁর যৌবন কালেই তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করলো। অতঃপর তাঁর তিরোধানের পর যখন তারা তাঁর মহত্ব স্বীকার করলো তখন আবার এতোটা সীমালংঘন করলো যে তাঁকে তারা খোদার পুত্র বরঞ্চ একেবারে খোদা বানিয়ে দিল। তারপর তাঁর প্রতি এ ধারণা বিশ্বাস আরোপ করলো যে, খোদা মসীহের আকৃতিতে এজন্যে আত্মপ্রকাশ করেণ যে, তিনি ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মানবের পাপরাশির কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করে যাবেন। কারণ মানুষ

---

*গীতা যদি এ দাবী করতো যে সে খোদার কেতাব এবং শ্রীকৃষ্ণ তা উপস্থাপনকারী তাহলে উপরোক্ত বাণীগুলো খোদার বলে গণ্য হতো এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খোদায়ী দাবী আরোপিত হতো না। কিন্তু মুশ্কিল এই যে, এ গ্রন্থ স্বয়ং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলীর সমষ্টি বলে পেশ করছে। সমগ্র গ্রন্থের কোথাও ঘূর্নাক্ষরেও এ কথা বলা হয়নি যে তা খোদার বাণী যা অহী ও ইলহামের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উপর নাজিল হয়েছে -গ্রন্থকার।

প্রকৃতিগতভাবেই পাপী এবং স্বয়ং নিজের আমল বা ক্রিয়াকর্মের দ্বারা ত্রাণলাভ করতে পারে না। মায়াযাল্লাহ! একজন সত্যবাদী নবী তাঁর পরওয়ারদেগারের প্রতি এতোবড়ো মিথ্যা দোষারোপ কি করে করতে পারেন? কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরক্তগণ শ্রদ্ধার ভাবাবেগে তার উপর এ মিথ্যা দোষারোপ করে বসলো। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে এমন সব বিকৃতি ঘটালো যে আজ কুরআন ব্যতীত দুনিয়ায় কোন কেতাবে মসীহের প্রকৃত শিক্ষা এবং স্বয়ং তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্টে চার ইঞ্জিল নামে যে কেতাবগুলো বিদ্যমান তা অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে সেসব-ঈসার মধ্যে খোদার আত্মপ্রকাশ করার, খোদার পুত্র হওয়ার এবং একেবারে স্বয়ং খোদা হওয়ার ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ। কোথাও হযরত মরিয়মের প্রতি এ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে- "তোমার সন্তান খোদার পুত্র বলে অভিহিত হবে" [(লিউক(St. LUKE) ১ ঃ ৩৫] কোথাও খোদার রূহ কবুতর আকারে ইউসুর উপর অবতরণ করে উচ্চস্বরে বলছে এ আমার প্রিয় পুত্র (মেথু St. Mathew: ১৬-১৭)। কোথাও মসীহ স্বয়ং বলছেন- "আমি খোদার পুত্র এবং তোমরা আমাকে সর্বশক্তিমানের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবে (মাক্স্ ১৪ ঃ ৬২) শেষ বিচার দিবসে খোদার পরিবর্তে মসীহ্কে খোদার সিংহাসনে বসানো হচ্ছে এবং তিনি শাস্তি ও পুরস্কারের ফরমান জারী করছেন- (মেথু ২৫ ঃ ৩১-৪৬)। কোথাও মসীহের মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে- "পিতা আমার মধ্যে এবং আমি পিতার মধ্যে-(জোন ঃ ১ ঃ ৩৮)। কোথাও সে সত্যবাদী মানবের মুখ থেকে এ ভুল কথাগুলো বের করা হচ্ছে- "আমি খোদার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি-(জোন ৮ঃ৪২)। কোথাও খোদা এবং তাঁকে একাকার করে দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর প্রতি এ উক্তি আরোপ করা হচ্ছে-"যে আমাকে দেখলো সে পিতাকে দেখলো-এবং পিতা আমার মধ্যে থেকে তাঁর কাজ করেন" (জোন ১৪ ঃ ৯-১০)। কোথাও খোদার সব কিছু মসীহের উপর হস্তান্তর করা হচ্ছে-(জোন ৩ ঃ ৩৫) কোথাও খোদা তাঁর সকল দায়িত্ব মসীহের উপর অর্পণ করছেন-(জোন ৫ঃ২০-২২)।

এ সব বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্মীয় গুরু ও পথ প্রদর্শকদের উপরে যেসব মিথ্যা অপবাদ অভিযোগের জঞ্জাল আবর্জনা চাপিয়ে দিয়েছে, তার প্রকৃত কারণ সেই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যার উল্লেখ আমরা প্রথমেই করেছি। তারপর যে জিনিষ এ অন্যায় অবিচারের সহায়ক হয়েছে তা হলো এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মনীষীদের পথনির্দেশনা ও শিক্ষাদীক্ষা তাঁদের তিরোধানের পর লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দিকে মনোযোগ দেয়া হলেও তা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এ জন্যে সামান্য কাল অতিবাহিত হওয়ার পর এর মধ্যে এতো পরিমাণে ভেজাল, বিকৃতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন সংঘটিত হয়েছে যে আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা সুকঠিন হয়ে পড়েছে। এ জন্যে কোন সুস্পষ্ট হেদায়েত ও পথনির্দেশনা বিদ্যমান না থাকার পরিণাম এই হয়েছে যে, যতোই সময়কাল অতিবাহিত হতে থাকে, প্রকৃত সত্যের উপর ততোই অলীক কল্পনা ও কুসংস্কারের জঞ্জাল বাড়তে থাকে এবং কয়েক শতকের মধ্যে প্রকৃত সত্য বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। শুধু মাত্র অলীক গল্প কাহিনীই রয়ে যায়।

সাইয়েদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দুনিয়ার সকল পথপ্রদর্শকের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে, তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিগত তের চৌদ্দ শতাব্দী যাবত একেবারে তার আসল রূপে সংরক্ষিত

৩—

আছে। খোদার ফজলে এমন কিছু ব্যবস্থা হয়েছে যে এখন তার পরিবর্তন অসম্ভব। কুসংস্কার ও বিস্ময়কর বস্তু ও ঘটনার প্রতি মানুষের অনুরাগ আসক্তি থাকার কারণে এটা অসম্ভব ছিল না যে, পূর্ণতার প্রতীক এ মহান ও মনোনীত ব্যক্তিত্বকেও তারা অলীক কাহিনীর বস্তু বানিয়ে খোদায়ীর কোন না কোন গুণে গুণান্বিত করে ফেলতো এবং তাঁকে অনুসরণ করার পরিবর্তে বিস্ময়তা ও পূজাঅর্চনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল নবী প্রেরণের শেষ পর্যায়ে এমন এক পথ প্রদর্শক পাঠাবার, যার সত্তা মানব জাতির জন্যে সকল কর্মকান্ডের চিরন্তর নমুনা এবং হেদায়েতের বিশ্বজনীন উৎস হয়ে থাকবে। এ জন্যে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে ওসব জুলুম অবিচার থেকে রক্ষা করেন, জাহেল ভক্ত অনুরক্তদের হাতে যেসব জুলুম অবিচার অন্যান্য নবী এবং বিভিন্ন জাতির পথ প্রদর্শকদের উপর করা হতে থাকে। প্রথমতঃ নবী মুহাম্মাদের (সঃ) সাহাবা ও তাবেঈন এবং পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ, পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিপরীত, তাঁদের নবীর জীবনচরিত সংরক্ষণ করায় নিজেরাই অসাধারণ ব্যবস্থাপনা করেন যার ফলে আমরা তাঁর ব্যক্তিত্বকে চৌদ্দশ' বছর অতীত হওয়ার পরও আজ প্রায় তেমন নিকট থেকে দেখতে পারি যেমন নিকট থেকে তাঁর যুগের মানুষ দেখতে পেতো। কিন্তু যদি বই পুস্তকের এ বিপুল ভান্ডার দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যা ইসলামী নেতৃত্ববৃন্দ বহু বছরের শ্রমসাধনায় সংগৃহীত করেছেন হাদীস ও জীবনচরিতের একটি পৃষ্ঠাও যদি দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান না থাকে যার থেকে নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনের কিছু অবগত হওয়া যেতো এবং শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব (কুরআন) রয়ে যায়। তথাপি আমরা এ মহাগ্রন্থ থেকে ঐসব বুনিয়াদী প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতে পারতাম, যা তার বাহক সম্পর্কে একজন ছাত্রের মনে উদয় হতো।

আসুন আমরা দেখি কুরআন তার বাহককে কোন রঙে রঞ্জিত করে পেশ করছে।

রসূলের মানুষ হওয়া

কুরআন মজিদ রেসালত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে এই যে, রসূল মানুষই ছিলেন। কুরআন নাযিলের পূর্বে শত শত বছরের ধারণা বিশ্বাস এ স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, মানুষ কখনো আল্লাহ্‌র রসূল ও প্রতিনিধি হতে পারে না। দুনিয়ার সংস্কার সংশোধনের জন্যে কখনো প্রয়োজন হলে খোদা স্বয়ং মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। অথবা কোন ফেরেশতা কিংবা দেবতাকে প্রেরণ করেন। মোটকথা যতো মনীষী দুনিয়ার সংস্কারের জন্যে আগমন করেছেন তারা সকলেই অতি মানব ছিলেন। এ ধারণা বিশ্বাস মানুষের মনে এতোটা বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে, যখন আল্লাহর কোন নেক বান্দাহ মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে আগমন করতেন, তখন সর্বপ্রথম মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে বলতো- "এ কেমন নবী যে আমাদেরই মতো পানাহার করে, ঘুমায় ও চলাফেরা করে ? এ কেমন পয়গম্বর যে আমাদের মতো যাবতীয় দোষত্রুটি ও দুর্বলতার শিকার হয় অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হয়, দুঃখ কষ্ট ও সুখশান্তি উপভোগ করে। আমাদের হেদায়েতই যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে তিনি আমাদেরই মতন একজন দুর্বল মানুষ কেন পাঠাতেন? খোদা কি স্বয়ং আসতে পারতেন না? প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এসব প্রশ্ন করা হতো এবং এসবকে বাহানা বানিয়ে মানুষ নবীগণকে অস্বীকার করতো। হযরত নূহ (আ) যখন তাঁর জাতির কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এলেন তখন তারা বল্লো।

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ - (المؤمنون : ٢٤)

–এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু নয়। সে তোমাদের উপর মর্যাদা লাভ করতে চায়। অথচ খোদা যদি চাইতেন ত ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। এ উদ্ভট কথা ত আমরা আমাদের বাপদাদার মুখে কখনো শুনিনি (যে পয়গম্বর কখনো মানুষ হয়)–(মুমেনূন ঃ ২৪)।

যখন হযরত হূদ (আঃ) কে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে পাঠানো হলো, ত তাঁর বিরুদ্ধেও সর্বপ্রথম এ অভিযোগ করা হলো ঃ

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ - (المؤمنون : ٣٣-٣٤)

–এ ব্যক্তি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা যা খাও, সে তাই খায়। তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। তোমরা যদি তোমাদেরই মতন একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হবে (মুমেনূন ঃ ৩৩–৩৪)।

হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) ফেরাউনের নিকটে সত্যের বাণীসহ পৌছেন, তখন তাঁদের কথা এ কারণেই মেনে নিতে অস্বীকার করা হয় যে, তাঁরা উভয়ে মানুষ ছিলেন ঃ

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا - (المؤمنون : ٤٧)

আমরা কি আমাদেরই মতো দু'জন মানুষের উপর ঈমান আনব? (মুমেনূন ঃ ৪৭)।

ঠিক এমনি ধরনের প্রশ্ন সেসময়েও উথাপন করা হয়েছিল যখন মক্কার একজন নিরক্ষর মানুষ চল্লিশ বছর যাবত নীরব জীবন যাপন করার পর হঠাৎ ঘোষণা করলেন–"খোদার পক্ষ থেকে আমাকে রসূল নিয়োগ করে পাঠানো হয়েছে।"

মানুষ এটা বুঝতেই পারলোনা যে তাদেরই মত হাত–পা, চোখ, নাক, দেহ ও প্রাণ বিশিষ্ট একজন মানুষ কি করে আল্লাহর রসূল হতে পারে? তারা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতো–

مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ - لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا -

(الفرقان : ٧-٨)

–এ আবার কেমন রসূল যে আহার করে এবং হাটে–বাজারে চলাফেরা করে? তার সাথে একজন ফেরেশতা নেমে এলো না কেন যে তার সাথে থেকে মানুষকে সতর্ক করে দিত? অথবা–নিদেনপক্ষে তার জন্যে কোন রত্নভান্ডার নামিয়ে দেয়া হতো অথবা তার সাথে কোন ফলের বাগান থাকতো যার থেকে সে খেতে পারতো–(ফুরকান ঃ ৭–৮)।

যেহেতু ভ্রান্তধারণাই রেসালাত মেনে নেয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল, সেজন্যে কুরআন মজিদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার খন্ডন করা হয়েছে। অতঃপর যুক্তিসহ বলা হয়েছে যে, মানুষের পথপ্রদর্শনের– মানুষই সবচেয়ে বেশী উপযোগী হতে পারে। কারণ নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাদানই নয়, বরঞ্চ স্বয়ং কাজ করে দেখানো এবং আনুগত্য অনুসরণের একটা দৃষ্টান্তও পেশ করা। এ উদ্দেশ্যে যদি কোন ফেরেশতা অথবা কোন অতি মানবীয় সত্তাকে পাঠানো হয়, যার মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা নেই– তাহলে মানুষ একথা বলতে পারে, "আমরা তার মতো কি করে আমল করব, কারণ আমাদের মতো তার ত প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তির বাসনা নেই এবং যে সব শক্তি মানুষকে পাপকাজে উদ্বুদ্ধ করে সেসব ত তার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে নেই?"

لَوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا - (بنى اسرائيل: ٩٥)

–যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে (স্বাভাবিক ভাবে) চলাফেরা করতে পারতো, তাহলে আমরাও তাদের (পৃথিবীবাসীদের) উপর আসমানের কোন ফেরেশতাকে রসূল করে নাযিল করতাম–(বনীইসরাইল–৯৫)।

অতঃপর আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট করে বর্নণা করেন যে, ইতিপূর্বে যতো নবী ও সত্যপথ প্রদর্শক বিভিন্ন জাতির মধ্যে আগমন করেন, তাঁরা ঠিক তেমনিই মানুষ ছিলেন।যেমন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সঃ) মানুষ। মানুষ যেমন পানাহার ও চলাফেরা করে তাঁরাও তেমনি পানাহার এবং চলাফেরাকরতেন।

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ -

(انبياء : ٧- ٨)

–তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তারাও মানুষই ছিল যাদের উপর আমরা অহী নাযিল করতাম। তোমরা না জানলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ। আমরা ওসব নবীকে এমন দেহ দান করিনি যে তারা আহার করতোনা, আর না তারা অমর ছিল– (আম্বিয়া–৭–৮)।

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ - (الفرقان : ٢٠)

–এবং আমরা তোমার পূর্বে যতো নবী পাঠিয়েছি তারা সকলে আহার করতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো –(ফুরকান–২০)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً - (الرعد: ٣٨)

–এবং তোমার পূর্বে আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের জন্যে বিবিও পয়দা করেছিলাম এবং সন্তানসন্ততিও দিয়েছিলাম–(রা'দ ঃ ৩৮)।

অতঃপর নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে আদেশ করা হলো, "তুমি তোমার মানুষ হওয়ার কথা স্পষ্ট ঘোষণা করে দাও যাতে করে তোমার পরে লোকে তোমাকেও তেমনিভাবে খোদায়ীর গুণে গুণান্বিত না করে, যেমনভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদের করা হয়েছে।

কুরআনের বিভিন্নস্থানে এ আয়াত এসেছে ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ - (الكهف: ١١٠ ، حم السجدة ٦)

–হে নবী। বলে দাও– আমি তোমাদের মতো নিছক একজন মানুষ। আমার উপর অহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের খোদা ত একজনই–(কাহাফ ঃ ১১১, হামীম সাজদা ঃ ৬)।

এসব বিশদ বিবরণ থেকে শুধু নবী মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাসের দ্বারই রুদ্ধ করা হয়নি, বরঞ্চ পূর্ববর্তী সকল নবী ও ইসলামী মনীষীর ব্যক্তিত্ব সমূহকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা হয়।

রসূলের শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা

অন্য যে বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্ট করে বয়ান করা হয়েছে তা হলো নবীর শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়টি। অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন কোন খোদার প্রেরিত মহাপুরুষকে খোদার সমার্থ বানিয়ে দিল, তখন স্বভাবতঃ এ ধারণা বিশ্বাসও সৃষ্টি হলো যে, খোদাপ্রেরিত লোক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। খোদার কর্মক্ষেত্রে তারা বিশেষ অধিকার লাভ করে থাকে। পুরস্কার ও শাস্তিদানের অধিকার তাদের থাকে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই তাদের কাছে সুস্পষ্ট। ভাগ্যের ফয়সালা তাদের মর্জি ও রায় অনুযায়ী রদবদল করা হয়। লাভ ও ক্ষতির উপরেও তাদের ক্ষমতা থাকে। ভালো মন্দেরও তারা মালিক। সৃষ্টজগতের সকল শক্তি তাদের অধীন। তারা একনজরে লোকের মন পরিবর্তন করে দিয়ে তাদের আঁধার ও পথ ভ্রষ্টতা দূর করে দিতে পারে। এ সব ধারণার বশবর্তী হয়েই লোক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আজব ধরনের ও উদ্ভট দাবী করতো। কুরআন বলে

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا - أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا - أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا - أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا - (بنی اسرائیل : ٩٠-٩٣)

–এবং তারা বল্লো ঃ আমরা ত কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনবনা যতোক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্যে যমীনে একটা ঝর্না প্রবাহিত করে দিয়েছ, অথবা তোমার জন্যে একটি খুরমা ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী হয়েছে এবং তার মধ্যে তুমি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করে দিয়েছ। অথবা তোমার দাবী অনুযায়ী আকাশকে খন্ড বিখন্ড করে আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। অথবা

আল্লাহ এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করাও। অথবা তোমার জন্যে একটি সোনার বাড়ি তৈরী হয়ে যায়। অথবা তুমি আকাশে চড়ে যাও এবং আকাশে চড়লেই তোমার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবনা যতোক্ষন না তুমি আমাদের এমন এক গ্রন্থ অবতরণ না করেছ যা পড়তে পারি।

হে মুহাম্মদ! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার রব সকল ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পাক ও পবিত্র। আমি কি মানুষ পয়গম্বর ব্যতীত অন্য কিছু? –(বনী ইসরাইল ঃ ৯০–৯৩)।

খোদার প্রেরিত মহাপুরুষ ও মনীষীবৃন্দের সম্পর্কে এ ধরনের যতো প্রকার ভ্রান্ত ধারণা লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, আল্লাহ তায়ালা তা সবই খন্ডন করেন এবং পরিষ্কার বলেন যে, খোদায়ী শক্তি ও খোদায়ী কাজকর্মে রসূলের তিল পরিমাণ অংশও নেই। বরঞ্চ একথাও বলা হয় ঃ আমাদের অনুমতি ব্যতীত নবী অন্যকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা ত দূরের কথা, স্বয়ং নিজের থেকে ক্ষতি দূর করারও শক্তি রাখেনা।

اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ (الانعام : ١٧)

–(হে নবী) খোদা যদি তোমার কোন ক্ষতি করেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ ক্ষতি দূর করতে পারে। আর তিনি যদি তোমার কোন মংগল করতে চান ত তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আনয়াম ঃ ১৭)।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ـ (يونس: ٤٩)

–(হে নবী) বলে দাও, আমি ত আমার নিজেরও কোন লাভ ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখিনা। অবশ্যি আল্লাহ চাইলে সে অন্য কথা–(ইউনুস ঃ ৪৯)।

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একথাও বলা হয়েছে যে, নবীর কাছে আল্লাহর ভান্ডারের কোন চাবি নেই, নবী ভবিষ্যতের জ্ঞানও রাখেন না এবং না কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ـ (الانعام : ٥٠)

আমি ফেরেশতা (অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধে)। আমি ত শুধুমাত্র তাই মেনে চলি যা আমার উপর অহী করা হয় (অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়)। (আনয়াম ঃ ৫০)।

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ (اعراف : ١٨٨)

–যদি আমি অদৃশ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখতাম, তাহলে আমার নিজের জন্যে বহু সুযোগ সুবিধা লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করতে পারতোনা। আমি ত নিছক একজন সতর্ককারী এবং তার জন্যে সুসংবাদদাতা যে আমার কথা মেনে নেবে। (আরাফ ঃ ১৮৮)।

আরও বলা হয়, আখেরাতের হিসাব নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে নবীর কোন হাত নেই। তার কাজ শুধু বাণী পৌছিয়ে দেয়া এবং সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া। আখেরাতে হিসাব নিকাশ নেয়া এবং শাস্তি অথবা পুরস্কার দেয়া খোদার কাজ।

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ـ (انعام: ٥٧-٥٨)

–(হে মুহাম্মদ) তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণসহ এসেছি এবং তোমরা তা মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছ। এখন এটা আমার এখতিয়ারে নেই যে, যে শাস্তি তোমরা ত্বরান্বিত করতে বলছো তা আমি স্বয়ং তোমাদের উপর নাযিল করব। ফয়সালা একেবারে আল্লাহর হাতে। তিনি প্রকৃত অবস্থা বয়ান করেন এবং তিনি উৎকৃষ্ট ফয়সালা করেন।

এদেরকে বলে দাও, সে শাস্তি যদি আমার এখতিয়ারে থাকতো যার জন্যে তোমরা এতো ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছ, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবে ফয়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু জালেমদের ব্যাপারে চূড়ান্ত করতে আল্লাহই ভালো জানেন– (আন্‌য়াম ঃ ৫৭–৫৮)।

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ـ (الرعد: ٤٠)

(হে নবী) তোমার কাজ ত শুধু পয়গাম পৌছিয়ে দেয়া। আর হিসাব নেয়ার কাজটা আমার। (রা'দ ঃ ৪০)।

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ـ (الزمر: ٤١)

(হে নবী) আমরা লোকের হেদায়েতের জন্যে তোমার উপর সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি। এখন যে কেউ হেদায়েত কবুল করে, সে তার নিজের জন্যেই ভালো করে। আর যে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়, সে নিজেরই জন্যে অন্যায়–অমংগল করে। আর তুমি তাদের উপর কোন হাবিলদার নও। (যুমার ঃ ৪১)।

আরও বলা হয়েছে যে মানুষের মন পরিবর্তন করে দেয়া এবং যাদের মনে হক গ্রহণ করার আগ্রহ নেই তাদের মধ্যে ঈমান পয়দা করা নবীর সাধ্যে নেই। সে পথপ্রদর্শক এ অর্থে যে, নসিহত করার যে হক, তা সে পুরোপুরি আদায় করে এবং যে পথ দেখতে চায় তাকে সে পথ দেখায়।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ـ (النمل: ٨٠-٨١)

–তুমি মৃতকে শুনাতে পারনা, আর না বোবার কাছে আওয়াজ পৌঁছাতে পার যখন সে মুখ ফিরে চলে যায়। আর না তুমি অন্ধকে গোমরাহী থেকে বের করে সোজা পথে এনে দিতে পার। তুমি ত শুধু তাদেরকেই শুনাতে পার যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে। অতঃপর আনুগত্যের মস্তক অবনত করে– (নমল ঃ ৮০–৮১)।

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ، إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ، إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - (فاطر: ٢٢-٢٤)

–তুমি কবরের মৃত ব্যক্তিদেরকে শুনাতে পারনা। তুমি শুধু সতর্ক করে দিতে পার। আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি। (১) (ফাতের ঃ ২২–২৪)।

এ কথাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, নবীর যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা, তা এ জন্যে যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করেন, ঠিকমতো তাঁর আদেশ মেনে চলেন, এবং যেসব কথা তাঁর উপর নাযিল করা হয়, তা অবিকল আল্লাহ্‌র বান্দাহদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। নতুবা তিনি যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতেন এবং আল্লাহর কালামের মধ্যে নিজের কল্পিত কোন কথার সংমিশ্রণ করতেন, তাহলে তাঁর কোন স্বাতন্ত্র্য–বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট থাকতোনা, এমনকি খোদার পাক্‌ড়াও থেকে বাঁচতেননা।

---

(১) কুরআনের এক স্থানে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

إِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ. (القصص: ٥٦)

হে নবী! তুমি যাকে চাও তাকে হেদায়েত করতে পারনা। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত করতে পারেন। তিনি তাদেরকে ভালো করে জানেন যারা হেদায়েত কবুলকারী।

সহীহ বুখারী–মুসলিমে বর্ণীত আছে যে, এ আয়াত নবী (সঃ) এর চাচা আবু তালেব সম্পর্কে নাযিল হয়। তাঁর যখন অন্তিম অবস্থা এলো তখন নবী (সঃ) চরম চেষ্টা করলেন যাতে তিনি (চাচা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা পড়েন এবং তাঁর খাতেমা বিল খায়ের হয় অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি (আবু তালেব) আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাকেই প্রাধান্য দিলেন। এজন্যে আল্লাহ বলেন, তুমি যাকে ভালোবাস তাকে হেদায়েত করতে পারনা।

কিন্তু মুহাদ্দেসীন ও তফসীরকারগণের এ পদ্ধতি সুবিদিত যে, একটি আয়াত নবীযুগের যে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট, সে আয়াতকে শানে নযুল হিসাবে বর্ণনা করেন। এজন্যে এ রওয়ায়েত এবং এ বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য রেওয়ায়েত– যা তিরমিযী, মুস্‌নাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থগুলোতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে ওমর (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণীত– থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না যে, সূরা কাসাসের এ আয়াত আবু তালেবের মৃত্যুর সময় নাযিল হয়েছিল। কিন্তু এর থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, এ আয়াতের সত্যতা সবচেয়ে অধিক এ ঘটনার সময় প্রকাশ পায়। যদিও নবী পাকের (সঃ) আন্তরিক বাসনা ছিল প্রত্যেক আল্লাহর বান্দাহকে সত্য পথে নিয়ে আসা। কিন্তু কোন ব্যক্তির কুফরের উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করাটা নবী (সঃ) এর কাছে সবচেয়ে কষ্টকর হয়ে থাকলে এবং ব্যক্তিগত ভালোবাসা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির হেদায়েতের জন্যে সবচেয়ে বেশী অভিলাষী হয়ে থাকলে– সে ব্যক্তি ছিলেন আবু তালেব। কিন্তু তাঁকেও হেদায়েতের পথে আনতে নবী (সঃ) সক্ষম হলেননা বলে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, কোন ব্যক্তিকে হেদায়েত করা এবং কাউকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত রাখা নবীর সাধ্যের অতীত। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পদ (হেদায়েতের সম্পদ) কোন আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয় বরঞ্চ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সত্য–প্রিয়তার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

(البقرة : ١٤٥)

এবং (হে নবী) তোমার নিকটে যে জ্ঞান এসেছে তা সত্ত্বেও তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহলে এমতাবস্থায় তুমি জালেম হয়ে পড়বে। (বাকারাহ ঃ ১৪৫)।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ۔ (البقرة : ١٢٠)

–(হে নবী) তোমার নিকটে জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কোন অলী ও সাহায্যকারী থাকবেনা (বাকারাহ ঃ ১২০)।

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤئِ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَىَّ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۔ (يونس: ١٥)

–(হে মুহাম্মদ) বলে দাও, আমার পক্ষ থেকে এ কালামের মধ্যে কিছু রদবদল করার এখতিয়ার আমার নেই। আমি ত শুধু তাই অনুসরণ করে চলি যা আমার উপর অহীর দ্বারা, নির্দেশ করা হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আমি ভয় করি–(ইউনুস ঃ ১৫)।

এসব কথা এজন্যে বলা হয়নি যে, মায়াযাল্লাহ, রাসূলে আকরাম (সঃ) এর পক্ষ থেকে নাফরমানী অথবা রদবদলের সামান্যতম কোন আশংকাও ছিল। প্রকৃত পক্ষে এর উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সামনে এ সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যে, নবী পাকের (সঃ) আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের দরবারে যে নৈকট্য লাভ হয়েছে তা এজন্যে নয় যে, নবীর সত্তার সাথে আল্লাহর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, বরঞ্চ নৈকট্য লাভের কারণ এই যে তিনি আল্লাহর চরম ও পরম অনুগত এবং আন্তরিকতাসহ তাঁর দাস।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) নবীগণের মধ্যে একজন

তৃতীয় যে বিষয়টি বার বার কুরআন মজিদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) কোন নতুন নবী নন। বরঞ্চ নবীগণের মধ্যে একজন এবং নবুয়তের ধারাবাহিকতার সংযোজক একটি অংশ বা আংটা যা সৃষ্টির সূচনা থেকে তাঁর আগমন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যার মধ্যে প্রত্যেক জাতি ও যুগের নবী–রসূলগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরআন হাকীম নবুয়ত ও রেসালাতকে কোন এক ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির মধ্যে সীমিত বা নির্দিষ্ট করেনা। বরঞ্চ সুস্পষ্ট করে একথা ঘোষণা করে যে, আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক জাতি, দেশ ও যুগে এ ধরনের পূতপবিত্র ব্যক্তি পয়দা করেছেন যারা মানব জাতিকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং পথভ্রষ্টতার ভয়াবহ পরিণাম থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ - (فاطر : ٢٤)

–এমন কোন জাতি ছিলনা যার মধ্যে কোন সতর্ককারীর আগমন হয়নি। (ফাতের ঃ ২৪)।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ -

(النحل : ٣٦)

–এবং আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন নবী রসূল পাঠিয়েছি (এ বাণীসহ) যে, আল্লাহর দাসত্ব আনুগত্য কর এবং তাগুতের দাসত্ব আনুগত্য থেকে বিরত থাক। (নহল ঃ ৩৬)।

এসব নবী ও সতর্ককারীদের মধ্যে একজন ছিলেন নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম। বহু স্থানে একথা বলা হয়েছে–

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى - (النجم : ٥٦)

–পূর্ববর্তী সতর্ককারীগণের মধ্যে আমি একজন সতর্ককারী (নজম ঃ ৫৬)।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - (يٰسٓ : ٣)

–হে মুহাম্মদ! তুমি রসূলগণের মধ্যে একজন (ইয়াসীন ঃ ৩)।

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحٰى اِلَىَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (الاحقاف : ٩)

–হে মুহাম্মদ, বলে দাও ঃ আমি কোন অভিনব রসূল নই। আমি জানিনা আমার সাথে কি আচরণ করা হবে এবং তোমাদের সাথেইবা কি আচরণ করা হবে। আমি ত সেই জিনিসের অনুসরণ করি যা আমাকে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। আমি ত একজন সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী (আহকাফ ঃ ৯)।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - (ال عمران : ١٤٤)

–মুহাম্মদ রসূল ব্যতীত কিছু নয় এবং তাঁর পূর্বেও অনেক রসূল অতিবাহিত হয়েছে– (আলে ইমরান ঃ ১৪৪)।

শুধু এতোটুকুই নয়, বরঞ্চ একথাও বলা হয়েছে যে, রসূলে আরবীর দাওয়াত তাই ছিল যার দিকে মানব জাতির জন্ম–সূচনা থেকে সত্যের আহ্বানকারী প্রত্যেক নবী আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। নবী মুহাম্মদ (সঃ) সেই স্বভাব ধর্মের প্রতিই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, যার আহ্বান প্রত্যেক নবী রসূল জানিয়েছেন।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ـ (البقرة : ١٣٦-١٣٧)

–বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপরে এবং সেই শিক্ষার উপরে যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে। ঐসবের উপরেও যা ইবরাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁদের সন্তানগণের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা কিছু দেয়া হয়েছিল মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করিনা এবং আমরা আল্লাহর অনুগত। অতএব তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তেমনি এ সব লোকও যদি ঈমান আনে, তাহলে তাঁরা সোজা–সরল পথের উপরই হবে। (বাকারাহ ঃ ১৩৬–১৩৭)।

কুরআনের এ বিশ্লেষণ এ সত্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনা যে, নবী মুহাম্মদ (সঃ) কোন নতুন ধর্ম বা দ্বীন সহ আগমন করেননি। অথবা পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কাউকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে অথবা কারো আনীত পয়গাম খন্ডন করার জন্যেও তিনি আসেননি। বরঞ্চ তাঁকে এজন্যে পাঠানো হয়েছিলো যে, যে সত্য দ্বীন প্রথম থেকেই সকল জাতির নবীগণ পেশ করে এসেছেন, এবং যাকে পরবর্তীকালে লোকেরা বিকৃত করেছে, সে দ্বীনকে সকল ভেজালমুক্ত করে তিনি পেশ করবেন।

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

এভাবে কুরআন মজীদ তার বাহকের সঠিক পরিচয় ও মর্যাদা বয়ান করার পর সেসব কর্মকান্ডের বর্ণনা দিচ্ছে, যার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। এ কাজ সামগ্রিকভাবে দুটি বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত। একটি শিক্ষা বিভাগ, অপরটি কর্ম বিভাগ।

নবীর শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী

এ বিভাগের কাজ নিম্নরূপ ঃ–

(১) আয়াত তেলাওয়াত, তাযকিয়ায়ে নফস এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ (ال عمران : ١٦٤)

প্রকৃতপক্ষে ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি আল্লাহতায়ালার বিরাট করুণা এই যে, তিনি তাদের জন্যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই এমন এক রসূলের আবির্ভাব করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনায়, তাদের আত্মশুদ্ধি করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। নতুবা তারা ত এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিল –(আলে ইমরান ঃ ১৬৪)।

তেলাওয়াতে আয়াত বা আয়াত পড়ে শুনানোর অর্থ আল্লাহর নির্দেশাবলী অবিকল শুনিয়ে দেয়া। তাযকিয়ার অর্থ লোকের চরিত্র ও তাদের জীবনকে মন্দ গুণাবলী, রীতিনীতি ও

ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, আচার আচরন এবং সঠিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিকাশ সাধন করা। কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর মহান গ্রন্থের সঠিক মর্ম বুঝিয়ে দেয়া, তাদের মধ্যে এমন দূরদৃষ্টি সৃষ্টি করা যাতে করে তারা আল্লাহর কিতাবের প্রকৃত গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। অতঃপর তাদেরকে সে হিকমত বা বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, যার ফলে তারা গোটা জীবনের সুদূর প্রসারিত বিভিন্ন দিকগুলোকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে পারে।

(২) দ্বীনের পরিপূর্ণতা

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا - (المائدة: ٣)

–আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সমাপ্ত করে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামের বিধিবিধানকে পছন্দ করলাম (মায়েদা ঃ ৩)।

অন্য কথায় কুরআন প্রেরণকারী তার বাহকের কাছে শুধুমাত্র তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শুনানো, লোকের আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) করা এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার খেদমতটুকুই গ্রহণ করেননি, বরঞ্চ তাঁর সে নেক বান্দাহর মাধ্যমে এ কাজগুলোকে পূর্ণত্বদান করেছেন। যেসব আয়াত ও কথা মানব জাতির কাছে পৌঁছাবার ছিল তা তাঁর (নবীর) মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যে সব অনাচার অমংগল থেকে মানব জীবনকে পরিশুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল সে সব তাঁর হাতে নির্মূল করেছেন। যে সব গুণবৈশিষ্ট্যের বিকাশ যে মর্যাদাসহ মানুষ ও সমাজের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নবীর নেতৃত্বে পেশ করেছেন। উপরন্তু কিতাব ও হিকমতের এমন শিক্ষা তাঁর মাধমে দান করিয়েছেন যে, ভবিষ্যতের সকল যুগে মহাগ্রন্থ কুরআন অনুযায়ী মানব জীবন গঠন করা যেতে পারে।

(৩) নবী পাকের তৃতীয় শিক্ষাগত কাজ ছিল সেসব মতপার্থক্যের রহস্য উদঘাটন করে দেয়া, যা পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। উপরন্তু সকল আবরণ উন্মোচন করে, সকল ভেজাল দূর করে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও জটিলতা নিরসন করে সেই সঠিক পথ আলোকিত করে দেয়া, যার অনুসরণ হরহামেশা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের একই মাত্র পথ ছিল।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - (النحل: ٦٣-٦٤)

খোদার কসম, হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বে আমারা বিভিন্ন জাতির জন্যে হেদায়েত পাঠিয়েছি। কিন্তু তারপর শয়তান তাদের ভ্রান্ত ক্রিয়াকর্মকে মনোমুগ্ধকর বানিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ আজ সে–ই তাদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে রয়েছে এবং তারা যন্ত্রণাময় শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে। আমরা তোমার উপর এ কিতাব শুধু এজন্যে নাযিল করেছি যে, তুমি সে সত্যকে তাদের সামনে

তুলে ধরবে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যাচ্ছে। আর এজন্যেও যে, এ কিতাব হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ হবে তাদের জন্যে যারা তার অনুসরণ মেনে নেবে (নমল ঃ ৬৩–৬৪)।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○ (المائدة : ١٥-١٦)

–হে আহলি কিতাব! তোমাদের নিকটে আমাদের রসূল এসেছে, যে তোমাদের নিকটে অনেক এমন বিষয় বিশদভাবে বয়ান করে, যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন কর, আর সে অনেক কিছু মাফ করে দেয়। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলোক এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। যারা এ গ্রন্থের আলোকে জীবন যাপন করে, আল্লাহ তাদেরকে এ গ্রন্থের মাধ্যমে সুখশান্তি ও নিরাপত্তার পথ দেখান, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসেন এবং সঠিক সরল পথে পরিচালিত করেন –(মায়েদাহ ঃ ১৫–১৬)।

(৪) নাফরমানদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো, ফরমাবরদারকে আল্লাহ তায়ালার রহমতের সুসংবাদ দান এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার–প্রসারও ছিল নবীর শিক্ষাদান কাজ।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا - (الاحزاب: ٤٥-٤٦)

হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং একটি আলোকদানকারী সূর্য বানিয়ে পাঠিয়েছি। (আহযাব ঃ ৪৫–৪৬)

নবীর বাস্তব কাজ

বাস্তব জীবনে ও তার কায়কারবারে যে কাজ নবীর দায়িত্বে ছিল তা নিম্নরূপ ঃ–

(১) সৎ কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, হালাল ও হারামের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেয়া এবং খোদা ব্যতীত অন্যের বাধানিষেধের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তস্বাধীন করা এবং তাদের চাপিয়ে দেয়া বোঝা লাঘব করা।

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (الاعراف: ١٥٧)

সে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্যে পাক জিনিস হালাল করে দেয় এবং নাপাক জিনিস হারাম করে দেয়। তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেয় এবং সেসব বাধানিষেধ রহিত করে দেয়, যার বন্ধনে আবদ্ধ ও দমিত হয়ে ছিল। অতএব যারা ঈমান আনবে, তার সহযোগিতা করবে এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে যা তার সাথে নাযিল করা হয়েছে, তারাই সাফল্য লাভকারী (আ'রাফ ঃ ১৫৭)।

(২) খোদার বান্দাহদের মধ্যে সত্য ও সুবিচার সহ ফয়সালা করা।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ (النساء: ١٠٥)

হে মুহাম্মদ, আমরা তোমার উপর সত্য সহকারে এ গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি আল্লাহর বলে দেয়া আইন–কানুন অনুযায়ী লোকের মধ্যে ফয়সালা কর এবং আত্মসাৎকারীদের উকিল না সাজ –(নিসা ঃ ১০৫)।

(৩) আল্লাহর দ্বীন এমনভাবে কায়েম করা, যাতে মানব জীবনের যাবতীয় ব্যবস্থা তার অধীন হয়ে যায় এবং তার মুকাবিলায় অন্যান্য যাবতীয় রীতিপদ্ধতি দমিত হয়ে যায়।

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ـ (الفتح: ٢٨)

–তিনি একমাত্র আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও দ্বীনে–হকসহ পাঠিয়েছেন, যেন সে যাবতীয় জীবন বিধানের উপরে তা বিজয়ী করতে পারে (আলফাত্‌হ ঃ ২৮)।

এভাবে নবীর কাজের এ বিভাগটি রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, নৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংস্কার এবং পূতপবিত্র সভ্যতার সকল দিককে পরিবেষ্টন করে রাখে।

নুবয়তে মুহাম্মদী বিশ্বজনীন ও চিরন্তন

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ কাজ কোন একটি জাতি, দেশ অথবা যুগের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। বরঞ্চ সমগ্র মানবজাতির জন্যে এবং সকল যুগের জন্যে একইভাবে প্রযোজ্য।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (سبا: ٢٨)

–হে মুহাম্মদ ! আমরা তোমাকে সকল মানুষের জন্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা করে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না (সাবা ঃ ২৮)।

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ - (الاعراف: ١٥٨)

–হে মুহাম্মদ! বলে দাও ঃ হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের জন্যে খোদার রসূল হয়ে এসেছি, সেই খোদার রসূল যিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ বা খোদা নেই– যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক। অতএব খোদার উপর ঈমান আন এবং তাঁর রসূল–উম্মী নবীর উপর, যে খোদা ও তার ফরমানগুলোর উপর ঈমান রাখে, তার অনুসরণ কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সরল সঠিক পথ পেয়ে যাবে। (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ - (الانعام: ١٩)

–হে মুহাম্মদ, বলে দাও। আমার প্রতি এ কুরআন অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারি এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার কাছে এ পৌছুবে– (আনয়াম ঃ ১৯)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ - (التكوير: ٢٧-٢٨)

–এ কুরআন ত একটি উপদেশমালা সকল দুনিয়াবাসীদের জন্যে। প্রতিটি ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তোমাদের মধ্যে সত্য পথের পথিক হতে চায় (তাকবীর ঃ ২৭–২৮)।

খতমে নবুওত

নবুয়তে মুহাম্মদীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নবুয়ত ও রেসালাতের ধারাবাহিকতা তাঁর, উপর এসে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তাঁর পর দুনিয়ায় আর কোন নবীর প্রয়োজন রইলো না।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ - (الاحزاب: ٤٠)

–মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। বরঞ্চ সে আল্লাহর রসূল এবং নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী (আহযাব ঃ ৪০)।

এ প্রকৃত পক্ষে নবুয়তে মুহাম্মদীর বিশ্বজনীনতার, চিরকালীনতার ও দ্বীনের পরিপূর্ণতার এক অনিবার্য ফল। যেহেতু উপরোক্ত বর্ণনার দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুয়ত সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্যে– কোন একটি জাতির জন্যে নয় এবং চিরকালের জন্যে, কোন একটি যুগের জন্যে নয় এবং যে কাজের জন্যে দুনিয়ায় নবীদের আগমনের প্রয়োজন ছিল, তা যখন চূড়ান্ত পূর্ণতায় পৌছে গেছে, সে জন্যে এ অত্যন্ত সংগত কথা যে তাঁর উপরে নবুয়তের ধারাবাহিকতা শেষ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টিকে স্বয়ং নবী (সঃ) অতিসুন্দরভাবে একটি হাদীসে বিশ্লেষণ

করেছেন। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টান্ত নবীদের মধ্যে এমন যে, কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করলো। সমস্ত গৃহটি নির্মাণ করে মাত্র একখানি ইটের স্থান খালি রাখলো। এখন যারাই গৃহটির চারদিকে চক্কর দিল তাদের মনে খটকা লাগার ফলে তারা বলতে লাগলো, যদি এ শেষ ইটখানিও এখানে রেখে দেয়া হতো তাহলে গৃহখানি একেবারে পূর্ণতা লাভ করতো। এখন নবুয়ত গৃহে যে ইটটির স্থান খালি পড়ে আছে, আমিই সেই ইট।

এ দৃষ্টান্ত থেকে খতমে নবুয়তের কারণ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। যখন দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে; আল্লাহর আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আদেশ নিষেধগুলো, আকীদাহ বিশ্বাস সমূহ, এবাদতবন্দেগী, তামাদ্দুন, সামাজিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি, মোটকথা, মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং দুনিয়ার সামনে আল্লাহর বাণী ও রসূলের উৎকৃষ্ট নমুনা এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যে, সকল প্রকার বিকৃতি ও এদিক সেদিক করা থেকে তাকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক যুগে তার থেকে পথনির্দেশনা লাভ করা যেতে পারে, তখন নবুয়তের আর কোন প্রয়োজন রইলোনা। প্রয়োজন শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়ার এবং পুনর্জাগরণের (রেনেসাঁর)। তার জন্যে হক্কানী ওলামা এবং সত্যনিষ্ঠ মুমেনদের জামায়াতই যথেষ্ট।

নবী মুহাম্মদের (সঃ) প্রশংসনীয় গুণাবলী

শেষ জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটি এই যে, এ গ্রন্থের বাহক ব্যক্তিগতভাবে কোন্ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে কুরআন মজীদ অন্যান্য প্রচলিত গ্রন্থাদির ন্যায় তাদের বাহকদের অতিরঞ্জিত প্রশংসার পথ অবলম্বন করেনি। তাঁর প্রশংসাকে কোন স্থায়ী বিষয়বস্তুও বানানো হয় নি। নিছক কথা প্রসংগে ইংগিতে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, এ পুণ্যাত্মার মধ্যে মানবতার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল।

(১) কুরআন বলে যে, তার বাহক চারিত্রিক গুণাবলীর শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিলেন।

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (ن: ٤)

–এবং হে মুহাম্মদ (সঃ), তুমি চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী (নূন ঃ ৪)

(২) কুরআন বলে যে, তার বাহক এমন একজন দৃঢ়–সংকল্প, দৃঢ়চিত্ত ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন যে, যখন তাঁর সমগ্র জাতি তাঁকে নির্মূল করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো এবং তিনি একজন সহযোগীসহ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন, সেই কঠিন বিপজ্জনক অবস্থায় তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেননি বরঞ্চ আপন সংকল্পে অটল ছিলেন।

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - (التوبه: ٤٠)

স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন কাফেরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল, যখন তিনি দুইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন এবং যখন দুজন গুহায় ছিলেন এবং যখন তিনি তার সাথীকে বলছিলেন চিন্তা করোনা আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন (তওবা ঃ ৪০)।

(৩) কুরআন বলে, তার বাহক একজন অত্যন্ত উদার–চেতা ও দয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন যিনি

তাঁর চরম শত্রুর জন্যেও ক্ষমা করার দোয়া করেন এবং অবশেষে আল্লাহকে এ চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দিতে হয় যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - (التوبه : ٨٠)

–তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না–(তওবা ঃ ৮০)

(৪) কুরআন বলে, তার বাহকের স্বভাবপ্রকৃতি ছিল অত্যন্ত নম্র। তিনি কোন দিন কারো প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেননি এবং এজন্যে দুনিয়া তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ - (آل عمران : ١٥٩)

–এ আল্লাহরই রহমত যে তুমি তাদের প্রতি বিনয়–নম্র। নতুবা তুমি যদি কর্কশভাষী ও পাষানহৃদয় হতে, তাহলে এ সব লোক তোমার চার পাশ থেকে কেটে পড়তো –(তওবা ঃ ১৫১)

(৫) কুরআন বলে, তার বাহক খোদার বান্দাহদেরকে সত্যসঠিক পথে আনার জন্যে মনের মধ্যে অস্থিরতা বোধ করতেন এবং গোমরাহীর জন্য তারা জিদ ধরে থাকলে মনে বড়ো কষ্ট পেতেন। এমন কি তাদের দুঃখে অধীর হয়ে পড়তেন।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا -
(الكهف : ٦)

–হে মুহাম্মদ (সঃ), এমন মনে হচ্ছে যে, তুমি তাদের জন্যে দুঃখে অভিভূত হয়ে প্রাণ হারিয়ে ফেলবে যদি তারা এ কথার উপর ঈমান না আনে –(কাহাফ ঃ ৬)।

(৬) কুরআন বলে, তার বাহক তাঁর উম্মতের জন্যে গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি তাদের শুভাকাংখী ছিলেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মর্মাহত হতেন। তাদের জন্যে তিনি ছিলেন দয়া ও স্নেহমমতার প্রতীক।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (التوبه : ١٢٨)

–তোমাদের নিকটে স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই এমন এক রসূল এসেছেন, যার কাছে সে প্রতিটি জিনিস কষ্টদায়ক হয় যা তোমাদের ক্ষতিকারক, যে তোমাদের কল্যাণকামী এবং আহলে ঈমানদের জন্যে বড়োই স্নেহশীল ও দয়ালু –(তওবা ঃ ১২৮)।

(৭) কুরআন বলে, তার বাহক শুধু তাঁর জাতির জন্যেই নয়, বরঞ্চ সমগ্র দুনিয়ার জন্যে রহমত স্বরূপ।

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء : ١٠٧)

–হে মুহাম্মদ (সঃ), আমরা তোমাকে সারা দুনিয়ার জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি –(আম্বিয়া ঃ ১০৭)।

(৮) কুরআন বলে, তার বাহক রাতে ঘন্টার পর ঘন্টা জেগে জেগে এবাদত করেন এবং খোদার স্মরণে দন্ডায়মান থাকেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ - (المزمل : ٢٠)

–হে মুহাম্মদ (সঃ), তোমার রব জানেন যে তুমি রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং কখনো অর্ধরাত, কখনো এক তৃতীয়াংশ রাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাক– (মুযাম্মেল ঃ ২০)।

(৯) কুরআন বলে, তার বাহক ছিল সত্যবাদী মানুষ। জীবনে কখনো তিনি সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি। অশুভ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হননি। আর না কখনো তিনি প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে হকের বিরুদ্ধে টু শব্দ করেছেন।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - (النجم: ٢-٣)

–(হে লোকেরা) তোমাদের ছাহেব না কখনো সত্য সরল পথ থেকে সরে পড়েছে, না সঠিক চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর না সে প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে কিছু বলে (নজম ঃ ২–৩)।

(১০) কুরআন বলে, তার বাহক সারা দুনিয়ার জন্যে অনুসরণযোগ্য আদর্শ এবং তাঁর গোটা জীবন পরিপূর্ণ নৈতিকতার সঠিক মানদন্ড।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - (الاحزاب: ٢١)

তোমাদের জন্যে রসূলের মধ্যে এক সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে –(আহযাব ২১)।

কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করলে তার বাহকের আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

যে কেউ কুরআন পড়লে স্বয়ং দেখতে পাবে যে, প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর বিপরীত এ গ্রন্থখানি তার বাহককে যে রঙে রঞ্জিত করে তা কতটা স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট এবং আবিলতা থেকে মুক্ত। এতে খোদায়ীর কোন লেশ নেই –আর না প্রশংসার কোন অতিরঞ্জন অত্যুক্তি। কোনরূপ অসাধারণ শক্তিও তাঁর প্রতি আরোপিত হয়নি। তাঁকে কাজকর্মে শরীকও বানানো হয়নি। আর না তাঁকে এমন সব দুর্বলতা–দোষত্রুটির দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছে যা একজন পথপ্রদর্শক এবং হকের প্রতি আহবানকারীর মর্যাদার পরিপন্থী। যদি ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য সকল গ্রন্থাবলী দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং শুধু কুরআন শরীফ রয়ে যায়, তথাপি নবী পাকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন ভুল বুঝাবুঝি, কোন সন্দেহ, সংশয়, ভক্তি শ্রদ্ধার কোন এটি হবার কোন অবকাশ থাকবে না। আমরা ভালোভাবে জানতে পারি যে, এ গ্রন্থের বাহক একজন পূর্ণত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সর্বোৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতার স্বীকৃতি দিতেন। কোন নতুন ধর্মের উদ্ভাবক তিনি ছিলেন না। কোন অতিমানব হওয়ার দাবীও তিনি করেননি। তাঁর দাওয়াত ছিল সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কিছু নির্দিষ্ট খেদমতের জন্যে তাঁকে আদেশ করা হয়েছিল। যখন তিনি এসব খেদমত পুরোপুরি আঞ্জাম দিলেন, তখন নবুয়তের ধারাবাহিকতা তাঁর উপর এসে সমাপ্তি লাভ করলো।[১]

(১) প্রকৃত পক্ষে এ প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯২৭ সালে 'আলজমিয়ত' পত্রিকায় 'হাবিব সংখ্যার' জন্যে। ১৯৪৪ সালে পুনর্বার তা তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়। তারপর এটি তাফহীমাত–২য় খন্ডে সন্নিবেশিত করা হয়। এখন এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার পূর্বে তার কিছু পরিবর্ধন সাধিত হয়–গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী মুহাম্মদের (সঃ) বংশ পরিচয়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

একথা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সর্বসম্মত যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশের সেই শাখা সম্ভূত যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) থেকে চলে এসেছে। এ বংশ পরম্পরা বনীইসমাইল নামে পরিচিত। নবী মুহাম্মদের (সঃ) জীবন চরিতের সাথে এ বিষয়ের সম্পর্ক এতো গভীর যে তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী থেকেই শুরু করতে হবে। কারণ তাছাড়া এটা বুঝতেই পারা যাবে না যে, ইরাকের এ বংশটি আরবের অভ্যন্তরে এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে পূণর্বাসিত হলো, এখানে তৌহীদপন্থীদের কেবলার ভিত্তি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আরবের অধিকাংশ উপজাতীয়দের সাথে নবী মুহাম্মদের (সঃ) কি সম্পর্ক ছিল যে কারণে তিনি কোন অপরিচিত নন, বরঞ্চ অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্বছিলেন।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইরাকবাসী ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি উর ইরাকের নমরূদ পরিবারের রাজধানী ছিল। খৃঃপূর্ব ২১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে গবেষক পন্ডিতগণের মতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আবির্ভাব ঘটে। উর ছিল তৎকালীন সভ্যতা সংস্কৃতি ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র। সেই সাথে এ ছিল সে জাতির শির্ক কুফুরের দূর্গ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন এ জাতির শির্কের বিরোধিতা ও তৌহীদের দাওয়াতের সূচনা করেন তখন সরকার, সমগ্র জাতি, তাঁর আপন পরিবার এমন কি তাঁর পিতা পর্যন্ত তাঁর শত্রু হয়ে গেল। সকলে মিলে তাঁকে ধমক দিয়ে ও ভীতিপ্রদর্শন করেও যখন তাঁকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে জীবিত জ্বালিয়ে মারার জন্য এক বিরাট অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্যে আগুনকে শীতল করে দেন এবং তিনি এ অগ্নিকুন্ড থেকে জীবিত ও সুস্থাবস্থায় বেরিয়ে আসেন। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (আম্বিয়া ঃ ৬৮–৬৯, আনকাবুত ২৪, সাফ্ফাত ঃ ৯৭–৯৮ দ্রষ্টব্য)।

কুরআনের বর্ণনা মতে অতপর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি পরিত্যাগ করে শাম ও ফিলিস্তিনের দিকে হিজরত করেন। সে কালে এসব স্থানকে বলা হতো কান্‌য়ান্‌ ভূমি। এ হিজরতে তাঁর সাথী ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আঃ)। কারণ তাঁর জাতির মধ্যে তিনিই ঈমান এনেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নবীর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দ্বিতীয় সংগিনী ছিলেন তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আঃ) যিনি আজীবন তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। এ প্রসংগে কুরআন বলে ঃ

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ
الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ - (الصّٰفّٰت: ٩٧-٩٨)

–তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো তার জন্যে এক অগ্নিকুন্ড তৈরী কর এবং এ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে তাকে নিক্ষেপ কর। তারা তার বিরুদ্ধে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে লাঞ্ছিত করলাম এবং ইব্রাহীম (আঃ) বল্লো, আমি আমার রবের দিকে চল্লাম অর্থাৎ হিজ্বরত করছি। তিনিই আমাকে সুপথ দেখাবেন–(সাফ্ফাত ঃ ৯৭–৯৮)।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ..... فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

(العنكبوت : ٢٤-٢٦)

–অতঃপর তার জাতির জবাব এ ছাড়া আর ছিলনা, তারা বল্লো তাকে মেরে ফেল অথবা জ্বালিয়ে দাও। সবশেষে আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। সে সময়ে লূত হযরত ইব্রাহীমকে মেনে নিল। এবং ইব্রাহীম বল্লো, আমি আমার রবের দিকে হিজ্বরত করছি। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞ (আনকাবুত ঃ ২৪–২৬)।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۔ (الانبياء : ٧١)

–আমরা তাকে (ইব্রাহীম) ও লূতকে রক্ষা করে সেই ভূখন্ডের দিকে নিয়ে গেলাম যার মধ্যে আমরা বিশ্ববাসীর জন্যে অগণিত বরকত রেখে দিয়েছি [১] (আম্বিয়া–৭১)।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۔ (الانبياء : ٧٤)

এবং লূতকে আমরা হুকুম ও এলম অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছি–(আম্বিয়া ঃ ৭৪)।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ (الصّٰفّٰت : ١٣٣)

এবং লূতও তাদের মধ্যে ছিল যাদেরকে রসূল বানানো হয়েছে (সাফ্ফাত ঃ ১৩৩)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এ হিজ্বরতের পর তাঁর জাতির কি দশা হয়েছিল তার কোন বিশদ বিবরণ কুরআনে নেই। তবে সূরা তওবার ৭০ আয়াতে যেসব জাতি শাস্তিলাভ করে তাদের সাথেই এ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে এইযে, এ হিজ্বরতে হযরত লূতের সাথে হযরত সারাও হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সাথে ছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনে কোন বিশ্লেষণ নেই। কিন্তু কুরআনের কিছু বর্ণনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী হিজরতে তাঁর সহগামিনী ছিলেন। যেমন সূরা সাফ্ফাতে আছে, হিজ্বরতের সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ দোয়া করতেন

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

–হে খোদা আমাকে নেক সন্তান দান কর। এ দোয়া একজন বিবাহিত লোকই করতে পারতো এবং তাও এমন সময়ে যখন তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত কালে এ দোয়া

---

(১) বরকতপূর্ণ ভূখন্ড বলতে শাম ও ফিলিস্তিনের এলাকা বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৭, বনীইসরাইল ১ আম্বিয়া ঃ ৮১ –আয়াতগুলোতে এ অঞ্চলকে বরকতপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (তাফহীম – ৪র্থ খন্ড – সাবা – টীকা ৩১ দ্রঃ)

করছিলেন। বাইবেলের ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, এ হিজরতে হযরত সারা সাথে ছিলেন। কিন্তু বাইবেলের অন্যান্য বর্ণনা আবার একেবারেই অমূলক। যেমন বলা হয়েছে যে, হযরত সারা হযরত লূতের সহোদরা ভগ্নি এবং হযরত ইব্রাহীমের আপন ভাতিজি। পরে তাঁকে তিনি বিয়ে করেন। আরও বলা হয়েছে যে এ হিজরতে হযরত ইব্রাহীমের সাথে তাঁর পিতাও ছিল (সৃষ্টিতত্ত্ব, GENESIS– অধ্যায় ১১ শ্লোক – ২৭–৩২)। বস্তুত শুধু কুরআনই নয়, বরঞ্চ তালমূদও এ সাক্ষ্য দেয় যে, তৌহীদের দাওয়াতের কারণে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) উপর যে জুলুম অত্যাচার করা হয়েছিল, তাতে তাঁর পিতারও হাত ছিল। (তালমূদ থেকে নির্বাচিত –এইস –পোলানো– লন্ডন –পৃঃ ৪০–৪২)। উপরন্তু খোদার কোন শরিয়তেই আপন ভাতিজিকে বিয়ে করা জায়েয নয়, একজন নবীর পক্ষে একাজ করা ত দূরেরকথা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রচার তৎপরতা

হযরত নূহের (আঃ) পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন প্রথম নবী যাঁকে আল্লাহতায়ালা ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত ছড়াবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি প্রথমে স্বয়ং ইরাক থেকে মিশর এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে আরব মরুর বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের পর বছর ধরে ঘুরাফেরা করে লোকের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগী ও আনুগত্যের তথা ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। অতঃপর তাঁর এ মিশনের প্রচারকার্যের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর খলিফা নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্দানে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র লূতকে (আঃ) সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে আপন কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাককে (আঃ) এবং আরবের অভ্যন্তরে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইলকে (আঃ) নিযুক্ত করেন। তারপর আল্লাহতায়ালার নির্দেশে মক্কায় সে ঘর নির্মাণ করেন যার নাম কা'বা এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশেই তাঁর মিশনের কেন্দ্র হিসাবে উক্ত ঘরকে নির্ধারিত করা হয়।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) বংশ থেকে দুটি বিরাট শাখা উদ্ভূত হয়। একটি হযরত ইসমাইলের (আঃ) সন্তানগণকে নিয়ে যারা আরবে রয়ে যান। কুরাইশ এবং আরবের কতিপয় গোত্র এ শাখার সাথে সম্পৃক্ত। আরবের যে সকল গোত্র বংশীয় দিক দিয়ে হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশধর ছিলনা তারাও যেহেতু তাঁর প্রচারিত ধর্মের দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত ছিল, সে জন্যে তারা তাদের ধারাবাহিকতা তাদের সাথেই সম্পৃক্ত করেছিল।*

দ্বিতীয় হযরত ইসহাকের (আঃ) বংশধর। এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), মূসা (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ইয়াহ্ইয়া (আঃ), ঈসা (আঃ) এবং আরও বহু নবী । হযরত ইয়াকুবের (আঃ) নাম ইসরাইল ছিল বলে এ বংশ বণীইসরাইল নামে অভিহিত হয়। তাঁদের প্রচারের ফলে যে সব জাতি তাঁদের দ্বীন গ্রহণ করে তারা হয়তো তাদের স্বাতন্ত্র তাদের মধ্যেই একাকার করে দেয় অথবা বংশীয় দিক দিয়ে পৃথক থাকে। তথাপি ধর্মী দিক দিয়ে তাদের অনুসারী হয়ে থাকে। এ শাখাটিতে যখন বিকৃতি অধঃপতন দেখা দেয়, তখন প্রথমে ইহুদীবাদ এবং পরে খৃষ্টবাদ জন্মলাভ করে।

নবী আকরামের (সঃ) যুগ পর্যন্ত আড়াইহাজার বছর যাবত বনী ইসমাইলের বিভিন্ন পরিবার আরবের বহু পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মানবসুলভ স্বভাব অনুযায়ী হযরত ইসমাইলের পূতপবিত্র পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে গৌরবজনক মনে করতো এবং বংশতালিকায় এর উল্লেখ করতো –গ্রন্থকার।

* যেহেতু নবী (সঃ) এর যুগ পর্যন্ত আড়াই হাজার বছর যাবত হযরত ইসমাইলের (আঃ) বিভিন্ন পরিবার আরববাসীর বহু পরিবারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, এ জন্যে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি অনুযায়ী এ সব বিভিন্ন পরিবার এ মহান পরিবারের সাথে আত্মীয়তাকে গৌরবজনক মনে করতো এবং নিজেদের নসব নামায় তার উল্লেখ করতো –(গ্রন্থকার)।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আসল কাজ ছিল দুনিয়াকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত মুতাবিক মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত করা। তিনি স্বয়ং ছিলেন আল্লাহর অনুগত। তিনি তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানের অনুসরণ করতেন। দুনিয়ায় সে জ্ঞান প্রচার করতেন। এ মহান খেদমতের জন্যই তাঁকে বিশ্ব নেতৃত্বে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর পরে এ নেতৃত্বের পদমর্যাদা তাঁর বংশের সেই শাখার উপর অর্পিত হয় যা হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) থেকে শুরু হয় এবং বণী ইসরাইল নামে অভিহিত হয়। এ বংশেই নবী জন্মলাভ করতে থাকেন। তাঁদের সেই সঠিক পথের জ্ঞান দান করা হয়। তাঁদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, দুনিয়ার জাতি সমূহকে তাঁরা সঠিক পথের নেতৃত্ব দিবেন। এ ছিল সে নিয়ামত যার প্রতি আল্লাহতায়ালা কুরআনের মাধ্যমে তাঁদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ শাখাটি হযরত সুলায়মান (আঃ) এর যুগে বায়তুল মাক্‌দেস্‌কে তার কেন্দ্র নির্ধারিত করে। এ কারণে যতোদিন এ শাখাটি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিল। বায়তুল মাক্‌দেস্‌ দাওয়াত–ইলাল্লাহর কেন্দ্র এবং খোদা পুরস্তদের কেবলা হয়ে থাকে।

হযরত ইসমাইল (আঃ) এর জন্ম

ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তানদের দ্বিতীয় শাখাটি বণীইসরাইল। এ শাখাটির মধ্যে যে দোষক্রটি ছিল তার মধ্যে একটি এই যে তারা ইতিহাসকে বিকৃত করে প্রত্যেক গর্বের বস্তু নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেয়। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে যে সব জাতির সাথে তাদের সংঘাত সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তাদেরকে কলংকিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা তারা করে। বাইবেলে এর বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি এই যে, তার দৃষ্টিতে হযরত লূত (আঃ) মোটেই কোন নবী ছিলেন না। কোন দাওয়াতী কাজের জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে সাদূম ভূখন্ডেও পাঠাননি। বরঞ্চ উভয় চাচা ভাতিজার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয় এবং চাচা ভাইপোকে অন্যত্র কোথাও গিয়ে বসবাস করতে বলেন–(সৃষ্টিতত্ত্ব–অধ্যায় ১৩, শ্লোক ঃ ৫–১৩)। এর থেকে অধিকতর ঘৃণার্হ দৃষ্টান্ত এই যে, বাইবেলের দৃষ্টিতে লূত জাতির উপর শাস্তি নেমে এলো, তখন লূত (আঃ) তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর সাদূমের নিকটবর্তী ফিলিস্তিনের হাবরুন শহরে বসবাসকারী আপন চাচা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নিকটে না গিয়ে একটি গুহায় অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে–মায়াযাল্লাহ, তাঁর কন্যাদ্বয় তাঁকে মদ্যপানে মদমত্ত করে তাঁর সাথে জড়িত হয় এবং ফলে উভয়ে গর্ভ ধারণ করে। একজনের গর্ভ থেকে মুআব জন্মগ্রহণ করে যে মুআবীদের পূর্বপুরুষ এবং অন্যজনের গর্ভ থেকে বিন্‌আম্মী জন্মগ্রহণ করে যে বনী আম্মুনের পূর্বপুরুষ (সৃষ্টিতত্ত্ব–অধ্যায় ১৯, শ্লোক ঃ ৩০–৩৮)। এভাবেই বনী ইসরাইল মুআবী ও আম্মুনীদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে মনের ঝাল ঝেড়েছে। কারণ পরবর্তীকালের ইতিহাস এ সাক্ষ্য দেয় যে, এদের সাথে বনী ইসরাইলের চরম সংঘাত–সংঘর্ষ চলে।

এ ধরনের আচরণ তারা বনী ইসমাইলের প্রতিও করেছে। বাইবেলে বর্ণীত আছে যে, হযরত ইসমাইলের মাতা হযরত হাজেরা হযরত সারার ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত সারা নিঃসন্তান ছিলেন বলে একদিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে বলেন, আপনি আমার ক্রীতদাসীর সঙ্গে মিলিত হন, যাতে করে আমার পরিবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। অতএব তাঁর কথামত হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত হাজেরার সাথে মিলিত হন এবং হযরত ইসমাইলের জন্ম হয়–(সৃষ্টিতত্ত্ব–

অধ্যায় ১৬, শ্লোক ঃ ১–৪, ১৫–১৬)। অথচ বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে অধ্যায় ১৬ এবং শ্লোক ১৬ বলে, তৎকালীন ফেরাউন বিপুল ধন সম্পদ, গবাদি পশু, চাকর–চাকরানি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে উপঢৌকন স্বরূপ দান করে। সে সবের মধ্যে হযরত হাজেরাও ছিলেন।[১] এজন্যে হযরত হাজেরাকে হযরত সারার ক্রীতদাসী বলা স্বয়ং বাইবেলের দৃষ্টিতেও ভুল। তাঁর সাথে যৌনমিলনের জন্যে হযরত সারার অনুমতিরও কোন প্রয়োজন ছিলনা।

বাইবেলে আরও আছে যে হযরত ইসমাইল (আঃ) ফিলিস্তিনেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর সাথে ছিলেন। এমন কি যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঔরসে হযরত সারার গর্ভে হযরত ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন ((সৃষ্টিতত্ত্ব–অধ্যায় ১৮, শ্লোক ঃ ২৪–২৬, অধ্যায় ২১, শ্লোক ঃ ১–৫)। তারপর বাইবেল বলে ঃ–

"এবং সে ছেলে (অর্থাৎ হযরত ইসহাক) বড়ো হয় এবং দুধ ছাড়ানো হয়। তার দুধ ছাড়াবার দিনে ইব্রাহীম (আঃ) বিরাট খানা পিনা ও আপ্যায়নের আয়োজন করেন। সারা যখন দেখলেন যে হাজেরার মিশরীয় পুত্র–যে ছিল ইব্রাহীমের ঔরসজাত–হাসি–খুশি করছে। তখন সারা ইব্রাহীমকে বল্লেন– এ ক্রীতদাসী ও তার পুত্রকে বের করে দিন কারণ এ ক্রীতদাসীর পুত্র আমার পুত্রের ওয়ারিশ হবেনা। একথা ইব্রাহীমের বড়ো খারাপ লাগলো। খোদা ইব্রাহীমকে বল্লেন, এ পুত্র এবং তোমার ক্রীতদাসীর ব্যাপারে মনে কিছু করোনা। সারা তোমাকে যা বলছে তা মেনে নাও----অতঃপর পরদিন সকালে ইব্রাহীম ঘুম থেকে উঠে রুটি এবং পানির মশক হাজেরার কাঁধে তুলে দিয়ে পুত্রসহ তাকে বিদায় করে দিলেন। সে চলে গেল এবং সাবা কূপের বিজন প্রান্তরে ভবঘুরের মতো ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। মশকের পানি শেষ হওয়ার পর সে তার পুত্রকে একটি ঝোপের নীচে নিক্ষেপ করলো। সে সামান্য দূরে গিয়ে বসলো এবং বলতে লাগলো– আমি এ ছেলের মৃত্যু দেখবোনা। সে তার সামনে বসে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। খোদা ঐ পুত্রের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং খোদার ফেরেশতাগণ আসমান থেকে হাজেরাকে ডেকে বল্লেন, হাজেরা! তোমার কি হয়েছে? ভয় করোনা, কারণ, যে স্থানে ছেলেটি পড়ে আছে সেখান থেকে খোদা তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। উঠ এবং ছেলেকে উঠাও। হাত দিয়ে তাকে সামলাও। কারণ তাকে আমি বিরাট জাতিতে পরিণত করব। খোদা তার চোখ খুলে দিলেন। সে একটি পানির কূপ দেখতে পেল। সেখানে গিয়ে মশকে পানি ভরলো। ছেলেকে পান করালো। খোদা সে ছেলের সাথে ছিল। সে বড়ো হলো এবং বিজন প্রান্তরে থাকতে লাগলো। সে তীরন্দাজ হয়ে পড়লো। সে ফারাম প্রান্তরে বসবাস করছিল। তার মা মিশর থেকে তাঁর জন্যে তার স্ত্রী নিয়ে এলো– (সৃষ্টিতত্ত্ব–অধ্যায় ২১, শ্লোক ঃ ৮–২১)।

এ মিথ্যা কাহিনী এ জন্যে রচনা করা হয়েছে, যাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর আরব, মক্কা, কাবা এবং যমযম কূপের সাথে কোন সম্পর্ক প্রমাণিত না হয়। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আরব সফরের উপর যদি আবরণ টেনে দেয়া হয়, হযরত ইসমাইল (আঃ) এর চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ফিলিস্তিনে অবস্থান এবং তার পর ফারানের বিজন প্রান্তরে তাঁর অবস্থান, তথায় পানির কূপ আবিস্কার এবং মিশরীয় কোন নারীর সাথে তাঁর বিবাহবন্ধন প্রভৃতির উল্লেখ ইসলামী ইতিহাসের সে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বিলুপ্ত করে দেয় যা

(১) হযরত হাজেরা (রাঃ) একটি গ্রামের অধিবাসিনী ছিলেন, যাকে উম্মুল আরব অথবা উম্মুল আরীক বলে। এ পূর্ব মিশরের ফারামা অথবা আত্তীনার সামনে রোম সাগরের তীর থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত। ফেরাউনের যুগে এখানে একটি দুর্গ ছিল, আজকাল তাকে তাল্লুল ফারান বলে– গ্রন্থকার।

দ্বীনে ইব্রাহীমের আরব কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত। ফারানের যে বিজন প্রান্তরের উল্লেখ বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে, তার দৃষ্টিতে তা অবস্থিত ছিল ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আবাবা উপত্যকার পশ্চিমে, সিনাই মরুভূমির–উত্তরে এবং মিশর ও রোমসাগরের পূর্বে। ফারান পর্বতের সাথে আরবের কোন সম্পর্কই ছিলনা যেখানে মক্কা অবস্থিত। উপরন্তু এ কাহিনীতে হযরত সারা (রাঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যে ঘৃণ্য চরিত্র অংকন করা হয়েছে যার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালাকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে, এর থেকে স্বয়ং বনী ইসরাইলের নৈতিক ধ্যান ধারণার একটা ঘৃণ্য ও জঘন্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এতে একজন নবীর (হযরত ইব্রাহীম (আঃ)) স্ত্রী এবং অন্য একজন নবীর (হযরত ইসহাক) মা এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, মা তার সতীনের ছেলের হাসিকেও বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয় এবং স্বামীকে বাধ্য করছে পুত্রকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে পরিবার থেকে বহিষ্কার করে দিতে। স্বামী যিনি একজন মহাসম্মানিত নবী, তাঁকে এমনভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে যে তিনি তাঁর পনেরো ষোল বছরের পুত্রকে তার মাতামহ শুধুমাত্র রুটি ও এক মশক পানি দিয়ে বিজন প্রান্তরে নির্বাসিত করছেন এবং তাদের জীবন মরণের কোন পরোয়া করছেননা। ওদিকে আল্লাহতায়ালার মর্যাদাও এভাবে দেখানো হচ্ছে যে, তিনি বনী ইসরাইলের পূর্ব পুরুষ হযরত ইসহাক (আঃ) এবং তাঁর মায়ের জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হযরত ইসহাকের মা স্বীয় সতীনের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তার প্রতি যে জুলুম অবিচার করার দাবী তুলেছেন তা যেন তিনি (হযরত ইব্রাহীম) মেনে নেন। এ গোটা কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক কল্পনারই এক সমষ্টি।

পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা সঠিক ইতিহাস জানতে পারি। আরববাসীর মধ্যে বংশানুক্রমে চলে আসা চার হাজার বছর যাবত অসংখ্য অগণিত মানুষের বারংবার বর্ণনা বিবৃতি এ ইতিহাসের সাক্ষ্যদান করে।

কুরআন বলে, হযরত ইব্রাহীম জন্মভূমি থেকে হিযরত কালে আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করেন–

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ (الصّٰفّٰت : ١٠٠)

–হে খোদা! আমাকে নেক সন্তান দান কর। (সাফ্‌ফাত ঃ ১০০)।

দীর্ঘ কাল অতীত হওয়ার পর এ দোয়া কবুল করা হয় যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অতি বার্ধক্যে পৌছেন। কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এ উক্তি উধৃত করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ـ (ابراهيم : ٣٩)

ঐ আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে আমার বার্ধক্য অবস্থায় ইসমাইল ও ইসহাক (দুই পুত্র সন্তান) দান করেছেন– (ইব্রাহীম ঃ ৩৯)।

এ দুই সন্তানের জন্মের আগে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। প্রথমে হযরত ইসমাইলের (আঃ) সুসংবাদ এভাষায় দেয়া হয় ঃ–

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ـ (الصّٰفّٰت : ١٠١)

–অতঃপর আমরা তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেই (আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ১০১)। তার কয়েক বছর পর যখন ইসমাইল (আঃ) প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেন, দ্বিতীয় পুত্রের সুসংবাদ এভাবে দেয়া হয়–

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ - (الذّٰرِيٰت : ٢٨)

(–এবং ফেরেশতাগণ তাকে (অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) কে) একজন জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দেয়– (যারিয়াত ঃ ২৮)। এ দ্বিতীয় সুসংবাদ দেয়া হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন–

اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ - (الحجر: ٥٤)

–তোমরা কি আমাকে আমার বার্ধক্যে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু ভেবে ত দেখ এ কোন্ ধরনের সুসংবাদ দিচ্ছ – (হিজর ঃ ৫৪)। এ সুসংবাদে সারার এ অবস্থা হয়েছিল–

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ - (الذّٰرِيٰت:٢٩)

–তার স্ত্রী চিৎকার করে সামনে এগিয়ে গেল এবং সে তার মুখ ঢেকে ফেল্লো এবং বল্লো– আমি বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা–(যারিয়াত ঃ ২৯)।

এ সব আয়াতের ভিত্তিতে বাইবেলের নিম্ন বর্ণনা সঠিক মনে করা যেতে পারে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ৮৬ বছর বয়সে হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং একশ' বছর বয়সে হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন – (সৃষ্টিতত্ত্ব–অধ্যায়–১৬, শ্লোক–১৬, অধ্যায়–২১ শ্লোক–৫)।

হযরত ইসমাইলের (আঃ) মক্কায় পুনর্বাসন

উপরের আলোচনায় একথা জানতে পারা গেল যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) তাঁর পিতার প্রথমপুত্র এবং পিতার বার্ধক্যাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এমন বয়সে কোন পিতার সন্তান লাভ এ দাবী রাখতো যে, তিনি তাঁর এ প্রথম পুত্র এবং চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত একমাত্র পুত্রকে স্নেহভরে বুকে জড়িয়ে রাখবেন। চোখের আড়াল হওয়াটাও তিনি সহ্য করবেন না। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নবী ছিলেন এবং সে কারণেই তিনি হকের দাওয়াতকেই অগ্রাধিকার দিতেন যার জন্যে আপন জন্মভূমিতে অশেষ জুলুম অবিচার সহ্য করেন, হিজরত করে ভিনদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান এবং প্রত্যেক স্থানে খোদার পয়গাম পৌঁছাবার কাজে তাঁর সকল শক্তি ও শ্রম ব্যয় করেন। এ প্রিয় সন্তানের জন্মের পর তাঁর সর্বপ্রথম মনের মধ্যে চিন্তার উদয় হয় যে, কি করে আরব দেশে তৌহীদি দাওয়াতের সে কেন্দ্র স্থাপন করা যায় যেখান থেকে শেষ নবীর আর্বিভাব হওয়ার কথা এবং যে কেন্দ্রটি কিয়ামত পর্যন্ত তৌহীদি দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে অক্ষুন্ন থাকবে। কুরআন আমাদেরকে একথা বলে যে আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে এ স্থানটি চিহ্নিত করে দেন যেখানে এ কেন্দ্র নির্মাণ বাঞ্ছিত ছিল। বস্তুত সূরায়ে হজ্বে বলা হয়েছে–

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ -

–স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন আমরা ইব্রাহীমের জন্যে এ ঘরের (খানায়ে কাবা) স্থান নির্দিষ্ট করে দিই –(হজ্ব ঃ ২৬)।

এ নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর এ মহান বান্দাহকে তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে অসাধারণ ধৈর্যশীলা ও আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা মাতাসহ ঠিক সেইস্থানে দৃশ্যতঃ একেবারে অসহায় অবস্থায় ফেলে আসেন যেখানে অবশেষে তাঁকে খানায়ে কাবা নির্মাণ হতে হতো।

বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া

হয়েছে। এ বর্ণনায় যেভাবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্থানে স্থানে নবী করীমের (সঃ) বক্তব্য উধৃত করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, যা কিছু তিনি বয়ান করেছেন তা নবীর কাছে শুনেই করছেন। তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা (রাঃ) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য পুত্রসন্তান ইসমাইল (আঃ) কে এনে একটি গাছের নীচে এমন স্থানে রেখে গেলেন, যেখানে পরে যমযমের উদ্রেক হলো। মক্কার জনবিরল উপত্যকায় সেকালে কোন মানুষ ছিলনা, আর না কোথাও পানি পাওয়া যেতো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চামড়ার থলিতে খেজুর এবং এক মশক পানি হযরত হাজেরা (রা) কে দিয়ে চলে যান। হযরত হাজেরা তাঁর পেছনে চলতে চলতে বলতে থাকেন, হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এ শুষ্ক তরুলতাবিহীন বিজন প্রান্তরে ফেলে কোথায় চল্লেন? একথা হযরত হাজেরা (রা) কয়েকবার বলেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ফিরেও তাকালেন না'[১] অবশেষে হযরত হাজেরা (রাঃ) বল্লেন- আল্লাহ কি আপনাকে এ কাজ করার আদেশ করেছেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শুধু এতোটুকু বল্লেন, হাঁ। একথায় হাজেরা (রাঃ) বল্লেন, যদি তাই হয় তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। একথা বলে তিনি ফিরে এসে সন্তানের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পাহাড়ের আড়ালে গেলেন যেখান থেকে মা ও পুত্রকে দেখা যায় না এবং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে (যেখানে তাঁকে সে ঘর তৈরী করতে হতো) এ দোয়া করলেন

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ - (ابراهيم: ٣٧)

-হে খোদা! আমি একটি পানি ও তরুলতাবিহীন প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার পবিত্র ঘরের পাশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে রেখে গেলাম, যেন তারা নামায কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মন তাদের জন্য অনুরক্ত করে দাও এবং তাদেরকে খাবার জন্যে ফলমূলাদি দান কর। সম্ভবতঃ তারা শোকর গোজার হবে-(ইব্রাহীম ঃ ৩৭)।

এদিকে ইসমাইলের (আঃ) মাতা তাকে দুধ পান করাতে থাকেন এবং নিজেও মশকের পানি পান করতে থাকেন। পানি শেষ হয়ে গেলে তাঁকে ও সন্তানকে পিপাসা লাগলো। তিনি সন্তানকে পিপাসায় ছটফট করতে দেখে ঠিক থাকতে পারলেননা। তিনি উপত্যকার দিকে ছুটে গেলেন যে লোক জন দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখা গেলনা। তারপর সাফা পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার মাঝখানে এলেন। তারপর দুই বাহু উত্তোলন করে এমনভাবে দৌড় দিলেন, যেমন ধারা কোন বিপন্ন মানুষ দৌড় দেয়। তারপর মারওয়া পাহাড়ে চড়ে দেখতে লাগলেন কোথাও কোন মানুষ নজরে পড়ে কিনা। কিন্তু কাউকে নজরে পড়লোনা এভাবে তিনি সাতবার সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন

(১) ফিরে না তাকাবার অর্থ নির্দয়তা ও অবহেলা-উপেক্ষা নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান নবী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ অবশ্যই ছিলেন, আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনের জন্যে তিনি এতোবড়ো বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন যে পাহাড় ঘেরা জনবিরল প্রান্তরে তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ও তার মাকে ফেলে যাচ্ছেন। তখন তাঁর মনের যে কি অবস্থা ছিল তা এ অবস্থা দৃষ্টে অবশ্য ধারণা করা যেতে পারে। এ অবস্থায় তিনি যদি স্ত্রী ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে দেখতেন তাহলে মন ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে পড়তো। এজন্যে বুকের উপর পাথর রেখে এগিয়ে চল্লেন। পশ্চাদগামিনী স্ত্রীর বার বার প্রশ্নের জবাবে তাঁর দিকে না দেখেই শুধু হাঁ বল্লেন।

এ কারণেই লোক সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন।[১] শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ে চড়েন, তখন তিনি একটা আওয়াজ শুনতে পান। তারপর নিজের মনেই বল্লেন "চুপকর" (অর্থাৎ হৈ চৈ করোনা) তখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। পুনরায় আওয়াজ এলে তিনি বল্লেন, 'হে মানুষ তোমার আওয়াজ আমাকে শুনালে । এখন আমার আবেদন পূরণের জন্যে তোমার নিকটে কি কিছু আছে?

হঠাৎ তিনি যমযমের স্থানে এক ফেরেশতা দেখতে পেলেন, ইব্রাহীম বিন নাফে' ও ইবনে জুরাইজ এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি জিব্রাইলকে দেখলেন যে তিনি পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা হাত দিয়ে মাটি খনন করছেন। তারপর পানি বেরিয়ে পড়লো। হযরত হাজেরা (রাঃ) অঞ্জলিতে করে পানি নিয়ে মশক ভরতে লাগলেন। যতোই তিনি পানি ভরেন, পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উপরে উঠতে থাকে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাইল–মাতার উপর রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দিতেন, (অর্থাৎ চার দিকে মাটি আইল দিয়ে ঘিরে না দিতেন, তাহলে যমযম প্রবহমান এক ঝর্ণা হতো।

এভাবে হযরত হাজেরা (রাঃ) পানি পান করতে থাকেন এবং সন্তানকে দুধ খাওয়াতে থাকেন। ফেরেস্তা তাঁকে বল্লেন "পানি নষ্ট হওয়ায় ভয় করোনা এখানে আল্লাহর ঘর আছে, যা এ শিশু ও তার পিতা নির্মাণ করবে। আল্লাহ এ ঘরের লোকদের ধ্বংস করবেন না।"

কিছুকাল এ অবস্থা চলার পর জুরহুম গোত্রের[১] কিছু লোক কাদা অঞ্চল থেকে এসে মক্কার নিম্নভূমি অংশে থেমে যায়। তারা ওখান থেকে দেখলো একটি পাখী একটি স্থানের চার পাশে উড়ছে। তারা বল্লো, এ পাখি ত পানির উপর চক্কর দিচ্ছে। এ উপত্যকার উপর দিয়ে আমরা এর পূর্বেও যাতায়াত করেছি কিন্তু কোথাও পানি ছিলনা। তারপর তারা দুএক জন লোককে পাঠালো। তারা সেখানে পানি দেখতে পেলো। তারা ফিরে এ সংবাদ অন্যদেরকে দিল। তারা এসে সেখানে ইসমাইলের (আঃ) মাকে দেখতে পেলো। তারা হযরত হাজেরাকে (রাঃ) বল্লো, তুমি কি আমাদেরকে এখানে থাকার অনুমতি দিতে পার? হাজেরা বল্লেন, হাঁ, তবে তোমাদের নয় আমার অধিকারে থাকবে। তারা এতে সম্মত হলো।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, ঐ জুরহুম গোত্র ইসমাইলের মাকে অত্যন্ত মিশুক দেখতে পেল। তিনি নিজেও চাচ্ছিলেন, যেন কিছু লোক এখানে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং তারা সেখানে রয়ে গেল এবং পরিবারের অন্যান্যকেও সেখানে নিয়ে এলো। কয়েক পরিবার সেখানে বসবাস করতে লাগলো। হযরত ইসমাইল (আঃ) তাদের মধ্যেই প্রতিপালিত ও বর্ধিত হন এবং তাঁদের নিকটেই আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। [১] এ ছেলেটিকে জুরহুমীদের বড়ো

---

(১) এ ঐ ঘটনার অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রমান। কাবা নির্মানের পর হজ্জের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) যমানায় শুরু হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত শত শত, হাজার হাজার এবং লক্ষ কোটি মানুষ এ ঘটনার স্মরণে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করে আসছে। এ হাজার হাজার বছরের পুনঃপৌনিক আমল যা কোন সময়ে বন্ধ হওয়া ব্যতীতই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এ ঘটনার এ এমন এক প্রমান যার থেকে অধিকতর ঐতিহাসিক প্রমান দুনিয়ার আর কোন ঘটনায় পাওয়া যায় না। এর বিপরীত ফারানের বিজন প্রান্তরে যে (পূর্ব পৃঃ পর) ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে, সেখানে বা পূর্বে এ ধরনের কোন সায়ী হয়েছে আর না আজ হয়।

(১) এ ইয়ামেনের প্রাচীন কাহ্তানী আরবদের একটি গোত্র।

(১) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) ভাষাও আরবী ছিলনা। তিনি ছিলেন ইরাকবাসী। তারপর কান্আনে বসবাস করতে থাকেন। হযরত হাজেরার ভাষাও আরবী ছিলনা। তিনি ছিলেন মিশরীয়।

ভালো লাগলো এবং তারা এ বাসনা পোষণ করতে থাকলো যেন তাদের বংশেই ছেলেটির বিবাহহয়।

পুত্র কুরবানীর ঘটনা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্রকে সেই উপত্যকা প্রান্তরে ছেড়ে আসার পর তাকে অযত্নে ফেলে রাখেননি। বরঞ্চ মাঝে মধ্যে খবরাখবর নেয়ার জন্যে আসতেন এবং কিছুদিন স্ত্রীপুত্রের কাছে অবস্থানও করতেন। তিনি স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে এ স্থানে ছেড়ে যাওয়ার সময় দোয়াকরেছিলেন।

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا ـ

–হে আমার রব। এ শহরকে তুমি নিরাপদ করে দাও। ঠিক দোয়া অনুযায়ী এ জনবিরল স্থানটি এখন একটি বস্তিতে পরিণত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইতিমধ্যে জুরহুমীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারও অবশ্যই করে থাকবেন। তারপর সে ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় ইতিহাসে নজীরবিহীন। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বার্ধক্যের সন্তান, প্রথম ও একমাত্র পুত্রকে নবযৌবন কালে খোদার ইংগিতে কুরবানী করার জন্যে তৈরী হলেন। কুরআনে এ ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ـ (الصّٰفّٰت : ١٠٢-١٠٧)

–তারপর যখন ছেলেটি তার সাথে দৌড়ে চলাফেরার বয়সে পৌছলো তখন একদিন ইব্রাহীম বল্লো, পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, যেন জবেহ করছি। এখন বল, তুমি কি বলছ? সে বল্লো, আব্বা! আপনাকে যে আদেশ করা হচ্ছে তা করে ফেলুন! আপনি ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন। অবশেষে তাঁরা উভয়ে যখন খোদার আনুগত্যে মস্তক অবনত করলো এবং ইব্রাহীম (আঃ) তার পুত্রকে মাথার উপুর করে ফেল্লো এবং আমরা তাকে ডাক দিয়ে বল্লাম, হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ! আমরা নেককার লোকদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চিত রূপে এ এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা এবং আমরা একটি বড়ো কুরবানী ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিলাম এবং এ সন্তানকে রক্ষা করলাম (সাফ্‌ফাত ঃ ১০২–১০৭)। এ ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয় (১) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে স্থানে পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন তা ছিল মিনা, সেখানে

---

(১) কুরআনে এ স্থানের নাম 'বাক্কা'ও বলা হয়েছে (আলে ইমরান ঃ ৯৬)। কিন্তু ইবনে হিশামের (প্রথম খন্ড পৃঃ ১১৯) বর্ণনামতে জানা যায় যে এটা তার প্রাচীন নাম নয় বরঞ্চ পরবর্তীতে যখন তার হারামের মর্যাদা লাভ হয় তখন তাকে এ নামেও অভিহিত করা হয়। ইবনে হিশাম বলেন, মক্কাকে বাক্কা এ জন্যে বলা হয় যে اِنَّهَا تَبُكُّ اَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ (সে স্বৈরাচারীদের ঘাড় ভেঙ্গে দেয়) তিনি তার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করে বলেন, জাহেলিয়াতের যুগে মক্কা কোন জুলুম ও বাড়াবাড়ি বেশীদিন টিকে থাকতে দিতনা। যারাই বাড়াবাড়ি করেছে তাদেরকে এ শহর থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছে–(গ্রন্থকার)

আজ পর্যন্ত ঐ তারিখেই (১০ই জিলহজ্ব) করা হচ্ছে।[১] উপরন্তু এ ঘটনা তখন ঘটে যখন হযরত ইসমাইলের (আঃ) বয়স বারো তেরো বছরের বেশী ছিল না। তখন হযরত ইসহাকের (আঃ) জন্ম হয়নি। কারণ এ সূরায়ে সাফ্ফাতে এ ঘটনা বিবৃত করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - (الصّٰفّٰت : ١١٢)

–এবং আমরা ইব্রাহীমকে নেক নবীগনের মধ্যে একজনের সুসংবাদ দিই (আয়াত ১১২)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ–

(১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে এটা দেখেননি যে, তিনি পুত্রকে জবেহ করে ফেলেছেন। বরঞ্চ দেখেন যে জবেহ করছেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি স্বপ্নের এ অর্থই বুঝেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্যিকার ঈমান পরীক্ষা করার জন্যে পুত্রের কুরবানীর নির্দেশ দিচ্ছেন। এজন্যে তিনি ঠান্ডা মাথায় কলিজার টুকরো পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে তৈরী হলেন।

(২) পুত্রকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে পুত্র সম্মত হলে তিনি আল্লাহর হুকুম পালন করবেন, সম্মত না হলে করবেন না। বরঞ্চ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দেখতে চেয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর নিকটে যে নেক সন্তানের জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে কি পরিমাণে নেক। যদি সে নিজেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন দিতে তৈরী হয় তাহলে তার অর্থ এইযে দোয়া পুরোপুরি কবুল হয়েছে এবং পুত্র দৈহিক দিক দিয়েই তাঁর সন্তান নয় বরঞ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও তাঁর প্রকৃত প্রশংসনীয় সন্তান।

(৩) হযরত ইসমাইলের (আঃ)–"যে জিনিষের আদেশ আপনাকে করা হয়েছে তা করে ফেলুন"–একথা বলার অর্থ তিনি তাঁর পয়গম্বর পিতার স্বপ্নকে আল্লাহর হুকুম এবং অহীর স্থলাভিষিক্ত মনে করতেন। তাঁর এ ধারণা সঠিক না হলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলতেন, এ নিছক স্বপ্ন–আদেশ নয় এবং আল্লাহ তায়ালাও এ সব আয়াতে তাঁর ধারণা খন্ডন করতেন। একথা ওসব যুক্তির অন্যতম যার ভিত্তিতে ইসলামে নবীর স্বপ্নকে অহীর প্রকার গুলোর মধ্যে একটি গণ্য করা যায়।

(৪) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে কুরবানী করার জন্যে চিৎ করে ফেলেননি, বরঞ্চ মুখ উপুর করে ফেলেন যাতে সন্তানের মুখ দেখে পুত্রস্নেহে হস্ত কম্পিত না হয়। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন নীচে থেকে হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালাবেন।

(৫) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্রকে জবেহ করার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ।" আল্লাহর এ ঘোষণা এজন্যে অত্যন্ত ন্যায় সংগত ছিল যে, স্বপ্নে এ দেখানো হয়নি যে তিনি পুত্রকে জবেহ করে ফেলেছেন। বরঞ্চ এটা দেখানো হয়েছিল যে, তিনি এমন করছেন। এ জন্যে স্বপ্নে যা দেখানো হয়েছিল তা যখন তিনি পূর্ণ করলেন তখন এরশাদ হলো, "তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ এবং সে বিরাট পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, যে পরীক্ষায় আমরা তোমাকে ফেলেছিলাম। আমরা আমাদেরনেকবান্দাহদের এ

---

(১) মিনায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন এ জন্যে ছিল যে সে সময়ে মক্কায় জনবসতি গড়ে উঠেছিল এবং হযরত ইসমাইলের (আঃ) মাতাও সেখানে অবস্থান করতেন। একারণেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কার বাইরে মিনার জনবিরল পাহাড়ী অঞ্চলে পুত্রকে নিয়ে যান।

ধরনেরই প্রতিদান দিয়ে থাকি, যেমন তোমাকে দিলাম। তোমার হাতে পুত্রকে কতল না করিয়েও তোমার দ্বারা এ বহিঃপ্রকাশ ঘটালাম যে, তুমি আমাদের মহব্বতে নিজের সন্তানকেও কুরবাণী করতে পার।

(৬) 'বড়ো কুরবানীর' অর্থ দুম্বাও হতে পারে যা হযরত ইসমাইলের বিনিময়ে জবেহ করার জন্যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীমকে এনে দিয়েছিলেন। এর অর্থ সে কুরবানীও হতে পারে যা সে সময় থেকে নবী মুহাম্মদের (সঃ) যুগ পর্যন্ত হয়ে এসেছে এবং নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হজ্ব ও ঈদুল আযহার সময়ে দুনিয়ার সকল মুসলমান করছে।

কুরবানী হযরত ইসহাককে করা হয়েছিল, না হযরত ইসমাইলকে?

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাইলের অভ্যাস ছিল প্রত্যেক গৌরবজনক বিষয়কে নিজেদের বলে উল্লেখ করা এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা অথবা অনেক গৌরব নিজের বলে দাবী করা। এ অভ্যাস অনুযায়ী পুত্র কুরবানীর এ ঘটনাকে তারা হযরত ইসমাইলের (আঃ) পরিবর্তে হযরত ইসহাকের (আঃ) প্রতি আরোপ করে। বাইবেল বলে ঃ

"খোদা আবরাহামকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে বলেন তুমি তোমার প্রিয় ও একমাত্র পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে মুরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে পাহাড় গুলোর মধ্যে একটি পাহাড়ে-যা তোমাকে বলে দিব জ্বালিয়ে কুরবানী করার জন্যে পেশ কর" (সৃষ্টিতত্ব-অধ্যায়-২২-শ্লোক ঃ ১-২)

এ বর্ণনায় একদিকে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা ইসহাকের (আঃ) কুরবানী চেয়েছিলেন এবং অপরদিকে বলা হচ্ছে তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। অথচ স্বয়ং বাইবেলের অন্যান্য বর্ণনা থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমানিত যে, হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র ছিলেন না। এর জন্যে বাইবেলের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ঃ-

"এবং আবরামের বিবি সারার কোন সন্তান ছিল না। তার একজন মিশরীয় ক্রীত দাসী ছিল যার নাম ছিল হাজেরা। এবং সারা আবরামকে বল্লো, দেখ খোদা ত আমাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অতএব তুমি আমার ক্রীতদাসীর কাছে যাও। সম্ভবতঃ তার দ্বারা আমার ঘরে সন্তান লাভ হবে। এবং আবরাম সারার কথায় সম্মত হলো, এবং কানআন দেশে দশ বছর বাস করেন, যেসময়ে সারা তার মিশরীয় ক্রীতদাসী তাকে (আবরাম) দান করে তার বিবি হওয়ার জন্যে। এবং সে হাজেরার নিকটে গমন করে এবং সে গর্ভবতী হয়" (সৃষ্টিতত্ব-অধ্যায় ৬৫-শ্লোক ঃ ১-৩)

"খোদার ফেরেশতা তাকে বল্লো, তুমি গর্ভবতী এবং তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম ইসমাইল রেখো" (সৃষ্টিতত্ব-১৬ ঃ ১১)

"যখন হাজেরার গর্ভে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করলো তখন আবরামের বয়স ৮৬ বছর ছিল" (সৃষ্টতত্ব-১৬ঃ১৬) এবং খোদাওন্দ আবরামকে বলেন-তোমার বিবি সারা থেকেও তোমাকে এক পুত্র দান করব তার নাম ইসহাক রাখবে, যে সামনের বছর এ নির্দিষ্ট সময়ে সারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে— তখন আবরাম তার পুত্র ইসমাইল এবং ঘরের সকল পুরুষকে নিল এবং ঐদিনই খোদার হুকুমে তাদের খাৎনা করলো-খাৎনার সময় আবরামের বয়স ছিল ৯৯ বছর

এবং ইসমাইলের খাৎনা হয় তের বছর বয়সে" (সৃষ্টিতত্বঃ– অধ্যায় ১৭ঃ১৫–২৫)।

–এবং যখন 'তার পুত্র তার থেকে পয়দা হলো তখন আবরামের বয়স ছিল একশত বছর (সৃষ্টিতত্বঃ–২১ঃ৫)।

এর থেকে বাইবেলের স্ববিরোধী বর্ণনা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একথা সুস্পষ্ট যে, চৌদ্দ বছর পর্যন্ত হযরত ইসমাইল (আঃ) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) একমাত্র পুত্র ছিলেন। কুরবানী যদি একমাত্র পুত্রের চাওয়া হয়ে থাকে, তা হলে তা হযরত ইসহাকের (আঃ) নয়, হযরত ইসমাইলের (আঃ) চাওয়া হয়েছিল। কারণ তিনিই একমাত্র পুত্র ছিলেন। আর যদি ইসহাকের কুরবানী চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে একথা বলা ভুল যে একমাত্র পুত্রের কুরবানী চাওয়া হয়েছিল।

তারপর আমরা যদি ইসলামী রেওয়ায়েতগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে বিরাট মতপার্থক্য দেখতে পাই। তফসীরকারগণ সাহাবী ও তাবেঈনের যে সব বর্ণনা উধৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে একদলের বর্ণনা এই যে, সে পুত্র হযরত ইসহাক ছিলেন। এ দলের মধ্যে নিম্নের বুযর্গানের নাম পাওয়া যায় ঃ–

হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ), কাতাদাহ,একরামা, হাসানবাসরী, মুজাহিদ, শ'বী, মাসরূক, মাকহুল, যুহ্‌রী, আতা মুকাতিল, সাদ্দী, কা'বাই আহবার, যায়েদ বিন আসলাম প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

দ্বিতীয় দল বলে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। এ দলের মধ্যে নিম্নের বুযর্গান রয়েছেনঃ

হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হযরত মায়াবিয়া (রাঃ), একরেমা, মুজাহিদ, ইউসুফ বিন মিহরান, হাসান বাসরী, মুহাম্মদ বিনকায়াব, আল্ কুরাযী, শা'বী, সাঈদ বিন মুসাইয়াব, দাহ্‌হাক, মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (ইমাম মুহাম্মদ বাকের), রাবী বিন আনাস, আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ মনীষীগণ।

এ দুটি তালিকা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, কিছু নাম উভয় দলের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তির দুটি পরস্পর বিরোধী উক্তি উধৃত করা হয়েছে। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে একরেমা এ উক্তি উধৃত করেছেন যে, সে পুত্র হযরত ইসহাক ছিলেন। কিন্তু তাঁর থেকেই আবার আতা বিন আবি রাবাহ এ উক্তি উধৃত করেছেন যে, "ইহুদীর দাবী যে তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক।" কিন্তু ইহুদী মিথ্যা কথা বলে।' এরূপ হযরত হাসান বাসরী থেকে একটি বর্ণনা এমন পাওয়া যায় যে, তিনি হযরত ইসহাকের (আঃ) জবেহ হওয়া সমর্থন করেন। কিন্তু আমর বিন ওবায়েদ বলে যে হাসান বাসরীর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিলনা যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর যে, পুত্রকে জবেহ করার হুকুম হয়েছিল তিনি হযরত ইসমাইল (আঃ)। এ মতানৈক্যের ফল এ হয়েছে যে, আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ অতি বিশ্বস্ততার সাথে হযরত ইসহাকের সপক্ষে রায় দেন। যেমন ইবনে জারীর ও কাজী ইয়ায। কেউ কেউ আবার নিশ্চিত করে বলেন যে, জবেহ হযরত ইসমাইলকে করা হয়। যেমন ইবনে কাসীর, কেউ কেউ আবার

দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন, যেমন জালালুদ্দীন সুইউতী। কিন্তু যদি গবেষণা অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের লেশ থাকেনা যে হযরত ইসমাইলকেই (আঃ) জবেহ করা হয়েছিল, তার যুক্তি নিম্নরূপ ঃ-

(১) সূরায়ে সাফ্‌ফাতে আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদ দেখতে পাওয়া গেল যে, জন্মভূমি থেকে হিজরত করার সময় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একজন নেক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। তার জবাবে আল্লাহতায়ালা তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেন। কথার ধরন থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ দোয়া তিনি তখন করেন যখন তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তারপর সুসংবাদ যে পুত্রের দেয়া হয় তা তাঁর প্রথমপুত্রের। তারপর এ সূরার কথার ধারাবাহিকতা একথা প্রকাশ করে যে, সেই পুত্রই যখন পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করার যোগ্য হলেন তখন তাঁকে জবেহ করার ইংগিত করা হলো। এখন একথা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) প্রথম সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) ছিলেন, হযরত ইসহাক নন।

স্বয়ং কুরআন পাকে পুত্রদ্বয়ের ক্রমিক এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۚ (ابراهيم: ٣٩)

-শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমার বার্ধক্যে আমাকে ইসমাইল ও ইসহাক দান করেন- (ইব্রাহীম ঃ ৩৯)।

(২) কুরআন পাকে যে হযরত ইসহাকের (আঃ) সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেখানে 'গোলামিন্ আলীম' (জ্ঞানবান পুত্র) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে (যারিয়াত ঃ ২৮) এবং সূরায়ে বলা হয়েছেঃ

لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۔ (الحجر: ٥٣)

ভয় করোনা, তোমাকে একজন গোলাম আলীমের সুসংবাদ দিচ্ছি-(হিজর ঃ ৫৩)। কিন্তু সূরায়ে সাফ্‌ফাতে যে পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেখানে গোলামিন হালীম- (ধৈর্যশীল পুত্রের) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। এর থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, উভয় পুত্রের সুস্পষ্ট গুণাবলী পৃথক পৃথক ছিল এবং জবেহের হুকুম গোলামিন আলীমের জন্যে নয়, গোলামিন হালীমের জন্যে ছিল। কারণ পুত্র কুরবানীর ঘটনা সেই পুত্রের জন্ম হওয়ার এবং যৌবনের কাছাকাছি পৌঁছার পর ঘটেছে এবং দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সুসংবাদ তার পর দেয়া হয়েছে।

(৩) কুরআন পাকে হযরত ইসহাকের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দিতে গিয়ে সাথে সাথে এ সুসংবাদও দেয়া হয় যে, তাদের বংশে ইয়াকুব (আঃ) এর মতো পুত্রও জন্মগ্রহণ করবেনঃ

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۔ (هود: ٧١)

-আমরা তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের-(হুদ ঃ ৭১)।

একথা সুস্পষ্ট যে, পুত্রের জন্মের সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে এ সুসংবাদও দেয়া হলো যে তার একজন যোগ্য পুত্র পয়দা হবে, সে সম্পর্কে যদি হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) এ স্বপ্ন দেখানো হতো তিনি তাকে জবেহ করছেন, তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার থেকে একথা কখনো বুঝতে পারতেননা যে, এ পুত্রকে কুরবানী করার ইংগিত করা হচ্ছে। কারণ তাকে কুরবানী করে দেয়ার পর তাঁর ঔরসে পুত্র অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আঃ) জন্মগ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতোনা।

আল্লামা ইবনে জারীর এ যুক্তির জবাব এভাবে দেন যে, সম্ভবতঃ এ স্বপ্ন হযরত ইব্রাহীমকে সে সময়ে দেখানো হয়েছিল যখন হযরত ইসহাকের (আঃ) ঘরে হযরত ইয়াকুব (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ এক অত্যন্ত দুর্বল জবাব। কুরআন পাকের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ "যখন সে ছেলে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি করার যোগ্য হলো"– তখন এ স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। নিরপেক্ষ মন নিয়ে কেউ এ শব্দগুলো পাঠ করলে তার মনে আট, দশ অথবা বড়ো জোড় বারো তেরো বছরের বালকের চিত্রই ভেসে উঠবে। কেউ এ ধারণাও করতে পারেনা যে, যুবক এবং সন্তানের পিতা হয়েছে এমন পুত্রের জন্যে এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল।

(৪) আল্লাহ তায়ালা গোটা কাহিনী বর্ণনা করার পর অবশেষে বলেন ঃ "আমরা তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিই– একজন নেক নবীর"। এর থেকে স্পষ্টই জানতে পারা যায় যে, এ সেই পুত্র নয় যাকে জবেহ করার ইংগিত করা হয়েছিল। বরঞ্চ প্রথমে অন্য কোন পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। তারপর যখন সে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি চলাফেরার যোগ্য হলো, তখন তাকে জবেহ করার হুকুম দেয়া হলো। অতঃপর যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন তাঁকে আর এক পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ দেয়া হলো। এ ক্রমিক ঘটনাবলী নিশ্চিতরূপে এ সিদ্ধান্ত করে দেয় যে, যে পুত্রকে জবেহ করার হুকুম করা হয়েছিল, তা হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন না, বরঞ্চ সে পুত্র তাঁর কয়েক বছর পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে জারীর এ সুস্পষ্ট যুক্তি একথা বলে খন্ডন করেন যে, প্রথমে হযরত ইসহাকের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়। তারপর যখন তিনি খোদার সন্তুষ্টির জন্যে জীবন দিতে তৈরী হয়ে গেলেন, তখন তাঁর পুরস্কার এ আকারে দেয়া হলো যে, তাঁর নবী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু তাঁর এ জবাব প্রথম জবাব থেকে অধিকতর দুর্বল। যদি প্রকৃত পক্ষে ব্যাপার তাই হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনা প্রসংগে এমন কথা বলতেন না –"আমরা তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম"। –বরঞ্চ একথা বলতেন–"আমরা তাকে এ সুসংবাদ দিলাম– তোমার এ পুত্রই নবী হবে নেককারদের মধ্য থেকে।"

(৫) নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে একথা প্রমাণিত যে, হযরত ইসমাইলের (আঃ) ফিদিয়া স্বরূপ যে দুম্বা জবেহ করা হয়েছিল, তার শিং হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (আঃ) সময় পর্যন্ত খানায়ে কাবায় সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হেরেমে ইবনে যুবাইরকে (রাঃ) অবরুদ্ধ করেন এবং খানায়ে কাবা ধ্বংস করেন, তখন সে শিং বিনষ্ট হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আমের শা'বী (রহ) সাক্ষ্য দেন যে, তাঁরা স্বয়ং খানায়ে কাবায় এ শিং দেখেছেন (ইবনে কাসীর)। এ একথারই প্রমাণ যে, কুরবানীর এ ঘটনা শামদেশে সংঘটিত হয়নি, বরঞ্চ মক্কায় হয়েছে, তা হয়েছে ইসমাইলের (আঃ) সাথে। এজন্যেই ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাইল (আঃ) কর্তৃক নির্মিত খানায়ে কাবায় তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

(৬) বহু শতক যাবত একথা আরব দেশের ঐতিহ্যে সংরক্ষিত ছিল যে কুরবানীর এ ঘটনা মিনায় সংঘটিত হয়। এ শুধু ঐতিহ্যই নয়। বরঞ্চ সে সময় থেকে নবী করীমের (সঃ) যামানা পর্যন্ত হজ্জের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একাজটিও বরাবর সংশ্লিষ্ট হয়ে এসেছে যে, ঐ মিনার স্থানে গিয়েই লোক কুরবানী করতো যেস্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কুরবানী করেছিলেন। তারপর যখন নবী মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী হিসাবে প্রেরিত হলেন, তখন তিনিও সেই প্রথাই চালু রাখলেন। এমন কি আজ পর্যন্ত হজ্জের সময় ১০ই যুলহজ্জে মিনায় কুরবানী করা হয়ে থাকে।

সাড়ে চার হাজার বছরের এ ক্রমাগত কাজ একথারই অনস্বীকার্য প্রমাণ যে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) এ কুরবানীর উত্তরাধিকারী বনী ইসমাইল হয়েছেন, বনী ইসহাক নয়। হযরত ইসহাকের (আঃ) বংশে এমন কোন প্রথা প্রচলিত ছিলনা যার জন্যে গোটা জাতি একই সময়ে কুরবানী করতো এবং তাকে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কুরবানীর স্মৃতি বলে বিবেচিত হতো।

এসব এমন যুক্তি প্রমাণ যা দেখার পর অবাক লাগে যে স্বয়ং উম্মতে মুসলেমার মধ্যে হযরত ইসহাকের (আঃ) জবেহ হওয়ার ধারণা কিভাবে বিস্তার লাভ করলো। ইহুদীগণ যদি হযরত ইসমাইল কে (আঃ) মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইসহাকের (আঃ) প্রতি এ মর্যাদা আরোপিত করার চেষ্টায় থাকে, তাহলে বোধগম্য হয়। কিন্তু মুসলমানদের বিরাট সংখ্যক লোকের একটি দল তাদের এ শঠতা কি করে মেনে নিল। এ প্রশ্নের বড়ো সন্তোষ জনক জবাব দিয়েছেন আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ "প্রকৃত ব্যাপার ত আল্লাহ তায়ালা জানেন। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ এটাই মনে হয় যে, প্রকৃত পক্ষে হযরত ইসহাকের (আঃ) জবেহ হওয়ার সপক্ষে যতো কথা বলা হয়েছে, তা সব কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত। এ ভদ্রলোক যখন হযরত ওমরের (রাঃ) যামানায় মুসলমান হন, তখন তিনি ইহুদী ও নাসারাদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত বিষয়গুলো তাঁকে শুনাতেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) সেসব শুনতেন। এ জন্যে অন্যান্যগণও তাঁর কথা শুনতে থাকে এবং আগড়ম বাগড়ম যা কিছুই তিনি বলতেন তা আবার তাঁরা বর্ণনা করতেন। অথচ এ সব বিষয়ের কোন কিছু জানার প্রয়োজন এ উম্মতের ছিলনা।"

এ প্রশ্নের উপর অতিরিক্ত আলোকপাত করে মুহাম্মদ বিন কাব কুরাযীর বর্ণনা। তিনি বলেন, একবার আমার উপস্থিতিতে হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের (রহ) নিকটে এ প্রসংগ তোলা হয় যে, জবেহ হযরত ইসহাককে (আঃ) করা হয়েছিল, না হযরত ইসমাইল (আঃ)কে। সে দরবারে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন যিনি প্রথমে ইহুদী আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন। পরে তিনি আন্তরিকতাসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমীরুল মুমেনীন! খোদার কসম (যাঁকে কুরবানী করা হয়েছিল) তিনি ইসমাইল ছিলেন। একথা ইহুদীরাও জানতো। কিন্তু তাঁরা আরবদের সাথে হিংসার বশবর্তী হয়ে এ দাবী করে যে হযরত ইসহাককে (আঃ) জবেহ করা হয়েছিল (ইবনে জারীর)।

এদুটি কথা একত্রে মিলিত করে দেখলে জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে এ ছিল ইহুদী প্রচার প্রোপাগান্ডা যা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর মুসলমানগণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে কোন গোঁড়ামি বিদ্বেষ পোষণ করতোনা। এ কারণে তাদের মধ্যে অনেকে ইহুদীদের ঐসব বর্ণনা, যা প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সূত্রে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের আবরণে তারা পেশ করতো, বুদ্ধিবৃত্তিক বাস্তবতা মনে করে মেনে নেয় এবং এ কথা অনুভব করেনি যে, এতে জ্ঞানের পরিবর্তে ছিল পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষ।

কাবার নির্মাণ

প্রথমেই এ কথা বলা হয়েছে যে যমযমের বরকতে জুরহুম গোত্রের বিভিন্ন পরিবার হযরত ইসমাইল (আঃ) ও হযরত হাজেরার (রা) নিকটে এসে বসতি স্থাপন করে এবং মক্কা একটি শহরের রূপ ধারণ করছিল। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত হাজেরার মিশুকতার কারণে নতুন নতুন বসতি স্থাপনকারীদের সাথে মাতাপুত্রের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। হযরত ইসমাইল

কা'বা শরীফের মানচিত্র
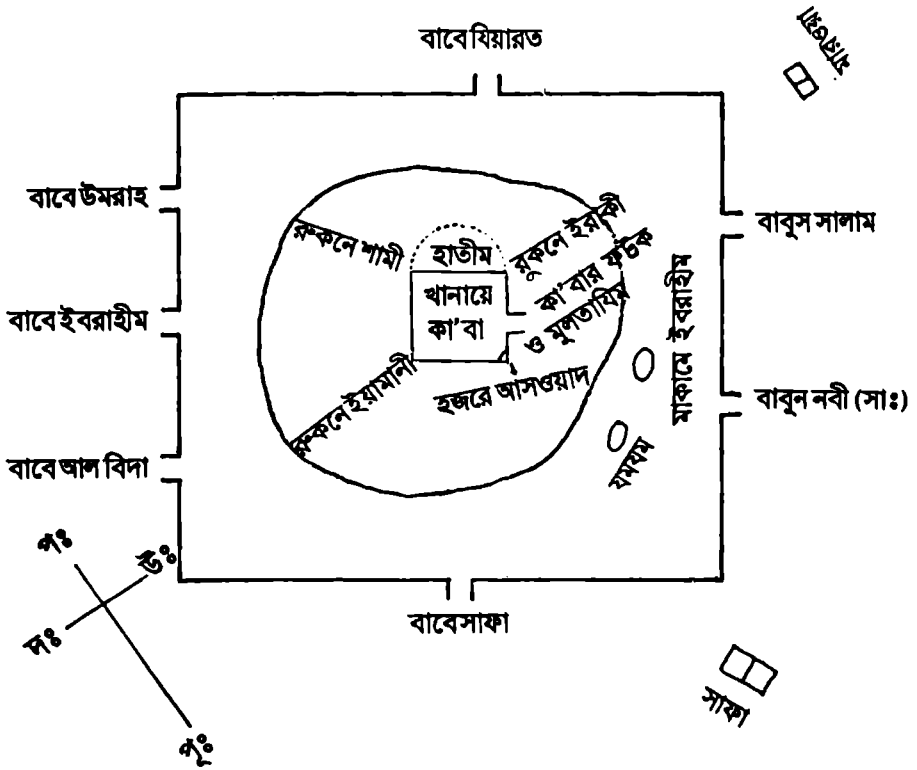
(আঃ) তাদের মধ্যেই পালিত ও বর্ধিত হন। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর অনুপম চরিত্র ও গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে জুরহুমীয়গণ এ অভিলাষ পোষণ করে যে, তাদের সাথে হযরত ইসমাইলকে (আঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা মতে প্রথম একটি বালিকার সাথে হযরত ইসমাইলের (আঃ) বিয়ে হয়। কিন্তু সে পুত্রবধূ হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পছন্দ হয় না। এজন্যে হযরত ইসমাইল (আঃ) তাকে পরিত্যাগ করে এমন এক বালিকাকে বিয়ে করেন যাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পছন্দ করেন। তার পক্ষে তাঁর বারো পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইসমাইলের (আঃ) প্রথম বিয়ের পরই হযরত হাজেরা (রাঃ) জান্নাতবাসিনী হন।

তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর আসল কাজ করার জন্যে মক্কা তশরিফ আনেন, যে উদ্দেশ্যে তিরিশ বছর পূর্বে তাঁর পরিবারের এ অংশকে পানি ও তরুলতাবিহীন উপত্যকাপ্রান্তরে এনে পুনর্বাসিত করেছিলেন। বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা) এর যে বর্ণনার উল্লেখ আমরা উপরে করেছি তাতে তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে বলছেন, একদা যমযমের পাশে গাছের নীচে হযরত ইসমাইল (আঃ) বসে তীর নির্মাণ করছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেখানে পৌছেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পিতাপুত্র উভয়ে এভাবে মিলিত হলেন যেভাবে পুত্র তার পিতার সাথে এবং পিতা তার পুত্রের সাথে মিলিত হয়। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, ইসমাইল! আল্লাহতায়ালা আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন। তদুত্তরে হযরত ইসমাইল (আঃ) বলেন, আপনার রব যে কাজের আদেশ করেছেন তা অবশ্যই করুন। ইব্রাহীম (আঃ) বল্লেন, তুমি এ কাজে আমাকে সাহায্য করবে? তিনি বলেন, জি হাঁ, নিশ্চয় আমি আপনার সাহায্য করব? তারপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) উপত্যকার সে অংশটির দিকে ইংগিত করলেন যা চারপাশের যমীন থেকে কিছুটা উঁচু ছিল এবং বল্লেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব দুই পিতাপুত্র মিলে বায়তুল্লাহর ভিত্তি নির্মাণ করেন। হযরত ইসমাইল (আঃ) পাথর এনে দিতেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) দেওয়াল গেঁথে চলেন। দেওয়াল যথেষ্ট উঁচু হওয়ার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সে পাথর তুলে আনেন যা মুকামে ইব্রাহীম নামে প্রসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার উপর উঠে পাথর গাঁথতে থাকেন এবং দেওয়াল আরও উঁচু করেন।

আরব এবং সারা দুনিয়ায় কাবার মর্যাদা

এ ঘরখানি নিছক একটি এবাদতের স্থানই ছিলনা। যেমন মসজিদগুলো হয়ে থাকে। বরঞ্চ প্রথম দিন থেকেই দ্বীন ইসলামের বিশ্বজনীন আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্র গণ্য করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এ ছিল যে এক খোদাকে যারা মানে তারা প্রতিটি স্থান থেকে বের হয়ে এখানে এসে সমবেত হবে, সকলে মিলে খোদার এবাদত করবে এবং ইসলামের বাণী সাথে করে পুনরায় আপন আপন দেশে ফিরে যাবে। এই ছিল সেই সমাবেশ, যার নাম রাখা হয়েছিল 'হজ্ব'। এ কেন্দ্রটি কিভাবে তৈরী হয়েছিল? কোন্ ভাবাবেগ ও দোয়ার সাথে উভয় পিতাপুত্র এ গৃহের দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন এবং কিভাবে হজ্বের সূচনা করেন এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে এভাবে বয়ান করা হয়েছে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَٰرَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ - فِيهِ ءَايَٰتٌۢ

بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ط (ال عمران: ٩٦-٩٧)

–বস্তুতঃ প্রথম যে ঘর মানুষের জন্যে নির্ধরিত করা হয়েছিল তা হচ্ছে সেইঘর যা মক্কায় নির্মাণ করা হয়। এ হচ্ছে বরকতপূর্ণ ঘর এবং সমস্ত দুনিয়াবাসীদের জন্যে হেদায়েতের কেন্দ্র। এতে রয়েছে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এবং মকামে ইব্রাহীম। যে কেউ এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পেয়ে যাবে (আলে ইমরান ঃ ৯৬–৯৭)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ (العنكبوت:٦٧)

–এরা কি দেখেনি আমরা কি রকম নিরাপদ হারাম বানিয়েছি। অথচ তার চারপাশে মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়। (আন্‌কাবুত ঃ ৬৭)

অর্থাৎ আরবে দুহাজার বছর ধরে চারদিকে লুঠতরাজ, হত্যা, ধ্বংসলীলা, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রচন্ডভাবে চলছিল, এ হারামে সর্বদা নিরাপত্তাই বিরাজ করতো। এমন কি অসভ্য বেদুইন পর্যন্ত তার সীমারেখার ভেতরে তার পিতার হত্যাকারীকে দেখতে পেলেও তার গায়ে হাত দিতে সাহস করতোনা।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...... وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ - رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (البقرة:١٢٥-١٢٩)

–এবং স্মরণ কর যখন আমরা এ ঘরকে লোকদের জন্যে কেন্দ্র, প্রত্যাবর্তনের ও নিরাপত্তার স্থান বানালাম এবং হুকুম দিলাম যে, ইব্রাহীমের এবাদতের স্থানকে জায়নামাজ বানাও এবং ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে নির্দেশ দিলাম আমার ঘরের তওয়াফকারী–এতেকাফকারী এবং রুকু সিজদাকারীদের জন্যে পাকসাফ রাখ। এবং যখন ইব্রাহীম দোয়া করলো, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে একটা নিরাপত্তাপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদেরকে ফলমূলের রিজিক দান কর যারাই তাদের মধ্যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান আনয়নকারী হবে— এবং যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল এ ঘরের ভিত গড়ছিল তখন দোয়া করছিল–হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের চেষ্টা কবুল কর। তুমি সবকিছু শ্রবণ কর ও জান। পরওয়াদেগার! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার মুসলিম (অনুগত) বানাও। এবং আমাদের বংশ থেকে এমন এক জাতি উত্থিত কর যারা তোমার অনুগত হবে। এবং আমাদেরকে আমাদের এবাদতের পন্থা পদ্ধতি বলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার কৃপা দৃষ্টি রাখ, তুমি বড়ো ক্ষমাকারী ও

মেহেরবান। হে পরওয়ারদেগার। তুমি এসব লোকদের মধ্যে এদের কওম থেকে এমন এক রসূল পাঠাও যে তাদেরকে তোমার আয়াত শুনাবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের চরিত্র পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই তুমি বিরাট শক্তিশালী ও বিজ্ঞ–(বাকারাহঃ ১২৫–১২৯)।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ - (ابراهيم: ٣٥ - ٣٧)

–এবং যখন ইব্রাহীম দোয়া করলো পরওয়াদেগার! এ শহরকে নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও, আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও। পরওয়ারদেগার! এসব প্রতিমা বহু লোককে গোমরাহ করেছে। অতএব যে কেউ আমার পথ অনুসরণ করবে সে আমার আর যে আমার পথ থেকে সরে পড়বে, তো তুমি ক্ষমাকারী ও মেহেরবান। পরওয়ারদেগার ! আমি আমার বংশের একটি অংশ তোমার এ মহিমান্বিত ঘরের পাশে এ পানি ও তরুলতাহীন উপত্যকায় এনে পুনর্বাসিত করেছি যাতে করে হে পরওয়ারদেগার, তারা নামায কায়েম করে। অতএব তুমি মানুষের মনকে এমন অনুরক্ত করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসে এবং তুমি তাদেরকে ফলমূলের রিযিক দান কর। আশা করা যায় যে তারা কৃতজ্ঞ হবে–(ইব্রাহীম ঃ ৩৫–৩৭)

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ - وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۙ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ ۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ - (الحج: ٢٦ - ٢٨)

এবং যখন আমরা ইব্রাহীমের জন্যে এ ঘরের স্থান নির্ধারিত করে দিলাম এ হেদায়েত সহ যে, কাউকে আমার সাথে শরীক করবেনা এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্যে পাকসাফ রাখবে এবং (হুকুম দিলাম) লোকের মধ্যে হজ্বের সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দাও যাতে করে তোমার নিকটে তারা চলে আসে, তা পায়ে হেঁটে আসুক অথবা দূরদূরান্ত থেকে দুর্বল উটনীর উপর চড়ে, যাতে তারা দেখতে পায় যে তাদের জন্যে কত প্রকারের দ্বীনী ও দুনিয়াবী লাভ রয়েছে। তারপর এ নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ যে সব পশু তাদেরকে

দিয়েছেন তাদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে অর্থাৎ কুরবানী করবে। সে সবের গোশ্‌ত তারাও খাবে এবং নিঃস্ব ও অভাবী লোকেরাও খাবে–(হজ্ব ঃ ২৬–২৮)।

জাহেলিয়াতের যুগে খানায়ে কাবার বরকত

আরব দেশে কাবার মর্যাদা শুধু একটি এবাদতখানা হিসাবেই ছিলনা। বরঞ্চ তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও পবিত্রতার কারণে তা গোটা দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে পড়েছিল। হজ্ব ও ওমরার জন্যে সমগ্র দেশ থেকে দলে দলে কাবার উদ্দেশ্যে লোক আসতো এবং এ জনসমাবেশের মাধ্যমে শতধা বিচ্ছিন্ন আরববাসীদের মধ্যে ঐক্যের এক সম্পর্ক স্থাপিত হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোক পারস্পরিক তামাদ্দুনিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। কাব্য প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান হতো। ব্যবসার লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ হতো। হারাম মাসগুলোর [১] বদৌলতে বছরের একতৃতীয়াংশ সময় আরববাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ মিলতো। এ সময়টাই এমন ছিল যে, তাদের বিভিন্ন কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারতো। কুরবানীর জন্যে গলায় পট্টি বাঁধা পশু তাদের সাথে থাকলে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতে বড়ো সুবিধা হতো। কারণ মানতের চিহ্ন স্বরূপ যেসব পশুর গলায় পট্টি বাঁধা থাকতো, সেসব দেখার পর আরববাসীদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনমিত হতো। সে সবের উপর হস্তক্ষেপ করতে কোন লুণ্ঠনকারী গোত্রেরও সাহস হতোনা।

হযরত ইসমাইলের (আঃ) রেসালাত ও আরববাসীদের উপর তার প্রভাব

যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) খানায়ে কাবা নির্মাণ করেন এবং এ ঘরকে কেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল ঘোষণা করে প্রতি বছর হজ্বের জন্যে খানায়ে কাবায় আসার আহ্বান জানানো হয়, খুব সম্ভব সে সময়েই হযরত ইসমাইল (আঃ) কে নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়, যাতে করে তিনি আরব দেশে দ্বীন ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمٰعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. (مريم: ٥٤-٥٥)

– এবং এ কিতাবে ইসমাইলকে স্মরণ কর। সে ওয়াদা পালনে সত্যবাদী এবং রসূল ও নবী ছিল। সে তার পরিবারস্থ লোকদেরকে নামায ও যাকাতের আদেশ করতো এবং আপন রবের কাছে পছন্দনীয় ছিল– (মরিয়ম ঃ ৫৪–৫৫)।

ইতিহাসে যদিও হযরত ইসমাইলের (আঃ) জীবন চরিত ও তাঁর রেসালাত সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর রেসালাত যে সার্থক ছিল তার প্রমাণ এই যে, সমগ্র আরবে খানায়ে কাবার একটা কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হজ্ব ও ওমরার জন্যে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক দলে দলে উৎসাহ উদ্দীপনাসহ আসতো। হজ্বের নিয়মনীতি তাই ছিল

---

(১) হারাম মাসগুলো হচ্ছে ঃ ওমরার জন্যে রজব মাস এবং হজ্বের জন্যে যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম মাস। এসব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকতো। ওমরা ও হজ্বের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কারীদের পথে কেউ বিরক্ত করতোনা –গ্রন্থকার।

যা সূচনায় নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছিল। সাফা ও মারওয়ার সায়ী এবং ১০ই যিলহজ্ব তারিখে মিনায় কুরবানী করার প্রথাও আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যা নিঃসন্দেহে হযরত হাজেরার (রাঃ) সায়ী এবং হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কুরবানীরই স্মরণিক ছিল। হজ্ব ও ওমরার উদ্দেশ্যে চার মাস নিষিদ্ধকরণও সমগ্র আরবে সর্বস্বীকৃত ছিল। দ্বীনে ইব্রাহীমের অন্যান্য বহু নিদর্শনও আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, খাৎনা, নাপাকির গোসল (বীর্যস্খলন কারণে), পশু জবেহ করা, উট নহর করা, মুর্দা দাফন করা, বিবাহ-তালাক, বিধবার শোক পালনের নীতি, মা, বোন ও কন্যাকে বিবাহের জন্যে হারাম মনে করা, খুনের বদলা খুন, প্রভৃতি। উপরন্তু কতিপয় জ্ঞানীব্যক্তি অজুও করতেন। কেউ কেউ নামাযও পড়তেন। যেমন কুস্ বিন্ সায়েদাতুল ইয়াদী। হযরত আবু যরও ইসলাম গ্রহণের তিন বছর পূর্বে নামায পড়া শুরু করেন। যদিও জানা যায়নি যে তা কি ধরনের নামায ছিল। তাছাড়া আরববাসীদের মধ্যে রোযা রাখারও প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা এতেকাফও করতো। হাদীসে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) জাহেলিয়াতের জীবনে একরাত এতেকাফ করার মানত করেছিলেন। বহু কাজ এমন ছিল যা আরববাসী পুণ্যকাজ মনে করতো এবং তার প্রশংসাও করতো। যেমন মেহমান ও মুসাফিরকে খানা খাওয়ানো, মিসৃকীনদের সাহায্য করা, স্বজনদের হক আদায় করা প্রভৃতি। যদি হযরত ইসমাইলের (আঃ) রেসালাত অসাধারণ সাফল্য লাভ না করতো, তাহলে এটা সম্ভব ছিলনা যে, আড়াই হাজার বছর যাবত জাহেলিয়াতের আঁধারে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও নবী পাকের (সাঃ) আগমন পর্যন্ত তাঁর প্রচারিত দ্বীনের নিদর্শনাবলী সমগ্র আরবব্যাপী অবশিষ্ট থাকতো। সবচেয়ে বড়ো কথা এটা যে, তাঁর এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত লোকদের তব্লিগেরই এ প্রভাব যে আরববাসীদের মধ্যে নবীর আগমনের সময় পর্যন্ত আল্লাহ সম্পর্কে সেসব ধারণাই পাওয়া যেতো, যার উল্লেখ কুরআন মজিদে স্থানে স্থানে করা হয়েছে। (যথা সূরা যুখরুফ ঃ ৮৭, আনকাবুত ঃ ৬১-৬৩, মুমেনুন ঃ ৬১-৬৩, ইউনুস ঃ ২২-২৩ ও ৩১, বনী ইসরাইল ঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য)।

এটাও ছিল রেসালতে ইসমাইলের প্রভাব যে, নবী মুহাম্মদের (সঃ) আগমন পর্যন্ত আরবে এমন সব লোকের একটি দল ছিল ইতিহাসে যাদেরকে হানীফ্ নামে স্মরণ করা হয়। আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিভিন্ন স্থানে তাঁদেরকে পাওয়া যেতো। তাঁরা শির্ক অস্বীকার করতেন এবং তৌহীদের স্বীকৃতি দিতেন, তাঁরা দ্বীনে ইব্রাহীমির অনুসরণ করতে আগ্রহী ছিলেন। আমরা তাফ্হীমুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে তাঁদের একটি তালিকা সন্নিবেশিত করেছি। নিম্নে তাঁদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করছিঃ

আন্নাবেগাতুল জা'দী- তিনি ছিলেন বনী আমের বিন্ সা'সায়া বংশের লোক। জাহেলিয়াতের যুগে তিনি দ্বীনে ইব্রাহীমি এবং হানিফিয়াত অর্থাৎ সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলতেন। রোযা রাখতেন এবং ইস্তেগফার করতেন। তাঁর জাহেলিয়াতের যুগের কথাবার্তায় তৌহীদ, মৃত্যুর পরের জীবন, শাস্তি ও পুরস্কার, জান্নাত, দোজখ প্রভৃতির উল্লেখ থাকতো। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন (আল্ ইস্তিয়াব, প্রথম খণ্ড-পৃঃ৩১)।

সিরমা বিন্ আনাস- ইনি ছিলেন বনী আদী বিন নাজ্জার বংশোদ্ভূত। জাহেলিয়াতের যুগে দরবেশসুলভ জীবন যাপন করেন। মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন। জেনাবাতের গোসল করতেন, ঋতুবর্তী নারী থেকে দূরে থাকতেন। মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যাদি ঘৃণা করতেন। প্রথমতঃ ঈসায়ী হতে চেয়ে থেমে যান। মসজিদের মতো একটি ঘর তৈরী করেন। গোসল ফরয হয়েছে এমন

কোন ব্যক্তিকে এবং ঋতুবর্তী নারীকে সেখানে যেতে দিতেন না। তিনি বলতেন–

"আমি ইব্রাহীমের রবের এবাদত করি এবং দ্বীনে ইব্রাহীমির অনুসারী।"

তাঁর কবিতার দুটি ছত্র নিম্নে উধৃত হলো ঃ–

الحمد لله ربی لا شريك له

من لم يقلها فنفسه ظلما

– প্রশংসা আমার রব আল্লাহর জন্যে যাঁর কোন শরীক নেই। যে এ কথা মানেনা, সে তার নিজের উপর জুলুম করে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন ঐ ব্যক্তি অতি বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। তিনি নবীর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন– (আল্ ইস্তিয়াব–১ম খণ্ড–পৃঃ ৩২৩, আল্ ইসাবা–২য় খণ্ড–পৃঃ ১৭৯, ইবনে হিশাম–২য় খণ্ড–পৃঃ ১৫৬)।

আমর বিন্ আবাসা– ইনি বনী সুলাইম বংশের লোক ছিলেন। ইবনে সা'দ বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই তিনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাঁর এ বক্তব্য উধৃত করেন, "জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল বলে মনে করতাম এবং প্রতিমা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল যে এগুলো কিছু নয়।"

তাঁর আর একটি উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"আমার মনে এ কথা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে মূর্তিপূজা ভ্রান্ত। একথা শুনে আমাকে একজন বল্লো, মক্কায় এক ব্যক্তি আছে যে এ ধরনের কথা বলে। অতএব আমি মক্কায় এলাম। নবী মুহাম্মদের (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর শিক্ষা জানতে পারলাম এবং ঈমান আনলাম"–(আল্ ইস্তিয়াব, ২য় খণ্ড– পৃঃ ৪৩১)।

সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে আমর বিন্ নুফাইলের, যিনি হযরত ওমরের (রা) চাচাতো ভাই এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদের [হযরত ওমরের (রা) ভগ্নিপতি] পিতা ছিলেন। ইনি তৌহিদী আকীদার উপর অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। তিনি মূর্তিপূজা, মৃতজীব, রক্ত এবং প্রতিমার নামে কুরবানী হারাম মনে করতেন। কন্যা হত্যা খুব খারাপ মনে করতেন এবং তাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। ইহুদী ও নাসারাদের ধর্মও তিনি খন্ডন করেন। তিনি বলতেন, আমাদের জাতির শির্ক এবং তাদের শির্কের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

হযরত আসমা বিন্তে আবি বকর (রা) বলেন, আমি যায়েদ বিন আমরকে দেখেছি। তিনি কাবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তিনি বলতেন, "কুরাইশের লোকেরা! খোদার কসম, আমি এমন কোন পশুর গোশ্ত খাব না যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে। খোদার কসম, ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর আমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

তিনি আরও বলতেন, "হে খোদা! যদি আমি জানতাম যে, তোমার এবাদতের কোন্ পন্থাপদ্ধতি তোমার নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় তা হলে সে পদ্ধতিতেই তোমার এবাদত করতাম।" তিনি হাতের তালুতে মাথা রেখে সিজদা করতেন। তিনি দ্বীনে ইব্রাহীমির তালাশে

শাম পর্যন্ত সফর করেন। কিন্তু তা তিনি ইহুদী ও নাসারার ধর্মের মধ্যেও খুঁজে পাননি। তারপর তিনি হাত তুলে দোয়া করেন,

– হে খোদা! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দ্বীনে ইব্রাহীমির উপর আছি।

অবশেষে নবী মুহাম্মদের (সঃ) আবির্ভাবের পাঁচ বছর আগে লাখাম শহরে কে যেন তাঁকে হত্যা করে। তাঁর চাচা এবং বৈমাত্রেয় ভাই খাত্তাব, পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্যে তাঁকে খুব কষ্ট দিত। অবশেষে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কুরাইশদের গুন্ডাপান্ডাদের লাগিয়ে দেয়া হয় যাতে তিনি মক্কা শহরে ঢুকতে না পারেন।

ইসলামী যুগে হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা) নবী করীমের (সঃ) কাছে আরজ করেন, "যায়েদের চিন্তাধারা কি আপনার জানা আছে? আমরা কি তাঁর জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে পারি?"

জবাবে নবী বলেন, হ্যাঁ, কিয়ামতের দিনে যিনি একাই একটি উম্মত হিসাবে উঠবেন– (আল্ ইস্তিয়াব, ২য় খণ্ড– পৃঃ ৫৩৯, আল্ ইসাবা, ১ম খণ্ড– পৃঃ ৫৫২, ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড– পৃঃ২৩৯–৪০)।

তথাপি সাধারণ আরববাসী যে ধরনের শির্কে লিপ্ত ছিল, তা জানতে পারা যায় তাদের সেই তাল্‌বিয়া থেকে যা তারা হজ্বের সময় পাঠ করতো। সে তালবিয়া ছিল নিম্নরূপঃ –

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّاشَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ –

– আমি হাজির, হে আমার আল্লাহ আমি হাজির। আমি হাজির, তোমার শরীক কেউ নেই ঐ শরীক ব্যতীত যে তোমারই। তুমি তারও মালিক এবং ঐ বস্তুরও মালিক যার সে মালিক।

এর অর্থ এই যে তারা তাদের বহু কল্পিত খোদাকে মাবুদ মেনে নেয়া সত্ত্বেও একজন সর্বোচ্চ রব হিসাবে আল্লাহকে মানতো এবং এটা মনে করতো যে এ সকল মাবুদ ঐ মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার বান্দাহ ও দাস। এসবকে রেসালাতে ইসমাইলীর প্রভাব ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে অতি নিকৃষ্ট জাহেলিয়াত ও শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস ছিল।

হযরত ইসমাইল (আঃ) এর পর খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

হযরত ইসমাইল (আঃ) যতোদিন জীবিত ছিলেন, খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবেত এর মুতাওয়াল্লী হন। কিন্তু নাবেতের মৃত্যুর পর জুরহুম গোত্রের লোক যারা হযরত হাজেরার (রাঃ) সময় মক্কায় বসতি স্থাপন করেছিল– খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জোর পূর্বক গ্রহণ করে। কারণ ইসমাইল (আঃ) এর সন্তানগণ ছিল সংখ্যায় কম এবং মক্কার জুরহুমীয়দের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাদের সাথে আমালিকের একটি শাখা কাতুরা অথবা বনী কায়তুরও কিছুকাল মক্কার ব্যবস্থাপনায় শরীক ছিল। শহরের বহিরাঞ্চল থেকে যারা আসতো জুরহুম তাদের থেকে ওশর আদায় করতো।

নিম্নাঞ্চল থেকে যারা আসতো আমালিক তাদেরকে ওশর দিতে বাধ্য করতো। অবশেষে কিছুকাল খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনা আমালিককের হাতেই ছিল। শেষ পর্যন্ত জুরহুম লড়াই করে তাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। অতঃপর তারাই পরবর্তী কয়েক শতক পর্যন্ত। খানায়ে কাবা ও মক্কার উপর আধিপত্য করে (মারুজুস্ যাহাব) সামউদী ২য় খন্ড পৃঃ ৫০ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৮)। তাদের মধ্যে ক্রমশঃ এতোটা বিকৃতি ঘটে যে মক্কার মর্যাদা বিনষ্ট করা শুরু করে। যেসব ধন-সম্পদ কাবায় হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হতো, তা তারা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতো। যিয়ারতের জন্যে আগমনকারীকে উত্যক্ত করতো। এমন কি, তাদের মধ্যে কেউ ব্যভিচারের কোন স্থান না পেলে খানায়ে কাবায় গিয়ে এ গোনাহের কাজ করতো। সে সময়ের একটি ঘটনা এই যে, এসাফ্ নামীয় এক ব্যক্তি নায়েলা নাম্নী এক নারীর সাথে খানায়ে কাবায় অবৈধ কাজ করে এবং আল্লাহ তায়ালা উভয়কে বিকলাংগ করে দেন। কিছুকাল পরে তাদের মূর্তি বানিয়ে একটি সাফায় এবং অপরটিকে মারওয়ায় রেখে তাদের পূজা করা শুরু করলো। খানায়ে কাবার মোতাওয়াল্লী এ ধরনের চরম নীচতায় নেমে আসে।

অবশেষে জুরহুমীয়দের বাড়াবাড়ি যখন চরমে পৌঁছলো, বনী কেনানা গোত্রের বনী বাকার বিন আব্দে মানাত এবং বনী খুযায়া গোত্রের গুবশান মিলিতভাবে লড়াই করে তাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে। যাবার সময়ে তারা কাবার ধনসম্পদ যমযমের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা বন্ধ করে ও নিশ্চিহ্ন করে তাদের স্বদেশ ইয়ামেনের দিকে রওয়ানা হয়। তারপর কাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বনী খুযায়ার ঐ শাখাটির হাতে ন্যস্ত হয় যা গুবশান নামে অভিহিত। তিন-চার শতক যাবত তারাই কাবার মোতাওয়াল্লী থাকে এবং তাদের যুগেই খানায়ে কাবা একটি পরিপূর্ণ প্রতিমাগৃহে পরিণত হয়। তার সূচনা এভাবে হয় যে, ঐ গোত্রের সর্দার আমর বিন লুহাই তার ধনদৌলত ও দানশীলতার কারণে খুযায়ার মুকুটবিহীন রাজা হয়ে পড়ে এবং যে কোন অভিনব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান (বিদআত) সে আবিষ্কার করে- সকলে দ্বিধাহীনচিত্তে তার অনুসরণ করে। একবার সে শাম দেশে গমন করে এবং সেখানে সে আমালিকগণকে বিভিন্ন মূর্তির পূজা করতে দেখেন, এ তার বেশ ভালো লাগে এবং সেখান থেকে হুবাল নামে এক প্রতিমা এনে কাবায় স্থাপন করে। ক্রমশঃ নতুন নতুন প্রতিমার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এসবের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং হযরত মরিয়ম (আঃ) এর মূর্তিও শামিল করা হয়। হযরত মরিয়মের মূর্তি সম্ভবত এ জন্যে রাখা হয়েছিল যাতে করে আরবের খৃষ্টানগণ কাবার দিকে ফিরে আসে। বুখারীর কিতাবুল আম্বিয়াতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) এক বর্ণনায় আছে যে কাবার ঘরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত মরিয়মের (আঃ) মূর্তিও ছিল। দ্বিতীয় একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মূর্তি এ আকৃতিতে ছিল যে তাঁদের হাতে জুয়া বা পাশার ঘুঁটি ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, বাহিরা, সায়েবা, অসিলা এবং হাম এর বিদআতগুলো আমর বিন লুহাই এর আবিষ্কার, যার খন্ডন করা হয়েছে সূরায়ে মায়েদার ১০৩ আয়াতে। কিন্তু একথা বলা ঠিক নয় যে দ্বীনে ইব্রাহীমির অনুসারীদের মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা এ ব্যক্তিই করেছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কা ছেড়ে যারাই আরবের অন্যত্র চলে যেতো তারা সাথে করে মক্কায় একটা পাথর নিয়ে যেতো এবং যেখানেই বসতিস্থাপন করতো সেখানে তা স্থাপন করে তার তাওয়াফ শুরু করতো (ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃঃ ৭৯-৮০)।

কাবার অলীগীরি অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার অধিকার খুযায়ীদের তখন শেষ হয়ে যায় যখন কুরাইশ

গোত্রের কুসাই বিন কিলাব তার শ্বশুরের কাছ থেকে এ দায়িত্ব লাভ করে। পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে।

ইসমাইল (আ) এর সন্তানগণ

আরবের কুলুজিবিদগণ (GENEOLOGISTS) এবং বাইবেলের সর্বসম্মত বর্ণনা মতে হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বারো পুত্র ছিল। কিন্তু মক্কায় জুরহুমীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসমাইল সন্তানদের অতি অল্পসংখ্যক লোকই মক্কা শহরে রয়ে গিয়েছিল এবং অন্যান্য সকলে আরবের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস এ সম্পর্কে নীরব যে তাঁর বারো পুত্রের সন্তানগণ কোথায় কোথায় গেল এবং তাদের বংশ থেকে কোন্ কোন্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলো। আরবের কুলুজি শাস্ত্রে যা সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য এবং যার মধ্যে মতপার্থক্য নেই তা হচ্ছে এই যে আদনান হযরত ইসমাইল (আঃ) এর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবেতের সন্তানগণের মধ্যে একজন। আদনানের পূর্বে হযরত ইসমাইল (আঃ) পর্যন্ত কত পুরুষ অতীত হয়েছে (সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে এবং আদনানের উর্ধতন বংশতালিকা সংরক্ষিত নেই। উরওরাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, এমন কোন লোক আমরা পাইনি যে আদনান ও হযরত ইসমাইলের (আঃ) মধ্যবর্তী বংশ তালিকা জানতো।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয়ে বলেন, আদনানের উপরে যারা বংশতালিকা বয়ান করে তারা মিথ্যা বলে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নসবনামা (বংশতালিকা) শুধু আদনান পর্যন্ত বয়ান করা উচিত। তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং বালাযুরীর আনসাবুল আশরাফে স্বয়ং নবী পাকের (সঃ) এ উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি মায়াদ বিন আদনান বিন উদাও পর্যন্ত বংশতালিকা বয়ান করার পর বলেন, পরবর্তী উর্ধতন বংশতালিকা বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী। কিন্তু উর্ধমুখী বংশতালিকা সংরক্ষিত না থাকার অর্থ এই নয় যে, ইসমাইল-সন্তানদের মধ্যে আদনানের হওয়ার মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ রয়েছে। সমগ্র আবরবাসী এ ব্যাপারে একমত যে আদনান বনী ইসমাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরবরা এ ব্যাপারে একমত হওয়া তার সত্যতার অনস্বীকার্য প্রমাণ। কারণ আরববাসী কুলুজির বড়ো গুরুত্ব দিত। বংশানুক্রমে ক্রমাগত চলে আসা বর্ণনা পাওয়া না গেলে কারো বংশ সম্পর্কে একমত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রসূলে আকরামের (সঃ) বংশতালিকা এবং আরব উপজাতীয়দের সাথে তাঁর সম্পর্ক

আদনানের পরে তার সন্তানের মধ্য থেকে যেসব আরব উপজাতীয় দল উদ্ভূত তাদের বংশতালিকা সংরক্ষিত আছে। কুলুজিবিদগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। আমরা এখানে প্রথমে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর বংশতালিকা সন্নিবেশিত করছি। তারপর বলবো কোন্ কোন্ পুরুষে গিয়ে আরবের কোন্ কোন্ উপজাতি নবীর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। নবী (সঃ) এর বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মদ (সঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন ইবনে হাশেম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা'ব বিন লুয়াই বিন গালেব বিন ফিহির বিন মালেক বিন আন্নাযুর বিন কিনানা বিন খুযায়মা বিন মুদরেকা বিন আল্ইয়াস (১) বিন মুযার নিযার বিন মায়াদ বিন আদনান।

(১) কোন কোন গ্রন্থকার এ নামের উচ্চারণ ইল্ইয়াস করেছেন কিন্তু সুহায়লী তাঁর রাওযুল উনুফে আল্ইয়াস-কেই সঠিক বলেছেন। বালাযুরীও তাঁর আনসাবুল আশরাফে এ নামের এ উচ্চারণই লিখেছেন -গ্রন্থকার।

এ বংশ পরম্পরার মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের পূর্বপুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে নিম্নের উপজাতিগুলো নবীর (সঃ) বংশের সাথে মিলে যাচ্ছে ঃ-

আদনানের অন্য পুত্র আক্ক এর সন্তান সন্ততির উর্ধমুখী বংশপরম্পরা আদনান পর্যন্ত পৌঁছে নবী (সঃ) এর পূর্বপুরুষের সাথে মিলে যাচ্ছে। আক্ক এর সন্তান-সন্ততি ইয়ামেনে গিয়ে বসবাস করতে থাকে এবং আশয়ারীদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) এ গোত্রেরই লোক ছিলেন।

বনী কুযায়া এবং বনী ইয়াদ মায়াদের সাথে মিলিত হয়। বনী আনমার (খাশয়াম ও বাজিলা), রাবিয়ার সকল উপজাতি যার মধ্যে বনী বকর বিন ওয়াইল, তাগ্‌বিলব, নাদিলা প্রভৃতি শামিল) বনী আবদুল কায়েস, আনাযা এবং নামির বিন কাসে- নিযারের সাথে মিলিত হয়েছে।

কায়েসের সকল উপজাতি (সুলাইম, মাযেন, ফাযারাহ, আবৃস, আশজা', মুররা যাবইয়ান, গাতফান, ওকাইল কুশাইর, যুশাম, সাকীফ, বাহেলা, বনী সায়াদ বিন বকর, সকল বনী হাওয়াযেন প্রভৃতি) মুযাবের সাথে মিলিত। নবী পাকের (সঃ) দুগ্ধমাতা হালীমা বনী সায়াদ বিন বকর বংশোদ্ভূত।

বনী তামীস, বনী দাবরাহ, মুযায়না, খুযায়া, আসলাম ওকল তাইম প্রভৃতি আল্‌ইয়াসের সাথে মিলিত।

বুযাইল, যে গোত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন, মুদরেকার সাথে মিলিত।

বনী আসাদ, কারা এবং সকল বনী আলহুন বিন খুযায়মা খুযায়মার সাথে মিলিত।

বনী আব্দে মানাত (যার মধ্যে বনী বকর ও বণী যামরা শামিল), বনী মালেক, বনী মালকান অথবা মিলকান, বনী হুদাল, বনী ফিরাস বনী ফুকাইম প্রভৃতি কিনানার সাথে মিলিত। হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) এর গোত্র বনী মালকান থেকে উদ্ভূত।

কুরাইশ

কুলুজিবিদগণের একটি দল একথা বলেন যে, আন্‌নযর বিন কিনানারই উপাধি ছিল কুরাইশ। কিন্তু গবেষক পন্ডিতগণ বলেন, কুরাইশ প্রকৃত পক্ষে আন্‌নযর এর নাতি এবং মালেক বিন নযর এর পুত্র ফিহিরের উপাধি ছিল।

যারা তার বংশধর তারাই কুরাইশের মধ্যে শামিল এবং যারা এর বংশধর নয় তারা কুরাইশের মধ্যে শামিল নয়। (১)

---

(১) কুরাইশ শব্দের অর্থে মতভেদ রয়েছে। এক অর্থ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একত্র হওয়া। কিন্তু এ অর্থের দিক দিয়ে কুসাই বিন কিলাবেরই উপাধি কুরাইশ হতে পারে। কারণ তার সময়েই কুরাইশের সকল পরিবার মক্কায় একত্র হয়। দ্বিতীয় অর্থ উপার্জন ও ব্যবসা বাণিজ্য যা ছিল কুরাইশদের পেশা। তৃতীয় অর্থ অনুসন্ধান, এ দিক দিয়ে কুরাইশ নযর বিন কিনানার উপাধি হয় কারণ তার সম্পর্কে আরব ঐতিহ্যে বর্ণিত আছে যে, সে অভাবীলোকদের অভাব অনুসন্ধান করে বেড়াতো এবং তাদের সাহায্য করতো। আর একটি অর্থ হলো সমুদ্রের বিরাটত্ব যা সবকিছু খেয়ে ফেলে। একটি উক্তি এরূপও আছে যে কুরাইশ বিন বদর বনী নযর বিন কিনানা বংশের এক ব্যক্তি ছিল যে সহযাত্রী রক্ষী (ESCORT) ও মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করবো, এ জন্যে আরববাসী এ গোত্রের কাফেলা দেখে বলতো, কুরাইশের কাফেলা এসে গেছে। এরূপ বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।কিন্তু গবেষণালব্ধ তথ্য এইযে কুরাইশ বনী ফিহিরের উপাধি ছিল -গ্রন্থকার।

কুরাইশদের মক্কায় একত্র হওয়া ও কাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বলাভ

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে মক্কায় জুরহুমীয়দের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ইসমাইলের বংশধরগণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কাবার ব্যবস্থাপনার ভার বনী খুযায়ার একটি শাখা গুবশানের উপর থাকাকালেও এ অবস্থাই হয়েছিল। বনী ইসমাইলের অন্যান্য শাখার ন্যায় কুরাইশও বনী কিনানার বিভিন্ন বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অতি অল্প অংশই মক্কায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে (১) কুসাই বিন কিলাবের হাতে এ অবস্থার অবসান ঘটে এবং মক্কাও কুরাইশদের অধীনে আসে এবং খানায়ে কাবার ব্যবস্থাপনাও তাদের হাতে ন্যস্ত হয়।

এর সূচনা এভাবে হয় যে, কুসাই এর পিতা কিলাব বিন মুররার মৃত্যুর পর তার মা ফাতেমা বিন্তে সায়াদ (আযদে শানাও–আ বংশের) বনী কুযায়া–এর একব্যক্তি রাবিয়া বিন হারাম–এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং শাম চলে যায়। সেখানে এ দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে এবং তার গর্ভে যেরাহ্ বিন রাবিয়া নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কুসাই যৌবনে পদার্পণের পর একবার বনী কুযায়ার এক ব্যক্তির সাথে তার লড়াই হয়। সে কুসাইকে এই বলে ভর্ৎসনা করে, "তুই আমাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে আমাদের উপরেই গর্জন করছিস। তুই তোর আপন লোকদের মধ্যে কেন যাস্না?"

তারপর কুসাই তার মাকে জিজ্ঞেস করে, "আমার পরিচয় কি?" সে বলে, তুমি কিলাবের পুত্র এবং কুরাইশ গোত্রের সন্তান। তোমার কওম বায়তুল হারামের পাশে মক্কা শহর ও তার চারপাশে থাকে। তখন কুসাই জিদ ধরে বলে, "আমি আমার কওমের লোকের কাছে যাব।"

অতঃপর যখন হজ্বের সময় এলো তখন সে বনী কুযায়ার হজ্বযাত্রীদের সাথে মক্কা পৌঁছলো। এখানে তার সহোদর ভাই যুহরা, কিলাবের মৃত্যুর সময় যে যুবক ছিল, পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুসাই তার নিকটেই রয়ে গেল। সে সময়ে হুলাইল বিন্ হুব্শিয়্যা খুযায়ী কাবার মুতাওয়াল্লী এবং মক্কার শাসক ছিল। কুসাই হুলাইল কন্যা হুববাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব দেয়। হুলাইল কুসাইয়ের বংশ আভিজাত্য ও তার মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দান করলো। তারপর কাবার ব্যবস্থাপনার ভার ও মক্কার সর্দারি কিভাবে তার হাতে এলো এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এইযে, হুলাইল স্বয়ং অসিয়ত করে যায় যে তার মৃত্যুর পর কুসাই খানায়ে কাবার মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য। অন্য বর্ণনা বলে যে, হুলাইলের মৃত্যুর পর কুসাই দাবী করে যে, সে এ পদের জন্যে অন্যান্যের তুলনায় অধিক যোগ্য। এতে বনী খুযায়া এবং বনী বকর সম্মত না হওয়ায় সে তার বৈমাত্রেয় ভাই রেযাহ্ এবং বনী কিনানা ও খুযায়াকে সাহায্যের আহ্বান জানায়। তারপর চারপাশে কুরাইশদের যেসব লোক বসবাস করতো তাদেরকেও একত্র করলো। অতঃপর বলপূর্বক খুযায়া এবং বনী বকরকে মক্কা থেকে বহিস্কার করে দিল। পরবর্তীকালে উভয় পক্ষ যখন বনী আব্দে মানাত বিন কিনানার গোত্রভুক্ত ইয়ামুর বিন আওফ্কে মধ্যস্ত মানলো, তখন সে সিদ্ধান্ত করে দিল যে খুযায়ার তুলনায় কুসাই খানায়ে

(১) ইবনে কাসীরের বর্ণনা মতে কাব বিন লুয়াই (কুসাইয়ের পরদাদা) এর মৃত্যু ও নবী মুহাম্মদের (সঃ) নবুওত প্রাপ্তির মধ্যে ৫৬০ বছরের ব্যবধান ছিল। এদিক দিয়ে সম্ভবতঃ গালেব বিন ফিহির হযরত মাসীহ (আঃ) এর সমসাময়িক ছিল। ইবনে কাসীর, সুহায়লী এবং অন্যান্য ইমামগণের বরাত দিয়ে একথাও বর্ণনা করেছেন যে মায়াদ বিন আদনানের যুগেই বখ্ত্–নসর এরোশালেম (জেরুযালেম) ধ্বংস করে ইহুদীদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এ ৫৮৭ খৃষ্টপূর্বের ঘটনা বালাযুরী মায়াদ বিন আদনানকে বখ্তনসরেরসমসাময়িকবলেছেন–গ্রন্থকার।

কাবার মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকতর হকদার। এজন্যে যে তার পরিচয় নিশ্চিতরূপে বনী ইসমাইলেরবংশোদ্ভূত।

খুযায়ার বিবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর কুসাই বনী আল্–গওস বিন্ মুর–এর প্রতি মনোযোগ দিল। তাদেরকে সূফা বলা হতো। জুরহুম এবং খুযায়ার সময়ে তারা এ মর্যাদা লাভ করেছিল যে, হজ্বের সময় তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করা যেতোনা। তাদের অনুমতিক্রমেই মিনায় যেতো। মিনা থেকে লোক বাড়ি রওয়ানা হতে পারতোনা যতোক্ষণ না সূফা জুমরাতে পাথর ছুড়েছে। তাদের পরেই অন্যান্য হাজীগণ রামী (পাথর ছুঁড়ে) করে রওয়ানা হতে পারতো। দীর্ঘ দিনের আমলের ফলে এ যেন এক দ্বীন হয়ে পড়েছিল যা মেনে চলা অপরিহার্য মনে করা হতো। কুসাই হজ্বের সময় সূফার সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে এ পদমর্যাদা থেকে বেদখল করে –(ইবনে হিশাম)।

এভাবে যখন কুসাই কাবার ব্যবস্থাপক ও মক্কার সর্দারি হাসিল করে, তখন সে ফিহ্রের সকল বংশধরকে, যারা কুরাইশ নামে অভিহিত ছিল, আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে মক্কায় একত্র করে এবং মক্কা তাদের মধ্যে বন্টন করে শহরের এক এক অংশে এক এক পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে।[১]এর ভিত্তিতে কুরাইশ তাদেরকে 'মুজাম্মে' বলে।

খুযাফা বিন্ গানেম আদাবী বলেন ঃ–

اَبُوْكُمْ قُصَىٌّ كَانَ يُدْعىٰ مُجَمِّعًا

بِهٖ جَمَعَ اللّٰهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ

–তোমাদের পিতাকে মুজাম্মে বলা হতো। তার দ্বারা আল্লাহ ফিহরের গোত্রদেরকে একত্র করেন।

মক্কার নগর রাষ্ট্র ও হজ্বের ব্যবস্থাপনা

কুসাইয়ের এ বিরাট খেদমতের জন্যে সকল কুরাইশ গোত্র তাকে নিজেদের সর্দার মেনে নেয়। কুরাইশের কোন পরিবারে যে বালিকাই যৌবনে পদার্পণ করতো, তাকে কুসাইয়ের গৃহেই কামিস পরিধান করানো হতো, কোন বিয়ে শাদি হলে তা হতো কুসাইয়ের গৃহে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটলে অথবা কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধের উপক্রম হলে, তাঁর গৃহেই সকল পরিবারের সর্দারগণ পরামর্শের জন্যে একত্র হতো। এ কারণে এ বাড়িকে বলা হতো "দারুন্নাদওয়া"। তার একটি দরজা ছিল হারামের দিকে। যুদ্ধের সময় কুসাই এর সন্তানদের মধ্যেই কোন এক জনকে পতাকাবাহী নিযুক্ত করা হতো। এ পদমর্যাদার নাম ছিল "আল্লেওয়া"। হজ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কুসাইদের হাতে থাকতো। তাদের একটা কাজ ছিল "আস্সিকায়া"। অর্থাৎ হাজীদের পানি পান করানো। দ্বিতীয়টি ছিল "আর রিফাদাহ"–অর্থাৎ হাজীদের আহার

(১) কুসাই মক্কা শহরকে কুরাইশ পরিবারের মধ্যে এভাবে বন্টন করে দেয় যে হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ এবং দু'ধারের পাহাড়ের উপত্যকা ও উচ্চভূমিতে বনী কাব বিন লুয়াই এর বিভিন্ন শাখাকে প্রতিষ্ঠিত করে–যাদের মধ্যে শামিল ছিল বনী আদী, বনী জুমাহ্, বনী সাহম, বনী তাইম, বনী মাখযুম, বনী যুহরা, বনী আবদুল ওয্যা, বনী আবদুদ্দার, বনী আল্ মুত্তালিব, বনী হাশিম, বনী আবেদ শামস, এবং বনী নওফাল। তাদেরকে বলা হতো কুরাইশ আল্বিতাহ্। অর্থাৎ মক্কার আভ্যন্তরীন অংশে বসবাসকারী এবং প্রকৃত হারাম বাসী। কায়াবের উর্ধতন পুরুষ ফিহরের বংশধরদের পরিবার সমূহ যথা বনী মুহারিব, বনী আল্হারিস, বনী তাইম উলাদুরাম, বনী আমের বিন লুয়াই প্রভৃতি ছিল–'কুরাইশুয্–যাত্তাহের' এবং তাদেরকে মক্কার বাইরের অংশ দেয়া হয়–গ্রন্থকার।

করানোর ব্যবস্থাপনা। যার জন্যে কুরাইশদের সকল পরিবার চাঁদা একত্রে জমা করে কুসাইকে দিত। সে হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ঐ সকল হাজীর আহারের ব্যবস্থা করতো যারা নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারতো না।

তৃতীয়টি ছিল 'আলহিজাবাহ্' অর্থাৎ খানায়ে কাবার চাবি রক্ষক। কাজ ছিল যিয়ারত কারীদের জন্যে কাবা খুলে দেয়া এবং বন্ধ করা।

কুসাই তার জীবনে মক্কা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিক ছিল। যখন কুসাই এর শেষ সময় উপস্থিত হলো তখন সে দেখলো, তার পুত্র আব্দে মানাফ আরবে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং তার মর্যাদাও স্বীকৃতি লাভ করছে, তখন সে মক্কা রাষ্ট্রের সকল কার্যভার (নাদ্ওয়া, হিজাবাহ্, রিফাদাহ, লেওয়া) দ্বিতীয় পুত্র আবদুদ্দারকে অর্পণ করে। কুসাই এর মৃত্যুর পর কিছুকাল-যাবত তার সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর কোন এক সময়ে এসব পদমর্যাদা বন্টন নিয়ে কলহ শুরু হয়। এ কলহে কুরাইশের কিছু পরিবার আবদুদ্দার এবং কিছু আবদে মানাফের সাথে মিলিত হয়। (১)

এ কলহ দীর্ঘস্থায়ী হতে যাচ্ছিল এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই আপোস মীমাংসা হয়ে যায়। যার ফলে হিজাবাহ, লেওয়া এবং নাদ্ওয়া আবদুদ্দারের অধীন থাকে এবং সিকায়াহ ও রিফাদাহ আবদে মানাফকে দেয়া হয়। আবদে মানাফের সন্তানগণ পরস্পর পরামর্শ করে এ দুটি পদমর্যাদা হাশিমকে দান করে। (২)

হাশিম

হাশিমের আসল নাম ছিল আমর। 'হাশিম' উপাধি সে তখন লাভ করে যখন মক্কায় একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে সময়ে হাশিম শাম থেকে খাদ্যদ্রব্য এনে রুটি তৈরী করে। বহু উট জবেহ করে তার ছালন তৈরী করে। তার মধ্যে রুটি খন্ড বিখন্ড করে একপ্রকার মালিদা তৈরী করে লোককে খাওয়ায়। 'হাশম' শব্দের অর্থ ভাঙা ও নিষ্পেষিত করা। রুটি খন্ড বিখন্ড করে ছালনে দিয়ে মালিদা বানাবার কারণে তাকে হাশিম নামে আখ্যায়িত করা হলো।

রিফাদাহ ও সিকায়াহ-এর দায়িত্ব হাশিমের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর তার নিয়ম এই ছিল যে, যখন হজ্বের সময় আসতো তখন সে কুরাইশদের লোকজনকে একত্র করে বলতো, "এসব আল্লাহর প্রতিবেশী এবং তার ঘরের লোক এ সময়ে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসে। এসব আল্লাহর মেহমান। আল্লাহর মেহমানগণই আপ্যায়নের সবচেয়ে বেশী হকদার। আল্লাহ তোমাদেরকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তার বদৌলতেই তোমাদের মান সম্মানে ভূষিত করেছেন। তিনি তোমাদের এমন হেফাজত করেছেন যা কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর জন্যে করে না। এ জন্যে আল্লাহর মেহমানদের এবং যিয়ারত কারীদের সম্মান কর। তারা ধূলা

---

(১) কুরাইশ পরিবার গুলোর মধ্যে যারা আবদে মানাফের সাথে মিলিত হয় তারা ছিল বনু আসাদ বিন আবদুল ওয্যা, বনু যুহরা বিন কিলাব, বনু তাইম বিন মুররা এবং বনু হারিস বিন ফিহর। তাদের সর্দার ছিল আব্দে শামস্। যারা আবদুদ্দারের সাথে মিলিত হয়, তারা ছিল বনু মখযুম, বনু সাহ্‌ম, বনু জুমাহ এবং বনু আদী। তাদের সর্দার ছিল আমের বিন হাশিম। বনী আমের বিন লুয়াই এবং বনী মুহারিব বিন ফিহর এ ঝগড়ায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে।

(২) রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাতে মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত এসব ব্যবস্থাপনা ঠিক সেভাবেই অক্ষুন্ন থাকে যেমনভাবে উভয় পরিবারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর হুযুর (সঃ) হিজাবাহ ও সিকায়াহ ব্যতীত অন্য সব রহিত করেন। হিজাবাহ ত আজ পর্যন্ত আবদুদ্দারের একটি শাখা শায়বাহ-বিন্-ওস্‌মানের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছে। অবশ্যি সেকায়ার দায়িত্ব অবশেষে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের হাতে এসেছিল তা কিছুকাল বনী আব্বাসের হাতেই ছিল। তারপর প্রথম আব্বাসীয় খলিফা তা নিজেই ছেড়ে দেন -গ্রন্থকার।

ধুসরিত হয়ে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আসছে। আসছে কংকালসার দুর্বল উটনীর পিঠে চড়ে। তাদের জামাকাপড় ময়লা হয়েছে। তাদের পাথেয় শেষ হয়েছে। অতএব তাদের আহার করাও, পানি পান করাও।”

এ ব্যাপারে কুরাইশের সকল পরিবারের পক্ষ থেকে চাঁদা আসতো। স্বয়ং হাশিম বিরাট অর্থ নিজের পক্ষ থেকে ব্যয় করতো। তারপর মক্কার সকল কূপ থেকে পানি এনে এনে চামড়ার চৌবাচ্চাগুলো ভর্তি করা হতো। কারণ জুরহুমীগণ যমযম ধ্বংস করে তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। রুটি ছালন একত্রে রান্না করে এবং রুটি দুধ একত্রে রান্না করে খাওয়া হতো। ছাতু, খেজুর প্রভৃতিও খেতে দেয়া হতো। হাজীদের মিনা থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত তাদের নানানভাবে আপ্যায়িত করা হতো। হাশিমের এ জনসেবা সকল গোত্রের প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ ছিল। তারা প্রতি বছর হজ্বের সময় তার উদারতাপূর্ণ জনসেবার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করতো।

কুরাইশদের ব্যবসা ও তার উন্নতি

কুরাইশদের ব্যবসার উল্লেখ সূরায়ে কুরাইশে

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ -

গ্রীষ্ম ও শীতের সফরের নামে আল্লাহর এক কৃপা হিসাবে করা হয়েছে। সর্বপ্রথম এ ধারণা হাশিমের মনেই উদয় হয়। সে তার তিন ভাই আবদে শাম্‌স্, মুত্তালিব ও নাওফালকে সাথে নিয়ে পরিকল্পনা করে যে তাদের সে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে হবে যা আরবদের পথে প্রাচ্যের শহরগুলির সাথে শাম ও মিশরের চলছিল। সেইসাথে আরববাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও খরিদ করে আনতে হবে যেন পথিমধ্যস্থ গোত্রগুলো তা খরিদ করতে পারে এবং মক্কার বাজারে দেশের ব্যবসায়ীগণ মাল খরিদ করতে আসতে থাকে। এ এমন এক সময় ছিল যখন ইরানের সাসানী সরকার সে আন্তর্জাতিক ব্যবসার উপরে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। উত্তরাঞ্চল ও পারস্য উপসাগরের পথ দিয়ে রোম সাম্রাজ্য এবং প্রাচ্যের শহরগুলোর মধ্যে সে ব্যবসা চলতো। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে লোহিত সাগরের তীর বরাবর যে ব্যবসার রাজপথ শাম ও মিশরে প্রসারিত তার ব্যবসা বড়োই জমজমাট ছিল। আরবের অন্যান্য ব্যবসায়ী কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের এ সুবিধাটুকু ছিল যে বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে পথের সকল উপজাতীয়গণ তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। হজ্বের সময় যে উদারতার সাথে কুরাইশগণ হাজীদের খেদমত করতো তার কারণে সকলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। তাদের এ আশংকা ছিল না যে, পথে তাদের কাফেলার উপর কেউ ডাকাতি করবে। পথিমধ্যস্থ উপজাতীয়গণ তাদের নিকট থেকে মোটা পথকরও আদায় করতোনা যা অন্যান্য কাফেলার নিকটে দাবী করা হতো। হাশিম এসব দিক বিবেচনা করে ব্যবসার স্কীম তৈরী করে এবং এ স্কীমে তার তিন ভাইকেই শামিল করে। শামের গাস্যানী বাদশাহ থেকে হাশিম, আবিসিনিয়ার বাদশাহ থেকে আবদে শাম্‌স্, ইয়ামেনের আমীরদের থেকে মুত্তালিব এবং ইরাক ও পারস্য সরকারদের থেকে নাওফাল ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা লাভ করে। (১) এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করছিল।

(১) তাবারী বলেন, হাশিম রোমের কায়সার এবং শাম ও গাস্যানের বাদশাহ থেকে, আবদে শামস্ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী থেকে, নাওফাল ইরানের বাদশাহ থেকে এবং মুত্তালিব হিমইয়ারের বাদশাহদের থেকে ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা এবং সফরকালীন নিরাপত্তার পরওয়ানা হাসিল করে। ইবনে সাযাদ বলেন যে রোমের কায়সার হাশিমকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতো। ব্যবসার উদ্দেশ্যে সে আংকারা পর্যন্ত অগ্রসর হতো –গ্রন্থকার।

এজন্যে এ চার ভাই মুতাজেররীন (পেশাগত ব্যবসায়ী) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চারধারের গোত্র এবং রাষ্ট্রগুলোর সাথে তারা যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল তার ভিত্তিতে তাদেরকে আস্‌হাবুইলাফ' ও বলা হতো। যার অর্থ ত বন্ধুত্ব সৃষ্টিকারী। কিন্তু পরিভাষা হিসাবে 'ইলাফের' অর্থ এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যার ভিত্তিতে পথ অতিক্রম করা কালীন নিরাপত্তা এবং বন্ধুগোত্রদের অঞ্চলে অবস্থানের নিরাপত্তাও লাভ করা হয়। এ রাজনৈতিক মৈত্রী (ALLIANCI) থেকে ভিন্ন ধরনের চুক্তি হতো।

এ ব্যবসার কারণে শাম মিশর, ইরান, ইরাক, ইয়ামেন এবং আবিসিনিয়া দেশগুলোর সাথে কুরাইশদের সম্পর্ক স্থাপনের সেসব সুযোগ হয়েছিল এবং বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি এতোটা উন্নত হয় যে, আরবের অন্য কোন গোত্র তাদের সমকক্ষ ছিলনা। ধনদৌলতের দিক দিয়েও তারা আরবের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। ফলে মক্কা আরব উপদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে পড়ে। এতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটা বিরাট সুবিধা এই হয়েছিল যে ইরাক থেকে তারা সে বর্ণমালা সংগ্রহ করে আনে যা পরবর্তীকালে কুরআন লেখার কাজে লাগে। কুরাইশদের যতো সংখ্যক শিক্ষিত লোক ছিল তেমন অন্য কোন গোত্রে ছিলনা। এ কারণেই নবী (সঃ) বলেছেন–

قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ .

–কুরাইশ মানবের নেতা (মুসনাদে আহমদ, আমর বিন আল–আস থেকে বর্ণিত)।

বায়হকীতে হযরত আলীর (রাঃ) একটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ–

كَانَ هٰذَا الامر فى حِمْيَرَ فنزعه الله منهم وجعله فى قريش -

–প্রথমে আরবের সর্দারি হিমইয়ারদের হাতে ছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের হাত থেকে কেড়ে কুরাইশকে দেন।

কুরাইশ এভাবে উন্নতির পথে চলতে থাকে এমন সময় আবরাহার অকস্মাৎ আক্রমণের ঘটনা ঘটে। সে সময় এ পবিত্র শহর দখল করতে এবং কাবা ধ্বংস করতে আবরাহা যদি সমর্থ হতো, তাহলে আরবে শুধু কুরাইশদেরই নয় বরঞ্চ স্বয়ং কাবার মর্যাদাও বিনষ্ট হতো। এ ঘর যে প্রকৃতই আল্লাহর–জাহেলিয়াতের যুগের আরবের এ বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে যেতো। এ ঘরের খাদেম হওয়ার কারণে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ছিল তাও একেবারে শেষ হয়ে যেতো। মক্কা পর্যন্ত হাবশীদের অগ্রসর হওয়ার পর রোম সাম্রাজ্য সামনে অগ্রসর হয়ে শাম ও মক্কার মধ্যবর্তী বাণিজ্যিক রাজপথ অধিকার করে বসতো। কুসাই বিন কিলাবের পূর্বে কুরাইশদের যে দুরবস্থা ছিল, তার চেয়েও অধিক দুরবস্থা তাদের হতো। কিন্তু আল্লাহতায়ালা যখন তাঁর ক্ষমতার এ আলৌকিক বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন যে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর সৈন্য প্রস্তর খন্ডের আঘাতে আঘাতে আবরাহার ষাট হাজার হাবশী সৈন্য ধ্বংস ও নিস্তনাবুদ করে দিল এবং মক্কা থেকে ইয়ামেন পর্যন্ত সমস্ত পথে ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর লোক পড়ে পড়ে মরতে লাগলো, তখন কাবা যে আল্লাহর ঘর, সমগ্র আরববাসীর এ বিশ্বাস আরও বহু গুণে মজবুত ও শক্তিশালী হলো। সাথে সাথে সারা দেশে কুরাইশদের মর্যাদাও বেড়ে গেল। এখন আরব বাসীদের এ দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে, এদের উপর আল্লাহর বিশেষ করুণা রয়েছে। ফলে কুরাইশগণ দ্বিধাহীন চিত্তে আরবের সর্বত্র তাদের ব্যবসায়ী কাফেলাসহ গমনাগমন করতো। তাদের উত্যক্ত করার কারো সাহস হতোনা। এমনকি কুরাইশী নয় এমন কোন ব্যক্তিকেও যদি নিরাপত্তা দান করতো, তাতেও কেউ আপত্তি করতোনা।

আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম

হাশিম তার ব্যবসা সংক্রান্ত সফর উপলক্ষ্যে শাম যাবার পথে প্রায় মদীনায় অবস্থান করতেন। মদীনার খযরজ গোত্রের এক মহিলাকে সে ইতঃপূর্বেই বিয়ে করেছিল এবং তার পক্ষ থেকে হাইয়া নাম্নী এক কন্যা এবং সায়ফী নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর এক সফরে সে খযরজ গোত্রেরই বনী নাজ্জার পরিবারের সাল্মা বিন্তে আমর বিন যায়েদ নাম্নী এক যুবতীকে দেখতে পেলো যে, সে বাজারের মধ্যে একটি উচ্চস্থানে বসে আদেশ করছে যে তার জন্যে কি খরিদ করা যায় এবং তার পক্ষ থেকে কি বিক্রি করা যায় । হাশিম তার সৌন্দর্য , জাঁকজমক, সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সে কারো সাথে এ শর্ত ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত ছিলনা যে সে তার আপন মর্জিমতো চলবে এবং কাউকে ভালো না লাগলে তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। হাশিম তার শর্ত মেনে নিল। মহিলাটি হাশিমের বংশীয় আভিজাত্য ও তার ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করে বিবাহে সম্মত হলো। মদীনাতেই উভয়ের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং এখানেই তার গর্ভ থেকে প্রায় ৪৯৫ খৃষ্টাব্দে আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করে। এ সফরেই হাশিম যখন গায্যা পৌঁছে তখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করে। এভাবে যৌবনে পদার্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত আবদুল মুত্তালিব মায়ের সাথে মদীনাতেই অবস্থান করে। হাশিম মৃত্যুর সময়ে অসিয়ত করে যায় যে, তার মৃত্যুর পর তার ভাই মুত্তালিব তার স্থানে সিকায়াহ ও রিফাদার মুতাওয়াল্লী হবে এবং সেই তার পরিবারবর্গ ও বিষয় সম্পদের দেখাশুনা করবে। সে সময় থেকে বনী হাশিম ও বনী আলমুত্তালিব একান্ত হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ছিল। এর বিপরীত বনী আবদে শামস্ (যার থেকে বনী উমাইয়ার উৎপত্তি হয়) এবং বনী নাওফাল একে অপরের মিত্র হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী কাল পর্যন্ত ছিল। মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুয়ত কালে যখন কুরাইশের সকল গোত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং শি'বে আবি তালেবে তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখে, তখন বনী হাশিমের সাথে বনী আল্ মুত্তালিবও এ অবরোধে নবীর সাথে ছিল। পক্ষান্তরে বনী নাওফাল ও বনী আবদে শাম্স বিরোধী দলের সাথে ছিল।

আবদুল মুত্তালিবের আসল নাম ছিল শায়বা এবং আপন দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্যে তাকে "শায়বাতুল হামদ'ও বলা হতো। সে মদীনায় প্রতিপালিত হচ্ছিল এমন সময় একদিন হাস্সান বিন সাবিত (রাঃ) এর পিতা সাবিত বিন মুনযের মক্কায় গিয়ে মুত্তালিবের সাথে দেখা করলো। পূর্ব থেকেই তার সাথে সাবিতের মেলামেশা ছিল। তার সাথে আলাপচারি প্রসংগে সাবিত বল্লো, তোমার ভাইপো শায়বা, একবার দেখনা–তোমার মন আনন্দে ভরে যাবে। বড়ো সুন্দর হাট্টা গোট্টাজোয়ান।

এ কথা শুনে মুত্তালিব অধীর হয়ে পড়লো এবং মদীনা গিয়ে আপন ভাতিজাকে একসাথে উটের পিঠে বসিয়ে মক্কা নিয়ে এলো। কুরাইশের লোকেরা এ যুবক ছেলেটিকে মুত্তালিবের সাথে আসতে দেখে বলতে লাগলো, "আবদুল মুত্তালিব (অর্থাৎ মুত্তালিবের গোলাম)"। মুত্তালিব তাদেরকে ধমক দিয়ে বল্লো, "এ আমার ভাই হাশিমের পুত্র শায়বা– আমার গোলাম নয়।"

কিন্তু আবদুল মুত্তালিব নামটি এতো মশহুর হয়ে পড়লো যে, আসল নাম তলিয়ে গেল। কিছুকাল পরে মুত্তালিব এক বাণিজ্যিক সফরের উদ্দেশ্যে ইয়েমেন গিয়ে মৃত্যুবরণ করলো। আবদুল মুত্তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হলো এবং 'সিকায়াহ' ও 'রিফাদাহ'–এর উভয় পদমর্যাদা সে লাভ করলো।

ইবনে সাদ তার প্রশংসা করে বলেন, সে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান, সবচেয়ে ধীর স্থির ও সহনশীল, সব চেয়ে দাতা এবং ঐসব অনাচার থেকে সব চেয়ে দূরে ছিল যা পুরুষদের অধঃপতন এনে দিত।

ইবনে হিশাম আরও বলেন, সে তার কওমের সম্মান ও শ্রদ্ধার এমন মর্যাদা লাভ করেছিল যা তার পূর্ব পুরুষদের কেউ লাভ করেনি। তার কওম তাকে ভালোবাসতো এবং লোকের মধ্যে সে বিরাট মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইবনে আসীর বলেন, আবদুল মুত্তালিবও রমযান মাসে গারে হেরায় গিয়ে তাহান্নুস্ (এবাদত) করতো এবং মাস ভর মিসকীনদেরকে আহার করাতো।

তাবারী, ইবনে আসীর ও বালাযুরী বলেন, আবদুল মুত্তালিবের চাচা নাওফাল হাশিমের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ আত্মসাৎ করেছিল। আবদুল মুত্তালিব প্রথমে কুরাইশদের প্রতিপত্তিশীল লোকদের কাছে অভিযোগ করে। তারা চাচা ও ভাতিজার কলহে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর আবদুল মুত্তালিব– নানার গোষ্ঠীর (মদীনার বনী আদী বিন তুজ্জার) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। অতঃপর তার মামু আবু সাঈদ বিন আদাস আশিজন লোকসহ মক্কায় পৌঁছে এবং তারা বলপূর্বক নাওফাল থেকে ভাগিনার অধিকার আদায় করে দেয়। তারপর নাওফালও বনী হাশিমের বিরুদ্ধে বনী আব্দে শামসের সাথে মিলিত হয় এবং নবী (সঃ) এর রেসালাতের যুগ পর্যন্ত বনী নাওফাল সে দলভুক্তই থাকে, যে দল বনী হাশিমের বিরোধী ও বনী আবদে শামসের সহযোগী ছিল। আবদুল মুত্তালিব যখন দেখলো যে বনী নাওফাল তার বিরোধী দলে মিলিত হয়েছে তখন সে খুযায়া সর্দারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এবং তাদের সাথে ঐক্য ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পন্ন করে এবং খানায়ে কাবায় গিয়ে তারা রীতিমতো চুক্তিনামা লেখেন। ইবনে সায়াদ ও বালাযুরীর বর্ণনায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাঁরা বলেন, বনী খুযায়া আবদুল মুত্তালিবের কাছে স্বয়ং আবেদন করে পারস্পরিক বন্ধুত্ব সাহায্য সহযোগিতার চুক্তি সম্পন্ন করে। এ চুক্তিতে বনী আল মুত্তালিব ও বনী হাশিম উভয় পরিবার শরীক হয়। বনী আব্দে শামস এবং বনী নাওফাল এর থেকে পৃথক থাকে। এ চুক্তিনামা লিখিত হয় দারুন্নাদওয়াতে এবং কাবাঘরে লটকানো হয়। তদনুযায়ী আবদুল মুত্তলিব তার সন্তানদেরকে অসিয়ত করেন বনী খুযায়ার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার। তারই প্রভাব এই ছিল যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যখন সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এই ছিল যে, আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যদি কেউ চায় ত উভয় পক্ষের যে কোন এক পক্ষের সাথে শরীক হতে পারে, তখন খুযায়া রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত করে।

আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক যমযম নতুন করে পুনরুদ্ধার

এ গৌরব আবদুল মুত্তালিবেরই প্রাপ্য যে, যে যমযম জুরহুমীয়গন একেবারে বন্ধ করে দিয়ে তার চিহ্ন পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছিল, তা তাঁর হাতেই নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। মুহাম্মদ বিন ইসহাক হযরত আলী (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বলেন, স্বপ্নে আবদুল মুত্তালিবকে যমযমের স্থান বলে দেয়া হয় এবং তাঁকে ঐ স্থান খনন করে এ পবিত্র কূপ বের করার নির্দেশ দেয়া হয়। সে সময় হারেস ব্যতীত আবদুল মুত্তালিবের কোন পুত্র ছিলনা, হারেসকে সাথে নিয়ে কোদাল ও বেলচাসহ তিনি উক্ত স্থানে পৌছলেন এবং খনন কাজ শুরু করলেন। যখন পানি বেরুলো তখন আবদুল মুত্তালিব উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর বল্লেন। এর থেকে কুরাইশরা জানতে পারলো যে যমযম বের হয়েছে। তারা সব একত্র হয়ে বলতে লাগলো, "আবদুল মুত্তালিব! এ ত আমাদের পিতা ইসমাইলের (আঃ) কূপ এবং এতে আমাদেরও অধিকার রয়েছে। তোমার সাথে আমাদেরও

এতে শরীক কর।" তিনি বল্লেন– "আমি তা করতে পারিনা। এ বিশেষ করে আমাকে দেয়া হয়েছে, তোমাদের কাউকে দেয়া হয়নি।" তারা এ নিয়ে ঝগড়া করতে চাইলে আবদুল মুত্তালিব বল্লেন–, "আচ্ছা কাউকে সালিশ মান।" তারা বনী সা'দ বিন হুযাইমের গণৎ কারিকার নাম করলো, যে শামদেশের উচ্চতর অঞ্চলে বাস করতো। আবদুল মুত্তালিব এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং কিছু সংগী সাথীসহ বনী উমাইয়া ও প্রতিটি কুরাইশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকসহ শামের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তারা একটি মরুভূমিতে পৌছলো যেখানে আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথীদের পানি একেবারে শেষ হয়ে গেল। পানির অভাবে তাদের মৃত্যুর আশংকা হলো। তারা তাদের সফরসাথী অন্যান্য কুরাইশদের নিকটে পানি চাইলো। তারা একথা বলে পানি দিতে অস্বীকার করলো, "দূর–দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও পানির কোন চিহ্ন দেখা যায় না, এমতাবস্থায় আমাদের পানিতে তোমাদেরকে শরীক করলে আমরাও সে ধ্বংসের শিকার হবো যার আশংকা তোমরা করছো।"

অবশেষে আবদুল মুত্তালিব তার সাথীদেরকে বল্লেন, "এসো আমাদের দেহে এখনো জীবন আছে। আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের জন্যে এক একটি গর্ত খনন করি এবং যে মরে যাবে তাকে তার গর্তেই দাফন করা হবে।" অতএব প্রত্যেকে গর্ত খনন করলো এবং সকলে মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলো। তারপর আবদুল মুত্তালিব সাথীদেরকে বল্লেন, "আমরা নিজেদেরকে অযথা মৃত্যুর কাছে সুপর্দ করেছি। এসো, সাহস করে চলতে থাকি, সম্ভবতঃ কোথাও পানি পাওয়া যাবে।" তারপর তারা সকলে চলার জন্যে তৈরী হলো, কিন্তু খোদার কুদরত এই যে, আবদুল মুত্তালিব যখন তাঁর উটকে উঠালেন এবং তাঁর পা মাটিতে পড়লো ত হঠাৎ তার নীচে থেকে মিষ্টি পানির ঝর্ণা বের হলো। আবদুল মুত্তালিব ও তার সাথীগণ তার জন্যে উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর বল্লো। তারা উট থেকে নেমে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলো এবং নিজেদের মশকগুলো পানিতে পূর্ণ করে নিল। তারপর অন্যান্য কুরাইশগণ যারা পানি দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদেরকে আবদুল মুত্তালিব ডেকে বল্লেন, "তোমরাও পান কর এবং মশক ভরে ভরে নাও।"

তারা সকলে এসে তৃপ্তি সহকারে পান করে বল্লো, "হে আবদুল মুত্তালিব! খোদাই আমাদের বিরুদ্ধে এবং তোমার সপক্ষে ফয়সালা করে দিয়েছেন। খোদার কসম, এখন আর যমযম নিয়ে তোমার সাথে ঝগড়া করবনা। যে খোদা এ মরুভূমিতে তোমাকে পানি দিয়েছেন, সেই খোদা যমযমও তোমাকে দিয়েছেন। এখন নিজের পানির দিকেই ভালোভাবে ফিরে চল।"

এভাবে তারা সেই গণৎকারিকার নিকটে যাওয়ার পরিবর্তে মক্কা ফিরে চল্লো।

এ 'সিকায়ার' পদমর্যাদা– যার মধ্যে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যমযমের পানি পান করানো, জীবনভর আবদুল মুত্তালিবের কাছেই রয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবু তালেব এ মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু আবু তালেব তাঁর উদারতার কারণে তাঁর শক্তি সামর্থেরও অধিক ব্যয় করতে থাকেন হাজীদের পানি, শরবত, দুধ, প্রভৃতি পান করাতে। যার জন্যে তাঁকে কয়েকবার তাঁর ভাই আব্বাসের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং তা তিনি পরিশোধ করতে পারেন নি। অবশেষে হযরত আব্বাস এ শর্ত আরোপ করে বলেন, "এখন যদি আপনি পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে সিকায়ার মর্যাদা আপনাকে আমার জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে সিকায়াহ হযরত আব্বাস লাভ করেন। এ প্রাক–ইসলাম যুগের কথা। ইসলামের যুগেও এ পদমর্যাদা বনী আব্বাসেরই রয়ে যায়।

আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, যমযম খনন কালে যখন আবদুল মুত্তালিব দেখলেন যে, তাঁর সাথে শুধু তাঁর এক পুত্র আছে এবং কুরাইশগণ সকলে এসে ঘেরাও করে রইলো তখন তিনি মানত করলেন, যেন আল্লাহ তাঁকে দশপুত্র দান করেন তাঁর সহযোগিতা করার জন্যে। তাহলে তিনি তাদের একজনকে কাবার পাশে আল্লাহর পথে কুরবানী করবেন। আল্লাহ তাঁর এ দোয়া পূরণ করেন এবং দশপুত্র দান করেন। তারা সব যৌবনে পদার্পণ করে। অবশেষে একদিন আবদুল মুত্তালিব সবাইকে একত্র করেন এবং তাঁর মানতের কথা তাদেরকে বলেন। সকলে বলে, "আল্লাহর নিকটে যে মানত আপনি করেছেন তা পূরণ করুন।" এ কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব সকল পুত্রকে নিয়ে কাবায় হুবাল নামে এক প্রতিমার নিকটে গেলেন। এখানে ফাল বের করা হয়। তাঁর দশপুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে তিনি কুরবানী করবেন এজন্যে তিনি ফাল বের করলেন এবং তাতে হযরত আবদুল্লাহর নাম বের হলো যিনি সকল পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন এবং আবদুল মুত্তালিবের অতি প্রিয় পুত্র ছিলেন। (১)

আবদুল মুত্তালিব বিনা দ্বিধায় আবদুল্লাহর হাত ধরে ছুরি হাতে নিয়ে ইসাফ ও নায়েলা মূর্তি দুটোর নিকটে নিয়ে চলেন তাঁকে জবেহ করার জন্যে। কুরাইশেরা এটা দেখতে পেয়ে আপন আপন বৈঠক থেকে উঠে দৌড় দিল এবং বল্লো–"আরে আবদুল মুত্তালিব। এ কর কি? তুমি এমন করলে প্রতিদিন কেউ না কেউ তার পুত্র এনে জবেহ করতে থাকবে। চল, হিজাযে অমুক মেয়েলোকটির কাছে যাই। সে যা বলে তাই করো। সম্ভবতঃ সে এ সমস্যার কোন সমাধান বলে দেবে।" (২)

এ প্রস্তাব অনুযায়ী তারা মদীনায় গিয়ে পৌঁছলো এবং জানতে পারলো যে, সে স্ত্রীলোকটি খয়বরে থাকে। তার কাছে গিয়ে তারা সব কথা বল্লো। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের ওখানে লোকের মুক্তিপণ কত হয়ে থাকে?

তারা বল্লো, দশ উট।

সে বল্লো, "চলে যাও এবং একথার উপর ফাল বের কর যে আবদুল্লাহকে কুরবানী করা হবে, না দশটি উট। যদি ছেলের নামের ফাল বের হয় তাহলে দশ উট আরও বাড়িয়ে দাও এবং ফাল বের কর। এভাবে দশ দশ উট বাড়িয়ে ফাল বের করতে থাক। যখন উটের নামে ফাল বেরুবে, তখন তার অর্থ এই হবে যে, তোমাদের রব পুত্রের পরিবর্তে এতো সংখ্যক উট কুরবানীর উপর রাজী হয়েছেন।"

আররাফা মহিলাটির একথা মেনে নিয়ে তারা সকলে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ফাল্ বের করতে শুরু করে। দশ বিশ তিরিশ এমনকি নব্বই পর্যন্ত আবদুল্লাহর নামই উঠতে থাকে। অবশেষে একশত উটে পৌঁছার পর ফাল উটের উপর বের হয়। কুরাইশের লোকেরা বলে, এখন ত তোমার রবের মর্জি বুঝা গেল। আবদুল্লাহকে ছেড়ে এখন উট জবেহ কর।

---

(১) কোন কোন জীবনী লেখক এ কথা বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ট পুত্র ছিলেন। এ কথা ভুল। সুহায়লী বলেন, হযরত আবদুল্লাহর অনেক ছোট হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন। হযরত হামযার (রাঃ) বয়স রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে চার বছর বেশী ছিল এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন তিন বছরের বড়ো। হযরত আব্বাসের (রাঃ) নিজের বর্ণনা এই যে হুযুর (সঃ) যখন পয়দা হন তখন তিনি তিন বছরের ছিলেন। তিনি বলেন, "আমার মনে আছে যে ঘরের মেয়েরা আমাকে হুযুর (সঃ) এর নিকটে এনে বল্লো, 'ভাইকে আদর কর।" তখন আমি আদর করলাম (রওযুল উনুফ)–গ্রন্থকার।

(২) সুহায়লী স্ত্রীলোকটি কুত্‌বা বলে উল্লেখ করেছেন। সে মদীনার নিকটে হিজর নামক স্থানে বাস করতো–গ্রন্থকার।

কিন্তু আবদুল মুত্তালিব মানলেন না। তিনি বল্লেন আমি আরো তিন বার ফাল বের করাব। অতএব তিনবার পাশার ঘুঁটি ফেলা হলো এবং তিন বারই উটের উপর ঘুঁটি পড়লো। (১) অতঃপর আবদুল মুত্তালিব একশ' উট জবেহ করলেন এবং জন সাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিলেন যে মানুষ, পশু এমনকি হিংস্র জীবও যতো খুশী গোশ্‌ত নিয়ে যেতে পারে।

এভাবে আর একবার ইব্রাহীমের (আঃ) বংশধরদের মধ্যে কুরবানীর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হলো যা মক্কার এ সৌভাগ্যবান পরিবারটির পুনর্বাসনের সূচনায় ঘটেছিল। যদিও মূলনীতি ও অর্থের দিক দিয়ে উভয় ঘটনার মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কর্মকান্ডের রহস্যই উদ্ভুত। প্রথমে এ পরিবারের সেই প্রথম ব্যক্তির কুরবানী অন্য এক ভাবে চাওয়া হয়েছিল যার থেকে আরবে দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করতে হয়েছিল। এখন সেই আখেরী নবী (সঃ) এর পিতার কুরবানী অন্যভাবে চাওয়া হলো, যে নবীকে সমগ্র বিশ্ব মানবের কাছে সেই দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের কাজ করতে হয়েছিল। প্রথম কুরবানীর মুক্তিপণ ছিল একটি দুম্বা এবং দ্বিতীয়টির একশত উট।

হযরত আবদুল্লাহর বিবাহ

হযরত আবদুল্লাহর বয়স পঁচিশ বছর, তখন তাঁর পিতা বনী যুহরা বিন কিলাবের সর্দার উহাব বিন আবৃদে মানাফের কন্যা আমেনা খাতুনের সাথে তাঁর বিবাহ দেন। আমেনা ছিলেন তাঁর কওমের সর্বোৎকৃষ্ট মেয়ে। কয়েক মাস দাম্পত্য জীবন যাপন করার পর হযরত আমেনা গর্ভবতী হন। এমন সময়ে স্বামী হযরত আবদুল্লাহ্ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে ফিলিস্তিনের শহর গাযায় গমন করেন।সেখান থেকে ফিরে মদীনা আসার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি সংগীসাথীদেরকে বল্লেন, তোমরা সব মক্কায় চলে যাও,আমি আমার দাদীর পরিবার আদী বিন নাজ্জারের ওখানে থাকব। এক মাস পর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। দারুন্ নাবেগাতেল জুন্দীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

তাঁর সাথীগণ মক্কায় পৌঁছে আবদুল মুত্তালিবকে হযরত আবদুল্লাহর অসুস্থতার কথা বলে। আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিসকে মদীনা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর মদীনা পৌঁছুবার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন।

এ অত্যন্ত সহীহ রেওয়ায়েত যা সাধারণতঃ সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মেনে নিয়েছেন। অথচ কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহর ইন্তেকাল এমন সময়ে হয় যখন রসূলুল্লাহর (সঃ) বয়স আটাশ মাস। কেউ দু'মাস, কেউ সাত মাসও বলেছেন। কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন স্বীকৃত কথা এই যে, হুযুর আকরাম (সঃ) যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়। এ সত্যের প্রতিই কুরআন ইংগিত করে–

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ -

–হে নবী। তিনি (তোমার বর) কি তোমাকে এতীম পাননি এবং তার পর আশ্রয়দান করেননি?

---

(১) এর থেকে জানা গেল যে, আরবে প্রথমে মানুষের মুক্তিপণ ছিল দশ উট। এ ঘটনার পর আরববাসী একশত উটই স্থায়ীভাবে মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করে।

তৃতীয় অধ্যায়
জন্ম থেকে নবুওতের প্রারম্ভ পর্যন্ত

শুভজন্ম

অবশেষে সে সময় এসে গেলো যার জন্যে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর পরিবারের একটি অংশ মক্কার পানি ও তরুলতাবিহীন বিজন উপত্যকা প্রান্তরে পুনর্বাসিত করেছিলেন এবং খানায়ে কাবা নির্মাণের সময় তিনি ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) দোয়া করেছিলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ - (البقرة : ١٢٩)

–হে আমাদের রব! তুমি এদের মধ্যে স্বয়ং তাদেরই কওম থেকে এমন এক রসূলের আবির্ভাব ঘটাও যে তাদেরকে তোমার আয়াত শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবে এবং তাদের জীবন পরিশুদ্ধ পরিমার্জিত করবে। (বাকারাহ ঃ ১২৯)

এ শুভ মুহূর্তটি আসার কিছুকাল পূর্বে আবরাহা ষাট হাজার সৈন্যসহ তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে এসেছিল। কিন্তু ষাট হাজার কেন, যদি সে ষাট লাখও নিয়ে আসতো, তাহলেও সেই পরিণাম হতো, যা হয়েছিল। যেখানে আল্লাহ তায়ালার এতো বিরাট পরিকল্পনা ক্রিয়াশীল যে এ স্থানে এমন সত্তাকে আনা হবে যিনি দুনিয়ার ইতিহাস বদলে দেবেন, যিনি সকল নবীর শেষ নবী এবং যার আগমনের জন্যে আড়াই হাজার বছর ধরে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, সেখানে যতো বড়ো মানবীয় শক্তিই হোক না কেন তা আল্লাহর শক্তির সাথে সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ না হয়েই পারে না।

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে প্রায় একমত যে আসহাবে ফীলের ঘটনা (মক্কায় আবরাহার আক্রমণ) মুহররম মাসে সংঘটিত হয়। রসূলুল্লাহর (সঃ) জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে হয়। আর তা হয়েছিল সোমবার দিনে। একথা স্বয়ং নবীই(সঃ) জনৈক বেদুঈনের প্রশ্নের জবাবে বলেন–(সহীহ মুসলিম, বর্ণনাকারী কাতাদাহ্)।

রবিউল আউয়ালের কোন্ তারিখ ছিল এতে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু ইবনে শায়বা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) এ উক্তি উধৃত করে বলেন যে, তিনি ১২ই রবিউল আউয়ালে পয়দা হন। এরই ব্যাখ্যা করেছেন মুহাম্মদ বিন ইসহাক এবং অধিকাংশ জ্ঞানীগুণীদের মতে এ তারিখই প্রসিদ্ধ। হাতির ঘটনা এবং হুযুরের (সঃ) জন্মের মধ্যে ব্যবধান কতটা এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে সর্বজনবিদিত কথা এই যে এ ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর হুযুর (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সৌর ও চান্দ্র মাস ও বছরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এক জটিল ব্যাপার। এ জন্যে নিশ্চয়তার সাথে একথা বলা মুশকিল যে জন্মের সৌর সাল ও মাস কি ছিল। সাধারণতঃ তাঁর জন্মমাস ৫৭০ খৃঃ অথবা ৫৭১ খৃঃ বলা হয়। সুহায়লী রওযুল উনুফে ২০শে এপ্রিল বলেছেন কিন্তু সাল উল্লেখ করেননি। কতিপয় গবেষক বলেছে ২৩শে এপ্রিল ৫৭১ খৃঃ। মাহমুদ পাশা ফালাকী ২০শে এপ্রিল ৫৭১খৃঃ বলেছেন এবং

তাঁর মতে তা ছিল ৯ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার। কসীন ডি পার্সিভাল (CAUSSIN DE PERCEVAL) তার গ্রন্থ আরবের ইতিহাসে ২০শে আগষ্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দে নবীর (সঃ) জন্ম তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। হিট্টি বলেন, নবী (সঃ) ৫৭১ খৃঃ অথবা তার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। কতিপয় প্রাচ্যবিদ দু'বছর পেছনে গিয়ে ৫৬৯ খৃষ্টাব্দকে নবীর জন্মকাল বলে উল্লেখ করেছেন। শুভ জন্মকাল নির্ভরযোগ্য সূত্রে সুবৃহে সাদিক্ (প্রত্যুষ বা উষাকাল) বলা হয়েছে।

সুসংবাদ ও নাম মুবারক

নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, গর্ভাবস্থায় বিবি আমেনা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর মধ্য থেকে এমন এক নূর উদ্ভাসিত হয়েছে যে শাম পর্যন্ত আলোকিত হয়েছে। আর একবার স্বপ্নে তাঁকে বলা হলো, তোমার গর্ভে এ উম্মতের সর্দার রয়েছে। সে পয়দা হলে তার নাম মুহাম্মদ রাখবে। ইবনে সায়াদ একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, স্বপ্নে তাঁর নাম আহমাদ রাখতে বলা হয়েছে,[১] সম্ভবতঃ এ দুটি নাম দুটি ভিন্ন ভিন্ন বলে দেয়া হয়েছিল। কারণ এ উভয় নামই হাদীস থেকে প্রমাণিত। বহু বর্ণনায় বিবি আমেনার একথাও উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি যখন ভূমিষ্ট হন তখন আমি অনুভব করছিলাম যে আমার ভেতর থেকে একটি নূর উদ্ভাসিত হয়েছে যার দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়েছে। বায়হাকী এবং ইবনে আবদুল বার্ ওসমান বিন আবি আল্আস এর মায়ের এ বর্ণনা উধৃত করেন যে, হুযুরের (সঃ) ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তিনি বিবি আমেনার কাছে উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ে যে দিকেই নজর পড়তো শুধু নূর আর নূরই দেখা যেতো। ভূমিষ্ট কালে ধাত্রীর কাজ করেন হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের মাতা শিফা বিন্তে আওফ্ বিন্তে আবদুল হারেস যুহরী।

জন্মের সপ্তম দিনে হযরত আবদুল মুত্তালিব তার আকীকাহ করেন এবং লোকদের খানার দাওয়াত দেন। খাওয়ার পর লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আবদুল মুত্তালিব তুমি তোমার যে সন্তানের জন্যে আমাদেরকে এ দাওয়াত খাওয়ালে তার নাম কি রাখলে?"

জবাবে তিনি বলেন, আমি তার নাম মুহাম্মদ রেখেছি। লোকেরা বল্লো–তুমি তোমার পরিবারের অন্যান্যদের নাম থেকে পৃথক নাম কেন রাখলে?

জবাবে আবদুল মুত্তালিব বলেন, আমি চাই যে, আসমানে আল্লাহ এবং যমীনে তাঁর সৃষ্টি যেন তার প্রশংসা করে।

---

(১) পূর্ব আরবে মুহাম্মদ নাম কদাচিৎ কারো ছিল। কিন্তু কারো নাম আহমাদ ছিল এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর কারণ যা আমরা তাফহীমুল কুরআন, পঞ্চমখন্ড, সূরা সফ্ টীকা ৭–৮ এ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি তা এই যে, আহলে কিতাবের মাধ্যমে কখনো কখনো আরববাসী একথা জানতে পারতো যে, আর একজন নবী আগমন করবেন যার নাম হবে মুহাম্মদ এবং তিনি ইসমাইল বংশে পয়দা হবেন। এ কথা শুনার পর আরবের কিছু লোক তাদের পুত্রের নাম মুহাম্মদ রাখতো, হয়তো সেই নবী হবে। নবী (সঃ) এর পূর্বে যাদের নাম মুহাম্মদ ছিল কাজী ইয়ায তাদের সংখ্যা ছয় বলেছেন। ইবনে খালাওয়াই ও সুহায়লী বলেছেন তিন এবং আবৃদানুল মারওয়াযী বলেছেন চার। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার ফত্হুল বারীতে বলেন, আমি অনুসন্ধান করে এমন পনেরো জনের নাম জানতে পেরেছি। তারপর তিনি আল– ইসাবাতে বলেন, তাদের কিছু সংখ্যক নবীর যুগ পায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি মুহাম্মদ বিন আদী বিন রাবিয়ার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর পিতা মুহাম্মদ নাম কিভাবে রাখেন। জবাবে তাঁর পিতা এ কথা বলেন, আমরা শাম দেশে সফর করছিলাম। এমন সময়ে এক ঈসায়ী খানকায় পৌছলাম। খানকার দায়িত্বশীল বল্লেন, তোমাদের কওমের মধ্যে এক নবীর আগমন হবে– যে হবে আখেরী নবী। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তার নাম কি হবে? তিনি বল্লেন– মুহাম্মদ। তারপর থেকে আমাদের ঘরে যে পুত্রসন্তান পয়দা হয় তার নাম মুহাম্মদ রাখা হয় –গ্রন্থকার।

দারিদ্রের মধ্যে জীবনের সূচনা

হযরত আবদুল্লাহ বিয়ে কালে যুবকই ছিলেন এবং ব্যবসারও সূচনা করেন। এমন সময় তাঁর ইন্তেকাল হয়। এজন্যে তিনি তাঁর এতীম শিশু ও স্ত্রীর জন্যে কোন বেশী ধনসম্পদ রেখে যেতে পারেননি। ইবনে সায়াদ বলেন, তিনি পাঁচটি উট, একপাল ছাগল এবং এক ক্রীতদাসী উত্তরাধিকার হিসাবে ছেড়ে যান। ক্রীতদাসী সেই উম্মে–আয়মান (রাঃ) ছিলেন যিনি বড়ো স্নেহ সহকারে নবী (সঃ) কে প্রতিপালন করেন। তাঁর আসল নাম ছিল বারাকা এবং তিনি ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত। পরবর্তীকালে নবী (সঃ) তাঁর মুক্ত গোলাম হযরত যায়েদ বিন হারিসার (রাঃ) সাথে তাঁর বিয়ে দেন। তাঁদের পক্ষে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন ।

তাঁর পবিত্র জীবনের এ গরীবানা অবস্থার উল্লেখ কুরআনে এভাবে করা হয়েছে–

وَ وَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى - (الضحٰى : ٨)

–আল্লাহ তোমাকে দরিদ্র পেয়েছিলেন এবং তারপর তোমাকে ধনশালী বানিয়ে দেন।

স্তন্য পান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কিছুদিন আবু লাহাবের ক্রীতদাসী সুয়ায়বার দুধ পান করেন। বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, তার দুধ হযরত আবু সালমাও (রাঃ) [উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমার প্রথম স্বামী], পান করেন। ইবনে সায়াদ ও ইবনে হিশাম বলেন, হযরত হামযা (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌শও (রাঃ) তারই দুধ পান করেন। আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌শ ছিলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নবের (রাঃ) ভাই। একারণেই তাঁরা ছিলেন নবী (সঃ) এর দুধ ভাই । এ খেদমতের বিনিময়ে নবী (সঃ) যৌবনে পদার্পণ করার পর হামেশা সুয়ায়বার সাথে অত্যন্ত সদাচরণ করেন। তাঁর শাদী হওয়ার পর হযরত খাদিজা (রাঃ) তার সম্মান শ্রদ্ধা করেন এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তারপর হযরত খাদিজা তাকে খরিদ করে আযাদ করে দিতে চাইলেন কিন্তু আবু লাহাব অস্বীকৃতি জানায়। পরে সে নিজেই তাকে আযাদ করে দেয়। হিজরতের পরও নবী (সঃ) তার জন্যে কাপড়–চোপড় ও পয়সা কড়ি পাঠাতেন। সপ্তম হিজরীতে নবী (সঃ) তার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর তার পুত্র মাসরুহ–এর হাল হকীকত জিজ্ঞেস করেন। সেও নবীর দুধভাই ছিল। জানা গেল যে তারও মৃত্যু হয়েছে এবং দুনিয়াতে তার কেউ নেই।

হালিমা সা'দিয়া

মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের এ নিয়ম ছিল যে, তাদের সন্তানদের দুগ্ধপানের জন্যে মরু এলাকার কোন ভালো ঘরে তাদেরকে পাঠিয়ে দিত, যাতে করে তারা সুন্দর ও উন্মুক্ত আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয় এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিক্ষা করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে বহিরাঞ্চলের গোত্রগুলো থেকে মেয়েলোক সময়ে সময়ে মক্কায় আসতো। তারা সর্দারদের সন্তান নিয়ে যেতো এবং ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক লাভ করতো। পরেও তারা সদাচরণ আশা করতো। এ ব্যাপারে নবী (সঃ) এর জন্মের কিছুদিন পর হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখা বনী সায়াদ বিন বকর–এর কতিপয় স্ত্রীলোক সন্তান লাভের জন্যে মক্কায় এলো। হালিমা বিন্তে আবু যুয়াইব স্বামী হারিস বিন আবদুল্লাহ সহ তাদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ইবনে হিশাম হালিমার নিজের বর্ণনা উধৃত করেন যাতে হালিমা বলেন, আমাদের অবস্থা বড়ো শোচনীয় ছিল। আমাদের এলাকা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ছিল। অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় আমাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ ছিল।

আমাদের গাধী এতো দুর্বল ছিল যে কাফেলার পেছনে পড়ে থাকতো। আমাদের উটনীও বেশী দুধ দিত না। আমার স্তনেও দুধ এতো কম ছিল যে সন্তানদের পেট ভরাতে পারতাম না। রাতভর কাঁদতো এবং আমরাও ঘুমোতে পারতামনা। মক্কায় পৌঁছে জানতে পারলাম যে কোন মহিলা নবী (সঃ)–কে নিতে রাজী নয়। প্রত্যেকেই বলতো সে এতীম। বাপ থাকলে কিছু ভালো আচরণ আশা করতাম। বিধবা মা ও দাদার থেকে কিছু পাব কি না পাব বলা যায় না।

হযরত হালিমা বলেন, অন্যান্য মেয়েলোক অন্যান্য ছেলেপুলে নিয়ে নিল, আমার ভাগ্যে একটিও জুটলোনা। সকলে যখন বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরী হলো তখন আমি স্বামীকে বল্লাম, 'আমি খালি হাতে যাওয়াটা পছন্দ করছিনা। গিয়ে ঐ বাচ্চাকেই নিয়ে নিচ্ছি।'

আমার স্বামী বল্লেন, তুমি এমন করলে তাতে আর দোষ কি। হতে পারে যে, আল্লাহ তার বদৌলতেই আমাদেরকে বরকত দেবেন।

অতএব আমি গিয়ে সেই বাচ্চাকে এ জন্যে নিলাম যে, আর কোন বাচ্চা আমি পেলাম না। তারপর নিজেদের অবস্থানের তাঁবুতে গিয়ে ঐ সন্তানের মুখে আমার স্তন রাখলাম ত দেখি যে এতো প্রচুর পরিমাণে দুধ বেরুলো যে, সেও তৃপ্তি সহকারে পান করলো এবং তার শরীক দুধভাই আবদুল্লাহ পেটভরে পান করলো। তারপর আমার স্বামী উটনীর দুধ দুইতে গেলে সে এতো দুধ দিল যে আমরা উভয়ে তৃপ্তিসহ পান করলাম এবং রাতটাও আরামে কাটলো। পরদিন ভোরে আমার স্বামী বল্লো– "খোদার কসম, হালিমা, তুমি ত বড়ো মুবারক বাচ্চা নিয়েছ।"

হালিমা আরও বলেন, ফেরার পথে আমাদের গাধীর অবস্থা এই ছিল যে, সে কাফেলার সকল সওয়ারী পশুকে পেছনে ফেলে চলতে লাগলো। আমার সহযাত্রী স্ত্রীলোকগণ বলতে লাগলো, হালিমা! একি তোমার সেই গাধী যার উপর চড়ে তুমি আমাদের সাথে এসেছিলে?

বল্লাম– হাঁ।

তারা বল্লো, আল্লাহর কসম। তার অবস্থাই ত একেবারে বদলে গেছে।

হালিমা বলেন, আমরা যখন বাড়ি পৌঁছলাম ত দুনিয়ার বুকের উপর হয়তো বা কোন এলাকা সে সময়ে এতোটা অনুর্বর ছিল না যতোটা ছিল আমাদের। কিন্তু ছাগলগুলো যেখানেই চরতে যেতো পেট ভরে ঘাস খেয়ে আসতো এবং প্রচুর দুধ দিত। এভাবে আমরা দিন দিন ঐ শিশুর বরকত বেশী বেশীই দেখতে পেতাম। দু বছর অতীত হওয়ার পর যখন দুধ ছাড়াবার সময় এলো তখন সন্তানটি সকল গোত্রের সন্তানদের অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ছিল। এমন মনে হতো যেন চার বছরের শিশু। আমরা তাকে মক্কায় তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের মন চাইছিল যে সে আমাদের কাছে আরও কাল থাক। আমি তার মাকে বল্লাম, আমার এ বাছাধনকে আমার কাছে আরও কিছুকাল থাকতে দিন যাতে সে আরও বড়ো ও মোটাসোটা হয়। আমার ভয় হয়, মক্কার আবহাওয়া তার স্বাস্থ্য খারাপ করে না দেয়।

মোটকথা আমি এতোটা পীড়াপীড়ি করলাম যে, তিনি তাকে আমার সাথে পাঠাতে রাজী হয়ে গেলেন। ইবনে সায়াদ বলেন, এভাবে হুযুর (সঃ) আরও দু'বছর হালিমার ওখানে রয়ে গেলেন।

বক্ষ বিদারণ

হালিমা বলেন, বাড়ি ফেরার পর দু'তিন মাস অতীত হয়েছে। এমন সময় একদিন সে শিশু তার দুধভাইয়ের সাথে আমাদের বাড়ির পেছনে আমাদের ছাগল দলের সাথে ছিল, তখন হঠাৎ

তার দুধভাই দৌড়ে এসে বল্লো, 'আমার সেই কুরায়শী ভাইয়ের কাছে সাদা পোষাকে দুজন লোক এসে তার পেট ফেড়ে ফেল্লো।' আমি এবং আমার স্বামী দৌড়ে গিয়ে দেখলাম শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার বাপ তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লো– বাছা, তোমার কি হয়েছে? সে বল্লো, সাদা পোষাক পরিহিত দুজন লোক এসে আমাকে ফেলে আমার পেট চিরে ফেল্লো। তারপর তার মধ্য থেকে কোন কিছু বের করে ফেলে দিল এবং পেটকে আগের মত করে দিল। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা আমার পেটে কোন কিছু তালাশ করতে থাকে। জানিনা তা কি? (২)

হালিমা বলেন, তাকে বাড়িতে আনার পর আমার স্বামী বল্লেন, হালিমা আমার ভয় হচ্ছে তার কিছু না হয়ে যায়। তাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়াই ভালো হবে। সুতরাং আমরা তাকে তার মায়ের কাছে মক্কায় নিতে গেলাম।

তার মা বল্লেন, কি হলো আন্না (স্তন্য দানের জন্যে নিযুক্ত ধাত্রী), একে নিয়ে এলে যে? তুমি ত তাকে তোমার কাছে রাখতে চেয়েছিলে।

আমি বল্লাম, আল্লাহ বাচ্চাকে বড়ো করে দিয়েছে। আর আমার যে দায়িত্ব ছিল তা পুরো করে দিয়েছি। এখন আমার ভয় হয়, তার কোন দুর্ঘটনা হয়ে না যায়।

বিবি আমেনা বল্লেন, আসল কথাটা কি আমাকে বল।

তাঁর পীড়াপীড়িতে হালিমা পুরো ঘটনা তার কাছে বলে ফেল্লেন।

বিবি আমেনা বল্লেন, এ বাচ্চার ব্যাপারে কি তোমার শয়তানের ভয় হয়?
হালিমা বল্লেন, হাঁ।

বিবি আমেনা বল্লেন, খোদার কসম, তার জন্যে শয়তানের পথ খোলা নেই, আমার এ বাচ্চা বিরাট মর্যাদার অধিকারী।

তারপর বিবি আমেনা তাকে গর্ভকালের ও ভূমিষ্ট হওয়ার কালের অবস্থা শুনিয়ে দেন।

শৈশব কালে নবী পাক (সঃ) এর মরুভূমিতে এ অবস্থানের কারণে তার আরবী ভাষা অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয়েছিল। কারণ তিনি ছিলেন কুরায়শী এবং বনী সায়াদের মধ্যে তিনি তাঁর শৈশব কাল কাটিয়েছেন, যাদের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ আরবী। এর ভিত্তিতেই নবী (সঃ) বলেন–

أَنَا أَعْرَبُكُمْ، انا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر-

–আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আরবী জানি। আমি কুরায়শী এবং স্তন্য পানের সময় কাটিয়েছি বনী সায়াদ বিন বকরের পরিবারের মধ্যে।

সুয়াইবার মতো হালিমার সাথে নবী (সঃ) হামেশা অত্যন্ত মহব্বতের সাথে সদাচারণ করেন। হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে নবী (সঃ) এর বিয়ে হবার পর একবার তিনি (বিবি হালিমা) এসে বল্লেন, আমাদের এলাকায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং গৃহপালিত পশু সব মরে গেছে।

---

(২) উল্লেখ্য যে এ বক্ষ বিদারণের ঘটনা খোদার একটি রহস্য যা মানুষ উদঘাটন করতে পারেনা। নবীদের (আঃ) সাথে এরূপ অসংখ্য আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে যার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু ব্যাখ্যা না জানা তা অস্বীকার করার কোন সংগত কারণ নয় –গ্রন্থকার।

তাঁর কথা শুনে নবী (সঃ) তাকে চল্লিশটি ছাগল এবং এক উট বোঝাই পণ্যদ্রব্য দান করলেন। ইবনে সা'দ মুহাম্মদ বিন মুনকাদারের বর্ণনা উধৃত করে বলেন, একজন মহিলা হুযুরের (সঃ) দরবারে হাজীর হওয়ার অনুমতি চাইলেন, যে তাঁকে শৈশবে স্তন্য দান করেছিল। সে যখন এলো ত নবী (সঃ) "আম্মা আসুন, আসুন" বলতে বলতে তাঁর চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দিলেন।

ফতেহ মক্কার সময় হালিমার ভগ্নি নবীর খেদমতে হাজীর হয়ে হালিমার মৃত্যু সংবাদ দিল। শুনে নবী (সঃ) এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর নবী (সঃ) তাকে দুশ'দিরহাম, কাপড় চোপড় এবং গদিসহ একটা উট দান করলেন। হাওয়াযেন যুদ্ধে যারা বন্দী হয়ে এলো তাদের মধ্যে হালিমার সে মেয়ে শাইমাও ছিল যে নবী (সঃ) কে তাঁর শৈশব কালে কোলে করে নিয়ে বেড়াতো। তাকে দেখে নবী (সঃ) চিনতে পারলেন, স্নেহপূর্ণ আচরণ করলেন এবং তাকে সম্মানে তার পরিবার বর্গের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাওয়াযেন প্রতিনিধি যখন নবী (সঃ) এর নিকটে করুণা ভিক্ষা চাইলো এবং বল্লো 'এসব বন্দীদের মধ্যে আপনার খালারাও আছে, দুধমাতারাও আছে' তখন নবী (সঃ) বল্লেন, যা আমার এবং বনী আবদুল মুত্তালিবের অংশ আছে তা আমি ছেড়ে দিলাম। আনসারগণ বল্লেন, আমাদের যে অংশ আছে তা আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ছেড়ে দিলাম। এভাবে ছ' হাজার কয়েদী মুক্ত হয়ে গেল। যে সম্পদ তাদেরকে ফেরৎ দেয়া হলো তার মূল্য পঞ্চাশ কোটি দিরহাম। নবী (সঃ) এর পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও এ পরিবারের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন এবং তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শন করতেন।

নবী মাতার ইন্তেকাল

ইবনে সা'দ ও ইবনে ইসহাক বলেন, নবী মুহাম্মদ (স) এর বয়স যখন ছ'বছর এবং ইবনে হাযম ও ইবনুল কাইয়েমের মতে (১) যখন সাত বছর, তখন বিবি আমিনা নবীর পরদাদীর (আবদুল মুত্তালিবের মাতা) পরিবার বনী আদী বিন নাজ্জারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে উম্মে আয়মান সহ শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে মদীনায় যান এবং এক মাস কাল অবস্থান করেন। তিনি শিশু মুহাম্মদকে সে স্থানটি দেখান যেখানে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। যেখানে তাঁকে দাফন করা হয় সে স্থানটিও দেখিয়ে দেন। এ সফরের ঘটনা শিশু মুহাম্মদের (সঃ) পরবর্তীকালে ভালোভাবে স্মরণ থাকে। হিজরতের পর যখন তিনি মদীনায় গমন করেন, তখন তাঁর মায়ের সাথে শৈশব কালের এ ঘটনা তাঁর সংগী সাথীদেরকে শুনাতেন। বনী আদী বিন নাজ্জারের ঘাঁটি দেখামাত্র তিনি চিনতে পারেন। তিনি বলতেন– "এখানে আমি এক আনসার বালিকা উনায়সার সাথে খেলা করতাম। দাদার নানীবাড়ির ছেলেদের সাথে যেসব পাখী এখানে পড়তো তাদেরকে উড়িয়ে দিতাম।"

---

(১) বিবি হালিমা সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর নবুয়তের পূর্বে তাঁর (হালিমার) ইন্তেকাল হয়। কিন্তু ইবনুল বারর তাঁর ইস্তিয়াবে আতা বিন ইয়াসারের বর্ণনা উধৃত করে বলেন, নবী (সঃ) এর দুধমাতা হালিমা যখন হুনাইন যুদ্ধের সময় নবীর দরবারে আগমন করেন, তখন তাঁকে দেখামাত্র নবী (স) দাঁড়িয়ে যান এবং স্বীয় চাদর বিছিয়ে বসতে দেন। ইবনুল বার আরও বলেন যে, হযরত হালিমা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন জা'ফর রেওয়ায়েত করেছেন। হাফেজ আবু ইয়ালা ও ইবনে হব্বান আবুদুল্লাহ বিন জাফরের (রাঃ) বরাত দিয়ে হযরত হালিমার রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার ইসাবায় হালিমার স্বামী সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, তিনি মক্কায় এসে নবী (স) এর খেদমতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইবনে সাদ বলেন, ইনি হারেমের পুত্র আবদুল্লাহ নবীর দুধভাই। ইবনে হাজার ইসাবায় উল্লেখ করেন যে শায়মা মুসলমান হয়েছিলেন–গ্রন্থকার।

দারুন্নাবেগা দেখে তিনি বলেন –"এখানে এসে আমি আমার আম্মার সাথে নেমে পড়ি এবং এ ঘরেই আমার আব্বার কবর হয়েছে। আমি বনী আদী বিন নাজ্জারের ঝর্ণাগুলোতে সাঁতার কাটার অভ্যাস করতাম।"

তারপর নবীকে (সঃ) নিয়ে তার আম্মা যখন মক্কা রওয়ানা হলেন এবং আবওয়া নামক স্থানে পৌছলেন তখন তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। উম্মে আয়মান নবীকে (সঃ) নিয়ে মক্কায় পৌছেন। ইবনে সা'দ বলেন, যে স্থানে নবীর আম্মাকে দাফন করা হয়েছিল, তাও তাঁর স্মরণ ছিল। সুতরাং ওমরায়ে হুদাইবার সময় যখন তিনি আবওয়ার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهٖ -

–আল্লাহ মুহাম্মদকে (সঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি দেন। তারপর তিনি (নবী (সঃ)) সেখানে গেলেন। করব ঠিক ঠাক করে দিলেন এবং কেঁদে ফেল্লেন। তাঁর কান্না দেখে মুসলমানগণও কেঁদে ফেল্লেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ত কাঁদতে নিষেধ করেছেন। তদুত্তরে তিনি বল্লেন–

اَدْرَكَتْنِىْ رَحْمَتُهَا فَبَكَيْتُ -

–তাঁর দয়া স্নেহ মমতা আমার মনে পড়লো এবং আমি কেঁদে ফেল্লাম।

হুযুর (সঃ) এর স্বীয় মাতার কবরে যাওয়া এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী এবং তাবাকাতে ইবনে সা'দে হযরত বুরায়দাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) এবং হযরত আবু হুরায়রাহ থেকে এসব বর্ণিত আছে।

আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

বিবি আমিনার মৃত্যুর পর নবী (সঃ) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে নিজের নিকটেই রাখলেন এবং তাঁর সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁকেই বেশী চাইতেন। এ জন্যে তাঁকে সর্বদা কাছে রাখতেন। নিকটে বসাতেন এবং যখন খুশী তখন তাঁর কাছে যেতেন– তা একাকীই থাকুন অথবা ঘুমের মধ্যে। তাঁর ভয়ে অন্যান্য সন্তান এ সাহস করতোনা। তিনি সাথে না বসলে আবদুল মুত্তালিব খানা খেতেননা কখনো কখনো খাবার সময় তাঁকে কোলে বসিয়ে নিতেন। খানায়ে কাবার দেয়ালের ছায়ায় তার জন্যে একটা বিছানা বিছিয়ে রাখা হতো এবং তাঁর সম্মানের জন্যে সে বিছানায় অন্য কোন সন্তান বসতো না। তার চারপাশে বসতো। সুঠামদেহী বালক মুহাম্মদ (সঃ) সোজাসুজি সে বিছানায় বসে পড়তেন। তাঁর চাচা তাঁকে উঠে যেতে বল্লে, আবদুল মুত্তালিব বলতেন, 'আমার বাছাকে থাকতে দাও। খোদার কসম, তার মর্যাদাই আলাদা। আশা করা যায় যে সে এমন মর্যাদা লাভ করবে ইতঃপূর্বে কোন আরব এমন মর্যাদা লাভ করেনি।'

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবদুল মুত্তালিব বলতেন– "তাঁর বড়ো শাহী মেজাজ।" তারপর তাঁকে (শিশু মুহাম্মদকে) কাছে বসিয়ে পিঠে ও মাথায় হাত বুলাতেন, মুখে চুমো দিতেন এবং তাঁর নড়ন চড়ন দেখে বড়ো আনন্দ পেতেন।

ইবনে সা'দ বলেন, বনী মুদ্‌লেজ গোত্রের লোক কোন ব্যক্তির চেহারা ও দৈহিক গঠন দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পারতো। তারা আবদুল মুত্তালিবকে বল্লো "এ শিশুর বিশেষভাবে দেখাশুনা করবে। কারণ আমরা এমন কোন পদচিহ্ন দেখতে পাইনি যা মকামে ইব্রাহীমের উপর

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পদচিহ্নের অনুরূপ, যেমন এ শিশুর পদচিহ্ন অনুরূপ।"

এ সময়ে সেখানে আবু তালিব উপস্থিত ছিলেন, আবদুল মুত্তালিব তাঁকে বলেন, এরা যা বলছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখ এবং হেফাজত কর।

কিন্তু দাদার এ স্নেহ বাৎসল্য শিশু মুহাম্মাদ (সঃ) বেশী দিন লাভ করতে পারেননি। তাঁর বয়স যখন আট বছর, তখন দাদা ইন্তেকাল করেন। ইবনে সা'দ এবং হাফেজ সাখাবী উম্মে আয়মানের এ বর্ণনা উধৃত করেন। উম্মে আয়মান বলেন, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর সময় নবী (সঃ) তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন।

পরবর্তীকালে নবীকে (সঃ) যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনার দাদার মৃত্যুর কথা কি আপনার মনে পড়ে ?" তিনি বলেন, হাঁ তখন আমার বয়স আট বছর।

হযরত আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর, কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী এবং কোন কোন বর্ণনা মতে, হযরত আবু তালিব স্বেচ্ছায় নবীর প্রতিপালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল আবদে মানাফ। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র তালিবের কারণে তাঁর কুনিয়াত আবু তালিব এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে আসল নাম চাপা পড়ে যায়। বালক তালিব নবী (সঃ) এর সমবয়স্ক ছিল এবং উভয়ের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিল। কুরাইশগণ যখন বদর যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে বনী হাশিমকে বাধ্য করে তখন তালিবও তাদের মধ্যে ছিল। সে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেনি, নিহতদের তালিকায় তার নামও ছিলনা এবং সে মক্কায়ও প্রত্যাবর্তন করেনি। তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

আবু তালিব নবী (সঃ) এর আপন চাচা ছিলেন। তিনি ভাইপোকে আপন সন্তানদের চেয়ে অধিক ভালো বাসতেন। নিজের কাছেই শয়ন করাতেন এবং যেখানেই যেতেন সাথে করে নিয়ে যেতেন। আহারের সময় তিনি (নবী মুহাম্মদ) এসে শরীক হলেই অন্যান্যগণ খাওয়া শুরু করতো। ওয়াক্দী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু তালিবের পরিবারস্থ লোকজন নবী মুহাম্মদকে (সঃ) ছেড়ে যদি আহার করতো, তা একা একা করুক অথবা একত্রে, তাদের কারো পেট ভরতোনা। কিন্তু নবী মুহাম্মদ তাদের সাথে আহার করলে পেট ভরে খাওয়ার পর খানা বেঁচে যেতো। তাঁর এ বরকত লক্ষ্য করে আবু তালিব এ নিয়ম করে দেন যে, আহার করতে বসলে বলতেন– "দাঁড়াও আমার বাছাকে আসতে দাও।" তারপর হুযুর (সঃ) এলে সকলে খানা খাওয়া শুরু করতো। আবু তালিব বলতেন, বাছা, তুমি বড়োই মুবারক (বরকতের অধিকারী)। খানা খেতে বসে ছেলেপুলেরা তাদের অভ্যাসমতো কাড়াকাড়ি শুরু করলে, হুযুর (সঃ) হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন। এ অবস্থা দেখে আবু তালিব তাঁর জন্যে পৃথক এবং নিজের জন্যে পৃথক খানার ব্যবস্থা করতেন। মাদুর বিছানো হতো এবং সেখানে আর কেউ বসতো না। শুধু হুযুর (সঃ) তাঁর সাথে বসে যেতেন। আবু তালিব বলতেন, রাবিয়ার খোদার কসম, আমার এ বাছাধনের সর্দারি শোভা পায়।

নবীর ছাগল চরানো

সম্ভবতঃ এ সে সময়ের ঘটনা যখন হুযুর (স) চাচার আর্থিক দুরবস্থা এবং সেই সাথে চাচার বিরাট পরিবার দেখে স্বয়ং কিছু উপার্জনের চিন্তা করে থাকবেন। শৈশব কালে দুধমাতার গৃহে অবস্থান কালে তিনি তাঁর দুধভাই–ভগ্নির সাথে তাদের পরিবারের ছাগল চরাতেন। জ্ঞানবৃদ্ধি

হওয়ার পর এ কাজ তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় শুরু করেন। হাদীসে ওবাইদ বিন ওমাইরের এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, হুযুর (সঃ) একবার বলেন, কোন নবী এমন ছিলেন না যিনি ছাগল চরান নি। লোকে জিজ্ঞেস করে, আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন? বলেন, হাঁ।

বুখারী কিতাবুল ইজারায় হযরত আবু হুরায়রার (রা) একটি বর্ণনা আছে। তাতে এ প্রশ্নের জবাবে হুযুর (সঃ) বলেন আমি কিছু কারারিতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম [১] কিররাত শব্দের বহুবচন কারারিত (এক দীনারের দশভাগের এক ভাগ অথবা বিশভাগের এক ভাগকে এক কিররাত বলে)। আবু সালমা বিন আবদুর রহমান বলেন, একবার লোকজন নবী (সঃ) সাথে পিলু বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তখন নবী (সঃ) বলেন, এর যে ফলগুলো কালো হয়ে গেছে তা পেড়ে আন। সেকালে যখন আমি ছাগল চরাতাম, তখন এ ফল পাড়তাম (ইবনে সা'দ–লন্ডন–পৃঃ ৭৯–৮০)।

প্রাথমিক বয়সেই নবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ

নবীর জন্মের পর থেকে দশ বারো বছর পর্যন্ত যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হলো, তার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর সংস্পর্শে যারাই এসেছে তাদের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। শুধু তাই নয় যে, তার পক্ষ থেকে বিচিত্র ধরনের বরকত প্রকাশ পেয়েছে, বরঞ্চ তাঁর স্বভাব চরিত্র সাধারণ শিশুদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। তাঁর চেহারা ও মুখমন্ডল থেকেও তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হতো।

বায়হাকী এবং ইবনে জারীর হযরত আলীর (রা) একটি বর্ণনা উধৃত করে বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন "দু বারের অধিক আমার মধ্যে সেসব কাজ করার আগ্রহ জন্মেনি যা জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ করতো এবং দু'বারই মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে সে কাজ করা থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর সে কাজের কোন ধারণাই আমার মনে জাগেনি। যেসব ছেলেরা আমার সাথে ছাগল চরাতো তাদেরকে একদিন বল্লাম, আমার ছাগলগুলোর দিকে একটু নজর রেখো, আমি মক্কায় গিয়ে রাতের বেলা সেসব আমোদপ্রমোদে অংশগ্রহণ করি যাতে অন্য ছেলেরা অংশগ্রহন করে। তারা রাজী হলো এবং আমি শহরের দিকে চল্লাম। তারপর প্রথম বাড়িতেই আমি গান বাজনার কোলাহল শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি হচ্ছে?. লোকে বল্লো অমুক অমুকে বিয়ে হচ্ছে। আমি বসে পড়লাম এবং সংগে সংগে আমার এমন ঘুম এলো যে প্রভাত হয়ে গেল এবং সূর্যের উত্তাপে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

"আরেক দিন আমার সাথীদের ঐ একই কথা বলতেই তারা রাজী হয়ে গেল। তারপর মক্কা প্রবেশ করে দেখলাম সেই গান বাজনাই হচ্ছে। আমি বসে পড়লাম এবং সেদিনও ঘুমে অভিভূত

---

(১) ইবনে মাজা সুয়াইদ বিন সাঈদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ বিষয়ে নবী (সঃ) এর ভাষা এই ছিল ঃ

كنت ارعاها لاهل مكة بالقراريط -

–আমি কিছু কারারিতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম। এ বর্ণনাটি বুখারীর বর্ণনার এ অর্থ করে যে হুযুর (সঃ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতেন। কিন্তু ইব্রাহীম আল্‌হারবী দাবী করেন যে কারারিতের অর্থ কোন নগদ অর্থ সম্পদ নয়, বরঞ্চ আজইয়াদের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম যেখানে নবী ছাগল চরাতেন। এ কথা সমর্থন করেছেন ইবনুল জাওযী ও আল্লামা আয়নী। কিন্তু প্রথম কথা এইযে মক্কায় ভূগোলে কোন স্থানের নাম কারারিত প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ পারিশ্রমিক নিয়ে ছাগল চরানো কোন দূষণীয় ব্যাপার নয় যে এ দোষ থেকে হুযুরকে (সঃ) মুক্ত করার জন্যে এতোসব করতে হবে।–গ্রন্থকার।

হয়ে পড়লাম এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমেই কাটালাম। সাথীদেরকে গিয়ে বল্লাম যে, আজও কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর থেকে এ ধরনের কোন কিছুর প্রতি আমার কোন আগ্রহই জন্মে নি।"

ইবনে সা'দ উম্মে আয়মানের বরাত দিয়ে বলেন, বুয়ানা নামে একটি প্রতিমা ছিল যার দর্শন লাভের জন্যে কুরাইশরা যেতো। সেখানে নযর নিয়াযও দিত। আবু তালিবও এ উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারের লোকজনসহ সেখানে যেতো। তরুণ মুহাম্মদকেও তাদের সাথে যেতে বলা হতো। কিন্তু প্রতি বছর এ ঝগড়াই বাধতো যে মুহাম্মদ (সঃ) যেতে অস্বীকৃতি জানাতেন এবং চাচা ও ফুফীগণ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হতেন। একবার বাড়ির মুরব্বীদের তিরস্কার ভর্ৎসনায় অতীষ্ট হয়ে এ উৎসবের সময় বহুক্ষণ ধরে নবী মুহাম্মদ (সঃ) কোথায় উধাও হয়ে থাকলেন। বাড়ির সকলে তাঁর জন্যে অস্থির হয়ে পড়লো। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাকে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত মনে হলো এবং তাঁর মুখমন্ডলও বিবর্ণ হয়ে গেছে। ফুফীগণ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বল্লো, বাছা, তোমার কি হয়েছিল? তিনি বল্লেন, আমার ভয় হচ্ছে আমার কিছু না হয়ে যায়। ফুফীগণ বল্লেন, আল্লাহ কখনো শয়তানের দ্বারা তোমার অনিষ্ট হতে দেবেন না যেহেতু তোমার মধ্যে এই এই গুণাবলী আছে। তিনি বল্লেন, যখনই আমি এ প্রতিমা ঘরের কোন প্রতিমার দিকে যাই, তখন এমন মনে হয় যে, একজন গৌরবর্ণের দীর্ঘকায় লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং বলছে, মুহাম্মদ, দূরে থাক, ওকে স্পর্শ করোনা। উম্মে আয়মান বলেন, তারপর থেকে তিনি আর কখনো এ উৎসবে যোগদান করেননি।

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বরাত দিয়ে বলেন, মুখাকৃতি বিচারপূর্বক চরিত্র নির্ণয় বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ (PHYSIOGNOMIST) একব্যক্তি মক্কায় আযদে শানুয়ার একটি শাখার লেহাব গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং মক্কায় যাতায়াত করতো, যখনই সে আসতো কুরাইশের লোকজন তাদের সন্তানদেরকে তার কাছে নিয়ে যেতো, যাতে করে সে বিদ্যার সাহায্যে তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। একবার যখন সে এলো, আবু তালেব তার অন্যান্য সন্তানদের সাথে হুযুরকে (সঃ) তার কাছে নিয়ে গেলেন। সে তাঁকে দেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কাজ শেষ করে সে বল্লো, একটু আগে যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম সে কোথায়? তাকে আন। আবু তালেব যখন দেখলেন যে সে বালক মুহাম্মদকে দেখার জন্যে বড়ো অস্থির, তখন তিনি তাঁকে সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে রাখলেন। সে লোকটি বল্লো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, খোদার কসম, সে বিরাট মহাপুরুষ হবে।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, একদিন কুরাইশদের ছেলেদের সাথে খেলা করতে করতে আমি ও পাথর বহন করে আনছিলাম। সকল ছেলে পাথর বহন করার জন্যে তাদের ইজার তহবন্দ খুলে গলায় বেঁধে রেখেছিল যার দরুন সকলেই উলংগ হয়ে পড়েছিল। যেইমাত্র আমিও এরূপ করলাম, হঠাৎ আমার উপর এক ঘুসি পড়লো এবং কে যেন আমাকে বল্লো, "তোমার ইজার বেঁধে নাও"। সুতরাং আমি আমার ইজার বেঁধে নিলাম।

এভাবে নবী মুহাম্মদকে শৈশব কালেই উলংগতা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন ৩৫ হাতি বর্ষে (যখন নবীর বয়স ৩৫ বছর এবং নবুয়ত প্রাপ্তির মাত্র পাঁচ বছর বাকী ছিল) কুরাইশগণ নতুন করে কাবা ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করে। এ সময়ে কুরাইশদের সকলে তাদের ইজার খুলে আপন আপন গলায় বেঁধে পাথর বহন করে আনছিল। বালক ও যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে কারো মধ্যেই উলংগতার কোন অনুভূতি ছিলনা। হযরত আব্বাস (রা) বালক মুহাম্মদকেও (সঃ) তাই করতে বল্লেন। তিনি এরূপ করার সাথে

সাথেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে বলেন," আমার ইজার কোথায়?" তখন তাঁর ইজার পরিয়ে দেয়া হলো এবং তিনি উঠে পড়লেন। এ ঘটনাটি হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ থেকে বুখারী ও মুসলিমে উধৃত হয়েছে। আবদুর রাজ্জাক, তাবারানী এবং হাকেম আবু তোফাইলের বরাত দিয়ে বলেন, গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, "হে মুহাম্মদ তোমার সতর ঢাক।" কিন্তু বর্ণনা থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে হুযুর (সঃ) একেবার উলংগ হয়ে ছিলেন। ইজার খুলে উলংগ হওয়ার পূর্বেই তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন।

মূর্তি পূজার প্রতি ঘৃণা

শৈশব কাল থেকেই শির্ক, মূর্তিপূজা এবং এসবের প্রদর্শনী ও করণীয় কাজের প্রতি তাঁর চরম ঘৃণা ছিল। প্রাক নবুয়ত জীবনেও এসবের মলিনতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বুখারী–আবওয়াবুল মুনাকেবে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল শীর্ষ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রাঃ) একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাতে বলা হয়েছে যে, একবার প্রতিমাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত খানা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা পশুর গোশ্‌ত্ নবীকে (সঃ) খেতে দেয়া হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করেন। মুসনাদে আহমাদে ওরওয়া বিন যুবাইর বর্ণনা করেন, "আমার নিকটে হযরত খাদিজার (রাঃ) এক প্রতিবেশী একথা বলেন, আমি নবীকে (সঃ) হযরত খাদিজা কে (রাঃ) লক্ষ্য করে এ কথা বলতেশুনলাম।

ای خدیجہ، واللہ لااعبدالات والعزّی، واللہ لا اعبد ابداً ۔

–হে খাদিজা! খোদার কসম, লাত ও মানাতের এবাদত কখনো করবনা। খোদার কসম, আমি তাদের এবাদত কখনো করবনা।

জবাবে খাদিজা (রাঃ) বলছিলেন, "রাখুন লাত আর রাখুন মানাত।"

এ ঘটনা বর্ণনার পর সে প্রতিবেশী হযরত ওরওয়াকে বলে যে, কুরাইশরা রাতে ঘুমোবার আগে এ প্রতিমা দুটির পূজা করতো। সম্ভবত এ নবী (সঃ) এর দাম্পত্য জীবনের সূচনা কালের ঘটনা।

শাম সফর এবং তাপস বাহিরার ঘটনা

একবার আবু তালিব একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে শাম দেশ সফরের জন্যে রওয়ানা হন। তখন নবী (সঃ) এর বয়স ছিল বারো বছর। আবু তালিব যখন রওয়ানা হন তখন নবী (সঃ) তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং ইবনে সা'দের বর্ণনামতে বলেন, "চাচাজান, আপনি আমাকে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন। আমার যে মা–বাপ কেউ নেই, যে আমার দেখাশুনা করবে।"

একথায় আবু তালিবের মন বিগলিত হলো এবং তিনি বল্লেন, খোদার কসম, আমি না একে দূরে রাখব আর না আমি তার থেকে দূরে থাকব। এ আমার সাথেই যাবে।

এ কাফেলা যখন শাম এলাকায় বুস্‌রা পৌঁছলো এবং তাপস বাহিরার গীর্জার নিকটে থাকলো, তখন তিনি তার অভ্যাসের খেলাপ গীর্জা থেকে বেরিয়ে এলেন। অথচ কোন কাফেলার জন্যে তিনি কখনো গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসতেন না। তিনি এ গোটা কাফেলার জন্যে আহার তৈরী করেন এবং সকলকে খানার দাওয়াত করেন। কাফেলার সকলেই খানা খেতে গেলেন। শুধু বালক মুহাম্মদ কে (সঃ) অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে অবস্থান শিবিরে রেখে যাওয়া হলো। বাহিরা জিজ্ঞেস করলেন,

– সবাই কি এসেছেন?

তারা বল্লেন, শুধু একটি অল্পবয়স্ক বালককে লটবহর দেখাশুনার জন্যে অবস্থান শিবিরে রেখেআসাহয়েছে।

বাহিরা বল্লেন, না, তাকেও ডাকুন।

কুরাইশদের মধ্যে একজন বল্লেন, লাত ও ওয্যার কসম, আমাদের জন্যে এটি খুবই খারাপ হবে যদি মুহাম্মদ (সঃ) আমাদের সাথে খানায় শরীক না হয়। তারপর সে গিয়ে মুহাম্মদ কে (সঃ) নিয়েএলো।

তাঁকে আনার পর বাহিরা তাঁকে খুব মনোযোগসহকারে দেখতে লাগলেন এবং তাঁর চেহারা ও মুখমন্ডলের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

খাওয়ার পর বাহিরা বালক মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে বালক, আমি তোমাকে লাত ও ওয্যার কসম দিয়ে বলছি, যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠিক জবাবদেবে।

হুযুর (সঃ) বল্লেন, আমাকে লাত ও ওয্যার কসম দেবেন না। তাদের থেকে বেশী আক্রোশ আমার আর কিছুর জন্যে নেই।

তিনি বল্লেন, আচ্ছা, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ওসব কথার জবাব দাও যা আমি জিজ্ঞেসকরি।

হুযুর (সঃ) বল্লেন, যা খুশী জিজ্ঞেস করুন।

তারপর বাহিরা হুযুরের (সঃ) অবস্থা, তাঁর ঘুম, দৈহিক গঠন এবং অন্যান্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং হুযুর (সঃ) জবাব দিতে থাকেন। তারপর বাহিরা তাঁর চারদিক ঘুরে ফিরে তাঁর দেহ পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন, এ আপনার কে হয়? আবু তালিব বল্লেন, এ আমার পুত্র।

বাহিরা– এর পিতা জীবিত হতেই পারেন না।

আবু তালিব– এ আমার ভাতিজা।

বাহিরা– তার পিতার কি হলো?

আবু তালিব– এ মাতৃগর্ভে থাকতেই তার পিতার মৃত্যু হয়।

বাহিরা– তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার ভাতিজাকে বাড়ি ফিরে নিয়ে যাও। ইহুদীদের থেকে একে রক্ষা করো। আল্লাহর কসম, তারা যদি একে দেখে সেসব আলামত চিনে ফেলতে পারে যা আমি চিনে ফেলেছি, তাহলে এর কিছু অনিষ্ট করবে। কারণ তোমার ভাতিজা বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারীহবে।

অতএব আবু তালিব অতি সত্বর তাঁর ব্যবসার কাজকর্ম সেরে হুযুর (সঃ) কে নিয়ে দেশে ফিরেযান।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদগণ অনেক অলীক কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন এবং যেসব জ্ঞানগর্ভ কথা নবুয়ত প্রাপ্তির পর হুযুর (সঃ) থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাঁরা সেসবকে খৃস্টান তাপসদের থেকে গৃহীত তথ্যাবলী বলে গণ্য করেন। উপরন্তু স্বয়ং আমাদের কিছু বর্ণনাও

এমন আছে যা কিছুটা এসব কল্পনাকে শক্তি যোগায়। সাধনার মাধ্যমে আপন অধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করেছেন এমন একজন সিদ্ধ তাপস যদি কিছু অসামান্য বরকতের নিদর্শন দেখে অনুভব করেন যে, এ কাফেলার মধ্যে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং অতঃপর হুযুরকে (সঃ) দেখার পর তাঁর অনুমান সত্য হয়, তাহলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। উপরন্তু এটা মনে করে যে ইহুদী একটি হিংসাপরায়ণ জাতি এবং আরবের উম্মীদের মধ্যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবকে নিজেদের জন্যে আশংকাজনক মনে করে তার ক্ষতি করতে পারে। যে জন্যে তাদের থেকে রক্ষা করাতে তিনি আবু তালিবকে পরামর্শ দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় যে, তিনি এ কথা মনে করে নিয়েছিলেন যে তিনিই (হুযুর (সঃ) সে ভবিষ্যত নবী যাঁর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে দেয়া হয়েছে। কারণ ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বারা অবশ্যই একথা জানা ছিল যে একজন নবী আসবেন এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। কিন্তু নিশ্চিত রূপে এটা জানা সম্ভব ছিলনা যে বালক মুহাম্মদ (সঃ)-ই সে নবী।

এ সম্পর্কে মুহাদ্দিস এবং জীবনী রচয়িতাগণ যেসব বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, সামগ্রিকভাবে তার উপর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। তিরমিযি, বায়হাকী, ইবনে আসাকির, হাকেম, আবু নঈম, আবু বকর আল্ খারায়েতী এবং ইবনে আবি শায়বাহ্ হযরত আবু মূসা আশয়ারী থেকে এ বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, বাহিরা হুযুরের (সঃ) হাত ধরে বলেন, ইনি সাইয়েদুল মুরসালীন, ইনি সাইয়েদুল আলামীন। একে অতিসত্বর আল্লাহতায়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠাবেন।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো (তিরমিযি প্রমুখ কতিপয় মুহাদ্দিসীনের বর্ণনামতে কুরাইশদের সর্দারগণ জিজ্ঞেস করে), আপনি এ সবের জ্ঞান কোথা থেকে লাভ করলেন?

বাহিরা বলেন, তোমরা যখন সামনে থেকে আসছিলে তখন গাছপালা পাহাড় পর্বত সিজদারত ছিল। আর এসব নবী ছাড়া আর কারো সামনে সিজদারত হয় না। তাছাড়া আমি সেই মোহরে নবুয়ত দেখতে ও চিনতে পারলাম যা তার পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে রয়েছে। তার উল্লেখ আমরা আমাদের কিতাবগুলোতেও পাই।

তারপর বাহিরা আবু তালিবকে বলেন, ইহুদীদের পক্ষ থেকে এর আশংকা রয়েছে। এ জন্যে তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। ইবনে আবি শায়বাহ্ আবু মূসা আশয়ারী থেকে যে বর্ণনা উধৃতি করেন তাতে এ উল্লেখ রয়েছে যে, যখন হুযুর (সঃ) গীর্জার দিকে আসছিলেন, একটি মেঘ তাঁর উপর ছায়া করছিল। এমন বর্ণনাও আছে যে, বাহিরার পীড়াপীড়িতে আবু তালিব হুযুর (সঃ) কে আবু বকর (রাঃ) এবং বেলাল (রা) এর সাথে মক্কা পাঠিয়ে দেন। অথচ আবু বকর (রাঃ) এর বয়স তখন দশ বছর ছিল এবং বেলাল (রাঃ) তাঁর থেকেও ছোট। দ্বিতীয়ত বেলালকে পাঠানো এক আজব ব্যাপার। কারণ সে সময়ে বনী আবদুল মুত্তালিবের সাথে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিলনা যাতে করে আবু তালিব তাঁর কোন খেদমত নিতে পারতেন। এ সফর সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সাতজন রোমীয় হুযুর (সঃ) কে হত্যা করার জন্যে বেরোয় এবং বাহিরার গীর্জায় পৌঁছে। বাহিরা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জন্যে এসেছ? তারা বলে, আমরা জানতে পেরেছি এ নবীর এ মাসে এদিকে আসার কথা। সেজন্যে সবদিকে লোক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমরা এখানে এসেছি। বাহিরা বলেন, তোমাদের কি ধারণা, যে কাজের ফয়সালা আল্লাহ করেছেন, তা কেউ রুখতে পারে? তারা বলে, না। তারপর তারা তাদের ইচ্ছা পরিহার করে।

এ সবের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বারো বছর বয়সে স্বয়ং হুযুর (সঃ), কুরাইশ এবং রোমের

শাসক গোষ্ঠী পর্যন্ত এ কথা জেনে ফেলে যে বালক মুহাম্মদ (সঃ) নবী হতে যাচ্ছেন।

আবু সাঈদ নাইশাপুরীর শারফুল মুস্তাফার বরাত দিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার ইসাবা গ্রন্থে এ কথা বলেন যে, এ ঘটনার তের বছর পর মুহাম্মদ (সঃ) যখন হযরত খাদিজার (রাঃ) ব্যবসার পণ্যদ্রব্য নিয়ে শাম যান, তখন বাহিরার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হয়। এবার তিনি বলেন,

اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله النبى الامىّ الذى بشّربه

عيسىٰ ابن مريم -

–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি আল্লাহর রসূল, উম্মী নবী যার সুসংবাদ ঈসা ইবনে মরিয়ম দিয়েছেন।

এর ভিত্তিতে ইবনে মান্দাহ্ এবং আবু নাঈম বাহিরাকে সাহাবীর মধ্যে গণ্য করেছেন। হাফেজ যাহাবী তাজ্‌রিদুস্ সাহাবায় বলেছেন যে, বাহিরা নবীর আগমনের পূর্বেই তাঁর উপর ঈমানএনেছিলেন।

দ্বিতীয়বার শামদেশ সফর সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে বুস্‌রাতে একটি গাছের তলায় হুযুর (সঃ) অবস্থান করেন যা তাপস নাস্তুরার গীর্জার সন্নিকটে ছিল। নাস্তুরা বাইরে বেরিয়ে এসে হুযুরের (সঃ) সাথী গোলাম মায়সারাকে জিজ্ঞেস করেন যে গাছের তলায় কে অবস্থান করছেন। সে বলে, হারামবাসী কুরাইশের এক ব্যক্তি। ওয়াকেদী এবং ইবনে ইসহাক বলেন যে, তদুত্তরে নাস্তুরা বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) এর পরে এ দুশ বছর যাবত নবী ছাড়া আর কেউ অবস্থান করেনি। আবু সাঈদ শারফুল মুস্তাফাতে অতিরিক্ত এ কথা বলেন যে, তারপর নাস্তুরা হুযুর (সঃ) এর নিকটে এলেন, তাঁর মাথা ও পায়ে চুমো দিলেন এবং বল্লেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর রসূল সেই উম্মী নবী যার সুসংবাদ ঈসা (আঃ) দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমার পরে এ গাছ তলায় নবী উম্মী হাশেমী আরবী মক্কী, সাহেবুল হাওযে ওয়াশ্ শাফায়াত এবং সাহেবে লেওয়াযে হাম্‌দ ব্যতীত আর কেউ অবস্থান করবেনা।

মায়সারা তাঁর এ উক্তি স্মরণ রাখে। তারপর হুযুর (সঃ) বুস্‌রার বাজারে বেচাকেনার জন্যে বের হন। এসময়ে এক ব্যক্তির সাথে জিনিসের মূল্য নিয়ে মতবিরোধ হয়। তখন সে বলে, লাত ও মানাতের কসম খেয়ে বলুন। হুযুর (সঃ) বলেন, তাদের কসম আমি কোন দিন খাইনি। তখন সে বলে, আমি আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। তারপর সে মায়সারাকে নিরিবিলি ডেকে নিয়ে বলে, ইনি নবী। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, ইনি সেই নবী যার উল্লেখ আমাদের পুরোহিতগণ তাঁদের কিতাবে দেখতে পান। মায়সারা এ কথাও মনে রাখে।

আবু নাঈম বর্ণনা করেন যে, এ সফরে মায়সারা দেখেন যে, দুজন ফেরেশতা হুযুর (সঃ)এর উপর ছায়া করে আছেন। এ কাফেলা যখন মক্কা পৌঁছে তখন বেলা দুপুর। তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর বালাখানায় ছিলেন। তিনিও দেখেন যে হুযুর (সঃ) উটের পিঠে এবং দুজন ফেরেশতা তাঁর উপরে ছায়া করে আছেন। আবু নাঈম ছাড়া অন্যান্যগণ অতিরিক্ত এ কথা বলেন যে, হযরত খাদিজা (রাঃ) তার সাথের অন্যান্য নারীদেরকেও এ দৃশ্য দেখান এবং তারা বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে। তারপর মায়সারা হযরত খাদিজা (রাঃ) এর নিকটে উপস্থিত হয়ে সেসব দৃশ্যের কথা বল্লো যা সে দেখেছিল। নাস্তুরা যা বলেছিলেন এবং শামের একজন ব্যবসায়ীর সাথে যে

ঘটনা ঘটেছিল তাও সে হযরত খাদিজাকে (রাঃ) বলে।

এ সব বর্ণনা যদি মেনে নেয়া যায় , তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, পনেরো বছর পূর্বে মুহাম্মদ (সঃ) জানতে পেরেছিলেন যে তিনি নবী হতে যাচ্ছেন। মায়সারা, খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর সাথে উপবিষ্ট কুরাইশদের বহু মহিলাও একথা জানতো। তারপর কুরাইশের যে কাফেলার সাথে মুহাম্মদ (সঃ) শাম গিয়েছিলেন তারাও এবং মক্কাবাসীও এ বিষয়ে অবহিত ছিল যে, ফেরেশতা তাঁর উপর ছায়া করেছিল। কারণ মায়সারা, হযরত খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর সংগের মহিলাগণ যখন সে দৃশ্য দেখছিলেন, তখন অন্যদের কাছে এ কথা গোপন থাকে কি করে?

যদিও কথাগুলো বিজ্ঞ মনীষীদের বর্ণনা থেকেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তথাপি কয়েকটি কারণে তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ এসব সুস্পষ্ট কুরআনের পরিপন্থী যাতে নবীকে (সঃ) সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ - (القصص : ٨٦)

–তুমি কখনো এ আশা করতেনা যে, তোমার উপর কিতাব নাযিল করা হবে (কাসাস ঃ ৮৬।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ - (الشورىٰ : ٥٢)

–তুমি ত জানতেনা যে, কিতাব কি বস্তু এবং না এটা জানতে যে ঈমান কাকে বলে– (শুরা ঃ ৫২)।

উপরোক্ত আয়াত দুটো একথার অকাট্য প্রমাণ যে, নবুয়তের পদমর্যাদায় ভূষিত হবার পূর্বে তিনি এ বিষয়ে একেবারে বেখবর ছিলেন যে, তাঁকে নবী বানানো হবে। যদি বারো বছর বয়সেই তাঁর একথা জানা থাকতো এবং পঁচিশ বছর বয়সে পুনরায় তার নিশ্চয়তা দান করা হয়ে থাকতো তাহলে তাঁর উপরে কিতাব নাযিল হওয়ার কোন আশা না করার কোন কারণ থাকতে পারতো না। তারপর এক সময়ে তাঁকে মানুষের সামনে ঈমান আনার দাওয়াত দিতে হবে একথাই বা মন থেকে মুছে ফেলতেন কি করে?

কুরআন মজিদের পর, এসব বর্ণনা ঐসব সহীহ বর্ণনারও খেলাপ যা হুযুর (সঃ) এর প্রতি প্রথম অহী নাযিল হওয়ার সময়, অতঃপর তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে তাঁর কথাবার্তা সম্পর্কে উধৃত করা হয়েছে। সে সময়ে তাঁর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা কি করে হতো যদি তিনি পঁচিশ বছর থেকে জানতেন যে তিনি নবী হবেন? এ অবস্থায় ত অহী নাযিল হওয়া তাঁর একেবারে প্রত্যাশা অনুযায়ীই হতো। তারপর হযরত খাদিজা (রাঃ) হেরার ঘটনা শুনার পর যা কিছু বলেন তা এ অবস্থায় কিছুতেই বলতেন না, যদি পনেরো বছর যাবত তাঁর এ কথা জানা থাকতো যে তিনি নবী হবেন। তাহলে তিনি ত একথাই বলতেন, যা আমরা প্রত্যাশা করছিলাম তাইত ঘটেছে।

এভাবে এসব বর্ণনা সে গোটা ইতিহাসেরই পরিপন্থী যা বিপুল ও পুনঃপৌণিক বর্ণনা সমষ্টির দৃষ্টিতে তাঁর নবুওত ঘোষণার পর মক্কায় উপস্থাপিত হয়েছিল। কুরাইশের লোকেরা যদি একত্রিশ বছর যাবত এ কথা জানতো যে, তিনি (মুহাম্মদ সঃ) নবী হবেন, তাহলে তাঁর নবুয়তের ঘোষণা তাদের প্রত্যাশার বিপরীত হতোনা এবং একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর তাদের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া হতো।

ফিজার যুদ্ধ

এখন আমরা পুনরায় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর দিকে ফিরে আসছি।

ইবনে হিশাম বলেন, নবীর (সঃ) বয়স যখন চৌদ্দ পনেরো বছর তখন ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [১]

ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, বালাযুরী এবং ইবনে জারীর তাবারী বলেন, এ যুদ্ধ ২০ হাতিবর্ষেসংঘটিতহয়। [২] এ হিসাবে হুযুরের (সঃ) বয়স বিশ বছর হওয়া উচিত। এ যুদ্ধে এক পক্ষ ছিল বনী কিনানা যার মধ্যে কুরাইশও শামিল ছিল এবং অপর পক্ষে ছিল কায়স্ আয়লান যার মধ্যে সাকীফ্, হাওয়াযেন প্রভৃতি ছিল। যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, বনী হাওয়াযেনের ওরওয়াতুর রাহ্হাল নামে এক সর্দার নু'মান বিন্ মুন্যির এর বাণিজ্যিক কাফেলাকে তার স্বীয় নিরাপত্তায় ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথ করে দেয়। বাররাস বিন কায়স নামে বনী কিনানার জনৈক সর্দার বলে, তুমি কি কিনানার মুকাবিলায় তাকে নিরাপত্তা দান করেছ?সে বল্লো– হাঁ, এবং সমগ্র দুনিয়ার মুকাবিলায়। এতে বাররাস ভয়ানক রাগান্বিত হয়ে পড়ে। তারপর সে নজদের বহিরাগত এলাকায় তায়মান নামক স্থানে ওরওয়াকে হত্যা করে। কুরাইশরা ওকাজ বাজারে ছিল এমন সময়ে তাদের কাছে এ খবর পৌঁছে। সংগে সংগেই তারা হারামের দিকে রওয়ানা হয়। হারামের সীমানায় প্রবেশ করার পূর্বেই হাওয়াযেন তাদেরকে ধরে ফেলে এবং সারাদিন যুদ্ধ চলতে থাকে। রাতে কুরাইশরা হারামের সীমার ভেতরে প্রবেশ করে এবং হাওয়াযেন থেমে যায়। তারপর আবার কয়দিন যাবত যুদ্ধ চলতে থাকে। এসব যুদ্ধের কোন কোনটাতে নবী (সঃ) এতোটুকু করতেন যে, দুশমনের পক্ষ থেকে কোন তীর এসে পড়লে তা তিনি কুড়িয়ে নিয়ে আপন চাচাদেরকে দিয়ে দিতেন। ইবনে সা'দ বলেন, পরে নবী (সঃ) বলতেন, যদি আমি এতে এতোটুকু অংশ গ্রহনও না করতাম ভালো হতো। সুহায়লী বলেন, নবী (সঃ) এ যুদ্ধে তাঁর চাচাদের সাথে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে কার্যত ঃ কোন অংশ গ্রহণ করেননি। নবী হবার পূর্বে এটি ছাড়া তিনি আর কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। এছাড়া কোনো প্রকার সামরিক অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেননি। এথেকে জানা যায়, জাহেলী যুগের যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে তিনি ছিলেন পবিত্র। এর মাধ্যমে আমরা একথাও জানতে পারি যে, নবী হিসাবে তিনি যে সামরিক নেতৃত্বের অনন্য যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি পেশাদার সেনাপতি ছিলেননা, ছিলেন সহজাত সেনাপতি।

'হিলফুল ফযূল'

নবী পাকের (সঃ) বয়স যখন বিশ বছর তখন কুরাইশের কতিপয় গোত্র একটি চুক্তি সম্পাদিত করে– যাকে বলা হতো 'হিলফুল ফযূল'। ইবনে আসীর তাঁর নিহায়া গ্রন্থে 'ফযূল' শব্দ দ্বারা এ চুক্তির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, জুরহুমের যুগেও এ ধরনের একটি চুক্তি

---

(১) ইক্দুল ফরীদ, আগানী এবং জওহরীর বর্ণনা মতে ইতঃপূর্বে তিনবার ফিজার যুদ্ধ হয়। চতুর্থ ফিজার যুদ্ধে হুযুর (সঃ) অংশগ্রহণ করেন। ইবনে সা'দ বলেন, এ যুদ্ধ ২০ হাতিবর্ষে সংঘটিত হয়। জওহরী সিহহ্তে লিখেছেন যে, কুরাইশগণ এ যুদ্ধকে ফিজার নামে এ জন্যে অভিহিত করে যে, এ হারাম মাসে হয়। যেহেতু হারাম মাসে যুদ্ধ করা পাপকাজ যে জন্যে কুরাইশরা বলে –আমরা পাপ কাজ করেছি। এ কারণেই হারাম মাসে সংঘটিত এ চারটি যুদ্ধকেই 'হিরবে ফিজার' বলা হয়েছে–(গ্রন্থকার)।

(২) হাতিবর্ষের অর্থ যে বৎসর আররাহা মক্কা আক্রমণ, করে। এ এমন এক অসাধারণ ঘটনা যে আরববাসী এ বছর থেকে সন তারিখের হিসাব করা শুরু করে–গ্রন্থকার।

হয়েছিল যার সম্পাদনকারী সকলের নাম ছিল 'ফযল'। এ জন্যে তা হিলফুল ফযূল নামে অভিহিত হয়। কিন্তু এর সঠিক কারণ তাই, যা হাফেজ ইবনে কাসীর হুমাইদীর বরাত দিয়ে হযরত আবু বকরের (রাঃ) পুত্রদ্বয় মুহাম্মদ ও আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন–, আমি আবদুল্লাহ বিন জুদআনের বাড়িতে এমন এক চুক্তিতে শরীক হয়েছিলাম যে ইসলামী যুগেও এ ধরনের চুক্তির আহ্বান জানালে তা আমি পছন্দ করব। অতঃপর সে চুক্তির ব্যাখ্যা তিনি এভাবে করেন–

تحالفوا ان يردّ وا الفضول على اهلها والّا يعزّ الظالم مظلومًا -

–তারা এ বিষয়ে পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ফযূলকে তার হকদারের দিকে ফিরিয়ে দেব এবং জালেম মজলুমের প্রতি বাড়াবাড়ি করতে পারবেনা। (আল্ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯১)।

'ফযূলকে তার হকদারের দিকে ফিরানোর' অর্থ এই যে, যে ফযল কোন জালেম জবরদস্তি হকদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তা হকদারকে ফিরিয়ে দেয়া হোক এবং জালেমকে তার জুলমের উপর অবিচল থাকতে দেয়া না হোক।

ইবনে সা'দ এ চুক্তি সম্পর্কে বলেন যে, তারা পরস্পর এ সিদ্ধান্ত করে যে তারা মজলুমের সহযোগিতা করবে এবং তার হক তাকে দিয়েই ছাড়বে।

ইবনে হিশাম চুক্তির বিবরণ বয়ান করতে গিয়ে বলেন যে, মক্কায় শহরের কোন অধিবাসী অথবা বহিরাগত কোন ব্যক্তির প্রতি জুলুম হতে দেবনা এবং জালেমের মুকাবেলায় মজলুমের সাহায্য করব। ইবনে সা'দ এ চুক্তির তারিখ বলেছেন ২০শে যিল্‌কা'দা, আমুলফীল। এর কারণ ছিল এই যে, ইয়ামেনের যুবাইদী নামের একটি গোত্রের জনৈক ব্যক্তি কিছু পণ্যদ্রব্য নিয়ে মক্কায় আসে। মক্কার জনৈক সর্দার আস্ বিন ওয়ায়েল তার পণ্যদ্রব্য খরিদ করে। কিন্তু মূল্য পরিশোধ করেনা। সে বেচারা বনী আবদুদার, বনী মখযুম, বনী জুমাহ, বনী সাহম এবং বনী আদীর এক এক জনের নিকটে গিয়ে ফরিয়াদ করে। কিন্তু সকলেই কর্কশ ভাষায় তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং আস্ বিন ওয়ায়েল সাহ্‌মীর মুকাবিলায় তার সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। সকলের পক্ষ থেকে নিরাশ হওয়ার পর প্রত্যুষে সে আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে এবং উচ্চস্বরে আলে ফিহ্‌রকে সম্বোধন করে বলে যে তার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। এতে নবীর চাচা যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব সাড়া দিয়ে বলেন, বিষয়টি এভাবে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তারপর তিনি বনী হাশেম, বনী আল মুত্তালিব, বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যা, বনী যোহ্‌রা এবং বনী তাইমকে আবদুল্লাহ বিন জুদআনের বাড়িতে একত্র করেন। ইনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) এর চাচাতো ভাই। সেখানে সকলে শপথ করলো যে, মক্কায় শহরের অধিবাসী অথবা বহিরাগত যেই মজলুম হবে, আমরা তার সাহায্য করব এবং জালেমের কাছ থেকে তার হক আদায় করে ছাড়ব। তারপর সকলে মিলে আসের নিকটে গেল এবং তার থেকে যুবায়দীর পণ্যদ্রব্য ফেরৎ নিয়ে তাকে দিয়ে দেয়া হলো।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইমাম যুহ্‌রীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন আমি আবদুল্লাহ বিন জুদআনের বাড়িতে এমন এক চুক্তিতে শরীক হই যে, যদি তার বিনিময়ে একটি লাল উটও পেতাম, তাহলে তা আমি গ্রহণ করতামনা। বর্তমান ইসলামী যুগেও এ ধরনের কোন চুক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হলে তা আমি গ্রহণ করব।

হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ

শৈশব কাল থেকে হুযুর (সঃ) এর যে স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা একটি সীমিত পরিমন্ডলে সু-পরিচিত ছিল- তা তাঁর বিশ পঁচিশ বছর বয়স কালে সমগ্র কুরাইশ কওমের নিকটে প্রকাশমান হতে থাকে। তাঁর ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, সত্যপ্রিয়তা, মধুর চরিত্র, সততা, গাম্ভীর্য বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, ধৈর্য ও আত্ম-সম্মান, মহানুভবতা, নেতৃত্বের গুণাবলী-মোটকথা তাঁর এক একটি মহৎ গুণের বিকাশ ঘটতে থাকে যার জন্যে তাঁর প্রতি মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা সৃষ্টি হতে থাকে এবং তাঁর প্রভাবও তাদের উপর বিস্তারলাভ করতে থাকে। এ সময়েই হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর সাথে ব্যবসায় অংশীদারিত্বের সিদ্ধান্ত করেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) কুরাইশদের মধ্যে তাঁর সতীত্ব ও পূতপবিত্র চরিত্রের জন্যে 'তাহেরা' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাহেরা অর্থ পূত পবিত্র। সমগ্র গোত্রের জন্যে তাঁকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, উন্নত চরিত্র ও বিবিধ গুণাবলীর জন্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দৈহিক সৌন্দর্যের সম্পদও দান করেছিলেন। কুরাইশের কোন রমনীই তাঁর থেকে অধিক ধনশালিনী ছিলনা। অনেক সময় কুরাইশদের অর্ধেক ব্যবসায়ী কাফেলা শুধু তাঁর মালসম্পদের উপরই নির্ভর করতো। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় আবু হালা বিন যুরারা তামিমীর সাথে। তার ঔরসে দুই পুত্র-হিন্দ্ ও হালা জন্মগ্রহণ করে। নবীর যুগে উভয়েই মুসলমান হয়। আবুহালার মৃত্যুর পর তিনি উতায়িক বিন আব্দে আল্মাখযুমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ঔরসে কন্যা হিন্দ্ জন্মগ্রহণ করে। পরে নবুয়ত যুগে সেও মুসলমান হয়। [১] দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বিধবাই রয়ে যান। অনেক কুরাইশ সর্দার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু তিনি তাদের ইচ্ছা পূরণে অস্বীকৃত জানান। তিনি তাঁর মালসম্পদ দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন এবং কোন না কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাল নিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে পাঠাতেন এবং সে তার নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করতো।

নবী (সঃ) এর সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নত চরিত্রের কথা যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁকে বল্লেন, আপনি আমার ব্যবসার মাল নিয়ে শাম দেশে যান। অন্য লোককে মুনাফার যে অংশ দিয়ে থাকি তার চেয়ে বেশী আপনাকে দেব।

এ হচ্ছে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা।

দ্বিতীয় বর্ণনা ইবনে সা'দ নুফায়সা বিন্তে মুন্ইয়া থেকে উধৃত করেন- যার বিস্তারিত বিবরণ যুরকানী দিয়েছেন। তা হচ্ছে এই যে, আবু তালিব হুযুরকে (সঃ) বলেন, ভাইপো, আমিত মালদার লোক নই। আমাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আর আমাদের নিকটে কোন ব্যবসার মালও নেই। তোমার কওম যে কাফেলা শাম পাঠাচ্ছে, তার রওয়ানা হওয়ার সময় আসন্ন। খাদিজাও এ কাফেলার সাথে তার মাল কারো হাতে পাঠাতে চায়। তুমি তার কাছে গেলে অন্যান্যের তুলনায় সে তোমাকেই অগ্রাধিকার দেবে। কারণ সে তোমার পূত চরিত্রের কথা জানে।

হুযুর (সঃ) বলেন, হয়তো খাদিজা স্বয়ং এ কাজের জন্যে আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

আবু তালিব বলেন, আমার ভয় হয়, সে অন্য কাউকে বেছে না নেয়।

চাচা ভাতিজার এ কথাবার্তা হযরত খাদিজা (রঃ) জানতে পারেন। কিন্তু হুযুরের (সঃ)

---

(১) কারো কারো মতে-উতায়িক প্রথম এবং আবু হালা দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন-গ্রন্থকার।

কথাই ঠিক হলো কারণ তিনি প্রথমেই হুযুরকে (সঃ) সে ব্যবসার পয়গাম পাঠিয়ে দেন যার উল্লেখ ইবনে ইসহাকের মাধ্যমে উপরে করা হয়েছে।

তাবাকাতে ইবনে সাদের একটি বর্ণনায় এমন আছে যা মুহাম্মাদ বিন আকীল থেকে উধৃত। বলা হয়েছে যে, আবু তালিব হযরত খাদিজাকে (রাঃ) গিয়ে বলেন, খাদিজা, তুমি কি পছন্দ কর যে তোমার ব্যবসায়ে অন্য কারো খেদমত নেয়ার পরিবর্তে মুহাম্মদের (সঃ) সাথে কথা ঠিক করে ফেলবে?

খাদিজা জবাবে বলেন, আপনি যদি দূরের কোন অপছন্দনীয় লোকের কথা বলতেন তা মেনে নিতাম। আপনিও এমন লোকের কথা বলছেন যিনি নিকটের বন্ধু।

মোটকথা হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে হুযুরের (সঃ) ব্যবসার ব্যাপারটি স্থিরীকৃত হয়ে যায় এবং তিনি তাঁর গোলাম মায়সারাকে নবী (সঃ) এর সাথে ব্যবসা উপলক্ষ্যে শাম দেশে পাঠিয়ে দেন। এ সফর শুরু হয় ২৫ হাতিবর্ষের জিলহজ্ব মাসের ১৫/১৬ তারিখে। পথে মায়সারা হুযুরের (স) স্বভাব চরিত্র ও মহৎ গুণাবলী দেখে তাঁর প্রতি অতিশয় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যাবর্তনের পর সব কথা বিস্তারিত হযরত খাদিজাকে জানিয়ে দেয়। ব্যবসায়ও হুযুর (সঃ) বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। ইবনে সা'দ নুফায়সা বিন্তে মুন্ইয়ার কথা উধৃত করে বলেন, ইতঃপূর্বে অন্যান্য লোক যে পরিমাণ মুনাফা করে খাদিজাকে দিত, হুযুর (সঃ) তার দ্বিগুণ মুনাফা এনে দেন এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) যে পরিমাণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, তার দ্বিগুণ হুযুরকে (সঃ) দেন। [১]

হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে বিবাহ

মক্কা থেকে শাম এবং শাম থেকে মক্কা–এ সুদীর্ঘ সফরে মায়সারা নবী মুস্তাফার (সঃ) সাথে দিনরাতের সাহচর্য লাভ করে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক দেখার পর তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তার কাছে সবকিছু শুনার পর হযরত খাদিজা (রাঃ) হুযুরকে (সঃ) বিয়ের সিদ্ধান্ত করেন। যদিও এর আগে তিনি হুযুর (সঃ) সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না এবং হুযুরের যেসব গুণাবলী কুরাইশদের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার চর্চাও তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁর চেয়ে উত্তম স্বামী পাওয়া যাবে না। বিবাহের বিষয়টি কিভাবে চূড়ান্ত হয় সে বিষয়ে বর্ণনায় কিছু মতপার্থক্য রয়েছে।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত খাদিজা সরাসরি হুযুরের (স) সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, হে ভাতিজা, আপনি আত্মীয় [১] এবং আপনার বিশ্বস্ততা, সততা, মহান স্বভাব চরিত্র, আভিজাত্য এবং প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে আমি চাই যে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

---

(১) এ সফর ছাড়াও হুযুরের (সঃ) অন্যান্য সফরের বিবরণও হাদীস ও সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ সব সফরে আরবের বহু এলাকা স্বচক্ষে দেখার তাঁর সুযোগ হয়। হাকেম তার মুস্তাদরাকে ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র জুরাশে হুযুরের (সঃ) দুটি সফরের উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুসনাদে আহমাদে আছে যে বাহরাইন থেকে আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি যখন মক্কা আসে, তখন হুযুর (সঃ) সেখানকার একএকটি স্থানের নাম করে করে সে সবের অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। লোক তাতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের দেশ খুব ঘুরে ফিরে দেখেছি। উল্লেখ্য যে সে সময়ে আরবের গোটা পূর্ব সমুদ্র তটভূমিকে বাহরাইন বলা হতো– বর্তমান কালের বাহরাইন নামক দ্বীপ নয়। –গ্রন্থকার।

(১) নবী (সঃ) এর ফুফী হযরত সাফিয়া (হযরত যুবাইরের (রাঃ) মা) হযরত খাদিজার ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন–গ্রন্থকার।
(২) কোন কোন গ্রন্থকার–বিন্তে উমাইয়া বলেছেন। কিন্তু বিন্তে মুন্ইয়া–ই সঠিক। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মুসলমান হন – গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইবনে সা'দ নুফাইসা বিন্তে মুনাইয়া (২) থেকেউধৃতকরেছেন।নুফাইয় বলেন, হযরত খাদিজা বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করার পূর্বে আমাকে মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকটে পাঠিয়ে দেন তাঁর মনোভাব জানার জন্যে। আমি গিয়ে তাঁকে বল্লাম, হে মুহাম্মদ (সঃ) আপনি বিয়ে কেন করছেন না? তিনি বলেন, আমার কাছে কি আছে যে বিয়ে করব?

বল্লাম, তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আপনাকে এমন স্থানে বিয়ের পয়গাম দেয়া হচ্ছে যেখানে সৌন্দর্যও আছে, সম্পদও আছে, অভিজাত্য এবং যোগ্যতাও আছে। আপনি কি তা কবুল করবেন?

তিনি বল্লেন, কার কথা বলছো?

বল্লাম,খাদিজা।

তিনি বল্লেন, তার সাথে আমার বিয়ে কি করে হতে পারে?

বল্লাম, আমার উপর এ দায়িত্ব ছেড়ে দিন।

বল্লেন, তাই যদি হয় ত রাজী আছি।

তারপর হযরত খাদিজা পয়গাম পাঠান এবং বিয়ের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আসতে বলেন। তিনি চাচা আমর বিন আসাদকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার জন্যে আসতে বলেন।

হযরত খাদিজার পিতা খুয়াইলেদ এন্তেকাল করেছিলেন সে জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে আমর বিন আসাদ এলেন এবং নবী (সঃ) তাঁর চাচা হযরত হামজা এবং আবু তালিবকে নিয়ে এলেন,

তারপর বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় (১) বিয়েতে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং মুদার গোত্রের প্রধানগণ এবং কুরাইশ সর্দারগণ শরীক ছিলেন। মোহর হিসাবে হুযুর (সঃ) বিশ উট দেন।(২)

ইবনে আবদুল বার বলেন, শাম সফর থেকে হুযুরের (স) প্রত্যাবর্তনের দুমাস পঞ্চান্ন দিন পর এ বিয়ে হয়। তাঁর বয়স তখন পঁচিশ বছর ছিল এবং হযরত খাদিজার চল্লিশ বছর। (৩)

---

(১) ইবনে সা'দ বলেন, আমাদের গবেষণা অনুযায়ী সেসব বর্ণনা সবই ভুল–যাতে বলা হয়েছে যে খাদিজার বিবাহ তাঁর পিতা খুয়াইলিদ পড়িয়ে দেন। তার চেয়ে অধিক অবান্তর বর্ণনা এই যে খুয়াইলিদকে মদ্য পান করানো হয়েছিল এবং নেশার অবস্থায় তিনি বিয়ে পড়িয়ে দেন। পরে জ্ঞান হওয়ার পর তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। আমদের মতে জ্ঞানীগণের পক্ষ থেকে যে কথা প্রমাণিত ও সংরক্ষিত তা এই যে খুয়াইলিদ হিরবে ফিজারের পূর্বে মারা যান এবং খাদিজার চাচা আমর বিন আসাদ তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন। –গ্রন্থকার।

(২) কিছু বর্ণনামতে মোহর ছিল ৪০ দীনার এবং কিছু বর্ণনা মতে ৫০০ দিরহাম–গ্রন্থকার।

(৩) ইস্তেদরাক পৃঃ ১২৮ দ্রষ্টব্য।

(বিবাহের সময় হুযুর (সঃ) এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স সম্পর্কে কিছু ভিন্নমত।)

বিয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স সম্পর্কে সর্বজন বিদিত ও গৃহীত অভিমত এই যে সে সময়ে হুযুরের বয়স পঁচিশ বছর এবং হযরত খাদিজার চল্লিশ বছর ছিল। কিন্তু কদাচিৎ কোন বর্ণনায় হুযুর (সঃ) এর বয়স একুশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং সাঁইত্রিশ বছর এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) পঁচিশ, আটাশ, ত্রিশ, পয়ত্রিশ এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বলা হয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞানীগণ তা মেনে নেননি। কিন্তু কেউ কেউ হযরত খাদিজার বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের বর্ণনাকে এ কারণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, চল্লিশ বছরে মহিলার ছয়টি সন্তান প্রসব করা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক সন্তানের মাঝে গড়ে যদি দেড় বছরো ব্যবধান হয় তাহলে শেষ সন্তান উনপঞ্চাশ বছর বয়সে ভূমিষ্ট হওয়া উচিত। আর যদি ঐসব বর্ণনাও মেনে নেয়া যায় যাতে বলা হয়েছে যে নবুওতের পর হযরত খাদিজার গর্ভে সন্তান জন্ম গ্রহনের উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে সে সময়ে তাঁর

হযরত খাদিজার গর্ভে নবী (সঃ) এর সন্তান

নবী (সঃ) এর সমস্ত সন্তান হযরত খাদিজার (রঃ) গর্ভে জন্মগ্রহণ করেণ। শুধুমাত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) এর গর্ভজাত ছিলেন। খাদিজার (রাঃ) গর্ভে দুইপুত্র এবং চার কন্যা সন্তান, যথা (১) কাসেম (রাঃ) যার জন্যে হুযুরকে (সঃ) আবুল কাসেম বলা হতো (২) আবদুল্লাহ (রাঃ) যাঁকে তাইয়েব ও তাহেরও বলা হতো। (৩) হযরত যয়নব (রাঃ) (৪) হযরত রুকাইয়া (রাঃ) (৫) হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে কে কার বড়ো ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু একথা জানা আছে যে, হযরত যয়নব(রাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন হুযুরের (সঃ) বয়স পঁচিশ বছর ছিল (ইসাবা) এবং নবীরএকচল্লিশ বছর বয়সে হযরত ফাতেমা(রাঃ) পয়দা হন (শরহে মুযাহির)।একথাও ইতিহাসে প্রমাণিত আছে যে নবুয়তের পঞ্চাশ বৎসরে যখন প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত হয়, তখন হযরত রুকাইয়া (রাঃ) তাঁর স্বামী হযরত ওসমান (রাঃ) এর সাথে হিজরত করেন। তার অর্থ এইযে- তিনি হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে দু বছরেরই ছোট ছিলেন তাই ত নবুওতের পঞ্চম বৎসরে তিনি বিবাহিতা ছিলেন।

একটি মহলের ঘৃণ্য স্পর্দ্ধা

কিছুলোক খোদার ভয় না করে স্পষ্ট দাবী করে বলে যে, হযরত খাদিজার (রাঃ) নবী (সঃ) এর একটি মাত্র সন্তান হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন এবং অন্যান্য কন্যাগণ হুযুরের ঔরসে নয়, হযরত খাদিজার (রাঃ) অন্য স্বামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেণ। অথচ কুরআনকে এর দ্বারা সুস্পষ্ট অস্বীকার করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ - (الاحزاب: ٥٩)

হে নবী, আপন বিবিগণ ও কন্যাগনকে বল, (আহযাব)। -এ কথা ইতিহাস থেকে অকাট্যরূপে প্রমাণিত যে মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) ব্যতীত হুযুরের (সঃ) ঔরসে তাঁর অন্যান্য বিবিদের কোন সন্তান হয়নি। এ শব্দগুলো একথাই প্রকাশ করছে যে, হুযুর (সঃ) এর একজন নয় বরঞ্চ একাধিক কন্যা ছিলেন। ইতিহাস থেকেও এ কথা প্রমাণিত যে, মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) ব্যতীত নবী পাকের ঔরস থেকে অন্য কোন বিবির কোন সন্তানই হয় নি। অতএব এ সকল কন্যা অবশ্যই হযরত খাদিজার (রাঃ) গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে এসব লোক চিন্তা করেনা যে- রসূলের ঔরসজাত সন্তানদেরকে অস্বীকার করে তারা কত বড়ো পাপ

বয়স ছাপান্ন বছর হওয়া উচিত। তা একেবারে ধারনার অতীত। আমাদের মতে এ অভিমত বুদ্ধিবৃত্তিক দিকে দিয়ে সঠিক নয়। নারী চিকিৎসা শাস্ত্রে (GYNAECOLOGY) একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ যা এ শাস্ত্রের দশ জন শিক্ষক (STANLEY G. CLAYTON) এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে, এ গ্রন্থের দ্বাদশ সংস্করণে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত গবেষণা মূলক অভিমত প্রকাশ করা হয়েছেঃ-

আটচল্লিশ ও বায়ান্ন বছর বয়সে সাধারণত ঃ মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় ঋতু বন্ধের সময় পঞ্চান্ন বছর বরঞ্চ তারও অধিক কাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। পক্ষান্তরে কোন কোন অবস্থায় চল্লিশ বছর এমন কি তার চেয়েও কম বয়সে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়। নারী সত্বর বালেগ হলে তার ঋতু বন্ধ বিলম্বে হয় এবং ঋতু বিলম্বে শুরু হলে তা সত্বর বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত গ্রন্থ -পৃঃ ১০১।

এ শাস্ত্রীয় অভিমতের ভিত্তিতে এ কোন আশ্চর্য জনক ব্যাপার নয় যে হযরত খাদিজার (রাঃ) গর্ভে পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর বয়সে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নবী মুস্তাফার (সঃ) বয়স ছিল একচল্লিশ বছর এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স- ছাপান্ন বছর।

করছে এবং তার জন্যে কত কঠোর জবাবদিহি আখেরাতে তাদেরকে করতে হবে। সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে সকলেই একমত যে, হযরত খাদিজার (রাঃ) গর্ভ থেকে হুযূরের (সঃ) শুধুমাত্র এককন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন না, বরঞ্চ আরও তিন কন্যা ছিলেন। নবী (সঃ) এর প্রাচীনতম জীবন চরিত রচয়িতা মুহাম্মদ বিন ইসহাক হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে হুযূরের (সঃ) বিবাহের উল্লেখ করার পর বলেন, ইব্রাহীম (রাঃ) ব্যতীত নবী (সঃ) এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম, তাহের (তাইয়েব), যয়নব (রাঃ), রুকাইয়া (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ), (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড পৃঃ ২০২)।

প্রসিদ্ধ কুলাচার্য (GENEALOGIST) হিশাম বিন মুহাম্মাদ বিন্ আস্ সায়ের কাল্‌বি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে একথা উধৃত করেছেন যে, মক্কায় নবুয়তের পূর্বে নবী (সঃ) এর ঔরসে সকলের আগে কাসেম (রাঃ) পয়দা হন। অতঃপর যয়নব (রাঃ), রুকাইয়া (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং উম্মে কুলসূম (রাঃ) পর পর পয়দা হন। নবুয়তের পর আবদুল্লাহ (রা) পয়দাহন যাঁকে তাইয়েব এবং তাহেরও বলা হতো, এ সবের মা ছিলেন হযরত খাদিজা (রাঃ) –তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৩)।

ইবনে হাযম জাওয়ামেউস–সীরাতে বলেছেন, হযরত খাদিজার গর্ভে হুযূরের চার কন্যা পয়দা হয়। সকলের বড়ো হযরত যয়নব (রাঃ), তাঁর ছোটো রুকাইয়া (রাঃ), তাঁর ছোটো ফাতেমা (রাঃ), তার ছোট উম্মে কুলসূম (রাঃ) (পৃঃ ৩৮–৪০)।

তাবারী, ইবনে সা'দ, কিতাবুল মুজাসসার গ্রন্থ প্রণেতা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন হাবীব এবং আল ইস্তিয়াব গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে আবদুল বার নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) এর পূর্বে হযরত খাদিজার দুজন স্বামী অতীত হয়েছে। একজন আবু হালা তামিমী যার ঔরসে হিন্দ্ ও হালা জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্বামী ছিল আতীক বিন আবেদ মাখ্‌যুমী যার থেকে হিন্দ্ নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহন করে। তারপর তাঁর বিয়ে হয় হুযুর (সঃ) এর সাথে। সকল বংশবৃত্তান্ত বিশারদ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁর ঔরসে উপরোক্ত চারজন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। (তাবারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১১, তাবাকাত ইবনে সা'দ, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৪–১৬, কিতাবুল মুজাসসার, পৃঃ ৭৮, ৭৯, ৪৫২, আল ইস্তিয়াব, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭১৮ দ্রঃ) *। এ সকল বর্ণনা কুরআন পাকের বিবরণকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত করে যে, হুজুরের (সঃ) একমাত্র কন্যা ছিলনা, বরঞ্চ ছিল চার জন।

দাম্পত্য জীবন

যদিও নবী (সঃ) এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়সের মধ্যে পনেরো বছরের পার্থক্য ছিল তথাপি হযরত খাদিজার ওফাতের পর নবী (সঃ) তাঁকে সারা জীবন স্মরণ করতে থাকেন।

---

* বায়হাকী মুসআব বিন আব্দুল্লাহ আযুযুবাইরীর বরাত দিয়ে বলেন যে, রসূলুল্লাহর (সঃ) সর্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কাসেম (রাঃ), অতঃপর যথাক্রমে যয়নব (রাঃ), আবদুল্লাহ (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), এবং রুকাইয়া (রাঃ), ইউনুস বিন বুকাইর ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা উধৃত করে বলেন, হযরত খাদিজার গর্ভে নবী (সাঃ) থেকে দুই পুত্র এবং চার কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। যথা আল কাসেম (রাঃ), আবদুল্লাহ (রাঃ), উম্মে কুলসূম (রাঃ), যয়নব (রাঃ), এবং রুকাইয়া (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), আবদুর রাজ্জাক তাঁর গ্রন্থ আল্ মুসান্নাফে ইবনে জুরাইহ–এর বরাত দিয়ে বলেন, হযরত খাদিজার গর্ভে হুযুর (সঃ) এর দুপুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং কাসেম (রাঃ) এবং চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যয়নব (রাঃ) এবং সবচেয়ে ছোট ফাতেমা (রাঃ)।

বুখারীতে হযরত আলীর (রাঃ) একটি বর্ণনা উধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেন –

خير نساءها مريم وخير نساءها خديجة -

এর একটা অর্থ ত এই যে, স্বীয় উম্মতের মহোত্তমা নারী ছিলেন মরিয়ম এবং এ উম্মতের মহোত্তমা নারী খাদিজা (রাঃ)। কিন্তু মুসলিম শরীফে ওয়াকীর বরাত দিয়ে একথা বলা হয়েছে এবং ওয়াকী একথা বলার সময়ে আসমান ও যমীনের দিকে ইংগিত করে নবী (সঃ) এর এ কথাগুলো উধৃত করেন। তার মর্ম এই যে, ওয়াকী অথবা যাদের মাধ্যমে একথা তাঁর কাছে পৌছে তাঁরা সকলেই এ মর্ম গ্রহণ করেন যে, দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম নারী এ দুজন। বুখারীতে হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা আছে যাতে তিনি বলেন, নবী (সঃ) এর বিবিগণের মধ্যে হযরত খাদিজার প্রতি আমার যেমন হিংসা হয় তেমন আর কারো প্রতি হয় না। অথচ আমার বিয়ের আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। কারণ এই যে, আমি প্রায়ই নবীকে তাঁর নাম উল্লেখ করতে শুনতাম। নবী (সঃ) কখনো কোন ছাগল জবেহ করলে অবশ্যই তার কিছু গোশ্‌ত হযরত খাদিজার বান্ধবীদের নিকটে পাঠিয়ে দিতেন। বুখারীর অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার হযরত খাদিজার ভগ্নি হযরত হালা বিন্তে খুয়াইলিদ এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁর আওয়াজ শুনে নবী (সঃ) অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বল্লেন

اللهم هالة

(আয় আল্লাহ এই ত হালা) কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর হযরত খাদিজার (রাঃ) কণ্ঠস্বরের অনুরূপ ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতে আমি খুব বিরক্ত হয়ে বল্লাম, কুরাইশদের একজন বৃদ্ধা নারীকে আপনি এতো স্মরণ করেন? অথচ বহু পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে তাঁর থেকে ভালো বিবি দান করেছেন।

মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানীর একটি বর্ণনায় আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতে হুযুর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর রাগ থেকে আমি কসম করে বল্লাম, সেই খোদার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমি ভবিষ্যতে তাঁর উল্লেখ করলে শুভাকাংখা সহই করব।

ইবনে সা'দ বলেন, বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহর (সঃ) জামাই আবুল আ'সও গ্রেফতার হন। নবী কন্যা হযরত যয়নব তখন মক্কায় ছিলেন। তিনি স্বামীকে মুক্ত করাবার জন্যে ফিদিয়া পাঠিয়ে দেন, যার মধ্যে হযরত খাদিজার (রাঃ) সে হারখানা ছিল যা তিনি আবুল আসের সাথে হযরত যয়নবের বিয়ের সময় জাহেলিয়াতের যুগে উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। সে হার দেখা মাত্র নবী (সঃ) স্নেহ বিগলিত হয়ে পড়েন। তিনি আপন লোকদেরকে বলেন, তোমরা যদি ভালো মনে কর ত যয়নবের কয়েদীকে এমনিতেই ছেড়ে দাও এবং তার ফিদিয়াও ফেরৎ দিয়ে দাও। সকলেই তাতে সম্মত হলো এবং আবুল আসকে বিনা ফিদিয়াতেই ছেড়ে দেয়া হলো।

বালাযুরী 'আন্‌সাবুল আশরাফে' হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা উধৃত করে বলেন, একজন কালো রঙের স্ত্রীলোক নবীর দরবারে এলো। নবী (সঃ) তাকে খুব সন্তুষ্ট চিত্তে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তার চলে যাওয়ার পর আমি (হযরত আয়েশা) জিজ্ঞেস করলাম, তার আগমনে আপনার এতো খুশী হওয়ার কি কারণ? নবী (সঃ) বল্লেন, সে প্রায়শ খাদিজার (রাঃ)

কাছে আসতো। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, হযরত খাদিজার (রাঃ) প্রতি নবী (সঃ) এর কত গভীর ভালবাসা ছিল যা তাঁর মৃত্যুর পরও আজীবন নবীর হৃদয়ে অক্ষুণ্ন ছিল।

হযরত খাদিজা (রাঃ) নবুয়তের পূর্বে পনেরো বছর এবং নবুয়তের পর দশ বছর নবী পত্নী হিসেবে জীবন যাপন করেন। নবুয়তের দশম বছরে তাঁর ইন্তেকাল হয় যখন নবীর বয়স পঞ্চাশ বছর এবং তার বয়স ছিল পঁয়ষট্টি বছর। কিন্তু নবী পাক তাঁর সমগ্র যৌবনকাল ঐ একজন বয়স্কা বিবির সাথেই কালাতিপাত করেন। সে সময়ে অন্য কোন নারীর চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হয়নি। অথচ সে সময়ে আরববাসীদের কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী গ্রহণ কোন দিক দিয়েই দূষণীয় ছিল না। আর নারীরাও এতে প্রতিবন্ধক হতো না। স্বয়ং হযরত খাদিজার পরিবার সহ কুরাইশের সকল পরিবারে এক এক জনের একাধিক স্ত্রী হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও নবীর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত এমন একজন স্ত্রীসহ দাম্পত্য জীবন যাপন'করাতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকা, যাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর হয়েছিল– ওসব সমালোচকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব যারা নবী পাকের শেষ দশ বছরের জীবনে বহু পত্নী গ্রহণকে মায়াযাল্লাহ তাঁর প্রবৃত্তির অভিলাষ চরিতার্থ বলে আখ্যায়িত করে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব যে কি কি কারণে তিনি শেষ জীবনে বিভিন্ন নারীর পাণিগ্রহণ করেন।

সচ্ছলতার যুগ ও নবীপাকের চারিত্রিক মহত্ব

হযরত খাদিজার (রাঃ) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর নবী পাকের (সঃ) অসচ্ছলতা দূর হয়। প্রথমে হযরত খাদিজা অপরের সাহায্যে ব্যবসা করতেন এবং তাতে লাভ কম হতো। কারণ অন্যান্যরা যে ধরনের চরিত্রের অধিকারী ছিল তাতে এ আশা করা যেতোনা যে, তারা অপরের পণ্যদ্রব্য পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও শুভাকাংখা সহ কেনা বেচা করবে। কিন্তু তাঁর ব্যবসা যখন নবী (সঃ) এর মতো একজন অতি বিশ্বস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে এলো এবং স্বামী হওয়ার কারণে স্বভাবতঃই স্ত্রীর জন্যে তিনি অত্যন্ত শুভাকাংখী ছিলেন, তখন তাঁর ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠলো। আল্লাহ তায়ালার এ এরশাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হলো ঃ–

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ -(الضحى : ٨)

এবং তিনি তাঁকে দরিদ্র পেয়েছিলেন এবং পরে তাঁকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন (আদ্দোহা ৮)।

এ সময়ে নবী পাকের সততা, বিশ্বস্ততা, কাজকর্ম ও লেনদেনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সত্যপরায়নতা, দান–খয়রাত্‌, আত্মীয় স্বজনের সাহায্য ও সেবাযত্ন, অসহায় মানুষের সাহায্য, দরিদ্রের ভরণ পোষন, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির সে সকল গুনাবলী গোটা কুরাইশ এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্রাবলীর কাছে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে পড়লো যা প্রথমে প্রকাশ লাভের সুযোগের অভাবে লুপ্ত ছিল। এখন সমাজে তাঁর মর্যাদা শুধু নৈতিকতার দিক দিয়েই নয়, বরঞ্চ বৈষয়িক দিক দিয়েও এতোটা উন্নীত হলো যে তিনি কুরাইশদের অন্যতম সরদার হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলেন। তাঁর উপরে মানুষের এতোটা আস্থা সৃষ্ট হলো যে, তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে লাগলো। এমন কি এ অবস্থা তখন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যখন নবুয়ত ঘোষণার পর মক্কার জনসাধারণ নবীর রক্ত পিপাসু হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রতি চরম দুশমনি পোষণ করা সত্ত্বেও তারা তাদের সকল আমানত তাঁর হেফাজতেই রেখে দিত। এ কারণেই হিজরতের সময়ে হযরত আলী (রাঃ) কে মক্কায় রেখে যেতে হয়েছিল যাতে করে তিনি সকলের আমানতের সম্পদ ফেরৎ দিয়ে আসতে পারেন। এ একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে,

নবুয়তের পূর্বেই শুধু নয় তার পরেও ইসলাম দুশমনদের অন্তরে তাঁর দিয়ানতদারী ও আমানতদারীর চিত্র অংকিত হয়েছিল এবং তারা তাঁকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য লোক মনে করতো।

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি এতোটা নিষ্ঠাবান ছিলেন যে জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর ব্যবসার জনৈক অংশীদার সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন সর্বোত্তম অংশীদার। সে ব্যক্তি আরও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি কখনো প্রতারণা করেননি, জালিয়াতি করেননি এবং ঝগড়াঝাটিও করেননি। তার নাম বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন বলা হয়েছে। ইবনে আবদুল বার-এর ইস্তিয়াবে তার নাম বলা হয়েছে কায়েস বিন আস্সায়েব উয়াইমের মাখ্যুমী। মুসনাদে আহমাদের কোন বর্ণনায় সায়েব বিন আবদুল্লাহ আল্মাখ্যুমী এবং কোন বর্ণনায় সায়েব বিন আবিস সায়েব। আবু দাউদ (কিতাবুল আদব- বাব ফী কিরাহিযাতিল মিরা) তে তার নাম সায়েবই বলা হয়েছে। স্বয়ং তার এ বর্ণনা উধৃত করা হয়েছে- আমি রসূলুল্লাহর খেদমতে হাজীর হলে লোক আমার প্রশংসা করতে থাকে। তিনি বলেন, আমি একে তোমাদের থেকে খুব ভালো জানি। আমি বল্লাম আমার মা বাপ আপনার জন্যে কুরবান হোক আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আমার ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন, কিন্তু সর্বদা কাজ কারবার পরিষ্কার রেখেছেন। না কখনো প্রতারণা করেছেন, আর না ঝগড়াঝাটি করেছেন।

আবু দাউদেই অন্য এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবিল্ খামসার একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, একবার আমি জাহেলিয়াতের যুগে নবী (সঃ) এর সাথে কেনা-বেচার ব্যবস্থাপনা করলাম। কিছু বিষয় স্থিরীকৃত হলো এবং কিছু রয়ে গেল। আমি বল্লাম আমি এস্থানে এসে আপনার সাথে দেখা করব। তারপর আমি সে কথা ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার সে কথা মনে পড়লো। তারপর আমি সেস্থানে এসে দেখলাম তিনি সেখানে রয়েছেন। তিনি বল্লেন, হে যুবক! তুমি আমাকে বড়ো কষ্ট দিলে, তিন দিন থেকে আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করছি (কিতাবুল আদব -বাবু ফিল্ ইদাত্) ।

যায়েদ বিন হারেসার ঘটনা

যে ঘটনা নবী পাকের মহান চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য দান করে- তা যায়েদ বিন হারেসার ঘটনা। তিনি ছিলেন কাল্ব গোত্রের হারেসা বিন শুরাহবিল (অথবা শারাহবিল) নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মা সু'দা বিন্তে সা'লাবাহ তাই গোত্রের শাখা মায়ানা গোত্র সম্ভূত ছিলেন। তাঁর আটবছর বয়সের সময় তাঁর মা তাকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি যান। সেখানে বনী কায়ন বিন জাসর এর লোকজন তাদের তাঁবুর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। তারপর লুঠতরাজ করে যাদেরকে ধরে নিয়ে গেল তাদের মধ্যে যায়েদও ছিলেন। তারপর তারা তায়েফের নিকটবর্তী ওকাজ মেলায় তাঁকে বিক্রি করে দেয়, খরিদকারী ছিলেন হযরত খাদিজার ভাতিজা হাকীম বিন হিসাম। তিনি তাঁকে মক্কায় এনে তাঁর ফুফী হযরত খাদিজাকে উপহার দেন। নবী (সঃ) এর সাথে হযরত খাদিজার যখন বিয়ে হয় তখন যায়েদকে হুযুর (সঃ) সেখানে দেখতে পান। তাঁর স্বভাব চরিত্র ও আচার আচরণ নবীর এমন ভালো লাগে যে তিনি তাঁকে হযরত খাদিজার নিকট থেকে চেয়ে নেন। এভাবে এ সৌভাগ্যবান বালক সেরা এমন এক সত্তার খেদমতে এসে যান যাঁকে আল্লাহ তায়ালা কয়েক বছরের মধ্যেই নবী বানাতে চান। তখন হযরত যায়েদের বয়স পনেরো বছর ছিল। কিছুকাল পর তাঁর বাপ-চাচা জানতে পারেন যে তাঁদের ছেলে মক্কায় রয়েছে।

তাঁরা অনুসন্ধান করতে করতে নবীর কাছে তাকে পেয়ে যান। তাঁরা নবীকে বল্লেন, আপনি যে পরিমাণ ফিদিয়া চান নিয়ে আমাদের সন্তান ফেরৎ দিন।

নবী (সঃ) বলেন, ঠিক আছে আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি এবং তাকে তার মর্জির উপর ছেড়ে দিচ্ছি যে সে তোমাদের সাথে যেতে চায়, না আমার কাছে থাকতে চায়। যদি সে তোমাদের সাথে যেতে চায় ত আমি কোনই ফিদিয়া নেবনা, তাকে এমনিই ছেড়ে দেব। কিন্তু যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, যে আমার কাছে থাকতে চায় তাকে খামাখা বের করে দেব।

তাঁরা বল্লেন, এ ত আপনি ইনসাফ থেকেও বড়ো ভালোকথা বলেছেন, আপনি বালকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।

নবী (সঃ) যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি এ দুব্যক্তিকে চেন?

যায়েদ বল্লেন, জি হাঁ উনি আমার পিতা এবং উনি চাচা। নবী (সঃ) বল্লেন, ভালোকথা, তুমি তাদেরকেও চেন এবং আমাকেও চেন। এখন তুমি পূর্ণ স্বাধীন। চাইলে তাদের সাথে চলে যাও, আর চাইলে আমার সাথে থাক। যায়েদ বলেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে চাইনা।

যায়েদের বাপ–চাচা বল্লেন, যায়েদ! তুমি কি স্বাধীনতা থেকে গোলামিকে প্রাধান্য দিচ্ছ? আর আপন মা–বাপ ছেড়ে অন্যের কাছে থাকতে চাচ্ছ?

যায়েদ বল্লেন, আমি এ মহান ব্যক্তির গুণাবলী দেখেছি এবং তার অভিজ্ঞতার আলোকে দুনিয়ার কাউকে তাঁর উপর প্রাধান্য দিতে পারি না।

যায়েদের জবাব শুনে তাঁর বাপ–চাচা সম্মত হয়ে গেলেন। নবী (সাঃ) তখনই যায়েদকে স্বাধীন করে দিলেন। অতঃপর হারাম শরীফে গিয়ে জনতার সামনে ঘোষণা করলেন, তোমরা সাক্ষী থাক আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে সে আমার ওয়ারিস হবে এবং আমি তার হবো।
এ ঘোষণার ভিত্তিতে লোকে তাঁকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সঃ) বলা শুরু করলো। এসব ঘটনা নবুয়তের পূর্বেকার। হুযুর যখন নবুয়তের পদমর্যাদায় ভূষিত হন, তখন হযরত যায়েদের নবীর খেদমতে পনেরো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঈমান আনার সময় তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর।

হুযুর (সঃ) এর তত্ত্বাবধানে হযরত আলী (রাঃ)

চাচা আবু তালিব হুযুরের (সঃ) শৈশব কাল থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত তাঁর প্রতি যে দয়া ও স্নেহমমতা প্রদর্শন করেছেন তা তিনি স্মরণ রেখেছেন। ইবনে ইসহাক বলেন, একবার মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দ্রব্যমূল্য চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। হুযুর (সঃ) মনে করলেন যে, তাঁর চাচার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং তার সন্তানসন্ততিও অনেক। তাঁর বোঝা লাঘব করার জন্যে কিছু করা উচিত। অতএব তিনি তাঁর অপর অর্থশালী চাচা হযরত আব্বাসের কাছে গিয়ে বল্লেন, আপনার ভাইয়ের পরিবার খুব বড়ো, তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের কারণে লোক যে চরম দুরবস্থায় আছে তা আপনি দেখছেন। চলুন আমরা তাঁর বোঝা লাঘব করার জন্যে তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করি। তাঁর এক ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব আপনি নিন এবং একটার আমি নিই।

হযরত আব্বাস এ কথায় রাজী হলেন এবং চাচা ভাতিজা উভয়ে আবু তালিবের নিকটে গিয়ে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করলেন। তিনি বল্লেন, আকীলকে অথবা ইবনে হিশামের মতে তালিবকে আমার কাছে রেখে অন্যদের মধ্যে যে যাকে পছন্দ কর নিয়ে যাও। অতএব নবী (সঃ)

হযরত আলীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত জাফরকে (রাঃ) নিয়ে নিলেন। হযরত আলী (রা) ছিলেন সকলের ছোট। তাঁর থেকে জাফর "আকীল" তালিব সকলেই দশ বছরের বড়ো, তাঁদের ছাড়াও আবু তালিবের অন্যান্য সন্তানও ছিল।

এভাবে হযরত আলী (রাঃ) শৈশব কালেই হুযুরের তত্ত্বাবধানে এলেন। হুযুর (সঃ) এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে আপন সন্তানের মতোই লালন পালন করেন। সম্ভবতঃ হযরত আলীর বয়স তখন চার পাঁচ বছরের বেশী ছিলনা।

কাবা ঘরের পুনর্নিমাণ

হুযুর (সঃ) এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর এবং নবুয়ত প্রাপ্তির মাত্র পাঁচ বছর বাকী তখন কুরাইশগণ কাবা ঘর নতুন করে নির্মাণ করার ইচ্ছা করে। কারণ ঘরখানি অত্যন্ত জরাজীর্ণ এবং বন্যার কারণে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। দেয়ালগুলো ছিল খুব নীচু এবং উপরে কোন ছাদও ছিলনা আর গাঁথুনি এভাবে করা হয়েছিল যে শুধু পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কোন কিছু দিয়ে সেগুলোকে একটি অন্যটির সাথে জোড়া দেয়া ছিলনা। দরজাও ছিল জমিন বরাবর। কাবা ঘরের ধন সম্পদ ঘরের মধ্যে খনন করা একটা গর্তের মধ্যে ছিল। কিছুলোক দেয়াল টপকিয়ে সেখানে পৌঁছে সম্পদ চুরি করে নিয়ে যেতো। নতুন করে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বে বনী মুলায়হের এক গোলাম দুয়াইক কাবার ধন চুরি করেছিল অথবা চোর চুরি করে তার কাছে রেখে দিয়েছিল। তার কাছ থেকেই চুরির মাল উদ্ধার করা হয়। (১)

এসব কারণে কুরাইশরা চাচ্ছিল যে উঁচু এবং মজবুত ঘর করে উপরে ছাদ দেয়া হোক। সে কালে জনৈক রোমীয় বণিকের বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্রের উত্তাল তরংগ ও প্রচন্ড ঝড়ে, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে জিদ্দা পোতাশ্রয়ে এবং ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে–শুয়াইবাহ পোতাশ্রয়ে যা জিদ্দার পূর্বে পোতাশ্রয় ছিল, আঘাত খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তার মধ্যে বাকূম নামক একজন রোমীয় স্থপতি ছিল। কাঠের কাজ করার জন্যে মক্কায় একজন কিবতী সূত্রধরও ছিল। জাহাজ ধ্বংস হওয়ার সংবাদ শুনে অলীদ বিন মগীরা কুরাইশের কিছু লোকজন সহ সেখানে গিয়ে জাহাজের কাঠ খরিদ করে। বাকুমের সাথে কথাবার্তা বলে তাকে সম্মত করলো যে, কাবা নির্মাণের কাজ সে সমাধা করবে। তারপর বনী মাখযুমের জনৈক ব্যক্তি আবু ওহাব বিন আমর বিন আয়েস (যিনি নবী পিতার মামু ছিলেন) উঠে কাবা ঘরের একটা পাথর খুলে পুনরায় যথাস্থানে রেখে বল্লেন, হে কুরাইশগণ এ নির্মাণ কাজে তোমাদের হালাল উপার্জনের অর্থ লাগাবে, এতে ব্যভিচার দ্বারা লব্ধ অর্থ, সুদের অর্থ, জুলুমের দ্বারা উপার্জিত অর্থ যেন নির্মাণ কাজে কেউ লাগাতে না পারে।

অন্য একটি বর্ণনা এরূপ আছে–এ ঘর নির্মাণে এমন কোন অর্থ লাগাবে না যা তোমরা বলপূর্বক অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে অথবা পারস্পরিক দায়িত্ব লংঘন করে অর্জন করেছ। *

---

(১) ইবনে আসীর বলেন, চুরির জন্যে তিন জনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা হয়। তাদের মধ্যে একজন আবু লাহাবও ছিল কিন্তু মাল যেহেতু দুয়াইকের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয় সে জন্যে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়– গ্রন্থকার।

* এ হচ্ছে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। মূসা বিন ওকবা মাগাযী গ্রন্থে বলেছেন যে উপরোক্ত বক্তব্য ছিল অলীদ বিন মুগীরার – গ্রন্থকার।

কিন্তু কুরাইশের লোকজন কাবার ঘর ভেঙে ফেলতে বড়ো ভয় পাচ্ছিল। অবশেষে অলীদ বিন মুগীরা পুরাতন ঘর ভাঙার জন্যে কোদাল হাতে নিয়ে বল্লো, হে আল্লাহ! আমরা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হইনি। আমরা মংগল ছাড়া ঘর ভাঙছিনা। –এ কথা বলে সে কাবা ঘরের এক অংশে আঘাত করলো। তারপর সে থেমে গেল। তারপর লোক সারারাত এ অপেক্ষায় রইলো যে, অলীদের উপর কোন বিপদ আসে কিনা। তারা বল্লো, কোন বিপদ এলে আমরা কাজ বন্ধ করে দেব এবং যে পাথর খুলে ফেলা হয়েছে তা যথাস্থানে রেখে দেবে। কোন বিপদ না এলে কাজ চলতে থাকবে। সকাল পর্যন্ত অলীদের উপর কোন বিপদ যখন এলোনা, তখন ঘর ভাঙ্গার দায়িত্ব বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন গোত্র গ্রহণ করলো। ইব্রাহীম (আঃ) এর তৈরী ভিত্তি পর্যন্ত দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা হলো। তারপর সকল গোত্রের লোক পাথর তুলে তুলে–নির্মাণ কাজে অংশগ্রহনকরলো। (২) তারপর যে স্থানে 'হাজরে আসওয়াদ' লাগানো হবে সে স্থান পর্যন্ত গাঁথুনি হওয়ার পর প্রত্যেক গোত্রই চাইছিল যে এ পাথর বসানোর মর্যাদা সেই লাভ করবে। এ নিয়ে এমন বাকবিতন্ডা চলে যে লড়াইয়ের উপক্রম হয়ে গেল। চার পাঁচ দিন ধরে এরূপ ঝগড়া বিবাদ চল্লো। অবশেষে একদিন সকলে পরামর্শ করার জন্যে হারামে সমবেত হলো। বনী মখযুমের এক ব্যক্তি আবু উমাইয়া বিন সগীরা (অলীদ বিন মগীরার ভাই) সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেন হে কুরাইশের লোকেরা ! নিজেদের এ মতানৈক্যের মীমাংসার লক্ষ্যে এ কথায় একমত হও যে, সকলের আগে যে ব্যক্তি এ মসজিদের দরজা,* দিয়ে প্রবেশ করবে সে এ বিষয়ে মীমাংসা করে দেবে।

তাঁর এ প্রস্তাব সকলে মেনে নিল। আল্লাহ তায়ালার করণীয় এই ছিল যে, সকলের আগে যিনি প্রবেশ করেন তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। লোক তাঁকে দেখামাত্র বলে উঠলো

هٰذَا الامين رضينا ، هٰذا مُحَمَّد -

–এ আমীন, আমরা রাজী আছি এ ত মুহাম্মদ। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে যে, লোক তাঁকে দেখা মাত্র বল্লো

اتاكم الامين -

তোমাদের নিকটে আমীন (অতি বিশ্বস্ত লোক) এসে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন জানতে পারলেন যে, এ বিবাদের মীমাংসা তাঁকে করে দিতে হবে তখন তিনি একখানা কাপড় আনতে বল্লেন। লোক কাপড় এনে দিল। তিনি তখন সে কাপড়ের উপরে 'হাজরে আসওয়াদ' রেখে দিলেন। তারপর তিনি প্রত্যেক গোত্রকে সে কাপড়ের এক এক

---

(২) এ নতুন নির্মাণ কাজে জিনিস পত্রের স্বল্পতা হেতু কাবার একটি অংশ বাইরে ফেলে রাখা হয় এবং তার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করা হয় যাতে করে বুঝতে পারা যায় যে এ কাবারই একটি অংশ। একে হেজাযও বলে এবং হাতীমও বলে। এ স্থানে হযরত হাজেরা এবং হযরত ঈসমাইল (আঃ) কে দফন করা হয়েছিল (ইবনে হিশাম)। ইবনে সা'দ বলেন, কুরাইশ বায়তুল্লাহর দরজা এতো বড়ো করে রাখে যা এখনো আছে। তারা সোম ও বৃহস্পতিবার দরজা খুলতো এবং দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকতো। যখন লোক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকতো, তখন সে যাকে খুশী ভেতরে যেতে দিত এবং যাকে খুশী তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত– গ্রন্থকার।

* দরজা বলতে বাবে বনী শায়বা বুঝানো হয়। একটি বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি সকলের আগে বাবুস্ সাফা দিয়ে প্রবেশ করে সে মীমাংসা করে দেবে। মুসা বিন ওকবা বলেন, এ পরামর্শ স্বয়ং অলীদ দেয়। কিন্তু আল ফাকেহীরা, ওয়াকেদী এবং ইবনে ইসহাক আবু উমাইয়ার নাম বলেন– গ্রন্থকার।

দিক ধরে হাজরে আসওয়াদ উঠাতে বল্লেন। যে স্থানে পাথরটি লাগানো সে স্থানে পৌঁছার পর তিনি পাথরটিকে আপন হাত দিয়ে উঠিয়ে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন।

এ নবুয়তের মাত্র পাঁচ বছর আগের ঘটনা। সে সময়ে গোটা জাতি হুযুরের (সঃ) আমীন বা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হওয়ার সাক্ষ্যদান করে। সমগ্র জাতি এটাও প্রত্যক্ষ করে যে, তিনি কত বিজ্ঞ ছিলেন যে এমন মারাত্মক বিবাদের অতি সুন্দরভাবে সমাধান করে তাঁর জাতিকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করলেন। ইবনে সা'দ বলেন শুধু এ একটি ঘটনাই নয় যে, হুযুর (সঃ) কুরাইশদের একটি বিবাদ মীমাংসা করে দিয়েছিলেন বরঞ্চ নবুয়তের পূর্বে অধিকাংশ তাদের বিষয়াদির মীমাংসার জন্যে তাঁর স্মরণাপন্ন হতো।

নবুয়তের পূর্বে যাঁরা নবীকে নিকট থেকে দেখেছেন'

নবুয়তের পূর্বে সবচেয়ে নিকট থেকে নবী মুহাম্মদের (সঃ) জীবন দেখার ও তাঁর সার্বিক অবস্থা জানার যাদের সুযোগ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে তাঁর পরিবারের লোক ছিলেন অর্থাৎ এক, হযরত খাদিজা (রাঃ) যিনি পনেরো বছর যাবত তাঁর স্ত্রী হিসাবে জীবন যাপন করেন। দুই, হযরত আলী (রাঃ) যিনি শৈশবকাল থেকেই নবী পরিবারে প্রতিপালিত হন এবং তিন, হযরত জায়েদ বিন হারেসা যিনি মাতাপিতাকে ছেড়ে নবীর সাথে থাকাকে প্রাধান্য দেন এবং যাকে নবী (সঃ) আপন পুত্র বানিয়ে নেন। তার পর ছিলেন হযরত উম্মে আয়মান (রাঃ) যিনি নবীকে শৈশবে লালন পালন করেন এবং পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে সর্বদা নবীর (সঃ) সাথে থাকেন। তাঁর সম্পর্কে নবী (সঃ) বলতেন আমার মায়ের পর উনিই আমার মা। তাঁকে 'আম্মা' বলেই সম্বোধন করতেন। এসব লোক ছাড়াও পরিবার বহির্ভূত এমন অনেকেই ছিলেন যারা নবীর সাহচর্য লাভের মর্যাদা লাভ করেন এবং বেশ কিছুকাল যাবত তারা নবীর সাথেউঠাবসা করেন।

তাঁদের মধ্যে নবীর নিকটতম বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। ইবনে মান্দাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) একটি বর্ণনা উধৃত করে বলেন, আঠার বছর বয়স থেকে হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীর সাথে উঠাবসা করতেন যখন নবী পাকের (সঃ) বয়স ছিল বিশ বছর। সে সময় থেকে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব বিরাজ করছিল। কারণ মক্কায় দুই ব্যক্তি এমন ছিলনা যাদের স্বভাব প্রকৃতি, চালচলন ও আচার আচরণের মধ্যে এমন সাদৃশ্য ছিল যা ছিল নবী (সঃ) এবং হযরত আবু বকরের মধ্যে। জাহেলিয়াতের যুগে হযরত আবু বকর ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং জাতীয় সর্দারগণের অন্যতম সর্দার ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল ব্যবসা। স্বভাব চরিত্রের জন্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা কোন দিন মদ স্পর্শ করেন নি। কুরাইশের লোকেরা দিয়াত অর্থাৎ খুনের বদলায় যে অর্থদন্ড নির্ধারিত হতো সে বিষয়টি তাঁর উপরে ছেড়ে দিত। সে দিয়াতের দায়িত্বও তিনি স্বীকার করে নিতেন। সমস্ত গোত্র মিলে তা পরিশোধ করতে সম্মত হতো। অন্য কেউ এ দায়িত্ব নিলে তাকে কেউ স্বীকার করতো না।

কুশনামা সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরা তাঁর জ্ঞানের উপরে সবচেয়ে বেশী আস্থা স্থাপন করতো। তাঁর নৈতিক প্রভাব শুধু কুরাইশ নয়, বরঞ্চ চারপাশের গোত্রগুলোর উপরেও ছিল– তাঁর অনুমান এর থেকে করা যায় যে, মক্কায় যখন মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন শুরু হয়,

তখন আবু বকরও হিজরতের জন্যে তৈরী হন। দু একদিনের পথ চলার পর আহাবিশের সর্দার* ইবনুদ্দুগুন্নার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে জিজ্ঞেস করে, আবু বকর কোথায় যাও?

আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমার জাতি আমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে, বহু দুঃখ কষ্ট দিয়ে আমার জীবন দুর্বিসহ করে দিয়েছে।

সে বলে, খোদার কসম, তুমি ত সমাজের সৌন্দর্য। বিপদে মানুষের সাহায্য করতে। ভালো কাজ কর। গরীবের উপকার কর। চল আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

তারপর সে তাঁকে নিয়ে মক্কায় এলো এবং ঘোষণা করলো, আমি ইবনে আবি কুহাফাকে আশ্রয় দিয়েছি। এখন যেন কেউ তার ভাল ছাড়া কিছু মন্দ না করে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত সুহাইব বিন সিনান রুমী। আসলে তিনি ছিলেন বনী নামের বিন কাসেতের বংশোদ্ভুত। তিনি ইরান রাষ্ট্রের অধীন মুসেলের নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা ছিলেন। শৈশব কালে ইরান ও রোমের মধ্যে যুদ্ধের সময় তিনি গ্রেফতার হন এবং কিছুকাল যাবত রোমীয়দের অধীন গোলামীর জীবন যাপন করেন। এভাবে হাত বদল হতে হতে মক্কায় পৌছেন এবং এখানে আবদুল্লাহ বিন জুদআন তাঁকে খরিদ করেন। ইবনে জুদআন যেহেতু হযরত আবু বকরের (রাঃ) নিকটাত্মীয় ছিলেন, এজন্যে তাঁর মাধ্যমে নবী (সঃ) এর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি প্রায়ই নবীর সাহচর্যে সময় কাটাতেন। তিনি এতোখানি মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, যখন হযরত ওমর (রা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন তিনি অসিয়ত করেন যে যতোক্ষণ পর্যন্ত শুরা কোন এক ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করতে একমত না হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি মসজিদে নববীতে নামায পড়াবেন।

তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তাঁর নিজের বক্তব্য বায়হাকী উধৃত করেন। তাতে বলা হয়েছে যে তিনি বলেন, হযরত খাদিজার সাথে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিয়ের ব্যাপার আমার চেয়ে অধিক আর কে জানে?

হযরত সুহাইব (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ) একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন হযরত হাকীম বিন হেযাম (রাঃ)। কুরাইশের অন্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তিনি ছিলেন। রিফাদার অর্থাৎ হাজীদের পানাহার করাবার মর্যাদা তিনি লাভ করেন। তিনি হযরত খাদিজা (রা) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন নবী (সাঃ) এর পাঁচ বছরের বড়ো। মুসনাদে আহমাদে এরাক বিন মালেকের বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে তিনি বলেন, নবীকে (সঃ) আমি সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতাম। যুবাইর বিন বাক্কার বলেন, নবুয়তের পরেও তাঁদের ভালোবাসা অটল ছিল যদিও তিনি মক্কা বিজয়ের পর ঈমান আনেন।

পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন, আযদে শানুওয়া গোত্রের দিমা বিন সা'লাবাহ্। তিনি এক অস্ত্রচিকিৎসকের কাজ করতেন। ইবনে আবদুল বার তাঁর ইস্তিয়াবে বলেন, তিনি জাহেলিয়াতের যুগে হুযুরের (সঃ) বন্ধু ছিলেন। মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন নবুয়তের সময় মক্কায় আসেন, তখন লোকে তাঁকে বলে যে মুহাম্মদ (সঃ) পাগল হয়েছেন।

* তিনটি গোত্রের সমষ্টির নাম ছিল আহাবিশ। তাদের মধ্যে বনু আল হারেস বিন আব্দে মানাত বিন কিনানা, বনী আলহুন বিন খুযায়মা বিন মুদরেকা (অর্থাৎ আদাল, কারা এবং দিশ এর গোত্রগুলো) এবং খুযায়ার মধ্যে বনু আলমুস্তালিক শামিল ছিল। তারা মিলে মক্কার নিম্ন এলাকায় আহবাশ নামক এক উপত্যকা প্রান্তরে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে। এ জন্যে তাদেরকে আহাবিশ বলা হতো –গ্রন্থকার।

তখন তিনি সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, বলুন আপনার কি অসুখ হয়েছে আমি চিকিৎসা করব।

জবাবে নবী (সঃ) তাকে কয়েকটি প্রভাব বিস্তারকারী আয়াত বা বাক্য শুনালেন যা মসনূন খুতবায় পাঠ করা হয়। এসব শুনে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

তারপর এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা নিকট আত্মীয় হওয়ার কারণে নবীকে (সঃ) খুব ভালোভাবে জানতেন এবং যাদের কাছে নবী জীবনের কোন কিছুই গোপন ছিলনা। যেমন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ)। তিনি নবী (সঃ) এর ফুফী উম্মে হাকীম আল্ বায়দার জামাই ছিলেন। হযরত যুবাইর বিন আওয়াম নবীর ফুফী হযরত সাফিয়ার (রাঃ) পুত্র ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ্ (রাঃ), হযরত সা'দ বিন আবি ওককাস (রাঃ) এবং হযরত উমাইর বিন আবি ওককাস (রাঃ) নবী মাতার আত্মীয় ছিলেন। হযরত আবু সাল্মা (রা) নবী (সঃ) এর ফুফাতো ভাই এবং দুধভাই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহশ নবীর ফুফু উমাইয়ার পুত্র ছিলেন। হযরত জাফর বিন আবি তালিব তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন।

তাঁরা সকলের আগে ঈমান আনেন। তাদের ঈমান আনার অর্থ এই যে হুযুরের জীবনকে নিকট থেকে দেখার পর তাদের হৃদয়ে হুযুরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব এমনভাবে অংকিত হয়ে যায় যে, তাঁকে নবী বলে গ্রহণ করতে তারা বলামাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। এ ঈমানকে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব অথবা ব্যক্তিগত ভালোবাসার কারণ বলা যেতে পারেনা। কারণ এসবের কারণে কেউ তার ধর্ম বিশ্বাস বা দ্বীন পরিবর্তন করতে পারেনা।

হুলিয়া শরীফ

নবুয়ত পূর্ব যুগের অবস্থার পরিসমাপ্তির পূর্বে আমরা ন্যায়সংগত মনে করি যে, নবী (সঃ) এর হুলিয়া শরীফও বর্ণনা করে দেয়া হোক। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের উপরে তার গঠন আকৃতি ও মুখমন্ডলের (হুলিয়ার) গভীর সম্পর্ক থাকে। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি, নাসায়ী, বায়হাকী, দার কত্নী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থগুলোতে হযরত আলী (রাঃ), আবু হুরায়রাহ (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ), হযরত জাবের বিন সামুরা (রা), হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন বুসর (রা), হযরত হিন্দ বিন আবি হালা (রা) এবং আরও কতিপয় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায় সে সবের দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে নবী পাকের (সঃ) হুলিয়া মুবারক এখানে আমরা বর্ণনা করছি। তাঁর দৈহিক উচ্চতা না খুব বেশী ছিল আর না খর্বাকৃতির, বরঞ্চ মধ্যম আকৃতি থেকে একটু বাড়ন্ত। কোন জনসমাবেশে তিনি থাকলে তাঁকে স্পষ্ট চোখে পড়তো। মুখাকৃতি না লম্বা ধরনের , না সম্পূর্ণ গোলগাল, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ গোলাকার বিশিষ্ট। দেহের বর্ণ না বাদামী, না লাল, না একেবারে সাদা, বরঞ্চ উজ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং দীপ্তিমান। মাথা ছিল বড়ো, বক্ষ প্রশস্ত, দুই স্কন্দের মাঝখানে বেশ ব্যবধান, দেখতে হাট্টাগোট্টা তবে মোটা নয়। দেহের জোড়াগুলো খুবই মজবুত ছিল। বাহু ছিল মাংশল এবং হাঁটুর নিম্নভাগ দেহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। বাহু ও হাঁটুর নিম্নাংশে হালকা লোম রাশি দেখা যেতো। দেহের বাকী অংশ ছিল লোমহীন। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত একটি কেশ রেখার মতো মনে হতো। মাথা ও দাড়ির চুল ঘনো ছিল। চুল হাবশীদের মতো কোঁকড়ানো ছিলনা এবং একেবারে সোজাও ছিলনা। কিছুটা ঢেউ তোলার মতো। মৃত্যু পর্যন্ত মাথা ও দাড়িতে বড়োজোর বিশটি চুল শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। আর তা শুধু তেল না লাগালেই দেখা যেতো। মাথার চুল কখনো কানের অর্ধেক পর্যন্ত, কখনো কানের তলা পর্যন্ত এবং কখনো

তার নীচ পর্যন্ত রাখা হতো। চক্ষুদ্বয় বড়ো এবং সুন্দর ছিল। সুরমা না লাগালেও মনে হতো যেন সুরমারঞ্জিত। অক্ষিগোলকে বা চোখের লাটাইয়ে ঈষৎ লাল রেখা ছিল। চোখের পাতার লোম ঘনো ও দীর্ঘ ছিল। ভুরু একটি অপরটি থেকে পৃথক ছিল, জোড়া ছিল না। মুখ বড়ো ছিল। আরববাসীগণ একে সৌন্দর্যের নিদর্শন মনে করতো। ছোট মুখ তারা পছন্দ করতো না। পায়ের তালু হালকা ছিল, হাত পায়ের আঙুল লম্বাও মাংশল ছিল। পায়ের মধ্যম অঙুলি বুড়ো আঙুল থেকে একটু বাড়ন্ত ছিল। হাতের তালু ছিল মাংসল। প্রথম নজরে মানুষ একটু ভয় পেতো। কিন্তু যতোই তার নিকটবর্তী হতো, তাঁর বিনয় নম্রতা ও মহান চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে আপন হয়ে যেতো। চলবার সময় এমন দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন যেন নীচে নামছেন অথবা উপরে উঠছেন। কোন দিকে তাকালে পুরোপুরি তাকাতেন এবং কোন দিক থেকে মুখ ফেরাতে হলে পুরোপুরি ফেরাতেন। আড় নয়নে দেখার অথবা শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখার অভ্যাস ছিলনা। তাঁর মুখে মুচ্কি হাসি দেখা যেতো। হাসবার সময় অট্টহাস্য করতেন না। তাঁর দৈহিক শক্তি এমন ছিল যে, কুরাইশদের মধ্যে শক্তিশালী পালোওয়ান রুকানা যাকে কেউ কোনদিন পরাজিত করতে পারেনি, নবীর সাথে কুস্তি লড়তে আসে। নবী তাকে আছাড় দিয়ে কুপোকাত করেন। সে পুনারায় উঠে কুস্তি লড়তে সাহস করেনি। নবী (সঃ) পুনরায় তাকে আছাড় দিয়ে ফেল্লেন। সে বল্লো, মুহাম্মদ। আশ্চর্য তুমি আমাকে আছাড় মারছ? তার অর্থ এই যে নবী না কোনদিন ব্যায়াম করেছেন, আর না পালোয়ানগিরি করেছেন। তথাপি তিনি রুকানা পালোয়ানকে দুবার আছাড় মেরে ফেলে দিয়েছেন। এ ব্যক্তি পরে মুসলমান হয়ে যান– রাদি আল্লাহো আনহু।

নবী (সঃ) এর শৈশব কালের একটি ঘটনা এই যে, একবার আবদুল্লাহ বিন জুদআনের বাড়িতে খানার দাওয়াত ছিল। আবু জেহেল হুযুরের সাথে ঝগড়া করতে লাগে। তারও তখন শৈশব কাল ছিল। হুযুর (সঃ) তাকে এমন জোরে আছাড় মেরে ফেলে দেন যে তার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়--যার দাগ সারা জীবন রয়ে যায়। ইবনে হিশাম বলেন, বদর যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হলে হুযুর বলেন, নিহতদের মধ্যে আবু জেহেলের লাশ বের করে দেখ তাঁর হাঁটুতে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যাবে। সত্য সত্যই তার লাশে হাঁটুতে ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল। তার এ ক্ষতচিহ্নের কাহিনী নবী (সঃ) বর্ণনা করেন।

এ বিশদ আলোচনায় বুঝতে পারা যায় যে, নবী (সঃ) শুধু মহান চরিত্রেরই প্রতীক ছিলেন না, বরঞ্চ পুরুষোচিত গুণাবলী এবং বীরত্বেরও প্রতীক ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়
রেসালাতের সূচনা এবং গোপন দাওয়াতী কাজের প্রাথমিক তিন বছর

নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নবীগণের ধ্যান ও চিন্তা গবেষণা

কুরআন মজিদ একথা বলে যে অহী আসার পূর্বে নবীগণ যে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা সাধারণ মানুষের জ্ঞান থেকে পৃথক কিছু ছিলনা। অহী নাযিলের পূর্বে তাঁদের কাছে এমন কোন জ্ঞান লাভের সূত্র ছিলনা যা অন্যের কাছেও ছিলনা। নবী (সঃ) কে বলা হয়-

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ ـ (الشورى: ٥٢)

-হে নবী তুমি কিছুই জানতেনা যে, কিতাব কাকে বলে এবং ঈমানই বা কোন্ বস্তু- (শুরা :৫২)।

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ـ (الضحى: ٧)

-এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পথ না-জানা পেয়েছেন এবং তারপর পথ দেখিয়েছেন- (দোহা : ৭)।

বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা থেকে ইলহামী ঈমান পর্যন্ত

কুরআন আমাদেরকে এ কথাও বলে যে, নবীগণ (আঃ) নবুয়তের পূর্বে জ্ঞান ও বিশেষ প্রজ্ঞার ঐসব সাধারণ সূত্রের মাধ্যমেই ঈমান বিল্ গায়েবের স্তর অতিক্রম করেন যেসব সূত্রে সাধারণ মানুষও লাভ করে থাকে। অহী আসার পর যা কিছু করে তা হলো এই যে, যেসব সত্যের প্রতি তাঁদের মন সাক্ষ্য দিত, সেসব সম্পর্কেই অহী অকাট্য সাক্ষ্য দেয় যে তা একেবারে সত্য এবং তারপর সেসব সত্য তাঁদেরকে বাস্তবে দেখিয়ে দেয়া হয় যাতে করে তাঁরা দৃঢ় প্রত্যয় সহ দুনিয়ার সামনে তার সাক্ষ্য দিতে পারেন। এ বিষয়টি সূরা হুদে বার বার বর্ণনা করা হয়েছে-

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ
مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ـ

-যে ব্যক্তি প্রথমে তার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাকৃতিক হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারপর খোদার পক্ষ থেকে এক সাক্ষীও এসে গেল (অর্থাৎ কুরআন) এবং তার পূর্বে মূসার কিতাবও পথ প্রদর্শন ও রহমত হিসাবে বিদ্যমান ছিল, তারপর কি সে এ সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? - (হুদ : ১৭)।

তারপর এ কথাই হযরত নূহ (আঃ) এর মুখ দিয়েই বলা হচ্ছে :-

يٰقَوْمِ اَرَ اَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ-

–হে আমার জাতির লোকেরা! একবার চিন্তা করে দেখ দেখি, আমি আমার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম এবং তারপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আমাকে রহমত (অহী ও নবুয়ত) দ্বারা ভূষিত করেছেন, আর এ জিনিষ তোমরা দেখতে পাওনা, তাহলে এখন কি তা আমরা জবরদস্তি তোমাদের মাথার উপর চাপিয়ে দেব?

তারপর ৬৩নং আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ) এবং ৮৮ নং আয়াতে হযরত শুয়াইব (আঃ) এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করছেন। এর থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে অহীর মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভের পূর্বে আম্বিয়া (আঃ) পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা গবেষণার স্বাভাবিক যোগ্যতাকে সঠিক পথে ব্যবহার করে

(যাকে উপরের আয়াতে – بَيِّنَةٌ مِّنَ الرَّبِّ -

এর অর্থ করা হয়েছে) তৌহিদ ও আখেরাতের সত্যতায় পৌঁছে যেতেন। এ সত্যলাভ খোদাপ্রদত্ত নয়, অর্জিত। তারপর আল্লাহতায়ালা তাদেরকে অহীর জ্ঞান দান করেন। আর এটা অর্জিত নয় বরঞ্চ খোদা প্রদত্ত।

প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ, চিন্তা গবেষণা এবং সাধারণ জ্ঞানের (COMMON SENSE) ব্যবহার ওসব আন্দাজ অনুমান ও দূরকল্পনা (speculation) থেকে একেবারে এক পৃথক জিনিষ আর এ দূরকল্পনা দার্শনিকগণই করে থাকেন। এ ত সেই জিনিষ যার প্রতি কুরআন মজিদ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। বার বার সে মানুষকে বলে, চোখ খুলে খোদার কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখ এবং তার থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। এভাবে খোদার নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ দ্বারা একজন নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সত্যের নাগাল পেয়ে যায়।(১)

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নবী জীবনের পূর্বের যে অবস্থা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি তার থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হুযুর (সঃ) নবী হওয়ার পূর্বেই শির্ক থেকে পাক পবিত্র এবং তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি কখনো তাঁর জাতির শির্কমূলক আকীদাবিশ্বাস মেনে নেননি– তাদের শির্কমূলক পূজা পার্বনে অংশগ্রহণ করেন নি। প্রতিমা ও প্রতিমা পূজা থেকে সর্বদা বিমুখ ছিলেন। দেবদেবীর উদ্দেশ্যে যে কুরবানী দেয়া হতো তার থেকেও দূরে থাকতেন। প্রাক নবী জীবনে তাঁর অবস্থা ঐসব একনিষ্ঠ তৌহীদ পন্থীদের অনুরূপ ছিল যার উল্লেখ আমরা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে করেছি। জাহেলিয়াতের যুগে জুরহুম ও খুযায়া গোত্রদ্বয় দ্বীনে ইব্রাহীমিতে যেসব রদবদল করেছিল, তার কোন একটিও তিনি নবুয়তের পূর্বে মেনে নেন নি। এমনিভাবে কুরাইশগণ তাদের আমলে ধর্মীয় বিকৃতির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এ থেকেও তিনি দূরে ছিলেন। যেমন কুরাইশগণ তাদের নিজেদের জন্যে কিছু বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে রেখেছিল যার ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে অন্যান্য আরববাসীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করতো। ইবনে হিশাম ও ইবনে সাদ বলেন যে, তারা হজ্বের সময় আরাফাত যাওয়া এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করার প্রথা পরিত্যাগ করেছিল। শুধু মুযদালফায় গিয়ে সেখান থেকেই ফিরে আসতো, তারা বলতো, আমরা হারামের অধিবাসী। আমাদের এ কাজ নয় যে আমরা সাধারণ হাজীদের মতো হারামের বাইরে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করব।

যদি আমরা এমনটি করি তাহলে, হারামের বাইরে বাসবাসকারী ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবেনা এবং তাতে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

অথচ তারা জানতো যে, আরাফাতে গিয়ে সেখানে অবস্থান করা অতঃপর সেখান থেকে মুয্দাল্ফা ও মিনায় প্রত্যাবর্তন করা হজ্বের অবশ্য পালনীয় প্রথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীনে ইব্রাহীমির মধ্যে শামিল। ক্রমশঃ এসব প্রভেদ পার্থক্য ঐসব হারাম বহির্ভূত গোত্রও মেনে চলা শুরু করলো যারা কুরাইশদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যেমন বনী কিনানা, খুযায়া ও আমের বিন সা'সায়া। এমনকি কুরাইশের সাথে যাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাদের মর্যাদাও সাধারণ আরববাসীদের চেয়ে বেড়ে গেল এবং তারা আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। কিন্তু নবী (সঃ) নবুয়তের পূর্বেই এ বিদআত খন্ডন করেছিলেন। ইবনে ইসহাক জুবাইর বিন মুতয়েম (রাঃ) এর একটি বর্ণনার উধৃতি দিয়েছেন, তাতে জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি অহী নাযিল হওয়ার পূর্বে হুযুরকে (সঃ) সাধারণ আরবদের সাথে আরাফাতে অবস্থান করতে দেখেছি।

কুরাইশ প্রবর্তিত বিদআতগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, হারামের বাইরে বসবাসকারীগণ হজ্ব বা ওমরার জন্যে এলে তারা বাইরে থেকে আনা আহার খেতে পারতোনা এবং বাইরে থেকে আনা কাপড় পরিধান করে তাওয়াফও করতে পারতোনা। হারাম শরীফের খানা তাদেরকে খেতে হতো এবং হারাম শরীফে কাপড় পাওয়া না গেলে উলংগ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হতো। বাইরের কাপড়ে তাওয়াফ করলে তা ফেলে দিতে হতো। সে কাপড় তারা নিজেও পরিধান করতে পারতোনা এবং অন্য কেউ সে কাপড় স্পর্শও করতে পারতোনা। আরববাসী এ কুপ্রথা বা বিদআতকে মুখ বুজে দ্বীন হিসাবে মেনে নিয়েছিল এবং এভাবে উলংগ তাওয়াফের প্রথা প্রচলিত হয়। (২)

হুযুরের (সঃ) নির্জনে এবাদত বন্দেগী

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনার ঘটনা স্ব স্ব সনদসহ ইমাম যুহরী থেকে, তিনি যুবাইর থেকে এবং তিনি তাঁর খালা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর অহীর সূচনা হয় সত্য ও সুন্দর স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা এমন হতো যেন তিনি তা প্রকাশ্য দিবালোকে দেখছেন। (১) তারপরতিনি নির্জনতা অবলম্বন করা শুরু করেন এবং গারে হেরার এবাদত করা শুরু করেন। (২)

হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীর (সঃ) এ কাজকে 'তাহান্নুস' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যায় এবাদত বন্দেগী বলেছেন। এ এক ধরনের এবাদত ছিল যা তিনি করতেন। কারণ তখন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে এবাদতের কোন পন্থাপদ্ধতি তাঁকে বলে দেয়া হয়নি। তিনি কয়েকদিনের পানাহারের বস্তু বাড়ি থেকে নিয়ে যেতেন। তারপর তিনি হযরত

---

(১) বায়হাকী বলেন, অহী নাযিলের ছ মাস পূর্বে তাঁর এ অবস্থা হয়।

(২) উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর হুযুর (সঃ) অধিক নির্জনতা অবলম্বন করেন। অবশ্যি এ নির্জনতার প্রতি তাঁর অনুরাগ বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল। ইবনে হিশাম এবং তাবারীর বর্ণনা মতে ইবনে ইসহাক এবং আবদুল্লাহ বিন যুবাইর ওবায়েদ বিন উমাইর আল্লায়সীর বর্ণনা উধৃত করে বলেন, হুযুর (সঃ) প্রতি বছর এক মাস হেরায় অতিবাহিত করতেন। কিছুদিনের আহার সাথে করে নিয়ে যেতেন। তারপর ফিরে এসে প্রথমে সাত বার কাবায় তাওয়াফ করতেন এবং আরও কিছুদিনের খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে হেরায় ফিরে যেতেন।

উপরন্তু হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ নির্জনবাস ও এবাদত বন্দেগীর সময় তিনি মিসকীনদেরকে অধিক পরিমাণে খানা খাওয়াতেন। কিন্তু তিনি এ কথা বলেন ন যে হুযুর (সঃ) হেরায় গিয়ে অবস্থান করার কাজ কখন শুরু করেন। তবে অনুমান করা যায় যে এ কাজ তিনি কয়েক বছর থেকে করতে থাকেন – (গ্রন্থকার)।

খাদিজার (রা) কাছে আসতেন এবং তিনি তাঁকে আরও কয়েকদিনের আহারের ব্যবস্থা করে দিতেন। (৩)

গারে হেরায় নির্জন বাসের কারণ

এ সময়ে যেসব কারণে হুযুর আকরাম (সঃ) মক্কার জনবসতি পরিত্যাগ করে পাহাড় কুঞ্জের মধ্যে হেরা গুহায় নির্জনতায় কাটাতেন, তার উপর সূরায়ে 'আলাম নাশরাহ্'–এর নিম্ন আয়াত কিছুটা আলোকপাত করে ঃ–

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - (المنشرح ٢ - ٣)

–আমরা তোমার উপর থেকে সে ভারি বোঝা নামিয়ে দিলাম যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

এ আয়াতে وزر শব্দের অর্থ ভারি বোঝা। আপন জাতির অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কর্মকান্ড দেখে দুঃখ, মনোবেদনা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ভারি বোঝা তাঁর সংবেদনশীল স্বভাব প্রকৃতিকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। তাঁর সামনে মূর্তিপূজা করা হচ্ছিল, শির্ক, কুফর ও কুসংস্কার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। নৈতিক পংকিলতা এবং নগ্নতা অশ্লীলতায় সমাজ জীবন নিমজ্জিত ছিল। কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন করা হতো। জুলুম, অনাচার ব্যভিচার সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। দুর্বল সবলের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল। গোত্রগুলো পরস্পর পরস্পরের উপরে হঠাৎ আক্রমণ করে বসতো। কোন কোন সময়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিগ্রহ শত শত বছর ধরে চলতো। কারো জান মাল ইজ্জত আবরু নিরাপদ ছিলনা যদি তার পেছনে কোন শক্তিশালী দল না থাকতো। এসব অবস্থা দেখে তিনি মর্মপীড়া ভোগ করতেন। কিন্তু এ চরম নৈতিক অধঃপতন থেকে জাতিকে রক্ষা করার কোন পন্থাই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এ দুশ্চিন্তাই তাঁর দেহমনকে ভেঙ্গে ফেলছিল। আল্লাহ তায়ালা হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করে এ ভারি বোঝা তাঁর উপর থেকে নামিয়ে দেন। নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি উপলব্ধি করেন যে তৌহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাসই সকল জীবন সমস্যার সমাধান করতে পারে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের পরিপূর্ণ সংস্কার সাধন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার এ পথ নির্দেশনা নবী মুস্তাফার (সঃ) সকল বোঝা হাল্কা করে দিল এবং তিনি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত হলেন যে এর মাধ্যমে তিনি শুধু আরব দেশেরই নয়, বরঞ্চ দুনিয়ার অন্যান্য দেশেরও মানব গোষ্ঠী যেসব অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, তাদেরকেও এসব থেকে রক্ষা করা যাবে। (৪)

সত্য স্বপ্ন

হাদীসে হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) এর উপর অহী নাযিলের সূচনা সত্য স্বপ্নের আকারে হয় (বুখারী ও মুসলিম)। এ ধারাবাহিকতা নবী যুগের প্রত্যেক স্তরেই অব্যাহত ছিল। হাদীসে তাঁর বহু স্বপ্নের উল্লেখ আছে, যার দ্বারা তাঁকে কোন শিক্ষাদান করা হয়েছে অথবা কোন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। কুরআন পাকেও তাঁর একটি স্বপ্নের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে (আল্ ফত্হ ঃ ১২৭)। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে একথারও উল্লেখ আছে যে নবী (সঃ) বলেছেন, ওমুক বিষয় আমার মনে উদিত করে দেয়া হয়েছে অথবা আমাকে এ কথা বলা হয়েছে, অথবা আমাকে এ হুকুম দেয়া হয়েছে অথবা এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে কুদ্সীগুলো বেশীর ভাগ এসব বিষয় সংক্রান্ত। (৫)

হেরা পর্বত
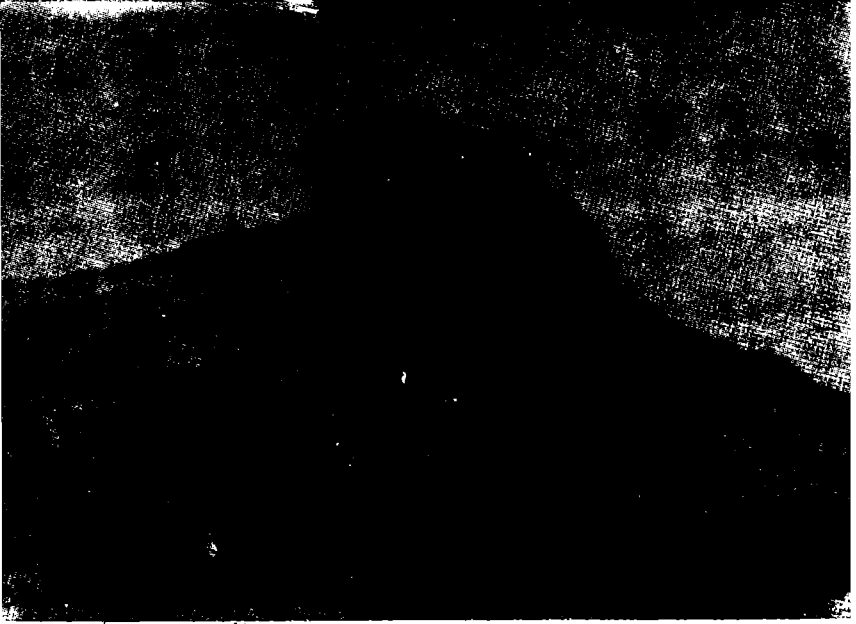
অহীর সূচনা

নবী মুস্তাফার (সঃ) বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাস (১) তখন একদিন রমযান মাসে হেরা গুহায় তাঁর উপর অহী নাযিল হয়। ফেরেশ্‌তা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, * পড়ুন। বোখারী শরীফের কয়েক স্থানে এ ঘটনা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উক্তি উধৃত করেন যাতে তিনি বলেন, আমি বল্লাম আমি ত পড়তে জানিনা। তখন ফেরেশতা আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, তা আমার অসহ্য হয়ে পড়লো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমায় বল্লেন, পড়ুন! বল্লাম আমি ত পড়তে জানিনা! তারপর তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার চেপে ধরলেন এবং আমার তা অসহ্য হয়ে পড়লো। তিনি ছেড়ে দিয়ে আবার বল্লেন, পড়ুন! বল্লাম, আমি ত পড়তে জানিনা। তিনি তৃতীয়বার আমাকে চেপে ধরলেন এবং আমার তা অসহ্য হয়ে পড়লো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন ,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

(পড় তোমার রবের নামের সাথে যিনি পয়দা করেছেন) এবং তারপর - مَالَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতোনা) পর্যন্ত পড়ে শুনালেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ভীত কম্পিত অবস্থায় হযরত খাদিজার (রাঃ) নিকটে এসে পৌঁছলেন এবং বল্লেন, আমাকে উড়িয়ে দাও, আমাকে উড়িয়ে দাও"। তাঁর ভয় ও শংকার ভাবটা যখন কেটে গেল তখন তিনি বল্লেন, হে খাদিজা এ আমার কি হলো?

তারপর সব ঘটনা তাঁর কাছে বলার পর তিনি বল্লেন, আমার ত জানের ভয় হচ্ছে।(১) হযরত খাদিজা (রাঃ) বলেন, কখনোই না, আপনি বরঞ্চ খুশী হয়ে যান। খোদার কসম আল্লাহ তায়ালা কখনো আপনার মর্যাদাহানি করবেন না (২) আপনি আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচরণ করেন। সত্য কথা বলেন। এক বর্ণনায় আছে, আপনি আমানত আদায় করেন। অসহায় লোকদের

---

(১) সাধারণতঃ বলা হয় যে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। কিন্তু তাঁর জন্ম হয় প্রথম হাতিবছর রবিউল আওয়াল মাসে এবং নবুয়ত দান করা হয় হাতিবছর রমযান মাসে। এজন্যে অহীর সূচনাকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ঠিক চল্লিশ বছর ছয় মাস –গ্রন্থকার।

* আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) এবং ইবনে ইসহাক ওবায়দুল্লাহ বিন ওমাইর আল্‌লায়সীর বর্ণনা উধৃত করে বলেন নবী (সঃ) বলেন, স্বপ্নে জিব্রীল (আঃ) এসে রেশমী কাপড়ে লিখিত একটা জিনিস আমাকে দেখালেন যাতে সূরায়ে আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো লিখিত ছিল। তারপর আমাকে পড়তে বল্লেন। বল্লাম, আমি পড়তে জানি না। তখন তিনি আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, পড়ুন! তারপর اِقْرَاْ | مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত আমাকে পড়ালেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর আমার মনে হলো কথাগুলো যেন আমার বুকের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে (তাবারী, ইবনে হিশাম, সুহায়লী)। ইবনে কাসীর,এ বর্ণনা উধৃত করে বলেন, এ যেন ভূমিকা ছিল ঐ বিষয়ের যা জাগ্রত অবস্থায় তার সামনে পেশ করা হয়েছিল যার উল্লেখ হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসে পাওয়া যায় –গ্রন্থকার।

(১) এ ভয়ের অনেক কারণ আলেমগণ বর্ণনা করেন যার সংখ্যা বার। কিন্তু আমাদের মতে প্রকৃত সঠিক ব্যাখা এই যে, নবুয়তের কঠোর দায়িত্বভার গ্রহণের চিন্তা করে তিনি ভীত কম্পিত হচ্ছিলেন এবং বার বার তাঁর এ কথা মনে হচ্ছিল যে, তিনি কিভাবে এ গুরুভার বহন করবেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, হুযুর (সঃ) নিজেকে বিরাট কিছু মনে করতেন না এবং তাঁর মনে এমন কোন অভিলাষও ছিল না যে তাঁর মতো লোকের নবী হওয়াই উচিত। তাঁর এ গর্ববোধও ছিলনা যে এ বিরাট কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা তার ছিল –গ্রন্থকার।

(২) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহতায়ালা আপনাকে কখনো দুঃখ কষ্টে ফেলবেন না –গ্রন্থকার।

বোঝা বহন করেন। অক্ষম লোকদের উপার্জন করে দেন। মেহমানদারি করেন, সৎ কাজে সাহায্য করেন। অন্য এক বর্ণনায় একথাও আছে। আপনার চরিত্র অতি মহান। তারপর হযরত খাদিজা (রাঃ) হুযুরকে (সঃ) নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলিয়াতের যুগে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ঈসায়ী হয়েছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অনেক বয়োবৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাকে বল্লেন, ভাইজান। আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। (৩)

আবূ নঈমের বর্ণনা মতে হযরত খাদিজা (রাঃ) স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘটনা ওয়ারাকাকে শুনিয়ে দেন। ওয়ারাকা হুযুরকে (সঃ) বলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখেছিলে? রসূলুল্লাহ (সঃ) যা দেখেছিলেন তা বলে দেন। ওয়ারাকা বলেন, এ হচ্ছে সেই নামুস (ঊর্ধ আকাশ থেকে অহী আনয়নকারী ফেরেশতা) যাকে মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিল করা হয়েছিল। আহা যদি তোমার নবুয়তের সময় আমি শক্তি সামর্থ রাখতাম। আহা! যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এসব লোকেরা আমাকে বের কের দেবে?

ওয়ারাকা বলেন, হা কখনো এমন হয়নি যে, কোন ব্যক্তি এমন জিনিস নিয়ে এসেছে যা তুমি এনেছ, আর তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি যদি তোমার সে যুগ পর্যন্ত বেঁচে থাকতাম, তাহলে মনে প্রাণে সাহায্য সহযোগিতা করতাম।

কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হতে না হতেই ওয়ারকা ইন্তেকাল করেন। (৬)

এ ঘটনা থেকে কি বুঝতে পারা যায়?

এ ঘটনা স্বয়ং এ কথা ব্যক্ত করছে যে ফেরেশতার আগমনের এক মুহূর্ত পূর্ব পর্যন্ত নবী (সঃ) এর মনে এ চিন্তাধারণার উদয় হয়নি যে, তাঁকে নবী বানানো হবে। এ জিনিসের অভিলাষী হওয়া ত দূরের কথা এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে এমনটিও ছিল তাঁর চিন্তাভাবনার অতীত। অহী নাযিল হওয়া এবং এভাবে ফেরেশতার সামনে উপস্থিত হওয়া তাঁর কাছে এক আকস্মিক ঘটনা ছিল। তার প্রতিক্রিয়া তাঁর উপরে তাই হয়েছিল। একজন বেখবর লোকের উপর এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই যা হয়ে থাকে। এজন্যে যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন মক্কাবাসীগণ তাঁর প্রতি বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। কিন্তু কেউ এ কথা বলেনি আমরা প্রথমেই আশংকা করেছিলাম যে তুমি কিছু একটা দাবী করে বসবে। কারণ কিছুকাল যাবত তুমি নবী হওয়ার প্রস্তুতি করছিলে।

এ ঘটনা থেকে আর একটি বিষয় জানা যায় যে, নবুয়তের পূর্বে নবী মুস্তাফার জীবন কত পাক পবিত্র এবং স্বভাবচরিত্র কত উন্নত মানের ছিল। হযরত খাদিজা (রাঃ) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। তাঁর বয়স তখন ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনেরো বছর যাবত তিনি নবীর জীবন সংগিনী ছিলেন। বিবির কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকে না। তিনি তাঁর এ সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হুযুরকে (সঃ) এতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ পেয়েছিলেন যে, যখন তিনি তাঁকে হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা শুনালেন, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথা মেনে নিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর ফেরেশতাই তাঁর নিকটে অহী নিয়ে এসেছিলেন। তেমনি ওয়ারাকা বিন

---

(৩) হুযুরকে (সঃ) ভাতিজা এজন্যে বলা হয় যে তাঁর তৃতীয় পুরুষের আবদুল ওয্যা হুযুরের চতুর্থ পুরুষের আবদুল মান্নাফের ভাই ছিলেন –গ্রন্থকার।

নাওফালও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হুযুরের (সঃ) জীবন লক্ষ্য করে আসছিলেন। পনেরো বছরে নিকট আত্মীয়তার ভিত্তিতে তিনি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আরও গভীর অভিজ্ঞতা পোষণ করতেন। তিনি যখন এ ঘটনা শুনলেন তখন তিনি তা কোন অসঅসা বা প্ররোচনা মনে করেন নি। বরঞ্চ শুনা মাত্রই বলে ফেলেন যে এ ত অবিকল সেই নামুস যা মূসা (আঃ) এর প্রতি নাযিল হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, তাঁর নিকটেও নবী মুস্তাফা (সঃ) এতো উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, তাঁর নবীর মর্যাদায় ভূষিত হওয়া কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। (৭)

ঘটনাটির পর্যালোচনা

অহী নাযিলের অবস্থাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে প্রথমে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, নবী (সঃ) এর নিকটে আকস্মিকভাবে এ ঘটনাটি ঘটে। এর পূর্বে তাঁর ধারণাও ছিল না যে তাকে নবী বানানো হবে। তাঁর মনের কোন স্থানেই এ ধরনের কোন অভিলাষ ছিল না। আর না এর জন্যে কোন প্রস্তুতিও তিনি করছিলেন। তিনি এ আশাও করেন নি যে একজন ফেরেশতা উপর থেকে পয়গামসহ তাঁর কাছে আগমন করবেন। তিনি নির্জনে বসে মুরাকাবা ও এবাদত বন্দেগী অবশ্যই করছিলেন। কিন্তু নবী হওয়ার কোন ধারণাই তাঁর মনে স্থান পায় নি। এ অবস্থায় যখন হেরা গুহার নির্জন পরিবেশে অকস্মাৎ ফেরেশতা এসে পড়লেন তিনি ঠিক তেমনি হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন যেমন এ অবস্থায় অবশ্যই একজন মানুষ হয়ে থাকে। তিনি এক বিরাট মহিমান্বিত ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তাঁর হতভম্বতা অবিমিশ্র ছিল না। নানান চিন্তার যৌক্তিক সমাবেশ ছিল। অর্থাৎ তাঁর মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হতে লাগলো এবং মন বিরাট উদ্বেগ উৎকন্ঠায় ভরে গেল। তিনি ভাবছিলেন, সত্যিই কি আমাকে নবী বানানো হয়েছে? আমাকে কোন বিরাট অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়নিত? এ বিরাট দায়িত্বের বোঝা আমি কিভাবে বহন করব? লোকের কাছে কিভাবে এ কথা বলবো যে আমি তোমাদের জন্যে নবী হয়ে এসেছি।* মানুষ আমার কথা কিভাবে মেনে নেবে? আজ পর্যন্ত যে সমাজে আমি সম্মানের সাথে বসবাস করে আসছি এখন সে সমাজের লোক আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে, আমাকে পাগল বলবে এ জাহেলিয়াতের পরিবেশের বিরুদ্ধে আমি কিভাবে সংগ্রাম করব? মোটকথা এ ধরনের কত প্রশ্ন তাঁর মনে উদিত হয়ে তাঁকে কত বিব্রত করে তুলছিল।

এ কারণেই যখন তিনি বাড়ি পৌছলেন, তিনি কম্পিত হচ্ছিলেন। বাড়ি পৌছামাত্র বল্লেন, "আমাকে (লেপ কম্বল) জড়িয়ে দাও, আমাকে (লেপ কম্বল) জড়িয়ে দাও।"

বাড়ির লোকজন তাঁকে জড়িয়ে দিলেন, কিছুক্ষণ পর যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন তখন পুরো ঘটনা হযরত খাদিজাকে (রাঃ) তিনি শুনিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন,

لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ -

আমার জানের ভয় হচ্ছে।

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন ঃ-

---

* নজীর বিহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্বেও সে সত্তা আত্মগর্ব ও আত্মম্ভরিতার এতো উর্ধে ছিল যে, যখন তাঁকে নবুয়তের পদমর্যাদায় হঠাৎ অধিষ্ঠিত করে দেয়া হলো তখনও বেশ কিছু সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে বিশ্বপ্রকৃতির মালিক প্রভু এ পদের জন্য নির্বাচিত করেছেন। (৮)

كلا والله مايحزنك الله ابدًا - انك لتصل الرحم وتصدق الحديث و
تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق -

কখোনই না খোদার কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো দুঃখ কষ্ট দেবেননা। আপনি ত আত্মীয় স্বজনের খেদমত করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায়ের সাহায্য করেন, নিঃস্ব অভাবীদের অভাব মোচন করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন, সকল নেক কাজে সাহায্য করেন।

তারপর তিনি হুযুরকে (সঃ) ওয়ারাকা বিন নাওফালের নিকটে নিয়ে গেলেন। কারণ তিনি আহলে কিতাবভুক্ত ছিলেন। পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি হুযুরের অবস্থা শুনার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, এ হচ্ছে সেই নামূস যা হযরত মূসার (আঃ) কাছেএসেছিলো।

একথা তিনি এ জন্যে বল্লেন যে, তিনি নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাঁর পুণ্য পূত চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি এ কথাও জানতেন যে, এখানে নবুয়তের দাবী করার প্রস্তুতির কোন আভাসও পাওয়া যায় নি। এ দুটি বিষয়ে যখন তিনি এ ঘটনার সাথে মিলিয়ে দেখলেন যে হঠাৎ অদৃশ্য জগত থেকে একজন এসে এ ব্যক্তিকে এ অবস্থায় এমন সব পয়গাম দিলেন যা নবীগণের শিক্ষারই অনুরূপ, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, এ অবশ্যই সত্য নবুয়ত।(৯)

পূর্ব থেকে যদি নবুয়তের অভিলাষ থাকতো

যদি নবী মুহাম্মদ (সঃ) পূর্ব থেকে নবী হওয়ার চিন্তাভাবনা করতেন, নিজের সম্পর্কে যদি এ চিন্তা করতেন যে, তাঁর নবী হওয়া উচিত এবং এ প্রতীক্ষায় থেকে মুরাকাবা করে করে আপন মনের উপর এ চাপ সৃষ্টি করতেন যে, কখন কোন ফেরেশতা তাঁর কাছে পয়গাম নিয়ে আসে তাহলে হেরাগুহার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি আনন্দে অধীর হয়ে বিরাট দাবীসহ পাহাড় থেকে নেমে সোজা তাঁর জাতির নিকটে পৌছে তাঁর নবুয়তের ঘোষণা করতেন। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত অবস্থা এই ছিল যে তিনি যা কিছু দেখলেন, তাতে বিস্মিত ও হতবাক হলেন। তারপর ভীত কম্পিত অবস্থায় বাড়ি পৌছলেন। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। একটুখানি প্রকৃতিস্থ হবার পর চুপে চুপে বিবিকে বল্লেন, আজ হেরাগুহায় নির্জন পরিবেশে এ ঘটনা ঘটেছে। জানিনা কি হবে! আমার জীবনের কোন মংগল দেখতে পাচ্ছিনা।

এ অবস্থা নবুয়ত প্রার্থীর অবস্থা থেকে কত ভিন্নতর! তারপর স্বামীর জীবন, তার অবস্থা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি তার স্ত্রী থেকে অধিক কে জানতে পারে? অভিজ্ঞতায় যদি এটা জানা যেতো যে, স্বামী নবুয়তের অভিলাষী এবং সর্বদা ফেরেশতা আগমনের প্রতিক্ষায় রয়েছেন তাহলে তার জবাব কখনো তা হতোনা যা হযরত খাদিজা (রাঃ) দেন। তিনি বলতেন মিয়া, ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বহুদিন থেকে যার আশায় দিন গুণছিলেন, তা ত পেয়ে গেলেন। চলুন পীরগিরির দোকান সাজিয়ে বসুন, নজর নিয়ায আমি সামলাব।

কিন্তু তিনি পনেরো বছরের সাহচর্যে স্বামী জীবনের যে রূপ লক্ষ্য করেছেন, তার ভিত্তিতে একথা বুঝতে তাঁর এক মূহূর্তও বিলম্ব হয় নি যে এমন নেক এবং নিঃস্বার্থ লোকের নিকটে শয়তান আসঁতে পারে না, আর না আল্লাহ তাঁকে কোন অশুভ পরীক্ষায় ফেলতে চান। তিনি যা কিছু দেখেছেন তা একেবারে সত্য। এ অবস্থা ওয়ারাকা বিন নাওফালেরও ছিল। তিনি বাইরের

কোন লোক ছিলেন না বরঞ্চ হুযুরের (সঃ) আপন জ্ঞাতি গোষ্ঠির লোকই ছিলেন। নিকট আত্মীয়ের দিক দিয়ে বৈবাহিক ভাই ছিলেন। বয়সে কয়েক বছরের বেশী হওয়ার কারণে নবী মুস্তাফার গোটা জীবন শৈশব থেকে সে সময় পর্যন্ত তাঁর চোখের সামনে ছিল। তিনিও তাঁর মুখে হেরার ঘটনা শুনামাত্রই বলে ফেল্লেন, আগমনকারী সে ফেরেশতাই যিনি মূসার (আঃ) কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। কারণ এখানেও ঠিক সেই অবস্থার সম্মুখীন উনি হয়েছেন যে অবস্থার সম্মুখীন হযরত মূসা (আঃ) হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একেবারে পূত পবিত্র চরিত্রের একজন সরল সহজ ও পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ। নবুয়তের কোন চিন্তাভাবনা করা ত দূরের কথা–তা লাভ করার কোন সামান্যতম ধারণাও কোন দিন মনে স্থান পায়নি। অকস্মাৎ এবং সজ্ঞানে ও প্রকাশ্যে এ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেন। অতএব দুই আর দুই চারের মত তিনি এ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে এখানে কোন আত্ম প্রবঞ্চনা অথবা শয়তানী ইন্দ্রিয় গোচর কোন ব্যাপার নয় বরঞ্চ এ সত্যনিষ্ঠ লোকটি কোন ইচ্ছা অভিলাষ ব্যতিরেকেই যা কিছু দেখেছেন তা প্রকৃত সত্যই দেখেছেন।

এ মুহাম্মদ (সঃ)এর নবুয়তের এমন এক সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এক সত্যপন্থী মানুষের এ সত্য অস্বীকার করা বড়ো কঠিন। এ জন্যে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এটাকে নবুয়তের দলিল হিসাবে পেশ করা হয়েছে। (১০) *

প্রথম অহীর বক্তব্য

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর প্রথম যে অহী প্রেরিত হয় তা সূরায়ে আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে গঠিত যাতে বলা হয়েছে–

"পড় তোমার রবের নামে যিনি পয়দা করেছেন। একটি মাংসপিন্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পড়; এবং তামার রব বড়ো মেহেরবান, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা তার জানা ছিলনা।"

এ অহী নাযিলের প্রথম অভিজ্ঞতা যা হুযুর (সঃ) লাভ করেন। এ পয়গামে তাঁকে এ কথা বলা হয়নি যে, কোন বিরাট কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং সামনে তাঁকে কি কি করতে হবে। বরঞ্চ একটি প্রাথমিক পরিচিতির পর তাঁকে কিছুদিনের অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে করে এ প্রথম অভিজ্ঞতায় তাঁর স্বভাব প্রকৃতির উপরে যে বিরাট চাপ পড়েছিল তার প্রভাব দূর হয়ে

---

* আল্লাহ বলেন – قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ..... الخ

–হে মুহাম্মদ বলে দাও– আল্লাহর ইচ্ছা যদি এ হতো, তাহলে এ কুরআন তোমাদেরকে কখনোই শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর সংবাদও দিতেন না। তাছাড়া এর আগে আমি তোমাদের মধ্যে একটি জীবন অতিবাহিত করেছি। তোমরা তোমাদের বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগাবেনা? (ইউনুস ঃ ১৬)।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ ...... الخ

তুমি কিছুই জানতেনা কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস। কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি যার দ্বারা আমরা আমাদের বান্দাহদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই (শুরা ঃ ৫২)

যায় এবং মানসিক দিক দিয়ে তিনি আগামীতে অহী লাভ করার এবং নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী হতে পারেন। *(১১)

অহীর বক্তব্যের ব্যাখ্যা

প্রথম অহী যা নবীর উপর নাযিল হয় তার প্রতিটি শব্দের উপর চিন্তাভাবনা করুন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - (العلق : ١)

পড়ুন (হে নবী) আপন রবের নামের সাথে যিনি পয়দা করেছেন (আলাক ঃ ১)

ফেরেশতা যখন হুযুরকে (সঃ) বল্লেন যে, হে নবী পড়ুন, তার জবাবে তিনি বল্লেন, আমি ত পড়তে জানিনা। এর থেকে বুঝা যায় যে, ফেরেশতা অহীর এ শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো যে, যেভাবে আমি পড়ছি তেমনি আপনি পড়ুন তাহলে হুযুরের একথা বলার কোন প্রয়োজন হতো না যে আমি পড়তে জানিনা।

'আপন রবের নামের সাথে পড়ুন'–অর্থাৎ আপন রবের নাম নিয়ে পড়ুন। অন্য কথায় বিসমিল্লাহ বলুন এবং পড়ুন। এর থেকে এটাও জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ অহী আসার পূর্বে শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তাঁর প্রভু বা রব বলে জানতেন এবং মানতেন। এ জন্যে এ কথা বলা প্রয়োজন হয়নি যে তাঁর রব কে। বরঞ্চ বলা হলো যে আপন রবের নাম নিয়ে পড়ুন। অর্থাৎ যে রবকে আপনি জানেন তাঁর নাম নিয়ে পড়ুন।

"যিনি পয়দা করেছেন"–একথা বলা হয়নি যে তিনি কাকে পয়দা করেছেন। এর থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বেরয় যে ঐ রবের নাম নিয়ে পড়ুন যিনি স্রষ্টা। যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগত ও তার প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - (العلق : ٢)

জমাট রক্তের মাংসপিন্ড থেকে মানুষ পয়দা করেছেন। সৃষ্টিজগতের সাধারণ সৃষ্টির উল্লেখের পর বিশেষ করে মানুষের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কোন্ তুচ্ছ অবস্থা থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণ মানুষ বানানো হয়েছে। علقة বহুবচন علق শব্দের যার অর্থ রক্তপিন্ড। এ সেই প্রাথমিক অবস্থা যা গর্ভ সঞ্চারের কিছুদিন পর প্রকাশ লাভ করে। তারপর তা গোশতের আকার ধারণ করে। তারপর ক্রমশঃ তার মধ্যে মানুষের আকার ধারণ করার ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - (العلق ٣-٤)

–পড়ুন, এবং আপনার রব বড়ো মেহেরবান যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন (আলাক ঃ ৩–৪)। অর্থাৎ এ হচ্ছে তাঁর বড়ো মেহেরবানী যে এ তুচ্ছ অবস্থা থেকে সূচনা করে তিনি মানুষকে জ্ঞানবান করে বানিয়েছেন যা সৃষ্টির সেরা গুণ। শুধু তাকে জ্ঞানবান করেই

* এ বিরতির পর দ্বিতীয়বার যখন অহী নাযিল শুরু হলো, তখন সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাত আয়াত নাযিল করা হয়। এতে প্রথমবারের মতো নবীর উপর এ নির্দেশ দেয়া হয়– তুমি উঠ এবং খোদার সৃষ্টি মানুষকে ঐ দৃষ্টিভংগীর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যার উপর তারা চলছে। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে –গ্রন্থকার।

বানাননি, বরঞ্চ তাকে কলমের সাহায্যে লেখার কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন যা ব্যাপক আকারে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমে তার স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণের মাধ্যম হয়ে পড়ে।

যদি তিনি ইলহামী পদ্ধতিতে মানুষকে কলম ও লেখার বিদ্যা শিক্ষা না দিতেন, তাহলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সংকুচিত ও আড়ষ্ট হয়ে রয়ে যেতো। তার প্রচার প্রসারের ও বিকশিত হওয়ার এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষ পর্যন্ত অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার কোন সুযোগই থাকতোনা।

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - (العلق. ٥)

–মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা তার জানা ছিল না।

অর্থাৎ মানুষ মূলতঃ একেবারে জ্ঞানহীন ছিল, সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে তা সবই আল্লাহর দেয়া বলেই সে লাভ করেছে। আল্লাহতায়ালাই যে পর্যায়ে মানুষের জন্যে জ্ঞানের দ্বার খুলে দেন সে পর্যায়ে তা খুলে যেতে থাকে। এ কথাই আয়াতুল কুরসীতে এভাবে বলা হয়েছে–

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ - (البقرة : ٢٥٥)

–এবং মানুষ তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে কোন কিছু আয়ত্ত করতে পারে না। অবশ্য তিনি নিজে চাইলে সে অন্য কথা।

যে সব বিষয়কে মানুষ তার জ্ঞানলব্ধ বলে মনে করে, তা প্রকৃত পক্ষে তার জ্ঞানবহির্ভূত ছিল। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তাঁর জ্ঞান মানুষকে দিয়েছেন। অবশ্যি মানুষ এটা অনুভব করতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে সে জ্ঞান দান করছেন।

এ পর্যন্তই সে আয়াতগুলো যা নবী (সঃ) এর উপর নাযিল করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীস থেকে জানতে পারা যায়, এ প্রথম অভিজ্ঞতা এতো কঠিন ছিল যে তার বেশী হুযুর (সঃ) সহ্য করতে পারতেন না। এজন্যে সে সময়ে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল, যে রবকে পূর্ব থেকেই আপনি জানতেন এবং মানতেন তিনি সরাসরি আপনাকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে আপনার উপরে অহীর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে এবং আপনাকে তিনি তাঁর নবী বানিয়েছেন।

এর কিছুকাল পরে সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম সাত আয়াত নাযিল হয়। এতে তাঁকে বলা হয়, নবুয়তে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁকে কোন্ কাজ করতে হবে।* (১২)

---

* এ প্রসংগে একথাটা জেনে রাখা ভালো যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিব্রীলকে (আঃ) মাত্র দুবার তাঁর আপন আকৃতিতে দেখেছিলেন। তাছাড়া তিনি সর্বদা মানুষের আকৃতিতেই নবীর কাছে আসতেন। বোখারীর কিতাবত্ তাওহীদে হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় জানা যায় এবং মুসলিমে কিতাবুল ঈমানে হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথমবার হযরত জিব্রীল (আঃ) পূর্বাকাশে প্রকাশিত হন (সূরায়ে নজমে উফুকেল আলা أُفُقِ الْأَعْلَى --এবং সূরায়ে তাকবীরে উফুকে মবীন افق مُبِين বলা হয়েছে এবং ক্রমশঃ হুযুরের (সঃ) দিকে অগ্রসর হন। অবশেষে তাঁর উপরে শূন্যে অবস্থান করেন। তারপর তিনি নবীর দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁর এতো নিকটবর্তী হন যে উভয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ধনুকের ব্যবধান রয়ে গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে সময়ে জিব্রীল (আঃ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে ছিলেন এবং সমগ্র উর্ধ পরিমন্ডল ছেয়ে থাকেন (বোখারী)। স্বয়ং নবী (সঃ) বলেন, আমি তাঁকে সেই আকৃতিতে দেখেছি, যে আকৃতিতে আল্লাহ তাঁকে পয়দা করেছেন। আকাশ ও জমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যমার্গ তাঁর বিরাট সত্তায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় (মুসলিম)।

অহী নাযিলের সূচনা কখন হয়?

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সম্বলিত এ সর্বপ্রথম অহী কখন নাযিল হয়েছিল? এ সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। ইবনে আবদুল বার এবং মাসউদী বলেন, হুযুরের (সঃ) নবী হিসাবে নিয়োগের তারিখ ৮ই রবিউল আওয়াল হাতিবর্ষ ৪১। ইবনুল কাইয়েম তাঁর যাদুল মায়াদে একে অধিকাংশের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যাঁদের এ বক্তব্য তাঁরা সম্ভবতঃ নবুয়তের ঘোষণা সে সময় থেকে নির্ণীত করেছেন, যখন বায়হাকীর বর্ণনা মতে অহী নাযিলের ছয় মাস পূর্বে নবী (সঃ) সত্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। কিন্তু অহী নাযিল সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ঃ–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ - (البقرة : ١٨٥)

–রমযান এমন এক মাস যার মধ্যে কুরআন নাযিল করা হয় (বাকারা ঃ ১৮৫)

কুরআনের এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত অন্য কোন বক্তব্য নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, রমযানের কোন্ তারিখ থেকে অহী নাযিলের সূচনা হয় এ ব্যাপারেও বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কেউ কেউ ৭ ই রমযান বলেছেন। ইবনে সা'দ একস্থানে ১২ ই রমযান এবং দ্বিতীয় স্থানে ইমাম বাকেরের (রাঃ) বরাত দিয়ে ১৭ই রমযান বলেছেন। বালাযুরী ইমাম বাকেরের উক্ত বর্ণনা নকল করেছেন। উপরন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও এ তারিখ বর্ণনা করেছেন। তাবারী ও ইবনে আসীর আবু কেলাবাতুল জারমীর বরাত দিয়ে ১৮ই রমযান এবং কতিপয় অন্য লোক ১৯ শে রমযান বলেছেন। ওয়াসেলা বিন আল্‌আস্‌কা জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আবুল জুলদ ২৪ শে রমযান বলেছেন। অথচ কুরআন পাকের এরশাদ হচ্ছে –

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ -

–আমরা এ কুরআনকে শবে কদরে নাযিল করেছি। ওলামায়ে উম্মতের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ এ মত পোষণ করেন যে রমযানের শেষ দশ রাতের কোন এক বেজোড় রাত শবে কদর। তাঁদেরও অধিকাংশ আবার ২৭ শে রমযান শবে কদর বলেন। (১৩)

কুরআন নাযিলের তারিখ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদীস

আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) শবে কদর সম্পর্কে বলেন, তা হচ্ছে ২৭ শে অথবা ২৯ শে রাত (আবুদাউদ ও তায়ালিসী) দ্বিতীয় বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে এই যে, তা হচ্ছে রমযানের শেষ রাত (মুসনাদে আহমাদ)

যির বিন হুবাইশ হযরত ওবাই বিন কা'বকে (রাঃ) শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কসম করে বলেন যে তা ২৭ শে রাত (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও ইবনে হিব্বান)

হযরত আবু যরকে (রাঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এবং রসূলের সাহাবীদের মধ্যে অনেকেরই এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না যে তা রমযানের ২৭ শে রাত (ইবনে আবি শায়বাহ)।

দ্বিতীয় বার নবী তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে দেখেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে নবী (সঃ) বলেন, আমি জিব্রীলকে (আঃ) সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে দেখেছি। তাঁর ছ'শ বাহু ছিল (তাফহীম), সূরা নজম, টীকা–৫, ৭, ৮, ১১, ও ১৪)।

হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শবে কদর রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যে এক বেজোড় রাত– একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ অথবা উনত্রিশ (মুসনাদে আহমদ)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তাকে (শবে কদর) শেষ দশ রাতের মধ্যে তালাশ কর –মাস শেষ হতে যখন ন'দিন বাকী, অথবা পাঁচ দিন বাকী (বোখারী) অধিকাংশ মনীষী এ মর্ম নিয়েছেন যে, হুযুর (সঃ) বেজোড় রাতগুলোকেই বুঝিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে যে, ন'দিন বাকী থাক সাত দিন বাকী থাক, পাঁচ দিন, তিন দিন অথবা শেষ রাত। অর্থাৎ এ তারিখগুলোতে শবেকদর তালাশ কর (তিরমিযি, নাসায়ী)

হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, শবে কদরকে রমযানের শেষ দশরাতের মধ্যে বেজোড় রাতে তালাশ কর (বোখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযি)। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এর বর্ণনায় আছে যে, নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ রাতে এতেকাফ করেছেন।

এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা হযরত মায়াবিয়া (রাঃ) হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বুযর্গান থেকে পাওয়া যার তার ভিত্তিতে সালফ সালেহীনের বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ২৭ শে রমযান কেই শবে কদর মনে করেছেন। [১৪]

নবুয়তের পর প্রথম ফরয, নামায

তাবারী বলেন যে, তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের ঘোষণা এবং মূর্তিপুজা পরিহার করার পর সর্বপ্রথম যে জিনিস ইসলামী শরীয়তে ফরয করা হয়েছে তা নামায। ইবনে হিশাম ও মুহম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ) এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, সর্বপ্রথম নবী (সঃ) এর উপর যে জিনিস ফরয করা হয় তা নামায। তা প্রথমে ছিল দু দু রাকায়াত করে। ইমাম আহমদ ইবনে লাহিয়ার একটি বর্ণনা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) থেকে উধৃত করেছেন যে, নবী (সঃ) এর উপর প্রথম বার অহী নাযিল হওয়ার পর জিব্রীল (আঃ) তাঁর কাছে অজু করা শিক্ষা দিলেন। ইবনে মাজাহ এবং তাবারানীতেও কিছু সনদের মতভেদ সহ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তার ব্যাখ্যা ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা থেকে হয় যে, নবী (সঃ) মক্কার মালভূমি অংশে ছিলেন এবং জিব্রীল (আঃ) সুন্দর আকৃতিতে এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধিসহ তাঁর সামনে আবির্ভূত হন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন যে আপনি জ্বিন ও মানুষের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে রসূল। এ জন্যে আপনি তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্–এর দাওয়াতদিন।

তারপর তিনি জিব্রীল (আঃ) মাটিতে পায়ের আঘাত করলেন এবং একটি ঝর্ণা বেরিয়ে পড়লো। তারপর তিনি অযু করলেন যাতে করে নবী নামাযের জন্যে পাক হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা করতে পারেন। তারপর বল্লেন, এখন আপনি অযু করুন।

তারপর জিব্রীল (আঃ) হুযুরকে (সঃ) সাথে করে চার সিজদার সাথে দু'রাকায়াত নামায পড়েন। তারপর হুযুর (সঃ) হযরত খাদিজাকে (রাঃ) সেখানে আনেন, অযু করান এবং তাঁকে সাথে নিয়ে দু'রাকায়াত নামায পড়েন। ইবনে হিশাম, ইবনে জারীর এবং ইবনে কাসীরও এ ঘটনাবিবৃত করেন।

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ এবং তাবারানী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) থেকে নকল করেন যে, হুযুর (সঃ) এর উপর অহী নাযিল হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি ফরয হয় তা হলো এইযে, জিব্রীল (আঃ) এসে নবীকে অযুর নিয়ম শিখিয়ে দেন। তারপর তিনি নামাযের জন্যে দাঁড়ান এবং নবীকে বলেন, আপনি আমার সাথে নামায পড়ুন। তারপর নবী (সঃ) ঘরে এসে হযরত খাদিজাকে (রাঃ) এ ঘটনা বলেন। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন। তখন নবী (সঃ) তাঁকে সেভাবে অযু করতে বলেন এবং তাঁকে নিয়ে সেভাবেই নামায পড়লেন যেভাবে তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর সাথে পড়েছিলেন অতপর এ ছিল প্রথম ফরয কাজ যা অহী নাযিলের পর নির্ধারিত করা হয়। সম্ভবতঃ এ সে রাতের প্রাতঃকালের ঘটনা যে রাতে

اِقْرَأْ

নাযিল হয়। তারপর থেকে হুযুর (সঃ) এবং খাদিজা (রাঃ) গোপনে নামায পড়তেন।

প্রথম চার মুসলমান

এ কথা সর্বসম্মত যে প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রাঃ) তারপর এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসার (রাঃ) মধ্যে সকলের আগে কে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সর্বসম্মত যে হযরত খাদিজার (রাঃ) পর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এ তিনজন।*

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীর আল্‌বেদায়াতে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত এবং বালাযুরী ওয়াকেদীর রেওয়ায়েত নকল করে বলেন যে, যখন হুযুর (সঃ) এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) গোপনে নামায শুরু করেন, তখন একদিন পরেই হযরত আলী (রাঃ) তাঁদেরকে এ অবস্থায় দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এ কি? হুযুর বলেন, এ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন যা তিনি নিজের জন্যে মনোনীত করে নিয়েছেন এবং যার সাথে তিনি তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন। অতএব আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি যে তুমি এক ও লা শারীক আল্লাহকে মেনে নাও, তাঁর এবাদত কর এবং লাত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর ।

হযরত আলীর বয়স তখন দশ বছর। তিনি বলেন, একথাত আমি এর পূর্বে কখনো শুনিনি। আমি একবার আব্বাকে জিজ্ঞেস করার আগে কোন ফয়সালা করতে পারি না।

সে সময়ে হুযুর (সঃ) এটা চাইতেন না যে, সময়ের পূর্বেই তাঁর রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। এজন্যে তিনি বলেন, তুমি যদি আমার কথা না মান বিষয়টি গোপন রাখবে। সে রাত হযরত আলী (রাঃ) চুপ চাপ থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রেরণা জাগিয়ে দেন এবং সকালে নবীর সামনে হাজীর হয়ে বলেন গতকাল আপনি আমাকে কি বলেছিলেন?

---

* ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে এ প্রাথমিক চারজন মুসলমানের নাম করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ কথা মনে করা যায় না যে, হুযুরের (সঃ) যেসব কন্যা সে সময়ে জ্ঞান বুদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের মহিয়সি মাতার সাথে ঈমান আনেননি। হযরত যয়নবের (রাঃ) বয়স হুযুরের (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির সময় দশ বছর ছিল। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং হযরত রুকাইয়ার (রাঃ) বয়স এতোটা হয়েছিল যে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াতের সূচনার আগে তাদের বিয়ে আবু লাহাবের ছেলেদের সাথে করিয়ে দেন। অবশ্যি হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবুয়তের এক বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী পরিবেশেই চোখ খোলেন। এ জন্যে আমাদের মতে প্রথম তিন কন্যাকে প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যেই শামিল করা উচিত হযরত ফাতেমা সম্পর্কে এটা মনে করা উচিত যে তিনি একজন মুমেনা-মুসলেমা হিসাবেই জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করেন-গ্রন্থকার।

হুযুর (সঃ) বলেন, তুমি এ সাক্ষ্য দাও যে, এক ও লা শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, এবং তুমি লাত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য শরীকদের সম্পর্ক ছিন্ন কর।

হযরত আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তা মেনে নেন। কিন্তু আবু তালিবের ভয়ে ইসলাম গোপন রাখেন। অবশ্যি তিনিও হুযুরের (সঃ) সাথে নামায শুরু করেন।

ইমাম আহমদ ইবনে জারীর এবং ইবনে আবদুল বার আফীফ কিন্দীর (আশয়াস বিন কায়েসের বৈমাত্রেয় এবং চাচাতো ভাই) বর্ণনা উধৃত করে বলেন, আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব মামার পুরাতন বন্ধু ছিলেন এবং প্রায় ইয়ামেনে এসে আতর খরিদ করতেন এবং হজ্বের সময় তা বিক্রি করতেন। একবার হজ্বের সময় যখন মিনাতে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, দেখলাম যে একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি এলেন এবং বেশ ভালো করে অযু করলেন, তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর সাবালক হতে বাকী এমন একটি বালক এলো এবং সেও খুব ভালো করে অযু করে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একজন মহিলা এলো এবং সেও অযু করে তার পেছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আমি বল্লাম, হে আব্বাস এ কোন দ্বীন? এতো আমি জানিনা।

আব্বাস (রাঃ) বল্লেন, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। তার দাবী হলো, আল্লাহ তাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তার দাবী হচ্ছে এই যে, কায়সার ও কিসরার ধনদৌলত তার অধীন হবে। আর এ দ্বিতীয়টি হলো আমার ভাতিজা আলী বিন আবি তালিব। সে তার দ্বীনের অনুসরণ করছে। আর এ হচ্ছে মুহাম্মদের (সঃ) বিবি খাদিজা বিন্তে খুয়ায়লিদ। সেও তার দ্বীনের অনুসারী হয়েছে।

পরবর্তীকালে কিন্দী স্বয়ং যখন মুসলমান হন, তখন দুঃখ করে বলেন, আহা যদি তাদের সাথে আমি চতুর্থ ব্যক্তি হতাম।

ইবনে হিশাম এবং ইবনে জারীর বলেন, পরে এক সময়ে আবু তালিবও হযরত আলীকে (রা) নামায পড়তে দেখেন। বলেন, বাছা, এ কোন্ দ্বীন যার তুমি অনুসরণ করছ? তিনি বলেন, আব্বাজান! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সঃ) এর উপর ঈমান এনেছি। তাঁর সত্যতা মেনে নিয়েছি এবং তাঁর সাথে নামায পড়েছি।

আবু তালিব বলেন, সে তোমাকে মংগল ছাড়া আর কোন কিছুর দিকে আহ্বান জানাবেনা। তুমি তার সাথে লেগে থাক।

ইবনে কাসীর আবু তালিবের এক উক্তি উধৃত করেন, তোমার চাচাতো ভাইয়ের সাথে থাক এবং তার মদদ কর। হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে যুরকানী শরহে মুওয়াহেবে লিখেছেন যে, তিনি হযরত খাদিজার (রাঃ) ভাইপো হাকীম বিন হিসামের ওখানে বসে ছিলেন। এমন সময়ে হযরত হাকীমের দাসী তাঁর কাছে এসে বল্লো, আপনার ফুফী আজ বলছিলেন যে তাঁর স্বামী হযরত মূসা (আঃ) এর মতো একজন নবী যাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। এ শুনা মাত্র হযরত আবু বকর (রাঃ) সোজা নবী (সঃ) এর নিকটে পৌঁছলেন এবং সে দাসীর কথা সত্য ছিল এ কথা জানার পর বিনা দ্বিধায় ঈমান আনেন। ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ বিন আলহুসাইন আত্তিমিমী থেকে এ বর্ণনা উধৃত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি যার কাছেই ইসলাম পেশ করেছি, সে কিছুনা কিছু ইতস্ততঃ করেছে এবং চিন্তা ভাবনা করেছে। কিন্তু আবু বকরের (রা) কাছে যখন আমি তার উল্লেখ করেছি। তিনি কোন ইতস্ততঃ করেননি এবং মেনে নিতে একটু

বিলম্বও করেননি।

হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বিবরণ বর্ণীত নেই যে, তিনি কি ভাবে ঈমান আনেন। কিন্তু পনেরো বছর যাবত তিনি হুযুরের গৃহে তার পরিবারের লোক হিসাবেই বসবাস করেন। নিশ্চয় তিনি হুযুর (সঃ) এবং হযরত খাদিজাকে (রা) নামায পড়তে দেখেছেন এবং এটাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে থাকবে।

এসব ঘটনা থেকে প্রসংগক্রমে এটাও জানতে পারা যায় যে, যদিও হুযুর (সঃ) প্রথম প্রথম অপ্রকাশ্যভাবে কাজ করছিলেন, তথাপি তাঁর এবং হযরত খাদিজা (রা)এর নিকটাত্মীয়গণ জানতেন যে, হুযুর (সঃ) পৈত্রিক দ্বীনের খেলাপ আর একটি দ্বীন পেশ করছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত হওয়ার দাবী করছিলেন। তাঁর এ দাবী তাঁর পরিবারের লোকজন এবং অন্ততঃ পক্ষে তাঁর এক বন্ধু শুধু মেনেই নেননি, বরঞ্চ তদনুযায়ী এবাদতও অন্য পন্থায় শুরু করেছিলেন। তথাপি যেহেতু এসব কথা তাঁর দুশমনদের জানা ছিলনা, শুধু তাঁর শুভাকাংখীদেরই জানা ছিল, সেজন্যে তারা এসব গোপনই রাখেন, যেমন হুযুর (সঃ) সূচনাতে তা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। আর এ বিষয়ের কোন আলাপ আলোচনাও করেননি, নইলে সময়ের পূর্বেই বিরোধিতা শুরু হয়ে যেতো।

প্রাথমিক তিন বছরে হুযুরের (সঃ) শিক্ষার জন্যে কি হযরত ইসরাফিলকে (আ) পাঠানো হয়েছিল?

ইবনে জারীর তাঁর ইতিহাসে, ইবনে সা'দ তাবাকাতে, কাস্তাল্লামী মুয়াহেবুল্লাদুন্নিয়াতে এবং যুরকানী শরহে মুয়াহেবে প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম শা'বীর এ বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, নবুয়তের প্রাথমিক তিন বছর যাবত হযরত ইসরাফিল (আঃ) কে শিক্ষাদানের জন্যে রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে লাগিয়ে দেয়া হয়। তিনি অহী নিয়ে আসতেননা। কারণ অহী আনয়নের দায়িত্ব হযরত জিব্রিলের (আঃ) ছিল। অবশ্যি তিনি অহী আনয়ন ব্যতীত অন্য পন্থায় হুযুর (সঃ)কে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।*

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াকুব বিন সুফিয়ান আল্‌হাফেয, এবং বায়হাকী ইমাম শা'বীর এ বর্ণনা নকল করেছেন এবং তিনি পর্যন্ত এ সনদ সঠিক। কিন্তু জানিনা স্বয়ং শা'বী কোন সূত্রে এটা জানলেন। কারণ তিনি ত হুযুর (সঃ) পর্যন্ত এর সনদ বয়ান করেননি। ইবনে সা'দ এবং ইবনে জারীর বলেন যে ওয়াকেদী এর সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে হুযুর (সঃ) এর সাথে হযরত জিব্রিল ব্যতীত আর কাউকে নিয়োজিত করা হয়নি।

এ এমন একটি ব্যাপার যে, না তাকে একেবারে অস্বীকার করা যায়, আর না নিশ্চিত করে গ্রহণ করা যায়। অস্বীকার করা এজন্যে মুশকিল যে, শা'বী একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এবং তাঁর মুরসাল রেওয়ায়েতও এতোটা কমজোর নয় যে তা একেবারে প্রত্যাখান কার যায়। কিন্তু তাকে একটা নিশ্চিত ঘটনাও বলা যায় না। কারণ রেওয়ায়েত তার সনদের দিক দিয়ে এতোটা মজবুতও নয় যে তাকে অবশ্যই মেনে নেয়া যায়। তথাপি বিষয়টি সম্ভাবনার অতীতও নয়। কারণ নবুয়তের পর হুযুরের কথাবার্তায় ও কাজকর্মে জীবনের সকল দিকের জন্যে জ্ঞানের যে অফুরন্ত সম্পদ আমরা পাই যে সম্পদে হাদীস ও সীরাত গ্রন্থগুলো পরিপূর্ণ এবং যার কোন

* সম্ভবতঃ এ পন্থা স্বপ্ন হতে পারে, ইল্‌কা (Intuition) অথবা সাক্ষাৎ কোন শিক্ষাদান হতে পারে -গ্রন্থকার।

নজীর অন্য কোন মানুষের কথা ও কাজে সামান্যতম পরিমাণেও পাওয়া যায়না– তা অবশ্যই অদৃশ্য জগত থেকে নবীর মনের গভীরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল। আর জ্ঞান সম্পদ বিতরণের খেদমত আল্লাহতায়ালা সম্ভবতঃ হযরত ইসরাফিল (আ) এর দ্বারা নিয়ে থাকবেন।

ফাত্‌রাতুল অহী

প্রথম অহী নাযিলের পর একটা সময় পর্যন্ত জিব্রিল (আঃ) অহী আনয়নে বিরত থাকেন। এ অবস্থা যতোই দীর্ঘায়িত হতে থাকে, হুযুরের (সঃ) মনোবেদনা ততোই বাড়তে থাকে। এমনকি, তিনি কখনো অবচেতন মনে মক্কার পাহাড় শাবিরে এবং কখনো হেরার উপরে গিয়ে মনে করতেন যে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করেন। এ অবস্থায় যখন তিনি কোন পাহাড়ের এক কিনারার দিকে যেতে থাকেন তখন তিনি আকাশ থেকে একটি ধ্বনি শুনতে পেয়ে থেমে যান। উপরে তাকিয়ে দেখেন হযরত জিব্রিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আমি জিব্রিল।

ইবনে সা'দ এ কাহিনী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে, ইবনে জারীর তাঁর তফ্‌সীরে এবং আবদুর রাজ্জাক তাঁর আল্–মুসান্নাফে ইমাম যুহরী থেকে নকল করেন। বোখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদেও এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। (১৫)

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে–

কিছুকাল যাবত রসূলুল্লাহর (সঃ) উপর অহী নাযিল বন্ধ থাকে। সে সময়ে তিনি এতোটা মানসিক কষ্ট ভোগ করতে থাকেন যে, অনেক সময়ে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে নিজেকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি পাহাড়ের চূড়ার কিনারায় পৌছতেন, তখন জিব্রিল (আ) তাঁর সামনে আর্বিভূত হয়ে বলতেন, আপনি আল্লাহর নবী। একথায় তিনি মনে প্রশান্তি লাভ করতেন এবং তাঁর মনের অস্থিরতা দূর হয়ে যেতো। – (ইবনেজারীর)।

তারপর ইমাম যুহরী হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) বর্ণনা উধৃত করে বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফাতরাতুল অহীর (অহী বন্ধ হওয়া) উল্লেখ করে বলেন, একদিন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমি আকাশ থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলাম। মাথা তুলতেই সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যাকে আমি গারে হেরায় দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি আকাশ ও জমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তা দেখে ভয়ানক ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লাম এবং ঘরে পৌছে বল্লাম, আমাকে লেপ কম্বল জড়িয়ে দাও। তারপর বাড়ির লোকজন আমাকে লেপকম্বল জড়িয়ে দিল, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল হয়–

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

(হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি)। তারপর ক্রমাগত আমার উপর অহী নাযিল হতে থাকে – (বোখারী, মুসলিম, মসনাদে আহমদ–ইবনে জারীর)।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রাথমিক সাত আয়াত নাযিল

এভাবে অহী বন্ধ থাকার সময় উত্তীর্ণ হয় এবং সূরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক সাত আয়াত নাযিল হয় যার মাধ্যমে হুযুরকে (সঃ) রেসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করে জরুরী হেদায়েত দেয়া হয় যা রেসালতের দায়িত্ব পালনের জন্যে জরুরী ছিল। এখানে এ পার্থক্য ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত যে, সূরায়ে আলাকের প্রাথমিক পাঁচটি আয়াত এ কথাই ঘোষণা করছিল যে,

হুযুরের (সঃ) উপরে অহী নাযিলের সূচনা হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী বানানো হয়েছে। এখন সূরায়ে মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলোর দ্বারা নবুয়তের সাথে রেসালতের দায়িত্বও তাঁর উপর আরোপিত করা হচ্ছে। তাঁকে আদেশ করা হচ্ছে– ওঠো এবং এ দায়িত্ব পালন করা শুরু কর। এ আয়াতগুলো সম্পর্কে কিছু বর্ণনাতে এতোদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলোই কুরআন মজিদের সর্বপ্রথম আয়াত। বোখারী, মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থগুলোতে হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে এর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উম্মতের মধ্যে এ কথা প্রায় সর্ববাদি সম্মত যে, সর্বপ্রথম –

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ -

পর্যন্ত নাযিল হয়। তারপর ইবনে আসীরের মতে সূরায়ে মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়া পর্যন্ত অহী নাযিল বন্ধ থাকে। তারপর আবার অহী নাযিল নতুন করে শুরু হয়। স্বয়ং হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে ইমাম যুহরী এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই ফেরেশতাকেই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে দেখেন যিনি হেরাগুহায় তাঁর কাছে এসেছিলেন। এ বর্ণনা আমরা উপরে বোখারী, মুসলিম প্রভৃতির বরাত দিয়ে উধৃত করেছি। (১৭)

এ সূরায় যে হেদায়েত দেয়া হয়

এখন সূরায়ে মুদ্দাস্‌সিরের এ আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং দেখুন যে এতে কি হেদায়েত দেয়া হয়েছে।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -

–হে লেপ বা কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি। এখানে রসূলুল্লাহকে 'হে রসূল, হে নবী'– বলে সম্বোধন করার পরিবর্তে 'হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু হুযুর (সঃ) জিব্রিলকে আসমান ও যমীনের মাঝখানে চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে বাড়ির লোক জনকে বলেন– আমাকে জড়িয়ে দাও, আমাকে জড়িয়ে দাও। এ জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁকে 'মুদ্দাস্‌সির' বলে সম্বোধন করেন। এ মধুর সম্বোধন থেকে আপনা আপনি যে অর্থ প্রকাশ পায় তাহলো– হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে কেন? তোমার উপর ত একটা বিরাট কাজের দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তা পালন করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ময়দানে নামতে হবে।

قُمْ فَاَنْذِرْ -

–উঠ এবং সতর্ক করে দাও।

এ হচ্ছে সেই ধরনের নির্দেশ যা নূহ (আ) কে নবুয়ত দানের পর করা হয়েছিল। যেমন–

اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

–তোমার জাতিকে সর্তক করে দাও– তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আমার পূর্বে–(নূহ ঃ ১)।

সূরা মুদ্দাস্‌সিরের উক্ত আয়াতের মর্ম এই ঃ হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! উঠে পড় এবং তোমার চারপাশের লোকেরা যে অবহেলায় জীবন যাপন করছে, তাদেরকে সতর্ক করে

দাও। এ অবস্থায় যদি তারা লিপ্ত থাকে তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে তাদেরকে সাবধান করে দাও। তাদেরকে সতর্ক করে দাও যে, তারা কোন মগের মুলুকে বাস করে না যে তারা যা খুশী তাই করবে এবং তার জন্যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -

এবং নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দাও।

এ হচ্ছে একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ যা এ দুনিয়ায় তাকে করতে হয়। তার প্রথম কাজ এই যে, জাহেল মানুষ এখানে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিচ্ছে তা সব 'না' করে দিতে হবে এবং প্রকাশ্যে সারা দুনিয়ায় এ ঘোষণা দিতে হবে যে, এ বিশ্বজগতে এক খোদা ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্ব আর কারো নেই। এ কারণেই ইসলামে "আল্লাহো আকবার" কালেমার সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আযানের সূচনাই হয় আল্লাহু আকবার ঘোষণার দ্বারা। নামাযেও একজন মুসলমান প্রবেশ করে আল্লাহু আকবার বলে। তারপর বার বার আল্লাহু আকবার বলে উঠা বসা করে। পশুর গলায় যখন ছুরি চালানো হয় তখন বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলে চালানো হয়। তক্‌বীর ধ্বনি আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্রপূর্ণ নিদর্শন। কারণ এ উম্মতের নবী তাঁর কাজই শুরু করেছেন আল্লাহু আকবার দিয়ে।

এখানে আর একটি সূক্ষ্ম দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যা ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত। এ আয়াতগুলোর শানে নুযুল থেকে জানা গেছে যে, এই সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সঃ) কে রেসালাতের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটাও সুস্পষ্ট যে, যে শহর ও পরিবেশে এ মিশনসহ দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ হচ্ছিল তা ছিল শির্কের লীলাক্ষেত্র। কথা শুধু এতোটুকুই ছিলনা যে, সেখানকার জনসাধারণ সাধারণ আরববাসীর মতো মুশরিক ছিল, বরঞ্চ তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, মক্কা মুয়ায্যামা ছিল মুশরিক আরবের সর্ববৃহৎ তীর্থস্থান। আর কুরাইশের লোকেরা ছিল এর পুরোহিত। এসব স্থানে কোন ব্যক্তির একাকী আবির্ভাব হওয়া এবং শির্কের মুকাবিলায় তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ছিল। এজন্যে "ওঠো এবং সতর্ক করে দাও" বলার সাথে সাথে বলা হলো, "আপন রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" এর মর্ম এই যে, যেসব ভয়ংকর শক্তিকে তুমি এ কাজের প্রতিবন্ধক মনে করছ তাদের মোটে পরোয়াই করোনা। পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও, আমার রব সেসব শক্তি থেকে অনেক বড়ো যারা আমার এ দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করার জন্যে দাঁড়াতে পারে।

এর চেয়ে অধিক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি আর কি হতে পারে যা আল্লাহর কাজ শুরু করার জন্যে কোন ব্যক্তির জন্যে করা যেতে পারে? আল্লাহর জন্যে শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র যার মনে গভীরভাবে অংকিত হয়, সে আল্লাহর জন্যে একাকীই সমগ্র দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনা।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -

–এবং তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখ।

একথাগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং এসবের মর্মও সুদূরপ্রসারী। তার একটি মর্ম এই যে, আপন পোষক পরিচ্ছদ পাক পবিত্র রাখ। কারণ পোষাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং আত্মার পবিত্রতা ওতপ্রোত জড়িত। একটি পবিত্র আত্মা নোংরা ময়লা দেহ ও অপবিত্র পোষাক পরিচ্ছদে থাকতে পারেনা। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে পরিবেশে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেন

তা শুধু আকীদা বিশ্বাস এবং চরিত্রের অধঃপতনের অতলতলেই নিমজ্জিত ছিলনা বরঞ্চ তাহারাত এবং পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা থেকেও বঞ্চিত ছিল। আর নবীর কাজ ছিল তাদেরকে সকল দিক দিয়ে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দেয়া। এ জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো যাতে করে তিনি তাঁর বাহ্যিক জীবনেও তাহারাতের (পবিত্রতা) সর্বোচ্চ মান কায়েম করতে পারেন। অতএব এ সেই হেদায়েতেরই ফলশ্রুতি যে, হুযুর (সঃ) মানব জাতিকে দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদের এমন বিস্তারিত শিক্ষাদান করেন যা আরব জাহেলিয়াত ত দূরের কথা আধুনিক যুগের সভ্যতম জাতিগুলোও লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষায় এমন কোন শব্দ পাওয়া যায় না যা তাহারাত শব্দের সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা এই যে, হাদীস ও ফেকাহর গ্রন্থগুলোতে ইসলামী হুকুম আহকামের সূচনাই হয় তাহারাত থেকে। এতে পাক নাপাকের পার্থক্য এবং পবিত্রতার পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বয়ান করা হয়েছে।

এ শব্দগুলোর দ্বিতীয় মর্ম হলো, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। বৈরাগ্যের ধারণা দুনিয়ার ধার্মিকতার এ মান নির্ধারিত করে দিয়েছে যে, মানুষ যতোই ময়লা অপরিচ্ছন্ন থাকবে সে ততো বেশী ধার্মিক বা সাধুজনোচিত হবে। কেউ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করলে তাকে দুনিয়াদার মনে করা হতো। অথচ মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি ময়লা অপরিচ্ছন্নতা ঘৃণা করে। ভদ্রতা ও রুচিজ্ঞানের সাধারণ অনুভূতি যার মধ্যে আছে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষের সাথেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এ কারণেই যারা আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেবে তাদের জন্যে এটা জরুরী যে, তার বাহ্যিক দিকটা এমন পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে যাতে করে মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখে এবং তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেন এমন অরুচিকর কিছু না থাকে যা স্বভাবতঃই ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে।

এ এরশাদের তৃতীয় মর্ম এই যে, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষত্রুটি থেকে পবিত্র রাখ। তোমার পোষাক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অবশ্যই হবে। কিন্তু তার মধ্যে গর্ব অহংকার, লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, জাঁকজমক ও প্রভাব প্রতিপত্তির চিহ্ন যেন না থাকে। পোষাকই সর্বপ্রথম মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় করিয়ে দেয়। যে ধরনের পোষাকই কেউ পরিধান করুননা কেন, তা দেখে প্রথম নজরেই লোকেরা এ অনুমান করে যে সে কোন্ ধরনের মানুষ। জমিদার ও নবাব–সুবাদের পোষাক, ধর্ম ব্যবসায়ীদের পোষাক, অহংকারী ও আত্মভোলা লোকের পোষাক, বালসুলভ ছেবলা ও হীনমনা লোকের পোষাক, গুন্ডা বদমায়েশ ও ভবঘুরে লোকের পোষাক–সবই পরিধানকারীদের স্বভাবপ্রকৃতির পরিচয় বহন করে। আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীদের স্বভাব প্রকৃতি এসব লোক থেকে স্বভাবতঃই ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব তাঁদের পোষাকও স্বভাবতঃই এসব লোকের থেকে পৃথক হওয়া উচিত। এমন পোষাক পরিধান করা উচিত যা দেখে প্রত্যেকেই মনে করতে পারে যে লোকটি বড়ো ভদ্র, বড়ো রুচিবান যে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত নয় অথবা প্রবৃত্তির অনাচারে লিপ্ত নয়।

চতুর্থ মর্ম এই যে, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। উর্দু ভাষার ন্যায় আরবী ভাষাতেও পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখাকে (পাক দামানী) চারিত্রিক দোষত্রুটির উর্ধে থাকা এবং উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইমাম নখয়ী, শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সাঈদ বিন জুবাইর, হাসান বাসরী অন্যান্য প্রখ্যাত তফসীরকারগণ এ আয়াতের অর্থই করেছেন যে, নিজের চরিত্র পূত পবিত্র রাখ এবং সকল প্রকার অনাচার থেকে দূরে থাক। আরবী প্রকাশভংগী বা বাগধারা (IDIOM) বলা হয়ে থাকে–

فُلَانٌ طَاهِرُ الثِّيَابِ فُلَانٌ طَاهِرُ الذَّيْلِ -

–অমুক ব্যক্তির কাপড় পাক পবিত্র এবং তার পোষাক পরিচ্ছদ পবিত্র। তার অর্থ এই যে তার স্বভাব চরিত্র উত্তম। পক্ষান্তরে বলা হয়

فُلَانٌ دَنِسُ الثِّيَابِ -

–তার কাপড় চোপড় ময়লা অর্থাৎ সে বদ প্রকৃতির লোক। তার কথাবার্তার কোন বিশ্বাস নেই।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - (المدثر: ٥)

ময়লা অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাক। ময়লা বা নোংরামি বলতে এখানে সব রকমের নোংরামিই বুঝায়। তা আকীদাহ বিশ্বাস ও চিন্তাধারার নোংরামির হোক আমল আখলাকের নোংরামি হোক, দেহ ও পোষাক পরিচ্ছদের নোংরামি হোক অথবা জীবন পদ্ধতির নোংরামি হোক। অর্থাৎ তোমার চার পাশে গোটা সমাজে বিভিন্ন প্রকারের যেসব নোংরামি বিস্তার লাভ করে আছে সেসব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। কেউ যেন তোমার প্রতি এ অভিযোগ আরোপ করতে না পারে যে, যেসব নোংরামি ও অনাচার থেকে তুমি লোককে বিরত রাখছ সেসবের মধ্যে কোন কোনটার চিহ্ন তোমার মধ্যেও পাওয়া যায়।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ - (المدثر: ٦)

–এবং ইহসান করোনা অধিক লাভ করার জন্যে।

এ শব্দগুলোর মর্ম এতো ব্যাপক যে, কোন একটি বাক্যে এর অনুবাদ করে এর পরিপূর্ণ মর্ম ব্যাখ্যা করা যায়না। এর একটি মর্ম এই যে, যার প্রতিই দয়া অনুগ্রহ করবে, নিঃস্বার্থভাবে করবে। তোমার দান, অনুগ্রহ ও সদাচরণ নিছক আল্লাহর জন্যে হতে হবে। উপকার ও কল্যাণ করার বিনিময়ে তুমি পার্থিব কোন সুযোগ সুবিধা হাসিল করবে এমন ধরনের কণামাত্র কামনা বাসনাও যেন তোমার না থাকে। অন্য কথায় কারো কল্যাণ করলে তা আল্লাহর জন্যে করবে ফায়দা হাসিল করার জন্যে কারো উপকার বা কল্যাণ করবেনা।

দ্বিতীয় মর্ম এই যে, নবুয়তের যে কাজ তুমি করছ, যদিও তা এক অতি কল্যাণকর কাজ যে তোমার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিকুল হেদায়েত লাভ করছে, তার জন্যে মানুষের কাছে গর্ব করে বেড়ায়োনা যে, তুমি তাদের বিরাট কল্যাণ করছ এবং এর থেকে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করোনা।

তৃতীয় মর্ম এই যে, তুমি যদিও একটা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছ কিন্তু আপন দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বিরাট কাজ মনে করোনা, এ ধারণা তোমার মনে যেন না আসে যে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করে এবং এ কাজে জীবন উৎসর্গ করে তুমি তোমার রবের উপর কোন মেহেরবানী করছ।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ - (المدثر: ٧)

–এবং আপন রবের জন্যে সবর কর।

অর্থাৎ যে কাজ তোমায় দায়িত্বে দেয়া হয়েছে তা এক অতি প্রাণান্তকর কাজ। এ কাজের জন্যে তোমাকে কঠিন বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট ও ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

তোমার স্বজাতি তোমার দুশমন হয়ে পড়বে। সমগ্র আরব তোমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু এ পথে যতো কিছুই আসুক তার জন্যে তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আপন দায়িত্ব অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততা সহকারে পালন করতে হবে। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে ভয়ভীতি, প্রলোভন, বন্ধুত্ব শত্রুতা, প্রেম প্রীতি সবকিছুই তোমার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এ সবের মুকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে আপন সংকল্পে অটল থাকবে।

এ ছিল সেই প্রাথমিক হেদায়াত যা আল্লাহতায়ালা তাঁর রসূলকে এমন সময়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁকে এ নির্দেশ দেন– উঠ এবং আপন কাজের সূচনা কর। যদি কেউ এ ছোটো ছোটো বাক্যগুলো ও সেসবের অর্থের উপর চিন্তাভাবনা করে তাহলে তার মন সাক্ষ্য দেবে যে, একজন নবীর কাজ শুরু করার সময় এর চেয়ে ভালো উপদেশ নির্দেশ আর কিছু দেয়া যেতে পারতোনা। এতে একথাও বলা হয়েছে যে কাজটা কি করতে হবে। সেইসাথে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে এ কাজ কোন্ নিয়তে, কোন মানসিকতা ও কোন চিন্তাধারা সহ করতে হবে। এ বিষয়েও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে এ কাজে কোন্ কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে এবং তার মুকাবিলা কিভাবে করতে হবে। আজ যারা অন্ধ বিদ্বেষে এ কথা বলে যে (মায়াযাল্লাহ) মৃগী রোগাক্রান্ত হওয়ার পর প্রলাপের ন্যায় এসব কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মুখ দিয়ে বেরুতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো দেখে স্বয়ং চিন্তা করে দেখুক যে এগুলো কি মৃগীরোগে আক্রান্ত অবস্থার কোন প্রলাপ, না খোদার হেদায়াত যা নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করার সময় তিনি তাঁর বান্দাহকে দান করছেন। (১৮)

অহী ধারণ করার অভ্যাস

ইতঃপূর্বে আমরা হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহর (রাঃ) বরাত দিয়ে বলেছি যে, সূরা মুদ্দাসসিরের পর হুযুরের (সঃ) উপর ক্রমাগত অহী নাযিল হওয়া শুরু হয়। কিন্তু প্রাথমিক কালে অহী নাযিলের সময় নবী পাকের এ অসুবিধা হতো যে ভুলে যাওয়ার আশংকায় তিনি তা (মুখস্থ করে) মনে রাখার চেষ্টা করতেন। আবার কখনো অহী নাযিল কালে কোন কিছুর অর্থ জিজ্ঞেস করতেন। এজন্যে এ সময়ে নবীকে অহী ধারণ করার পন্থা ভালো করে শিখিয়ে দেয়ারও প্রয়োজন ছিল। সূরা তা–হা–য় বলা হয়েছে–

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ

وَحْيُهٗ ۚ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۔ (طٰهٰ ١١٤)

উচ্চ ও মহান আল্লাহ। তিনিই সত্যিকার বাদশাহ। আর দেখ (হে নবী) কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করোনা যতোক্ষণ না তোমার উপর অহী পুরোপুরি পৌঁছে গেছে। এবং দোয়া কর, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বেশী বেশী ইল্‌ম দান কর (তা–হা ঃ ১১৪)

বক্তব্যের ধারা পরিষ্কার এ কথা বলছে যে

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۔ পর্যন্ত এসে ভাষণ শেষ হয়ে গেছে। তারপর বিদায় কালে ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশে নবীকে (সঃ) সতর্ক করে দিচ্ছেন এমন বিষয়ে যা অহী নাযিল কালে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। মাঝখানে টিপ্পনী কাটা সংগত মনে করা হয়নি। তাই পয়গাম প্রেরণ সমাপ্ত করার পর তিনি হুযুরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেন। এমন কি

ছিল যার জন্যে সতর্ক করে দেয়া হলো? স্বয়ং সতর্ককরণের শব্দগুলোই তা প্রকাশ করছে। নবী (সঃ) অহীর পয়গাম গ্রহণ করা কালে তা মনে রাখার জন্যে তা আবৃত্তি করার চেষ্টা করছিলেন। এ চেষ্টার ফলে বার বার তাঁর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছিল হয়তো। হয়তো অহী গ্রহণের ধারাবাহিকতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। পয়গাম শুনার ব্যাপারে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া না হয়ে থাকবে। এ অবস্থা দৃষ্টে প্রয়োজন বোধ করা হয় যে তাঁকে অহী গ্রহণ করার সঠিক পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয়া হোক এবং মাঝে মাঝে মনে রাখার যে চেষ্টা তিনি করছিলেন তা নিষেধ করে দেয়া হোক।

সূরা কিয়ামাহ্ নাযিলের সময়েও এ অবস্থা হয়েছিল। এ জন্যে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে তাঁকে সতর্ক কের দেয়া হলো।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۔ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۔ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۔ (القيامة: ١٦-١٩)

এ স্মরণ রাখার জন্যে তাড়াহুড়া করে নিজের জিহ্বা বার বার চালনা করোনা। এটা মনে করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদেরই দায়িত্ব। অতএব যখন আমরা তা শুনাচ্ছি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক তারপর তার মর্ম বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের দায়িত্ব। (১)

সূরায়ে আ'লা তেও নবীকে (সঃ) এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব এবং তুমি তারপর আর তা ভুলে যাবেনা। (২)

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ۔

পরে যখন অহীর পয়গাম গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা নবীর হয়ে গেল তখন এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এজন্যে পরবর্তী সূরাগুলোতে এ ধরনের সতর্কবাণী আমরা দেখতে পাইনা।

গোপন তবলিগের তিন বছর

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে রেসালাতের বাণী পৌছাবার যে হিকমত শিক্ষা দেন তদনুযায়ী তিনি নবুয়তের ঘোষণা ও জন সাধারণের মধ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেননি। বরঞ্চ প্রথম তিন

---

(১) সূরায়ে কিয়ামার মধ্যে এ বাক্যটি প্রাসংগিকক্রমে আসায় যে ব্যাখ্যা আমরা করেছি তা নিছক অনুমান ভিত্তিক নয়। বরঞ্চ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোতে এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে তাবারানী, বায়হকী এবং অন্যান্য মুহাদ্দেসীন বিভিন্ন সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা নকল করে বলেন যে যখন হুযুর (সঃ) এর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল তখন তিনি ভুলে যাওয়ার আশংকায় জিব্রাঈল (আঃ) এর সাথে অহীর কথাগুলো আবৃত্তি করতে থাকতেন। এতে বলা হলো –

لَا تُحَرِّكْ ......

এ কথাই শা'বী, ইবনে যায়েদ, যুহ্হাক, হাসান বাসরী, কাতাদাহ, মুজাহিদ এবং অন্যান্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত আছে। (১৮)

(২) হাকেম সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রাঃ) থেকে এবং ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা নকল করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরআনের শব্দগুলো এ আশংকায় পুনরাবৃত্তি করতেন পাছে তিনি ভুলে না যান। মুজাহিদ এবং কালবী বলেন, জিব্রীল (আঃ) অহী শুনিয়ে বিদায় না হতেই হুযুর (সঃ) ভুলে যাওয়ার আশংকায়ই প্রথমাংশ পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করতেন। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা নবী (সঃ) কে নিশ্চয়তা দেন যে অহী নাযিলের সময় তুমি চুপ করে শুনতে থাকবে। আমরা তা তোমাকে পড়িয়ে দেব এবং চিরকালের জন্যে তোমার মনে থাকবে। এ আশংকা তুমি করবেনা যে তার কোন একটি শব্দ তুমি ভুলে যাবে। (১৯)

বছর এমন মহৎ ব্যক্তিদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন যাঁরা দলিল প্রমাণ ও বুঝাপড়ার মাধ্যমে তাওহীদ কবুল করতে এবং শির্ক পরিহার করতে উদ্যত ছিলেন।। সেই সাথে তাঁদের কাছেও দাওয়াত পৌঁছান যাঁদের প্রতি এ আস্থা পোষণ করা যেতো যে যতোক্ষণ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তিনি জনসাধারণ্যে ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ শুরু করার ফয়সালা না করেন, ততোক্ষণে তারা গোপনীয়তা রক্ষা করে চলবে। এ কাজে হযরত আবু বকর (রাঃ) [১] এর প্রভাব সবচেয়ে অধিক কার্যকর ছিল। তাবারী ও ইবনে হিশাম তার কারণ এই বলেন যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক ও সৌহার্দপূর্ণ স্বভাবের লোক, তাঁর গুণাবলীর জন্যে তিনি তাঁর স্বজাতির অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। কুরাইশদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বংশবৃত্তান্ত (Genealogy) আর কারো জানা ছিলনা। কে ভালো কে মন্দ এবং কার কি গুণাবলী এসবও তাঁর চেয়ে অধিক আর কারো জানা ছিলনা। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সদাচরণের জন্যে প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁর স্বজাতি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধির, জন্যে তাঁর ব্যবসা ও সদাচরণের জন্যে অধিক সময় তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতো এবং তাঁর কাছে এসে বসতো। এ সুযোগে তিনি যাদের প্রতি আস্থা পোষণ করতেন তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন। তাঁর তবলিগে প্রভাবিত হয়ে বিরাট সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর যাঁরাই মুসলমান হতেন তাঁরা তাঁদের বন্ধু মহল থেকে তালাশ করে ভালো লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন। সে সময়ে মুসলমানগণ গোপনে মক্কার জনহীন প্রান্তরে নামাজ পড়তেন যাতে করে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণ কেউ টের না পায়।

দারে আরকামে প্রচার কেন্দ্র ও বৈঠকাদি কায়েম

আড়াই বছরের পর বেশ কিছু কাল অতীত হওয়ার পরপরই এমন এক ঘটনা ঘটে যার ফলে এ আশংকা হয় যে অসময়ে মক্কার কাফেরদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়ে না যায়।

ইবনে ইসহাক বলেন যে, একদিন মুসলমানগণ মক্কার এক প্রান্তরে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় একদল মুশরিক তাদেরকে দেখে ফেলে এবং ধর্মোদ্রোহী বলা শুরু করে। কথায় কথায় লড়াইয়ের উপক্রম হয় এবং হযরত সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রাঃ) একজনের প্রতি একটা উটের হাড় ছুড়ে মারে এবং তার মাথা ফেটে যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে হিশাম এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু হাকেম উমারী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির মাথা ফেটে যায় সে ছিল বনী তাইমের আবদুল্লাহ বিন খাতাল। তারপর নবী (সঃ) অবিলম্বে সাফার নিকটবর্তী হযরত আরকাম বিন আবি আরকামের গৃহকে বৈঠকাদি এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কেন্দ্রে পরিণত করেন। এতে করে লোক এখানে একত্র হয়ে নামাযও পড়তে পারবে এবং যারা গোপনে মুসলমান হতে থাকবে তারা এখানে আসতেও থাকবে। ইসলামের ইতিহাসে এ দারে আরকাম চিরন্তন খ্যাতি লাভ করে। তিন বছরের গোপন দাওয়াতের কাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশ্যে জন সাধারণের মধ্যে দাওয়াত শুরু হওয়ার পরও এ মুসলমানদের কেন্দ্র হয়ে থাকে। হুযুর (সঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানে এসে মুসলমানগণ তাঁর সাথে মিলিত হতেন। শিয়া'বে আবিতালিবে বন্দী থাকার পূর্ব পর্যন্ত এ ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র।

---

(১) তার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন ওসমান। কিন্তু তাঁর কুনিয়াত আবু বকর এতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে প্রকৃত নাম চাপা পড়ে যায়। যামাখ্শারী বলেন, পূত পবিত্র স্বভাব চরিত্রের দিকে সকলের অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে তাঁকে আবু বকর বলা হতো। জাহেলিয়াতের যুগেই তাঁর এ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে –গ্রন্থকার।

তিন বছরের গোপন দাওয়াতের ফলাফল

প্রকাশ্যে ইসলামী দাওয়াতের সময়কালের উপর আলোচনা করার আগে আমাদের দেখা উচিত যে এ তিন বছরে কতটুকু কাজ হয়েছে। কুরাইশদের কোন্ কোন্ গোত্রের কারা কারা কতজন মুসলমান হয়েছিল। কুরাইশের বাইরে থেকে কতলোক, কত মাওয়ালী, গোলাম, বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল নিম্নে তার তালিকা দেয়া হলো, বহু চেষ্টা চরিত্র ও অনুসন্ধানের পর এ কাজ সম্ভব হয়েছে। কারণ এর পূর্ণ তালিকা কোথাও একত্রে পাওয়া যায়না।

বনী হাশিম গোত্র

১। জাফর বিন আবি তালিব

২। তাঁর বিবি আস্মা বিন্তে উমাইস্ খাশ্আমিয়্যা (কুরাইশ গোত্র বহির্ভূত এ মহিলা)

৩। সাফিয়্যা (রাঃ) বিন্তে আবদুল মুত্তালিব [নবীর ফুফী এবং হযরত যুবাইরের (রাঃ) মাতা।]

৪। আরওয়া (রাঃ) বিন্তে আবদুল মুত্তালিব [তুলাইব (রাঃ) বিন উমাইরের মা এবং হুযুরের ফুফী।]

বনী আল্ মুত্তালিব গোত্র

৫। উবায়দাহ (রাঃ) বিন আল্ হারিস বিন মুত্তালিব।

বনী আব্দে শাম্স্ বিন আব্দে মানাফ গোত্র

৬। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বিন্ ওত্বা বিন রাবিয়া

৭। তাঁর বিবি সাহ্লা (রাঃ) বিন্তে সুহাইল বিন্ আমর

বনী উমাইয়া গোত্র

৮। উস্মান (রাঃ) বিন আফ্ফান

৯। তাঁর মা আরওয়া (রাঃ) বিন্তে কুরাইয

১০। খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিন আল্আস বিন উমাইয়া

১১। তাঁর বিবি উমায়মা (রাঃ) বিন্তে খালাফ আল্ খুযাইয়া (কেউ কেউ তার নাম উমায়না বলেছেন)।

১২। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বিন্তে আবি সুফিয়ান (প্রথমে তিনি উবায়দুল্লাহ বিন জাহশের বিবাহ বন্ধনে ছিলেন, পরে উম্মুল মুমেনীন হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।)

হুলাফায়ে বনী উমাইয়া গোত্র (বনী উমাইয়ার সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ)।

১৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহ্শ

১৪। আবু আহমদ বিন জাহ্শ

১৫। উবায়দুল্লাহ বিন জাহ্শ*

এ তিন জন ছিলেন বনী গানাম বিন দূদান বংশোদ্ভূত। হুযুরের (রাঃ) ফুফী উমায়মা বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র এবং উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নবের ভাই।

---

* ইনি তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা সহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মারা যান। —গ্রন্থকার।

বণী তাঈম গোত্র

১৬। আস্‌মা বিন্তে আবি বকর (রাঃ)

১৭। উম্মে রুমান (রাঃ) {হযরত আবু ককরের (রাঃ) স্ত্রী এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকরের (রাঃ) মা।}

১৮। তাল্‌হা (রাঃ) বিন উবায়দুল্লাহ

১৯। তাঁর মা সা'বা (রাঃ) বিন্তে আল্‌ হাদ্‌রামী।

২০। হারেস (রাঃ) বিন খালেদ

বনী তাঈমের সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ গোত্র

২১। সুহাইব (রাঃ) বিন সিনান রুমী

বনী আসাদ বিন আবদুল ওয্যা গোত্র

২২। যুবাইর (রাঃ) বিন আল আওয়াম (হযরত খাদিজার ভাতিজা এবং হুযুরের (সঃ) ফুফাতো ভাই।

২৩। খালিদ (রাঃ) বিন হিযাম (হাকীম বিন হিযামের ভাই এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) ভাতিজা)।

২৪। আসওয়াদ (রাঃ) বিন নাওফাল

২৫। আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া

বনী আবদুল ওয্যা বিন কুসাই গোত্র

২৬। ইয়াযিদ (রাঃ) বিন যামায়া বিন আল আসওয়াদ

বনী যোহরা গোত্র

২৭। আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ

২৮। তাঁর মা শিফা (রাঃ) বিন্তে আওফ

২৯। সা'দ বিন আবি ওক্কাস (রাঃ)। আবু ওক্কাসের আসল নাম মালিক বিন ওসাইব ছিল।

৩০। তাঁর ভাই ওমাইর (রাঃ) বিন আবি ওক্কাস

৩১। তাঁর ভাই আমের (রাঃ) বিন আবি ওক্কাস

৩২। মুত্তালিব (রাঃ) বিন আযহার (আবদুর রহমান বিন আওফের চাচাতো ভাই)

৩৩। তাঁর বিবি রামলা (রাঃ) বিন্তে আবি আওফ সাহ্‌মিয়া

৩৪। তুলাইব (রাঃ) বিন আযহার

৩৫। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন শিহাব।

বণী যোহরার সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধগোত্র

৩৬। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ। ইনি ছিলেন হযাইল গোত্রের এবং মক্কার বনী যোহরার সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ

৩৭। ওত্‌বা (রাঃ) বিন মাসউদ (আবদুল্লাহ বিন মাসউদের ভাই)

৩৮। মিকদাদ (রাঃ) বিন আমর আল্‌ কিন্দী

৩৯। খাব্বাব (রাঃ) বিন আল আরাত

৪০। শুরাহবিল (রাঃ) হাসানাত আল কিন্দী

৪১। জাবের (রাঃ) বিন হাসানাত (শুরাহবিলের ভাই)

৪২। জুনাদা (রাঃ) বিন হাসানাত (ঐ)

বণী আদী গোত্র

৪৩। সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল [হযরত ওমরের (রাঃ) চাচাতো ভাইও ভগ্নিপতি]

৪৪। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) বিন্তে আল খাত্তাব [হযরত ওমরের (রাঃ) ভগ্নি]

৪৫। যায়েদ (রাঃ) বিন খাত্তাব (হযরত ওমরের বড়ো ভাই)

৪৬। আমের (রাঃ) বিন রাবিয়া আল্ আন্যী (খাত্তাব তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করেছিল)।

৪৭। তাঁর স্ত্রী লায়লা (রাঃ) বিন্তে আবি হাসমা

৪৮। মা'মার (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন নাদ্‌লা

৪৯। নুয়াইম (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন আল্লাখ্‌খাম।

৫০। আদী (রাঃ) বিন নাদ্‌লা

৫১। উরওয়াহ (রাঃ) বিন আবি উসাসা (আমর বিন আসের বৈমাত্রেয় ভাই)

৫২। মাসউদ (রাঃ) বিন সুয়াইদ বিন হারেসা বিন নাদ্‌লা।

বনী আদীর সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ গোত্র।

৫৩। ওয়াকেদ বিন আবদুল্লাহ (খাত্তাব তাঁকে পুত্র বানিয়ে নেয়)।

৫৪। খালিদ (রাঃ) বিন বুকাইর বিন আবদে ইয়ালিল আল্‌লায়লী

৫৫। ইয়াস (রাঃ) বিন বুকাইর বিন আবদে ইয়ালিস আল্লায়সী

৫৬। আমের (রাঃ)

৫৭। আকেল (রাঃ)

বনী আবদুদ্দার গোত্র

৫৮। মুসয়াব (রাঃ) বিন উমাইর

৫৯। তাঁর ভাই আবুর রুম (রাঃ) বিন উমাইর

৬০। ফেরাস (রাঃ) বিন আন্নাদর

৬১। জাহ্‌ম (রাঃ) বিন কায়েস

৬২। উসমান (রাঃ) বিন মাযউন

৬৩। তাঁর ভাই কুদামা (রাঃ) বিন মাযউন

৬৪। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাযউন

৬৫। সায়ের বিন উসমান (রাঃ) বিন মাযউন

৬৬। মা'মার (রাঃ) বিন আল্‌হারেস বিন মা'মার

৬৭। তাঁর ভাই হাতেব (রাঃ) বিন আল্ হারেস

৬৮। তাঁর স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) বিন্তে মুজাল্লিল আল্ আমেরিয়া

৬৯। মা'মারের ভাই হাত্তাব (রাঃ) বিন আলহারেস

৭০। তাঁর স্ত্রী ফুকাইহা বিন্তে ইয়াসার

৭১। সুফিয়ান বিন মা'মার (রাঃ)

৭২। নুবায়না (রাঃ) বিন ওসমান

বনী সাহ্ম গোত্র

৭৩। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন হুযাফা

৭৪। খুনাইস (রাঃ) বিন হুযাফা (হযরত ওমরের (রাঃ) জামাই। (উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার (রা) প্রথম স্বামী

৭৫। হিশাম (রাঃ) বিন আল্আস বিন ওয়ায়েল

৭৬। হারেস (রাঃ) বিন কায়েস

৭৭। তাঁর পুত্র বশীর বিন হারেস (রাঃ)

৭৮। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মা'মার বিন হারেস (রাঃ)

৭৯। কায়েস (রাঃ) বিন হুযাফা (আবদুল্লাহ বিন হুযাফার ভাই)

৮০। আবু কায়েস (রাঃ) বিন আল হারেস

৮১। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আল হারেস

৮২। সায়েব (রাঃ) ঐ

৮৩। হাজ্জাজ (রাঃ) ঐ

৮৪। বিশার (রাঃ) ঐ

৮৫। সাঈদ (রাঃ) ঐ

বনী সাহ্মের বন্ধু গোত্র

৮৬। উমাইর (রাঃ) বিন রিয়াব

৮৭। মাহমিয়্যা (রাঃ) বিন আল্ জাযু [হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বিবি উম্মুল ফযল (রাঃ) এর বৈমাত্রেয়ভাই।]

বনী মাখযুম গোত্র

৮৮। আবু সালমা আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আবদুল আসাদ [হুযুরের (সঃ) ফুফাতো এবং দুধ ভাই, উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালমার (রাঃ) প্রথম স্বামী]।

৮৯। তাঁর বিবি উম্মে সালমা (রাঃ) (ইনি ও তাঁর স্বামী আবু সালমা আবু জেহেলের নিকট আত্মীয়ছিলেন।)

৯০। আরকাম (রাঃ) বিন আবিল আরকাম (যার দারে আরকামের উল্লেখ আগে করা হয়েছে)।

৯১। আইয়াশ (রাঃ) বিন আবি রাবিয়া (আবু জেহেলের বৈমাত্রেয় ভাই। হযরত খালেদ বিন অলীদের চাচাতো ভাই)।

৯২। তাঁর বিবি আসমা (রাঃ) বিন্তে সালামা তামিমিয়্যা

৯৩। অলীদ (রাঃ) বিন অলীদ বিন মুগীরা

৯৪। হিশাম (রাঃ) বিন আবি হুযায়ফা

৯৫। সালমা (রাঃ) বিন হিশাম

৯৬। হাশিম (রাঃ) বিন আবি হুযায়ফা

৯৭। হাববার (রা) বিন সুফিয়ান

৯৮। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সুফিয়ান

বনী মাখযুমের মিত্র গোত্র

৯৯। ইয়াসের (রাঃ) (আম্মার বিন ইয়াসেরের পিতা)

১০০। আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)

১০১। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ বিন ইয়াসের (রাঃ)

বনী আমের বিন লুহাই গোত্র

১০২। আবু হাবরা (রাঃ) বিন আবি রুহম (হুজুরের ফুফী বাররা বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র)।

১০৩। তাঁর বিবি উম্মে কুলসূম (রাঃ) বিন্তে সুহাইল বিন আমর। [আবু জান্দাল (রাঃ)এর ভগ্নি]।

১০৪। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সুহাইল বিন আমর

১০৫। হাতেব (রাঃ) বিন আমর (সুহাইল বিন আমরের ভাই)

১০৬। সালীত (রাঃ) বিন আমর

১০৭। সাকরান (রাঃ) বিন আমর (সুহাইল বিন আমরের ভাই। ইনি উম্মুল মুমেনীন সাওদা (রাঃ) বিন্তে যামায়ার প্রথম স্বামী)

১০৮। তাঁর বিবি সাওদা (রাঃ) বিন্তে যামায়া (সাকরানের মৃত্যুর পর উম্মুল মুমেনীন হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করেন)।

১০৯। সালীত বিন আমরের বিবি ইয়াকাযা (রাঃ) বিন্তে আলকামা (ইসাবায় উম্মে ইয়াকাযা বলা হয়েছে এবং ইবনে সা'দ ফাতেমা বিন্তে আল্‌কামাহ বলেছেন)।

১১০। মালেক (রাঃ) বিন যামায়া (হযরত সাওদার ভাই)।

১১১। ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)

বনী ফহর বিন মালেক গোত্র

১১২। আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বিন আল্‌ জাররাহ্‌

১১৩। সুহাইল (রা) বিন বায়দা

১১৪। সাঈদ (রাঃ) বিন কায়েস

১১৫। আমর (রাঃ) বিন আল হারেস বিন যুহাইর

১১৬। ওসমান (রাঃ) বিন আবদ গানম বিন যুহাইর (হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের (রাঃ) ফুফাতো ভাই)।

১১৭। হারেস (রাঃ) বিন সাঈদ

বনী আব্দে কুসাই গোত্র

১১৮। তুশাইব (রাঃ) বিন উমাইর (হুযুরের ফুফু আরওয়া বিন্তে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র) এ গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতো। তাছাড়া তাদের বিরাট সংখ্যক দাসদাসীও ছিল। তিন বছরের গোপন দাওয়াতী কাজের ফলে এরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের নাম নিম্নরূপঃ

১১৯। উম্মে আয়মান বারাকাহ (রাঃ) বিন্তে সালাবাহ যিনি শৈশব থেকেই হুযুরকে কোলে করে মানুষ করেন।

১২০। যিন্নিরা রুমিয়া (রাঃ) (আমর বিন আল্ মুয়াম্মিল এর মুক্ত দাসী)।

১২১। বেলাল (রাঃ) বিন রাবাহ।

১২২। তাঁর মা হামামা (রাঃ)

১২৩। আবু ফুকাইহা (রাঃ) বিন ইয়াসার আল জুহমী (সাফওয়ান বিন উমাইয়ার মুক্ত দাস)

১২৪। লাবীবা (রাঃ) (মুয়াম্মেল বিন হাবীবের দাসী)।

১২৫। উম্মে উবাইস (রাঃ) (বনী তাইম বিন মুনরা অথবা বনী যুহরার দাসী। প্রথম উক্তি যুবাইর বিন বাক্কারের এবং দ্বিতীয় উক্তি বালাযুরীর)।

১২৬। আমের (রাঃ) বিন ফুহাইরা (তুফাইল বিন আবদুল্লাহর দাস)।

১২৭। সুমাইয়া (রাঃ) (হযরত আম্মার বিন ইয়াসেরের) মাতা এবং আবু হুযায়ফা বিন মুগীরা মাখযুমীরদাসী।

অকুরাইশদের মধ্যে যাঁরা মক্কায় প্রাথমিক কালে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হলো

১২৮। মিহ্জান (রাঃ) বিন আল্ আদরা আল্ আসলামী।

১২৯। মাসউদ (রাঃ) বিন রাবিয়া বিন আমর। ইনি ছিলেন বনী আল্হুন বিন খুযায়মার কারা গোত্রীয়।

এভাবে প্রাথমিক চারজন মুসলমানের সাথে ১২৯ জন যোগ করলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় একশত তেত্রিশ (১৩৩)। হুযুর (সঃ) প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করার পূর্বেই এ সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মুসলমানদের দলভুক্ত হন।[১]

সঠিক চিন্তা ও সুস্থ প্রকৃতির লোক তাঁরা ছিলেন। তাঁরা নিছক যুক্তি প্রমাণ ও পারস্পরিক বুঝাপড়ার মাধ্যমে শির্কের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করেন, তাওহীদের সত্যতা মেনে নেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে খোদার রসূল বলে স্বীকার করেন, কুরআনকে

(১) আবদুল বার ইস্তিয়াবে এবং ইবনে আসীর উসদুল গাবায লিখেছেন –"বলা হয়ে থাকে যে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর বিবি উম্মুল ফযল (রাঃ) প্রথম মহিলা যিনি হযরত খাদিজার (রাঃ) পর মুসলমান হন।" এ কথা সত্য হলে এ প্রাথমিক মুসলমানদের সংখ্যা ১৩৪ হয়। এ মহিলার প্রকৃত নাম লুবাবা বিন্তে আলহারেস। ইনি উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনার (রাঃ) ভগ্নি। হযরত খালেদ বিন অলীদের (রাঃ) খালা এবং হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবের স্ত্রী আসমা বিন্তে উমাইসের বৈমাত্রেয় ভগ্নি। আমরা এ তালিকায় তাঁর নাম এ জন্যে সন্নিবেশিত করিনি যে–'বলা হয়ে থাকে বা কথিত আছে' দুর্বলভাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে –গ্রন্থকার।

আল্লাহর বাণী হিসাবে নিজেদের জন্যে হেদায়াতের উৎস বলে গণ্য করেন এবং আখেরাতের জীবনকে অকাট্য সত্য বলে মেনে নেন। এ পরিমাণ নিষ্ঠাবান এবং দ্বীনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন কর্মী তৈরী হওয়ার পর হুযুর (সঃ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।[২১]

নির্দেশিকা

১। রাসায়েল ও মাসায়েল –প্রথম খন্ড পৃঃ ২৯
২। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন
৩। তাফহীমুল কুরআন –সূরায়ে আলাকের ভূমিকা
৪। ঐ –আলাম নাশরাহ, টীকা–২
৫। ঐ –শূরা, –টীকা ৮৩
৬। ঐ –সূরায়ে আলাকের ভূমিকা
৭। ঐ ঐ
৮। রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খন্ড পৃঃ ২৩২
৯। ঐ ঐ পৃঃ ২২৯–৩২
১০। তাফহীমুল কুরআন– কাসাস, টীকা ১০৯
১১। ঐ সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকা
১২। ঐ আলাকা, টীকা ১–৬
১৩। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন
১৪। তাফহীমুল কুরআন –কদর, টীকা–১
১৫। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন
১৬। তাফহীমুল কুরআন– সূরা মুদ্দাস্‌সিরের ভূমিকা
১৭। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন
১৮। তাফহীমুল কুরআন, কিয়ামাহ টীকা–১১
১৯। ঐ – আ'লা,টীকা–৭
২০। ঐ – তা–হা, টীকা ৯১, কিয়ামা –১১, আ'লা–৭
২১। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন

পঞ্চম অধ্যায়

দাওয়াতের জন্যে যে হেদায়াত নবীকে (সঃ) দেয়া হয়

গোপন তবলিগের প্রাথমিক তিন বছরের অবস্থা আমরা বর্ণনা করেছি। এখন সাধারণ দাওয়াতের দশ বৎসর কালীন মক্কী যুগের ইতিহাস বর্ণনা করার পূর্বে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে বলে দেয়া প্রয়োজনীয় বোধ করছি। এর ফলে পরবর্তীকালের ঘটনাগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, নবীকে (সঃ) রেসালতের দায়িত্ব পালনের কি হেদায়াত দেয়া হয়েছিল যা এতোটা ফলপ্রসূ ছিল যে তা মানুষের মন জয় করে ফেল্লো, মনের বক্রতা দূর করে দিল এবং একটি অসভ্য বর্বর জাতিকে একেবারে বদলে দিল?

দ্বিতীয় এই যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রকৃত ধরনটা কি ছিল যার জন্যে নবী (সঃ) এর বিরুদ্ধে এমন বিরোধিতার ঝড় উঠলো যা আরবে নিছক শির্ক অস্বীকারকারী এবং তওহীদ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনদিন উঠেনি? কিন্তু এ দাওয়াত কিরূপ বলিষ্ঠভাবে পেশ করা হয় যে জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীদেরকে শেষ পর্যন্ত অসহায় ও শক্তিহীন করে ফেলে?

এ অধ্যায়ে আমরা প্রথম বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করব এবং দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর উপর পরবর্তীঅধ্যায়ে।(১)

প্রাথমিক দাওয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ তায়ালা আরবের বিখ্যাত কেন্দ্রীয় শহর মক্কায় তাঁর এক বান্দাহকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) পয়গম্বরীর কাজে বেছে নেন এবং আপন শহর ও গোত্রের মধ্যে দাওয়াতী কাজের সূচনা করার নির্দেশ দেন। এ কাজ শুরু করার জন্যে প্রথমে যেসব হেদায়াতের প্রয়োজন ছিল তাই দেয়া হয় এবং তা ছিল তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এক–পয়গম্বরকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান যে, তিনি স্বয়ং নিজেকে এ বিরাট কাজের জন্যে কিভাবে তৈরী করবেন এবং কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করবেন।

দুই–প্রকৃত ব্যাপারের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে ঐসব ভুল ধারণার খন্ডন যা আশপাশের লোকের মধ্যে পাওয়া যেতো যার কারণে তাদের আচরণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

তিন–সঠিক আচরণের প্রতি আহ্বান এবং হেদায়াতে–এলাহীর ঐসব বুনিয়াদী নৈতিক মূলনীতির বর্ণনা যার অনুসরণে মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভ হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ের এসব পয়গাম ছোটো ছোটো ও সংক্ষিপ্ত কথায় দেয়া হতো। ভাষা হতো অত্যন্ত মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ, মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। যাদেরকে সম্বোধন করা হতো তাদের রুচিসম্মত সাহিত্যিক ভাষায় কথা বলা হতো, যাতে করে তা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে, কথার সুর লালিত্যে কর্ণকুহর আকৃষ্ট হতে পারে এবং তার সুসংহতি ও সুষমতার কারণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা বার বার আবৃত্ত করতে থাকে। তারপর এসব কথা ও আলোচনায়

স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির উল্লেখ ছিল খুব বেশী। যদিও প্রচার করা হচ্ছিল বিশ্বজনীন সত্যতা, কিন্তু তার জন্যে যুক্তি প্রমাণ সাক্ষ্য ও দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছিল এমন নিকটতম পরিবেশ থেকে যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল সেসব লোক যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হচ্ছিল। তাদেরই ইতিহাস ঐতিহ্য, তাদেরই প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ করা পুরানিদর্শন ও ধ্বংসাশেষ এবং তাদেরই আকীদাহ্ বিশ্বাস ও নৈতিক এবং সামাজিক অনাচার সম্পর্কেই যাবতীয় আলোচনা হতো যাতে করে তার থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো।

দাওয়াতের এ প্রাথমিক পর্যায় প্রায় চার পাঁচ বছর যাবত ছিল যার প্রথম তিন বছর ছিল গোপন আন্দোলনের স্তর। এ পর্যায়ে নবী (সঃ) এর দাওয়াত ও তবলিগের প্রতিক্রিয়া তিনটি আকারে প্রকাশ লাভ করে।

(১) কতিপয় সৎ ব্যক্তি এ দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলিম–উম্মাহ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়

(২) অজ্ঞতা ও ব্যক্তিস্বার্থের দরুন অথবা পূর্বপুরুষদের দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দরুন বিরাট সংখ্যক লোক বিরোধিতার জন্যে অগ্রসর হয়।

(৩) মক্কা ও কুরাইশদের গন্ডি অতিক্রম করে এ নতুন দাওয়াতের আওয়াজ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পরিমন্ডলে পৌঁছে যায়।

এখন থেকে এ দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এ পর্যায়ে ইসলামের এ আন্দোলন এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের মধ্যে এক প্রাণান্তকর সংঘাত সংঘর্ষ শুরু হয় যা আট নয় বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। শুধু মক্কা এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যেই নয়, বরঞ্চ আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে যারা প্রাচীন জাহেলিয়াত অক্ষুণ্ন রাখতে চাইতো। তারা বল প্রয়োগে এ আন্দোলন নসাৎ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। এ কাজের জন্যে তারা সকল প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করে মিথ্যা প্রচারণা চালায়; অভিযোগ, সন্দেহ সংশয়, ত্রুটি অনুসন্ধান ও কঠোর সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের মনে বিভিন্ন রকমের প্ররোচনা দান ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। অপরিচিত লোকদেরকে নবী (সঃ) এর কথা শুনতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হতো। ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর অমানুষীক জুলুম নির্যাতন করা হতো। তাঁদের সাথে আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। তাঁদের জীবন এতোটা অতীষ্ঠ করে তোলা হয় যে, দু'বার তাঁরা ঘরদোর ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন। অবশেষে তাঁদের সকলকে তৃতীয়বার মদীনায় হিজরত করতে হয়। কিন্তু এ ধরনের কঠোর ও নিত্যনতুন প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রসার লাভ করতে থাকে। মক্কা এমন কোন পরিবার এবং এমন কোন গৃহ ছিলনা যার কোন না কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলনা। অধিকাংশ ইসলাম বিরোধীদের শত্রুতাপূর্ণ আচরণে কঠোরতা ও তিক্ততার কারণ এই ছিল যে তাদের নিজেদের ভাই, ভাইপো, পুত্র, কন্যা, ভগ্নি, জামাতা প্রভৃতি ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীই নন বরঞ্চ ইসলামের উৎসর্গীত সহায়ক শক্তি হয়ে পড়েছিলেন। তাদের রক্তমাংসের আপন জনগণও তাদের বিরুদ্ধে লড়তে তৈরী হলো। মজার ব্যাপার এই যে– যাঁরা পুরাতন জাহেলিয়াতের ঘনো আঁধার থেকে বেরিয়ে এ নতুন আন্দোলনে যোগদান করছিলেন, তাঁরা আগেও সমাজের সবচেয়ে সৎলোক ছিলেন এবং এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার পর তাঁরা এতোটা সত্যনিষ্ঠ ও পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতেন যে, দুনিয়া সে আন্দোলনের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করে পারতোনা যে এমন মহৎ ব্যক্তিদেরকে তার দিকে আকৃষ্ট করতো এবং তাদেরকে এমন মহৎ বানিয়ে দিত।

এ দীর্ঘ ও কঠোর সংঘাত– সংঘর্ষ চলাকালে আল্লাহতায়ালা সুযোগ ও প্রয়োজন মতো

এমন উত্তেজনাময়ী ভাষণ নাযিল করতে থাকেন– যার মধ্যে ছিল যেন নদীর প্রবাহ, বন্যার শক্তি এবং প্রচন্ড আগুনের প্রভাব। এসব ভাষণে একদিকে আহলে ঈমানদেরকে তাঁদের প্রাথমিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে দেয়া হয়, তাঁদের মতে দলবদ্ধ জীবন যাপনের অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়। তাঁদেরকে তাক্ওয়া, চরিত্রের মহত্ব এবং পবিত্র জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়া হয়। তাঁদেরকে দ্বীনে হকের প্রচার প্রদ্ধতি বলে দেয়া হয়। সাফল্যের প্রতিশ্রুতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দ্বারা তাঁদের জন্যে সাহস সঞ্চার করা হয়। তাদেরকে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। জীবন বিলিয়ে দেয়ার এমন উদ্দীপনা ও ভাবাবেগ তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় যে, তারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে এবং বিরোধিতার বিরাট ঝড়–ঝঞ্জার মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়।

অপরদিকে বিরোধীগণ এবং সত্যপথ প্রত্যাখানকারী ও অবহেলায় কাল যাপনকারীদেরকে ঐসব জাতির পরিণাম থেকে সতর্ক করে দেয়া হয় যাদের ইতিহাস তাদের জানা ছিল। ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয় যেসব দিনরাত তাঁদের সফরে তারা অতিক্রম করে যেতো। এমন সব সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী থেকে তাওহীদ ও আখেরাতের যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হতো যা রাতদিন আসমান ও যমীনে তাদের চোখের সামনে ভাসতো। যেগুলোকে তারা স্বয়ং নিজেদের জীবনেও সর্বদা দেখতো এবং অনুভব করতো। শির্ক, স্বেচ্ছাচারিতা, আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাস এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ প্রীতির ভ্রান্তিসমূহ সুস্পষ্ট যুক্তি দ্বারা তাদের সামনে তুলে ধরা হতো যা তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতো। তাদের এক একটি সন্দেহ সংশয় দূর করা হয়, এক একটি অভিযোগের ন্যায়সংগত জবাব দেয়া হয়। যেসব বিভ্রান্তিতে তারা ভুগছিল এবং অপরের মধ্যে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছিল তার এক একটি দূর করে দেয়া হয়। জাহেলিয়াতকে এমন অন্তঃসারশূন্য প্রতিপন্ন করা হয় যে বুদ্ধি ও বিবেকের দুনিয়ায় কোথাও তার স্থান রইলোনা। সেইসাথে খোদার গজব, কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থা এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়ও তাদেরকে দেখানো হয়। তাদের অসৎ চরিত্র, ভ্রান্ত জীবনধারা, জাহেলী রীতিনীতি, সত্যের বিরোধিতার জন্যে এবং ঈমান আনয়নকারীকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়। নীতি নৈতিকতা ও তামাদ্দুনের সেসব বুনিয়াদী মূলনীতি তাদের সামনে পেশ করা হয় যার ভিত্তিতে আবহমান কাল থেকে খোদার মনোনীত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ সভ্যতার পত্তন হয়ে আসছে।

এ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তর ছিল এবং প্রতিটি স্তরে দাওয়াত ব্যাপকতর হতে থাকে। সংগ্রাম ও প্রতিবন্ধকতা কঠোরতর হতে থাকে। মুসলমানগণ বিভিন্ন আকীদাহ বিশ্বাস ও আচরণের লোকদের সম্মুখীন হতে থাকেন এবং তদনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত পয়গামগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতাও বাড়তে থাকে।[২]

ইসলামী দাওয়াতের এ বিরাট কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে নবীকে (সঃ) যে বিস্তারিত হেদায়াত দেয়া হয় সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মক্কার কঠিন বিরোধিতার যুগে কোন্ বিরাট নৈতিক শক্তি ইসলামী তবলিগের জন্যে অগ্রসর হওয়ার পথ পরিষ্কার করে এবং কোন্ ফলপ্রসূ শিক্ষা এ তবলিগ প্রভাবিত লোকদেরকে খোদার পথে সকল শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে এবং প্রত্যেক বিপদ মুসিবত বরণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। নিম্নে আমরা এসব হেদায়াত এক একটি করে বর্ণনা করছি।

দাওয়াতে হিকমত ও উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - (النحل: ١٢٥)

হে নবী তোমার রবের পথে আহ্বান জানাও হিকমত এবং উত্তম উপদেশসহ (নহল ঃ ১২৫)। হিকমতের অর্থ এই যে, নির্বোধের ন্যায় কোন বাছবিচার না করেই তবলিগ করা নয়, বরঞ্চ বুদ্ধিমত্তার সাথে দ্বিতীয় পুরুষের মনমানসিকতা, যোগ্যতা ও অবস্থা উপলব্ধি করার পর সুযোগমত কথা বলা। সব ধরনের লোকের সাথে একই ধরনের প্রকাশভংগীতে আলাপ আলোচনা না করা। যে ব্যক্তি বা দলের প্রতি তবলিগ করতে হবে, প্রথমে তার বা তাদের রোগ নির্ণয় করতে হবে। তারপর এমন যুক্তি প্রমাণসহ সে রোগের চিকিৎসা করতে হবে যা তাদের অন্তরের গভীর প্রদেশ থেকে সে ব্যাধি নির্মূল করে দিতে পারে।

উত্তম উপদেশের দুটি অর্থ। এক এই যে দ্বিতীয় পুরুষকে শুধু যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চিন্ত করলেই যথেষ্ট হবেনা। বরঞ্চ তার ভাবাবেগের প্রতিও আবেদন রাখতে হবে। পাপাচার, অনাচার ও পথভ্রষ্টতা শুধু যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করা নয় রবঞ্চ মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে তার জন্যে যে জন্মগত ঘৃণা দেখতে পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তার ভয়াবহ পরিণামের ভয় প্রদর্শন করতে হবে। হেদায়েত ও সৎ কাজের সত্যতা ও গুণাবলী শুধু যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ তার প্রতি অনুরাগ ও অভিলাষ সৃষ্টি করতে হবে।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, নসিহত এমন পদ্ধতিতে দিতে হবে যেন তার মধ্যে দুঃখকাতরতা ও শুভাকাংখা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ যাকে নসিহত দেয়া হচ্ছে, সে যেন এমন মনে না করে যে তাকে তুচ্ছ নগণ্য মনে করা হচ্ছে এবং উপদেশদাতা আপন শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে আনন্দবোধ করছে। বরঞ্চ দ্বিতীয় পুরুষ যেন অনুভব করে যে উপদেশদাতার অন্তরে তার সংশোধনের জন্যে একটা ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা আছে এবং প্রকৃত পক্ষে সে তার মংগলই চায়।

আলাপ আলোচনা যেন তর্কযুদ্ধ ও বুদ্ধির মল্লযুদ্ধে পরিণত না হয়। অন্যায় তর্কবিতর্ক, একে অপরের প্রতি দোষারোপ, পীড়াদায়ক কোন উক্তি ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রভৃতি পরিহার করতে হবে। প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করে দেয়া এবং নিজের বুদ্ধির বাহাদুরি দেখানো যেন উদ্দেশ্য না হয়। বরঞ্চ কথা হবে মিষ্টি মধুর, চরিত্র হতে হবে অতি উন্নত ও সম্ভ্রান্ত মানের। যুক্তি প্রমাণ যেন হয় ন্যায়সংগত ও মনঃপূত। দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যে জিদ, আপন প্রভাব প্রতিপত্তির অনুভূতি এবং হঠকারিতা সৃষ্টি যেন হতে না পারে। সহজ কথায় তাকে বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে। যদি মনে হয় যে, কূটতর্কে নেমে আসছে তাহলে তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে যাতে করে সে অধিকতর গোমরাহিতে লিপ্ত না হয়। (৩)

দাওয়াতে হকের জন্যে ধীরস্থির ও রুচিসম্মত পদ্ধতি

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا - (بنى اسرائيل: ٥٣-٥٤)

–এবং হে মুহাম্মদ (সঃ) আমার বান্দাহদেরকে বলে দাও ঃ তারা যেন এমন কথা বলে যা সবচেয়ে উত্তম। আসলে শয়তান সেই, যে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। প্রকৃত পক্ষে

সে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। তোমাদের রব তোমাদের অবস্থা খুব ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। তিনি চাইলে তোমাদের উপর রহম করতে পারেন এবং চাইলে তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। আর, হে নবী, আমরা তোমাকে লোকের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। (বনী ইসরাইল ঃ ৫৩–৫৪)

অর্থাৎ আহ্‌লে ঈমান, কাফের মুশরিক এবং দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথা বার্তায়, আলাপ আলোচনায় কোন রুক্ষ কর্কশ ভাষা ব্যবহার করবেনা এবং অতিরঞ্জিত করে কোন কথা বলবেনা। বিরুদ্ধবাদীরা যতোই বিরক্তিকর কথা বলুক না কেন মুসলমানদের কোন সময়ের জন্যে সত্যের পরিপন্থী কোন কথা মুখ দিয়ে বের করা উচিত নয় এবং রাগের মাথায় বেহুদা কথার জবাব বেহুদা কথায় দেয়া উচিত নয়, ঠান্ডা মাথায়– মাপজোক করে এমন কথা বলা দরকার যা হবে একেবারে সত্য এবং ইসলামী দাওয়াতের মর্যাদার সাথে সংগতিশীল।

আর যদি তোমরা কখনো অনুভব কর যে, বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দেবার সময় নিজের মধ্যে রাগের আগুন জ্বলছে এবং স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, শয়তান তোমাকে উস্কানি দিচ্ছে যাতে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ নষ্ট হয়ে যায়। তার চেষ্টা হচ্ছে এইযে তোমরাও বিরোধীদের মতো সংস্কার সংশোধনের কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই ঝগড়া বিবাদেই লেগে যাও যার মধ্যে সে (শয়তান) মানব জাতিকে লিপ্ত রাখতে চায়।

আহ্‌লে ঈমানের মুখ থেকে একথা বেরুনো ঠিক নয় যে "আমরা বেহেশ্‌তী এবং অমুক ব্যক্তি বা দল জাহান্নামী"। এ বিষয়ে ফয়সালা করার এখতিয়ার ত আল্লাহতায়ালার। স্বয়ং নবীর কাজও শুধু দাওয়াত দেয়া। লোকের ভাগ্য তার হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি যে তিনি কারো জন্যে রহমত এবং কারো জন্যে শাস্তির ফয়সালা শুনিয়ে দেবেন। (৪)

আহ্বায়কের মর্যাদা ও দায়িত্ব

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ - (الانعام : ١٠٤)

–দেখ তোমার রবের পক্ষ থেকে দৃষ্টিশক্তির আলোক এসে গেছে। এ দৃষ্টিশক্তি যে কাজে লাগাবে সে তার নিজেরই মংগল করবে। আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আমি তোমাদের কোন প্রহরী নই (আনয়াম ঃ ১০৪)।

"আমি তোমাদের প্রহরী নই" –কথার অর্থ এই যে আমার কাজ শুধু এতোটুকু যে সেই আলোক তোমার সামনে পেশ করবো যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। তারপর চোখ খুলে তা দেখা না দেখার কাজ তোমাদের। আমার উপর এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি যে যারা স্বয়ং চোখ বন্ধ করে রেখেছে তাদের চোখ বলপূর্বক খুলে দেব এবং যারা দেখবেনা তাদেরকে জোর করে দেখাবোই। (৫)

اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ، وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - (الانعام: ١٠٢–١٠٧)

–হে নবী (সঃ) সেই অহীর অনুসরণ করে যাও, যা তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। তিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। আর এ মুশরিকদের পেছনে লেগে থেকোনা। যদি আল্লাহর ইচ্ছা এই হতো যে এরা শির্ক না করুক তাহলে এরা শির্ক করতোনা। তোমাকে আমরা তাদের প্রহরা নিযুক্ত করিনি এবং না তুমি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক। (আনয়াম ঃ ১৬–১০৭) –এর অর্থ এই যে তোমাকে আহ্বায়ক ও মুবাল্লিগ বানানো হয়েছে, কোতওয়াল বা পুলিশের কর্তা বানানো হয়নি। তাদের পেছনে লেগে থাকার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার কাজ শুধু এতোটুকু যে লোকের সামনে এ আলোক পরিবেশন কর এবং সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার ব্যাপারে তোমার যতোটুকু শক্তি সামর্থ রয়েছে তার কোন ত্রুটি করোনা। কেউ যদি এ সত্য গ্রহণ না করে তা না করুক। তোমাকে এ কাজের জন্যে আদেশ করা হয়নি যে, মানুষকে সত্যপন্থী করেই ছাড়তে হবে। আর তোমার নবুয়তের গন্ডির ভেতরে কেউ বাতিলপন্থী রয়ে গেলে তার জন্যে তোমাকে জবাবদিহিও করতে হবে না। অতএব কিভাবে অন্ধকে চক্ষুষ্মান বানানো যায় এবং যারা চোখ মেলে দেখতে চায় না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়, অযথা এসব চিন্তা করে নিজকে বিব্রত করোনা। যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হিকমতের দাবীই এটা হতো যে দুনিয়ায় কাউকে বাতিলপন্থী থাকতে দেয়া হবেনা, তাহলে তোমার দ্বারা এ কাজ নেয়ার কি প্রয়োজন আল্লাহর ছিল? তাঁর কি একটি মাত্র সৃজনী ইংগিত গোটা মানবজাতিকে হকপন্থী বানাতে পারতোনা? কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ত মোটেই তা নয়। উদ্দেশ্য এই যে মানুষের জন্যে হক ও বাতিল বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকবে। তারপর হকের আলো তার সামনে পেশ করে তার পরীক্ষা করা যে দুটির মধ্যে সে কোন্‌টি বেছে নিচ্ছে। অতএব তোমার জন্যে সঠিক কর্মপন্থা এই যে, যে আলোক তোমাকে দেখানো হয়েছে তার আলোতে তুমি সোজাপথে চলতে থাক এবং অপরকেও তার দাওয়াত দিতে থাক। যারা এ দাওয়াত কবুল করবে তাদেরকে আপন করে নেবে এবং তাদেরকে কখনো বিচ্ছিন্ন করবেনা। দুনিয়ার চোখে তারা যতোই নগন্য ও তুচ্ছ হোকনা কেন। আর যারা তোমার দাওয়াত কবুল করবেনা তাদের পেছনে লেগে থেকোনা। যে অশুভ পরিণামের দিকে তারা স্বয়ং যেতে চায় এবং যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর, তাদেরকে সেদিকে যেতে দাও। (৬)

তবলিগের সহজ পন্থা

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى • فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى -(الاعلىٰ : ٨ - ٩)

–এবং (হে নবী), আমরা তোমাকে সহজ পন্থার সুযোগ দিচ্ছি। অতএব নসিহত কর যদি নসিহত ফলপ্রদ হয় –(আল্‌–আলা ঃ ৮–৯)।

অর্থাৎ হে নবী, দ্বীনের তবলিগের ব্যাপারে আমরা তোমাকে অসুবিধায় ফেলতে চাইনা যে তুমি বোবাকে কথা শুনাও এবং অন্ধকে পথ দেখাও। বরঞ্চ তোমাকে সহজ পন্থা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছি। তা এই যে, যদি তুমি অনুভব কর যে, কোথাও নসিহত করলে লোক তার থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত তাহলে সেখানে নসিহত কর। এখন প্রশ্ন এই যে, কে তার থেকে সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত এবং কে প্রস্তুত নয়? ত এ কথা ঠিক যে, জনসাধারণের মধ্যে তবলিগ বা প্রচারের মাধ্যমেই তা জানা যাবে। এ জন্যে সাধারণের মধ্যে তবলিগ অব্যাহত রাখতে হবে। তবে তার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, আল্লাহর বান্দাহদের মধ্য থেকে তাদেরকে তালাশ করে বের করতে হবে যারা–এর সুযোগ গ্রহণ করে সত্য পথ অবলম্বন করবে। এসব লোকের

প্রতি তোমার বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি তোমার বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে এমন লোকের পেছনে তোমার সময় নষ্ট করা উচিত নয়, যাদের সম্পর্কে তোমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তারা তোমার নসিহত গ্রহণ করতে চায়না।(৭)

তবলিগে ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্ব কাদের

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - (الانعام : ٥٢)

– এবং হে নবী, যারা তাদের রবকে রাত দিন ডাকে এবং তাঁর সন্তোষ লাভের অভিলাষী, তাদেরকে তোমার থেকে দূরে নিক্ষেপ করোনা। তাদেরকে যেসব বিষয়ের হিসাব দিতে হবে তার কোনটার বোঝা তোমার উপরে নেই এবং তোমার যেসব বিষয়ে হিসাব দিতে হবে তার কোনটির বোঝা তাদের উপর নেই। তার পরেও যদি তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ কর তাহলে তুমি জালেম হবে– (আনয়াম ঃ ৫২)।

যারা প্রথমেই রসূলুল্লাহর (সঃ) উপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেক এমন ছিলেন যারা অত্যন্ত গরীব ও শ্রমজীবী ছিলেন। রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি কুরাইশদের বড়ো বড়ো সর্দারদের এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে একটা এই ছিল যে, "তোমার চারধারে আমাদের সমাজের যতোসব দাসদাসী ও নিম্নশ্রেণীর লোক জমা হয়েছে।"

তারা উপহাস করে বলতো, "দেখ তার কেমন সম্মানিত সাথী মিলেছে? যেমন বেলাল (রা), আম্মার (রা), সুহাইব (রা), খাব্বাব (রা)। ব্যস্, আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে কি এসব লোকই পেয়েছিলেন যাদেরকে বেছে নেয়া যেতে পারতো?"

ঈমান এনেছিলেন এমন দরিদ্র লোকদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ করেই তারা ক্ষান্ত হতোনা, বরঞ্চ ঈমান আনার পূর্বে তাদের মধ্যে কারো কোন দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ করে করে তারা বলতো, "দেখ, অমুক, যে কাল পর্যন্ত এমন ছিল, এবং অমুক যে এমন এমন কাজ করেছিল আজ তারাও নির্বাচিত সম্মানিত দলভুক্ত"। বস্তুতঃ এ সূরা আনয়ামের ৫৩ আয়াতে তাদের এ উক্তি উধৃত করা হয়েছে– "এরাই কি সেসব লোক আমাদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহর ফযল ও করম হয়েছে?" এ আয়াতে তারই জবাব দেয়া হয়েছে। তার অর্থ এই যে, যারা সত্যের অভিলাষী হয়ে তোমার কাছে আসে তাদেরকে এসব বড়ো লোকদের খাতিরে দূরে ঠেলে দিও না। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তারা কোন ভুল ত্রুটি করে থাকলেও তার দায়িত্ব তোমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি।(৮)

হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘটনা

একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে মক্কার কতিপয় প্রভাবশালী সর্দার বসেছিল এবং হুযুর (সঃ) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেন।* এমন সময় ইবনে উম্মে মাকতুম নামে

* হুযুরের (সঃ) দরবারে সেসময়ে যারা বসেছিল, বিভিন্ন বর্ণনায় তাদের নামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ তালিকায় ওতবা, শায়বা, আবু জাহেল, উমাইয়া বিন খালফ, উবাই বিন খালফ্ প্রমুখ চরম ইসলাম দুশমনদের নাম পাওয়া যায়। এর থেকে জানা

জনৈক অন্ধ হুযুরের খেদমতে হাজির হন এবং ইসলাম সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান। তাঁর এ হস্তক্ষেপ হুযুরের মনঃপূত হয়না এবং তিনি তাঁর প্রতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। এ কারণে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সূরা আবাসা নাযিল হয়।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى -

বিরক্ত হলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল এজন্যে যে সে অন্ধ তার কাছে এলো (আবাসা ঃ ১-২)।

দৃশ্যতঃ যে প্রকাশভংগীর দ্বারা কথার সূচনা করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অন্ধের প্রতি অবহেলা এবং বড়ো বড়ো সর্দারদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার জন্যে এ সূরায় নবী (সঃ) এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সূরাটি নিয়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তাভাবনা করলে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে ঐসব কুরাইশ সর্দারদের উপর যারা গর্ব অহংকার, হঠকারিতা এবং সত্য বিমুখতার কারণে রসূলুল্লাহর (সঃ) সত্যপ্রচারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। নবীকে (সঃ) তবলিগের সঠিক পন্থা বলে দেয়ার সাথে সাথে সেই পদ্ধতির ক্রটিবিচ্যুতিও বুঝিয়ে দেয়া হয় যা তিনি কাজের সূচনায় অবলম্বন করেছিলেন। একজন অন্ধের দিক থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং কুরাইশ সর্দারদের প্রতি মনোযোগ প্রদান এজন্যে ছিলনা যে তিনি বড়ো লোকদেরকে সম্মানিত এবং অন্ধকে তুচ্ছ নগণ্য মনে করতেন, এবং (মায়াযাল্লাহ) কোন রুক্ষতা তাঁর মেজাজের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল যার জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁকে পাকড়াও করেন। বরঞ্চ ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে ছিল এই যে, একজন দায়ী (আহ্বায়ক) যখন তার দাওয়াতের সূচনা করে তখন স্বভাবতঃই তার প্রবণতা এই হয় যে সমাজের প্রভাবশালী লোক তার দাওয়াত কবুল করুক যাতে কাজ সহজ হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তিহীন, অথর্ব অকর্মণ্য অথবা দুর্বল লোকদের মধ্যে দাওয়াতের প্রসার ঘটলেও তাতে কিছু যায় আসেনা। দাওয়াতের সূচনায় প্রায় এ কর্মপদ্ধতিই রসূলুল্লাহ (সঃ) অবলম্বন করেছিলেন। পরিপূর্ণ এখলাস (নিষ্ঠা) এবং দাওয়াতে হকের প্রসার ঘটাবার প্রেরণাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, বড়ো লোকদের সম্মান শ্রদ্ধা করার এবং ছোটদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার চিন্তাধারণা তাঁর ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি এটা নয়। বরঞ্চ এ দাওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির গুরুত্ব রয়েছে যে হকের প্রত্যাশী। সে যে ধরনেরই দুর্বল,প্রভাব প্রতিপত্তিহীন অথবা অকর্মণ্য হোক না কেন। আর এমন ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই, যে সত্যবিমুখ, তা সে সমাজের যতোবড়ো প্রভাবশালী হোকনা কেন। এজন্যে নবী (সঃ) প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ত পরিবেশন করবেনই। কিন্তু তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করার প্রকৃত হকদার তারাই যাদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার আগ্রহ উৎসাহ পাওয়া যায়। নবীর মহান দাওয়াতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয় যদি তাঁর দাওয়াত এমন সব গর্বিত লোকের কাছে পেশ করা হয়, যারা গর্বভরে এ কথা মনে করে যে গরজ তাদের নয়, বরঞ্চ তার (নবীর)।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى
فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ
يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى - كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ -

---

যায় যে, এ ঘটনা তখন ঘটে যখন এদের সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর মেলামেশা হতো এবং সংঘাত-সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলনা যে তাঁর কাছে তাদের যাতায়াত এবং দেখা সাক্ষাত একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল -(গ্রন্থকার)।

–হে নবী (সঃ), তুমি কি জান, হয়তো তার সংশোধন হবে অথবা নসিহতের প্রতি মনোযোগ দেবে এবং নসিহত তার জন্যে ফলদায়ক হবে? যে কোন পরোয়াই করেনা তাদের প্রতি তুমি মনোযোগ দিচ্ছ। অথচ তাদের সংশোধন না হলে তোমার উপর তার কি দায়িত্ব? আর যে ব্যক্তি স্বয়ং তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত–শংকিত হয়, তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। কখনোও না। এ ত নসিহত। যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করুক–(আবাসা ঃ ৩–১২)।

এটা সেই মূল সূক্ষ্ম কৌশল যা নবী (সঃ) তবলিগে দ্বীনের ব্যাপারে এখানে উপেক্ষা করেছিলেন এবং একথা বুঝাবার জন্যে আল্লাহতায়ালা প্রথমে ইবনে মাকতুমের সাথে নবী (সঃ) এর আচরণের সমালোচনা করলেন। তারপর বল্লেন যে সত্যের আহ্বায়কের দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্ব কার প্রতি দেয়া উচিত এবং কার প্রতি উচিত নয়। এক হচ্ছে, সে ব্যক্তি যার বাহ্যিক অবস্থা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে সে সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্যের অভিলাষী। সে সর্বদা শংকিত যে কি জানি বাতিলের অনুসরণ করে সে খোদার বিরাগভাজন হয়ে না পড়ে। এজন্যে সে সত্য ও সঠিক পথের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। দ্বিতীয় সে ব্যক্তি যার আচরণ স্পষ্টতঃ বলে দিচ্ছে যে তার মধ্যে সত্যের কোন অনুসন্ধিৎসা নেই। বরঞ্চ সে নিজেকে কারো মুখাপেক্ষীই মনে করেনা যে তাকে সত্য সঠিক পথ দেখানো হোক। এ দু ধরনের লোকের মধ্যে এটা দেখার বিষয় নয় যে কে ঈমান আনলে তা দ্বীনের জন্যে খুবই কল্যাণকর হবে এবং কার ঈমান দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তেমন ফলদায়ক হবেনা। বরঞ্চ দেখার বিষয় এই যে কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে প্রস্তুত এবং কে এ অমূল্য সম্পদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল নয়। প্রথম ধরনের লোক অন্ধ হোক, খঞ্জ হোক, পংগু অথবা নিঃস্ব হোক অথবা দৃশ্যতঃ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য খেদমত করার যোগ্য না হোক, কিন্তু সেই হকের আহ্বায়কের জন্যে এক মূল্যবান ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিই মনোযোগ দেয়া উচিত। কারণ এ দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাহদের সংস্কার সংশোধন। এ ব্যক্তির অবস্থা এই যে তাকে নসিহত করলে সে সংস্কার সংশোধন মেনে নেবে। এখন রইলো দ্বিতীয় ধরনের ব্যক্তি। ত সে ব্যক্তি সমাজে যতোই প্রভাব প্রতিপত্তিশীল হোক না কেন তার পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তার আচরণ প্রাকশ্যেই এ কথা ঘোষণা করছে যে, সে নিজেকে সংশোধন করতে চায়না । এজন্যে তার সংশোধনের চেষ্টায় সময় ব্যয় করা সময়ের অপচয় মাত্র। সে যদি পরিশুদ্ধ হতে না চায় ত পরিশুদ্ধ না হোক। পরিণামে ক্ষতি তার হবে, তার কোন দায় দায়িত্ব সত্যের আহ্বায়ককে বহন করতে হবেনা।

যে অন্ধের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি একজন মশহুর সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ)। হাফেজ ইবনে আবদুল বার তাঁর আল ইস্তিয়াবে এবং হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল্–ইসাবা'তে বলেন যে, ইনি উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজার (রাঃ) ফুফাতো ভাই ছিলেন। তাঁর মা উম্মে মাকতুম এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) পিতা খুয়াইলিদ পরস্পর ভাইভগ্নি ছিলেন। হুযুরের (সঃ) সাথে তাঁর এ সম্পর্ক জানার পর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা যে তিনি তাঁকে দরিদ্র অথবা নিম্ন পদমর্যাদার লোক মনে করে তাঁকে উপক্ষো করেছেন এবং বড়োলোকদের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। কারণ ইনি ছিলেন হুযুরের (সঃ) শ্যালক এবং স্বগোত্রীয় লোক। কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিলেননা। যে জন্যে হুযুর (সঃ) তাঁর সাথে এ আচরণ করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ (أعمى। অন্ধ) শব্দ থেকেই জানা যায়। আর এটাকেই নবীর অযত্ন–অবহেলার কারণ বলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হুযুরের (সঃ)

ধারণা এই ছিল যে এখন তিনি যেসব লোককে সৎপথে আনার চেষ্টা করছিলেন তাদের মধ্যে যেকোন একজন হেদায়েত লাভ করলে তা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির বিরাট কারণ হতে পারে। অপর দিকে ইবনে মাকতুম একজন অন্ধব্যক্তি। তিনি তাঁর অপারগতার জন্যে ইসলামের জন্যে ততোটা ফলদায়ক হবেননা যতোটা হতে পারে এসব সর্দারদের মধ্যে কোন একজন মুসলমান হলে। এজন্যে এ সময়ে কথাবার্তায় হস্তক্ষেপ করা তাঁর উচিত নয়। তিনি যা কিছু বুঝাতে ও জানতে চান তা এরপর যে কোন সময়ে জানতে বুঝতে পারেন।(৯)

তবলিগের হিকমত

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - (العنكبوت : ٤٦)

–এবং আহলে কিতাবদের সাথে তর্কবিতর্ক করোনা। কিন্তু (করলে) উত্তম পন্থায় কর (আনকাবূত ঃ ৪৬)। অর্থাৎ তর্কবিতর্ক বা আলাপচারি ন্যায়সংগত যুক্তি প্রমাণসহ এবং অত্যন্ত ভদ্র ও শালীন ভাষায় হতে হবে। পারস্পরিক বুঝাপড়ার মনমানসিকতাসহ হতে হবে। যাতে করে প্রতিপক্ষের চিন্তাচেতনার সংশোধন হয়। মুবাল্লিগের এ বিষয়ে চিন্তা থাকা উচিত যে সে যেন দ্বিতীয় পুরুষের মনের দুয়ার উন্মুক্ত করে সেখানে সত্যকথা পৌছিয়ে দিতে পারে এবং তাকে সঠিক পথে আনতে পারে।

একজন পালোয়ানের মতো লড়াই করা তার ঠিক নয় যে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হবে। বরঞ্চ তাকে একজন চিকিৎসকের মতো রোগের চিকিৎসা করতে হবে। একজন চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসাকালে সর্বদা এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে যে, তার কোন ভুলের কারণে যেন রোগীর রোগ আরও বেড়ে না যায়। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে যে যতো কম কষ্টের মধ্যে সম্ভব যেন রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়। এখানে স্থান কাল পাত্র হিসাবে আহলে কিতাবদের সাথে আলোচনার ব্যাপারে এ হেদায়েত দেয়া হয়েছে বটে। কিন্তু এ শুধু আহলে কিতাবদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। বরঞ্চ তবলিগে দ্বীনের ব্যাপারে এ এক সাধারণ হেদায়েত যা কুরআন মজীদে স্থানে স্থানে দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ –

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - (النحل: ١٢٥)

দাওয়াত দাও তোমার রবের পথের দিকে হিকমত এবং উত্তম নসিহতের সাথে এবং লোকের সাথে এবং আলাপ আলোচনা কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম (নমল ঃ ১২৫)।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (حم السجدة : ٣٤)

–ভালো ও মন্দ একরূপ নয়। (প্রতিপক্ষের হামলার জবাবে) প্রতিরোধ এমন পন্থায় করবে যা সর্বোৎকৃষ্ট হবে। ফলে তুমি দেখবে যে, যে ব্যক্তির সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেন সে পরম বন্ধু (হামীম সিজদাহ ঃ ৩৪)।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ -(المؤمنون: ٩٦)

–তুমি অন্যায়কে ভালো পন্থায় প্রতিরোধ কর। আমার জানা আছে সেসব কথা যা তারা তোমার বিরুদ্ধে বলছে (মুমেনুন ঃ ৯৬)। [১০]

দাওয়াতে হকের সঠিক কর্মপন্থা

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ - وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ - (الاعراف : ١٩٩-٢٠٢)

(হে নবী) কোমলতা ও ক্ষমার আচরণ কর এবং ভালো কাজের প্রেরণা দিতে থাক এবং জাহেলদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়োনা। যদি শয়তান কখনো তোমাকে উস্কিয়ে দেয় ত আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। প্রকৃতপক্ষে যারা খোদাভীরু তাদের অবস্থা ত এই হয় যে যদি কখনো শয়তানের কুপ্রভাবে তাদের মধ্যে কোন খারাপ বাসনার উদয় হয়, তখন তৎক্ষনাৎ তারা সজাগ হয়ে পড়ে এবং তারপর তারা স্পষ্ট দেখতে পায় (তাদের সঠিক কর্মপন্থা কি)। এখন রইলো তাদের (শয়তানদের) ভাইবন্ধুগণ। তারা তাদেরকে বক্রতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করে না– (আ'রাফ ঃ ১৯৯–২০২)

এ আয়াতগুলোতে নবীকে (সঃ) দাওয়াত ও তবলিগ এবং হেদায়েত ও সংস্কার সংশোধনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল (হিকমত) শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু হুযুরকেই (সঃ) শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য নয় বরঞ্চ তাঁর মাধ্যমে সকলকে এ হিকমত শিক্ষা দেয়া হয়েছে যাঁরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দুনিয়াবাসীকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ ঃ–

(১) সত্যের আহ্বায়কের যেসব গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন তার মধ্যে একটি এই যে, তাঁকে কোমলপ্রাণ সহনশীল ও উদারচেতা হতে হবে। তাঁকে তার সংগী সাথীদের জন্যে স্নেহশীল, জনসাধারণের জন্যে দয়ালু এবং প্রতিপক্ষের জন্যে সহনশীল হতে হবে। সহযোগীদের দুর্বলতাও উপক্ষো করতে হবে এবং বিরুদ্ধবাদীদের কঠোরতাও। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতেও মেজাজ প্রকৃতিকে শান্ত ও স্বাভাবিক রাখতে হবে। অত্যন্ত অসহনীয় কথাবার্তাও উদারতার সাথে সহ্য করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যতোই শক্ত কথা বলা হোক, অপবাদ অপপ্রচার করা হোক, অন্যায় ও সহিংস প্রতিরোধের ইচ্ছাই প্রকাশ করা হোক না কেন, সবকিছু উপেক্ষা করে চলাই উচিত। কঠোরতা ও রুক্ষতা প্রদর্শন, অভদ্র ও অশোভন উক্তি এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ স্বভাব প্রকৃতি বিষম পরিণাম ডেকে আনে। এতে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, সফল হয় না। বিষয়টিকে নবী (সঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন রাগান্বিত অবস্থায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় যেন আমি সুবিচারপূর্ণ আচরণ করি। যে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তার সাথে যেন আমি সম্পৃক্ত হই। যে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে যেন তার অধিকার দিয়ে দিই। যে আমার উপর জুলুম করে তাকে যেন মাফ করে দিই।

নবী পাক (সঃ) এসব হেদায়েত তাদেরকেও দিতেন যাদেরকে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে দ্বীনের কাজে পাঠাতেন। তিনি বলেন ঃ–

بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا ـ

অর্থাৎ যেখানেই তোমরা যাও তোমাদের আগমন যেন লোকের জন্যে সুসংবাদ বয়ে নিয়ে যায়, ঘৃণার উদ্রেক না করে। লোকের জন্যে তোমরা যেন সুযোগ সুবিধার কারণ হও, সংকীর্ণতা ও কঠোরতার নয়।

আল্লাহতায়ালা এতদসম্পর্কে নবীর (সঃ) সপক্ষে প্রশংসাবাণীই শুনিয়েছেন --

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ـ

–এ আল্লাহ তায়ালার রহমত যে তুমি তাদের প্রতি কোমলপ্রাণ। নতুবা তুমি যদি রুক্ষ প্রকৃতির এবং পাষাণ হৃদয় হতে, তাহলে এসব লোক তোমার চারপাশ থেকে কেটে পড়তো– (আলে ইমারান ঃ ১৫৯)।

(২) দাওয়াতে হকের সাফল্যের পন্থা এই যে, দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে মানুষকে সর্বজন পরিচিত অর্থাৎ ঐসব সহজ সরল ও সুস্পষ্ট মংগল ও কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে যা সকল মানুষ জানে এবং যে কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করার জন্যে সাধারণ জ্ঞান বিবেকই (COMMON SENSE) যথেষ্ট। এভাবে হকের আহ্বায়কের আবেদন সর্বশ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করে এবং শ্রোতার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে সে আবেদন পৌঁছে যায়। এমন সুপরিচিত দাওয়াতের বিরুদ্ধে যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ব্যর্থতাই ডেকে আনে এবং দাওয়াতের সাফল্যের পথ সুগম করে। কারণ সাধারণ লোক– যতোই তারা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হোক না কেন, যখন দেখে যে একদিকে এক পুণ্যাত্মা মহান চরিত্রবান ব্যক্তি সোজাসুজি কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং অপর দিকে বহু লোক তার বিরোধিতায় নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অমানবিক কলাকৌশল ব্যবহার করছে, তখন ক্রমশঃ তাদের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যের বিরোধিতাকারীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের আহ্বায়কের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদের ময়দানে শুধু তারাই রয়ে যায় যাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বাতিল ব্যবস্থার সাথে জড়িত। অথবা যাদের অন্তরে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ ও জাহেলী যুগের বিদ্বেষ কোন সত্যের আলো গ্রহণ করার যোগ্যতাই অবশিষ্ট রাখেনা। এটাই সেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন কলাকৌশল যার বদৌলতে নবী (সঃ) আরবে সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পরে অল্পকালের মধ্যেই ইসলামের প্লাবন অন্যান্য দেশে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে কোথাও শতকরা একশ' এবং কোথাও আশি–নব্বই জন অধিবাসী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

(৩) এ দাওয়াতের কাজে কল্যাণকামীদেরকে সৎকাজে প্রেরণা দান যতোটা জরুরী, ততোটা জরুরী অন্ধলোকদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া– তারা বিতর্কে লিপ্ত করার যতোই চেষ্টা করুক না কেন। সত্যের আহ্বায়ক বা পতাকাবাহীকে এ ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং তিনি শুধু তাদেরকেই সম্বোধন করবেন যারা যুক্তিসম্মত পন্থায় বক্তব্য উপলব্ধি করতে আগ্রহী। আর যদি কেউ অজ্ঞলোকের ন্যায় হঠকারিতা, ঝগড়াবিবাদ ও বিদ্রুপাত্মক আচরণ শুরু করে, তাহলে প্রতিপক্ষের ভূমিকা পালন করতে সত্যের আহ্বায়কের অস্বীকার করা উচিত। কারণ এ বিতর্কে লিপ্ত হয়ে কোন লাভ নেই। বরঞ্চ ক্ষতি এই যে, যে

সময়টুকু তিনি দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার এবং ব্যক্তিচরিত্র গঠনে ব্যয় করতে পারবেন, সে সময়টুকু এ বাজে কাজে অপচয় করা হবে।

(৪) উপরে যা বলা হলো সে প্রসংগেই অতিরিক্ত কথা এই যে, যদি কখনো সত্যের আহ্বায়ক প্রতিপক্ষের জুলুম, দুষ্কৃতি এবং তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনা ও দোষারোপে নিজের স্বভাব প্রকৃতিতে উত্তেজনা অনুভব করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে করা উচিত যে, এ শয়তানের পক্ষ থেকে উস্কানি দেয়া হচ্ছে এবং তক্ষুণি খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত যাতে করে তিনি তার বান্দাহকে ভাবাবেগের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং সে এমন বেশামাল হয়ে না পড়ে যাতে করে দাওয়াতে হকের জন্যে ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ করে না বসে। দাওয়াতে হকের কাজ সকল অবস্থাতে ঠান্ডা মাথাই হতে পারে এবং সে পদক্ষেপই সঠিক হতে পারে যা ভাবাবেগে পরিচালিত হয়ে নয়, বরঞ্চ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে খুব চিন্তা ভাবনা করেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শয়তান যেহেতু এ কাজের প্রসার বরদাশ্‌ত করতে পারেনা, সেজন্যে সে সর্বদা তার অনুসারীদের দ্বারা সত্যের পতাকাবাহীর উপর বিভিন্ন ধরনের হামলা চালাবার চেষ্টা করবে এবং প্রতিটি হামলার দ্বারা সত্যের পতাকাবাহীকে এভাবে উস্কাতে থাকবে যে– হামলার ত জবাব দেয়া উচিত। হকের আহ্বায়কের মনের কাছে শয়তান যে আবেদন পেশ করে তা অধিকাংশ সময়ে বড়ো বড়ো প্রতারণামূলক ব্যাখ্যাসহ এবং ধর্মীয় পরিভাষার পোষাকে আবৃত থাকে। কিন্তু তার পেছনে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু থাকেনা। এ জন্যে উপরে বর্ণিত শেষ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুত্তাকী (অর্থাৎ খোদাভীরু এবং পাপাচার থেকে দূরে থাকার অভিলাষী) তারা তাদের মনের মধ্যে শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন পাপ প্রবণতার স্পর্শ অনুভব করার সাথে সাথেই সজাগ সতর্ক হয়ে যায় এবং তারপর তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে এ অবস্থায় কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করলে দাওয়াতে দ্বীনের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং হকপুরস্তির দাবীই বা কি? অপরদিকে স্বার্থপরতাই যাদের কর্মকান্ডে ক্রিয়াশীল এবং এ কারণে শয়তানদের সাথে যাদের দহরম মহরম, তারা শয়তানী হামলায় টিকে থাকতে পারেনা এবং পরাজয় বরণ করে ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে। তারপর শয়তান তাদেরকে যে যে প্রান্তরে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে সেখানে নিয়ে যায় এবং কোথাও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়না। প্রতিপক্ষের প্রতিটি গালির জবাবে তাদের কাছে একটি করে গালি এবং প্রত্যেকটি কৌশলের জবাবে তাদের কাছে বৃহত্তর কৌশল থাকে।

আল্লাহতায়ালার এ এরশাদের একটা সাধারণ উদ্দেশ্যও আছে। তা হলো এই যে, তাক্‌ওয়া সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মপদ্ধতি সাধারণতঃ তাক্‌ওয়াহীন ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যারা প্রকৃত পক্ষে খোদাকে ভয় করে এবং অন্তর থেকে চায় যে তারা অনাচার পাপাচার থেকে দূরে থাকুক, তাদের অবস্থা এই হয় যে, খারাপ ধারণার একটুখানি স্পর্শ মনে লাগতেই, খচ্‌খচে ব্যথা অনুভব করতে থাকে, যেমন আঙুলে কোন তীক্ষ্ণ সূঁচালো বস্তু ঢুকলে অথবা চোখে সামান্য কিছু পড়লে অনুভূত হয়। যেহেতু সে পাপ চিন্তাধারণা ও কামনা বাসনা এবং খারাপ নিয়তে অভ্যস্ত নয়, সেজন্যে এ সবকিছুই তার স্বভাব প্রকৃতির খেলাপ হয়, যেমন একজন রুচিবান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিলাষী মানুষের কাপড়ে কোন কালির দাগ অথবা ময়লার ছিটে ফোটা তার স্বভাব প্রকৃতির খেলাপ হয়। এ খটকা যখন সে অনুভব করে তখন তার চোখ খুলে যায়, এবং তার বিবেক জাগ্রত হয়ে এসব অন্যায় অনাচারের ধুলিকণা তার থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে লেগে যায়। তার বিপরীত যারা না খোদাকে ভয় করে আর না মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে চায় এবং যাদের শয়তানের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তাদের মনের মধ্যে খারাপ ধারণা

বাসনা, অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য পাকাপোক্ত হতে থাকে এবং এসব নোংরা বিষয়ে তাদের মনে কোন উদ্বেগও সৃষ্টি হয়না। ঠিক যেমন কোন ডেক্‌চীতে শূয়রের মাংস রান্না হচ্ছে কিন্তু ডেকচীর মালিকের খবর নেই যে তার মধ্যে কি রান্না হচ্ছে। অথবা কোন মেথরের শরীর ও জামাকাপড় মলমূত্রে জবজবা কিন্তু তার কোন অনুভূতিই নেই যে, সে কিসের দ্বারা নোংরা ও অপবিত্র হয়ে আছে। (১১)

চরম বিরোধিতার পরিবেশে দাওয়াত ইলাল্লাহ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

(حٰم السجدة : ٣٣)

–ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হবে যে আল্লাহর দিকে ডেকেছে, নেক কাজ করেছে এবং বলেছে "আমি মুসলমান"–(হামীম সিজদাহ ঃ ৩৩)।

এর পূর্বের আয়াতগুলোতে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তারপর এ আয়াতে তাদেরকে সেই আসল কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যার জন্যে তারা মুসলমান হয়েছে। পূর্বের আয়াতগুলোতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তারা যেন আল্লাহর দাসত্ব– আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং এ পথ অবলম্বন করার পর তার থেকে বিচ্যুত না হওয়াটাই বুনিয়াদী নেক কাজ যা মানুষকে ফেরেশ্‌তাদের বন্ধু ও বেহেশ্‌তের অধিকারী বানিয়ে দেয়। এখন তাদেরকে বলা হচ্ছে যে পরবর্তী মর্যাদা, যার চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা মানুষের জন্যে আর নেই, এই যে, সে স্বয়ং নেক আমল করবে এবং অন্যকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাকবে। তারপর যেখানে ইসলামের ঘোষণা করার অর্থ নিজের উপরে বিপদমুসিবতের আহ্বান জানানো, এমন প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ পরিবেশে নির্ভয়ে বলবে,– "আমি মুসলমান – আল্লাহর অনুগত।"

এ এরশাদের পুরোপুরি গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যে সে সময়ের পরিবেশ পরিস্থিতি সামনে রাখতে হবে– যখন এ কথা বলা হয়েছিল। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার ঘোষণা করতো, সে হঠাৎ অনুভব করতো যে সে যেন হিংস্র পশুর বনে প্রবেশ করেছে এবং প্রতিটি হিংস্র পশু তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খেয়ে ফেলার জন্যে দৌড়ে আসছে। এর থেকে অগ্রসর হয়ে যে ব্যক্তি ইসলামের তবলিগের জন্যে মুখ খুলেছে, সে যেন হিংস্র পশুদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে– এসে আমাকে চিবিয়ে গিলে খাও। এমন অবস্থায় বলা হলো যে কোন ব্যক্তির আল্লাহকে প্রভু বলে মেনে নিয়ে সোজা পথ অবলম্বন করা এবং তার চেয়ে বিচ্যুত না হওয়া নিঃসন্দেহে বড়ো বুনিয়াদী নেক কাজ। কিন্তু উচ্চতম পর্যায়ের নেক কাজ এই যে, সে ব্যক্তি জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে–"আমি মুসলমান" এবং পরিনামের কোন পরোয়া না করে মানুষকে আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত দেবে। আর এ কাজ করতে গিয়ে নিজের আমল এতোটা পূতপবিত্র রাখবে যে ইসলাম ও তার পতাকাবাহীদের কোন দোষ ধরার সুযোগ না থাকে। (১২)

মন্দের মুকাবিলা সবচেয়ে ভালো দিয়ে

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - (حٰم السجدة ٣٤)

–হে নবী (সঃ), পুণ্য ও পাপ সমান হয়না। তুমি পাপকে সেই পুণ্যকাজ দিয়ে প্রতিরোধ কর– যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে তুমি দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে তোমার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে– (হামীম সিজদা ঃ ৩৪)।

এ এরশাদের পুরোপুরি মর্ম উপলব্ধি করতে হলে সে অবস্থাকে সামনে রাখতে হবে যে অবস্থায় নবীকে (সঃ) এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীগণকে এ হেদায়েত দেয়া হয়েছিল। অবস্থা এই ছিল যে, দাওয়াতের মুকাবিলা চরম হঠকারিতা এবং চরম আক্রমণাত্মক বিরোধিতার সাথে করা হচ্ছিল। নবী (সঃ) কে বদনাম করার জন্যে এবং তার প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার জন্যে সব ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা হচ্ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছিল। বিরুদ্ধ প্রচারণাকারীর একটা দল নবীর বিরুদ্ধে মানুষের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করতে থাকে। তাঁকে ও তাঁর সংগী সাথীদের উপর নানাপ্রকার নির্যাতন চলাতে থাকে। অতীষ্ঠ হয়ে মুসলমানদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর নবীর তবলিগ বন্ধ করার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয় যে, তারা হৈ হল্লোড় করার জন্যে তাঁর দিকে ওঁত পেতে থাকতো। যখনই তিনি দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে মুখ খুলতেন, তখন তারা এমন হৈ হল্লা করতো যে তাঁর কোন কথাই শুনা যেতোনা। এ এমন এক নিরুৎসাহব্যঞ্জক অবস্থা ছিল যে, দৃশ্যতঃ দাওয়াতের সকল পথই রুদ্ধ বলে মনে হতো। সে সময়ে বিরোধিতার শক্তি চূর্ণ করার জন্যে এ প্রতিকার ব্যবস্থা নবীকে শিখিয়ে দেয়া হয়।

প্রথম কথা এই বলা হয় যে, নেকী ও বদী বা পাপপুণ্য সমান হতে পারেনা। প্রকাশ্যতঃ তোমার বিরুদ্ধবাদীরা অনাচার পাপাচারের যতো প্রচন্ড ঝড়ই সৃষ্ট করুকনা কেন, যার মুকাবিলায় নেকী বা সততা সৎকর্ম একেবারে অসহায়–শক্তিহীন মনে হয়, কিন্তু মানুষ যতোক্ষণ মানুষ বলে বিবেচিত হবে, তার স্বভাব প্রকৃতি অনাচার পাপাচারের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করে পারেনা। পাপাচারের সহযোগীই নয়, বরঞ্চ তার পতাকাবাহী স্বয়ং অন্তরে এ কথা বিশ্বাস করে যে সে মিথ্যাবাদী এবং জালেম এবং আপন স্বার্থের জন্যেই হঠকারিতা করে চলেছে। এতে করে অপরের অন্তরে তার জন্যে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা ত দূরের কথা, স্বয়ং নিজেদের চোখেই নিজেদেরকে হেয় করা হয় এবং তাদের নিজেদের মনের মধ্যেই একটা ভীতি লুক্কায়িত থাকে যা বিরোধিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় তাদের সাহস ও সংকল্পকে ভেতর থেকে আঘাত করতে থাকে। এ দুষ্কর্মের মুকাবিলায় যদি সেই সৎকর্ম অনবরত অব্যাহত থাকে, তাহলে অবশেষে তা বিজয়ী হয়েই থাকে। কারণ সৎকর্মের মধ্যে স্বয়ং একটি শক্তি থাকে যা মনকে বশীভূত করে এবং মানুষ যতোই অধঃপতিত হোক না কেন, আপন মনে তার জন্যে শ্রদ্ধা অনুভব না হয়েই পারেনা। তারপর যখন পাপ ও পুণ্য সংগ্রামরত হয় এবং উভয়ের গুণাগুণ জনসাধারণের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, তখন এমতাবস্থায় কিছুকাল যাবত সংঘাত সংঘর্ষের পর এমন লোক খুব কমই থাকে যে পাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও পুণ্যের প্রতি অনুরক্ত হয় না।

দ্বিতীয় কথা এ বলা হয়েছে যে, পাপের মুকাবিলা শুধু পুণ্যের দ্বারা নয়, এমন পুণ্যের দ্বারা করতে হবে– যা খুবই উচ্চমানের হয়। অর্থাৎ কেউ যদি আপনার সাথে অসৎ ব্যবহার করে এবং আপনি তাকে ক্ষমা করে দেন তাহলে এ নিছক একটা নেক কাজ হলো। অতি উচ্চমানের নেক কাজ এই যে, যে আপনার সাথে অসদাচরণ করলো, আপনি সুযোগ হলে তার সাথে সদাচরণ করুন।

তার সুফল এই বলা হয়েছে যে, চরম দুশমনও পরম বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ, এই হলো মানবীয় প্রকৃতি। গালির জবাবে নীরব থাকলে নিঃসন্দেহে একটি নেক কাজ হবে। কিন্তু এতে গালিদানকারীর মুখ বন্ধ করা যাবেনা। কিন্তু যদি আপনি গালির জবাবে তার জন্যে দোয়া করেন তাহলে আপনার চরম নির্লজ্জ দুশমনও লজ্জিত হয়ে পড়বে এবং কদাচিৎ হয়তো সে আপনার বিরুদ্ধে মুখ খুলবে। ধরুন, কোন ব্যক্তি আপনার ক্ষতি করার জন্যে কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনা এবং আপনি তার বাড়াবাড়ি বরদাশ্‌ত করেই চল্লেন, তাহলে এমনও হতে পারে যে সে আপনার ক্ষতি করার জন্যে অধিকতর সাহসী হয়ে পড়বে। কিন্তু যদি কখনো এমন হয় যে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এবং আপনি তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করলেন, তাহলে সে আপনার পায়ে পড়ে যাবে। কেননা কোন দুষ্কৃতি এ সুকৃতির মুকাবিলায় খুব কমই টিকে থাকতে পারে। তথাপি এ সাধারণ নীতি পদ্ধতি এ অর্থে গ্রহণ করা সঠিক হবেনা যে এ উচ্চ পর্যায়ের সুকর্ম–সুকৃতি অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক চরম দুশমনকে পরম বন্ধুতে পরিণত করবে। দুনিয়ায় এমন ইতর প্রকৃতির লোকও আছে যে, আপনি তার বাড়াবাড়ি ক্ষমা করার এবং তার মন্দের জবাব সদাচরণ সহ দেয়ার যতোই মহত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, সে বিচ্ছুর ন্যায় বিষাক্ত হুল্ ফুটাতে ক্ষুণ্ণ হবেনা। কিন্তু এ ধরনের দুষ্কৃতির মূর্তপ্রতীক মানুষ খুব কমই পাওয়া যায় যেমন কল্যাণের মূর্ত প্রতীক মানুষের অস্তিত্ব অতি নগণ্য হয়ে থাকে। (১৩)

দাওয়াতে হকে ধৈর্যের গুরুত্ব

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ - (حٰمٓ السجدة : ٣٥)

অতঃপর এরশাদ হলো–

–"এ গুণাবলীর সৌভাগ্য হয় শুধু তাদের যারা সবর করে এবং এ মর্যাদালাভ শুধু তারাই করতে পারে– যারা বড়ই সৌভাগ্যবান– (আয়াত ঃ ৩৫)।

অর্থাৎ এ ব্যবস্থাপত্রও বড়ো ফলপ্রসূ। কিন্তু তার প্রয়োগ যেমন তেমন কথা নয়। তার জন্যে প্রয়োজন বিরাট মনোবলের। তার জন্যে বিরাট সংকল্প, সাহসিকতা, ধৈর্যশক্তি এবং আপন প্রবৃত্তির উপর বিরাট আধিপত্যের প্রয়োজন। সাময়িকভাবে এক ব্যক্তি কোন দুষ্কৃতির মুকাবিলায় ভালো কাজ করতে পারে। এ অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু যেখানে কাউকে বছরের পর বছর ধরে এমন সব বাতিলপন্থী দুষ্কৃতিকারীদের মুকাবিলায় সত্যের জন্যে লড়তে হয় যারা নৈতিকতার কোন সীমা লংঘন করতে ইতস্ততঃ করেনা এবং ক্ষমতা মদমত্ত হয়ে থাকে, সেখানে দুষ্কর্মের মুকাবিলা সৎকর্ম দিয়ে করে যাওয়া এবং তাও উচ্চমানের সৎকর্ম দিয়ে, এবং একবারও ধৈর্যচ্যুত না হওয়া–কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ সে ব্যক্তিই করতে পারে, যে ঠান্ডা মাথায় হকের সমুন্নতির জন্যে কাজ করার দৃঢ় সংকল্প পোষণ করে। যে ব্যক্তি পুরোপুরি তার প্রবৃত্তিকে জ্ঞানবুদ্ধি–বিবেকের অধীন করেছে, যার মধ্যে সাধুতা–সততার মূল এতো গভীরভাবে প্রোথিত যে বিরোধীদের কোন দুষ্কৃতি নোংরামি তাকে তার উচ্চ স্থান থেকে নীচে নামিয়ে আনতে এবং ধৈর্যহারা করে ফেলতে পারেনা।

তারপর এইযে বলা হয়েছে, "এ মর্যাদা শুধু তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ো সৌভাগ্যবান।" ত এ হলো প্রাকৃতিক বিধান। বিরাট মর্যাদাশীল লোকই এসব গুণে গুনান্বিত হয়। আর যাদের এসব গুণাবলী থাকে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে–রুখতে পারেনা। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, ইতর শ্রেণীর লোক তাদের ইতরামি,

ঘৃণ্য কলাকৌশল এবং অভদ্র আচরণের দ্বারা তাকে পরাভূত করতে পারবে। (১৪)

শয়তানের উস্কানি থেকে খোদার আশ্রয়

শেষে বলা হয়েছে–

وَ اِمَّا يَنۡزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيۡطَانِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ ـ (حٰمٓ السجدة : ٣٦)

আর শয়তানের পক্ষ থেকে যদি কোন উস্কানি অনুভব কর তাহলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর (আয়াত ঃ ৩৬)

শয়তান ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যখন সে দেখে যে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বে ইতরামির মুকাবিলা ভদ্রতার দ্বারা এবং দুষ্কৃতির মুকাবিলা সুকৃতির দ্বারা করা হচ্ছে। সে চায় যে কোন প্রকারে একবার হলেও সত্যের জন্যে সংগ্রামকারী তাদের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান পরিচালক কোন না কোন ভুল করে ফেলুক যার ভিত্তিতে জনগণকে বলা যাবে যে, দেখ তালি এক হাতে বাজেনা। এক পক্ষ থেকে যদি কিছু মন্দ আচরণ করা হয়েই থাকে, ত অন্য পক্ষও এমন ভালো মানুষ নয়। অমুক অভদ্র আচরণ ত তারাও করেছে। সাধারণ মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে, তারা সুবিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে একপক্ষের বাড়াবাড়ি এবং অপরপক্ষের পাল্টা পদক্ষেপের মধ্যে কোন তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করতে পারবে। যতোক্ষণ তারা দেখতে থাকে যে বিরুদ্ধবাদীরা সবরকমের নীচতা অবলম্বন করছে, কিন্তু প্রতিপক্ষ ভদ্রতা, শালীনতা ও সততা ধার্মিকতার পথ থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হচ্ছেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত জনগণ এর দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। কিন্তু যদি কোথাও এদের পক্ষ থেকে কোন অন্যায় আচরণ অথবা এদের মর্যাদার হানিকর কোন আচরণ করা হয়, তা চরম বাড়াবাড়ির জবাবেই করা হোক না কেন, তাহলে তাদের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষই সমান বলে বিবেচিত হয়। ফলে বিরুদ্ধবাদীরাও একটি কথার জবাবে হাজারটি গালি দেয়ার বাহানা পেয়ে যায়। এ জন্যেই এরশাদ হচ্ছে – শয়তানের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাক। সে বড়ো দরদী ও শুভাকাংখী সেজে তোমাদেরকে উস্কানি দেবে এই বলে যে, "অমুক বাড়াবাড়ি ত কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা যায়না, অমুক কথার দাঁতভাঙা জবাব দেয়া উচিত, এ হামলার জবাবে পাল্টা হামলা করা উচিত। নতুবা তোমাদেরকে কাপুরুষ মনে করা হবে এবং তোমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে প্রত্যেক ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যখন এ ধরনের উস্কানি অনুভব করবে, তখন সাবধান হয়ে যাবে যে শয়তান তার উস্কানি দ্বারা তোমাদের উত্তেজিত ও রাগান্বিত করে তোমাদের দ্বারা কোন ভুল পদক্ষেপ করাতে চায়। সাবধান হওয়ার পর, তোমরা যেন এ অহমিকার শিকার হয়ে একথা না বল, "আমাদের নিজেদের উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। শয়তান আমাদের দ্বারা কোন ভুল করাতে পারবেনা।" নিজেদের উপরোক্ত ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত শক্তির অহমিকাই শয়তানের দ্বিতীয় বৃহত্তর ভয়াবহ প্রতারণা হবে। তার পরিবর্তে তোমাদের খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ একমাত্র তিনিই যদি তওফিক দান করেন এবং হেফাজত করেন তাহলেই মানুষ ভুল করা থেকে বাঁচতে পারে।

এ বিষয়ে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা এমন এক ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যা ইমাম আহমাদ হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) বরাত দিয়ে তাঁর মুসনাদে উধৃত করেছেন। তিনি বলেন যে, একদা এ ব্যক্তি নবী (সঃ) এর উপস্থিতিতে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) চরম গালি দিতে থাকে। হযরত আবু বকর (রাঃ) নীরবে তার গালি শুনতে থাকে। নবীও (সঃ) তা দেখে মৃদু হাস্য করতে থাকেন। অবশেষে হযরত আবু বকরের (রাঃ) ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং তিনিও প্রত্যুত্তরে একটি শক্ত

কথা বলে ফেলেন। তাঁর মুখ থেকে সে কথাটা বেরুতেই নবী (সঃ) ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এবং তা তাঁর মুখমন্ডলে প্রতিভাত হয়ে পড়লো। তারপর তিনি সেখান থেকে উঠে গেলেন। আবু বকরও (রাঃ) তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'একি ব্যাপার' সে আমাকে গালি দিচ্ছিল এবং আপনি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছিলেন তারপর আমি জবাব দিতেই আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন।

নবী (সঃ) বল্লেন, যতোক্ষণ তুমি নীরব ছিলে, একজন ফেরেশতা তোমার সাথে ছিল, যে তোমার পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছিল। তরপর তুমি যখন মুখ খুল্লে তখন ফেরেশতার জায়গায় শয়তান এসে গেল। আমি ত শয়তানের সাথে বসে থাকতে পারিনা। (১৫)

হকের আহ্বায়ককে হতে হবে নিঃস্বার্থ

হকের দাওয়াতে তার আহ্বায়ককে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে থাকতে হবে এবং এটাই হবে তার সততা ও নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন পাকে বার বার বলা হয়েছে যে নবী (সঃ) দাওয়াত ইলাল্লাহর যে কাজ করছেন তাতে তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। বরঞ্চ তিনি খোদার সৃষ্ট জীবের কল্যাণের জন্যেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গীত করেছেন। সূরায়ে আনয়ামে বলা হয়েছে–

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ، اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ - (الانعام ٩٠)

–হে নবী (সঃ), বলে দাও–আমি এ তবলিগ ও হেদায়েতের কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। এ ত এক সাধারণ নসিহত সমস্ত দুনিয়াবাসীদের জন্যে– (আনয়াম ঃ ৯০)।

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ، اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ - (يوسف : ١٠٤)

–এবং হে নবী (সঃ), তুমি এ কাজের জন্যে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইছনা। এ ত একটি উপদেশ যা দুনিয়াবাসীদের জন্যে সাধারণ (ভাবে দেয়া হচ্ছে) (ইউসূফ ঃ ১০৪)।

এ সম্বোধন প্রকাশ্যতঃ নবী (সঃ) এর প্রতি কিন্তু এর প্রকৃত দ্বিতীয় পুরুষ কাফেরদের জনতা, তাদেরকে এভাবে বুঝানো হচ্ছে, আল্লাহর বান্দারা, একটু চিন্তা করে দেখ! তোমাদের এ হঠকারিতা কতটা অসংগত। পয়গম্বর যদি তাঁর কোন ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে দাওয়াত ও তবলিগের এ কাজ করতেন অথবা যদি তিনি তাঁর নিজের জন্যে কিছু চাইতেন, তাহলে তোমাদের এ কথা অবশ্যই বলার সুযোগ থাকতো– এ স্বার্থবাদী লোকের কথা আমরা কেন মানব? কিন্তু তোমরা দেখছ যে এ ব্যক্তি নিঃস্বার্থ। তোমাদের জন্যে এবং দুনিয়াবাসীদের কল্যাণের জন্যে সে নসিহত করছে। এতে তার নিজের কোন স্বার্থ নেই। হঠকারিতার সাথে তার মুকাবিলা করার কি সংগত কারণ থাকতে পারে? যে ব্যক্তি সকলের মংগলের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কোন কথা বলে, অকারণে তার বিরুদ্ধে তোমরা জিদ ধরে বসে আছ কেন? খোলামনে তার কথা শোন। মনে লাগে ত মান, না লাগলে মেননা। (১৬)

সূরায়ে মূমেনূনে বলা হয়েছেঃ–

اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - (مومنون : ٧٢)

–হে নবী (সঃ), তুমি কি তাদের নিকটে কিছু চাইছ? তোমার জন্যে তোমার রবের দানই উৎকৃষ্টতর এবং তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা–(মুমেনূন ঃ ৭২)।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই ঈমানদারীর সাথে নবীর (সঃ) উপরে এ অভিযোগ করতে পারেনা যে, তিনি যতোকিছু করছেন তার পশ্চাতে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। একদা তাঁর বিরাট ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। এখন তিনি দারিদ্র পীড়িত। একসময় জাতি তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো, প্রত্যেকে পরম শ্রদ্ধা জানাতো। এখন তিনি গালি ও পাথরের আঘাত ভোগ করছেন। এখন তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এক সময়ে তিনি বিবি বাচ্চাসহ আনন্দে জীবন যাপন করছিলেন। এখন এমন এক দ্বন্দ্বসংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়েছেন যা তাঁকে একমুহূর্তেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেনা। উপরন্তু তিনি এখন এমন এক বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন যে সমগ্র দেশ তাঁর দুশমন হয়ে পড়েছে। এমনকি স্বয়ং তাঁর আপনজনও তার রক্তপিপাসু হয়ে পড়েছে। কে বলতে পারে যে এসব একজন স্বার্থপর লোকের কাজ? স্বার্থবাদী ব্যক্তি ত তার জাতি ও গোত্রের কুসংস্কারের পতাকাবাহী হয়ে নানা কলাকৌশলে নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করে। স্বার্থপর ব্যক্তি এমন আদর্শের প্রচার করেনা যা শুধু গোত্রীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জই নয়, বরঞ্চ তা নির্মূল করে দেয় যার ভিত্তিতে আরবের মুশরিকদের প্রভুত্ব নেতৃত্ব কায়েম রয়েছে। (১৭)

সূরায়ে সাবায় বলা হয়েছে–

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ - (سبا: ٤٧)

–হে নবী (সঃ), বলে দাও, যদি আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকি, তা তোমাদেরই জন্যে। আমার পারিশ্রমিক ত আল্লাহর দায়িত্বে। তিনি ত সবকিছুর সাক্ষী– (সাবা ঃ ৪৭)।

আয়াতের প্রথমাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। এক এই যে, আমি যদি তোমাদের কাছে কিছু পারিশ্রমিক চেয়ে থাকি, তা তোমাদের ভাগ্যেই ঘটুক। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদের মংগল ছাড়া আর কিছু নয়। শেষাংশের অর্থ এই যে, অভিযোগকারীরা যতো খুশি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক। কিন্তু আল্লাহ সবকিছুই জানেন। তিনিই সাক্ষী যে আমি এ কাজ নিঃস্বার্থভাবে করছি, কোন ব্যক্তিস্বার্থে করছিনা। (১৮)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ - (ص ٨٦)

–হে নবী (সঃ), বলে দাও আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। আর না আমি কৃত্রিম–বানোয়াট লোকের একজন–(সা'দ ঃ ৮৬)।

অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে একজন নই যারা তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মিথ্যা দাবী সহ ময়দানে নামে এবং সে এমন কিছু সাজে যা সে প্রকৃত পক্ষে নয়।

একথা শুধু মক্কায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দেবার জন্যে নবীর (সঃ) মুখ দিয়ে বলানো হয়নি। বরঞ্চ এর পশ্চাতে হুযুরের (সঃ) গোটা জীবন সাক্ষ্য দেয় যা চল্লিশ বছর যাবত তিনি এসব কাফেরদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। মক্কায় প্রতিটি শিশু পর্যন্ত এ কথা জানতো যে মুহাম্মদ

(সঃ) কোন বানোয়াটি লোক নন। সমগ্র জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তিই তার মুখ থেকে এমন কোন কথা শুনেনি যার থেকে এ সন্দেহ করা যেতো যে তিনি কিছু হতে চান এবং নিজেকে খ্যাতনামা বানাবার প্রচেষ্টায় আছেন।(১৯)

সূরায়ে তূর ও কলমে বলা হয়েছে–

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ - (طور: ٤٠، قلم: ٤٦)

–হে নবী (সঃ), তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইছ যে তারা জবরদস্তিমূলক জরিমানার বোঝার তলে নিস্পেষিত হয়ে আছে?–(তূর ঃ ৪০, কলম ঃ ৪৬)।

এ প্রশ্নে আসলে সম্বোধন করা হচ্ছে কাফেরদেরকে। তার অর্থ এই যে, যদি রসূল তোমাদের কাছ থেকে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইতেন এবং যদি আপন স্বার্থের জন্যে এ সব চেষ্টা চরিত্র করছেন, তাহলে তার থেকে তোমাদের দূরে সরে যাওয়ার ত অন্ততঃ পক্ষে একটা সংগত কারণ থাকতো। কিন্তু তোমরা স্বয়ং জান যে তিনি তার এ দাওয়াতে একেবারে নিঃস্বার্থ এবং নিছক তোমাদের কল্যাণের জন্যেই তিনি জীবনপাত করছেন। তারপর কি কারণ থাকতে পারে যে তোমরা শান্তমনে তার কথা শুনতে পর্যন্ত তৈরী নও। এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত প্রচ্ছন্ন আছে। সারা দুনিয়ার কৃত্রিম ও বানাওটি নেতাদের এবং ধর্মীয় আস্তানার পুরোহিতদের মতো আরবেও মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা, পন্ডিত ও পুরোহিতগণ প্রকাশ্যে ধর্মীয় ব্যবসা চালাতো। সে জন্যে এ প্রশ্ন তাদের সামনে রাখা হলো যে এক দিকে এসব ধর্মব্যবসায়ী রয়েছে যারা প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে নযর–নিয়ায চাইছে এবং প্রতিটি ধর্মীয় খেদমতের জন্যে পারিশ্রমিক দাবী করছে। অপরদিকে এ ব্যক্তি একেবারে নিঃস্বার্থভাবে, বরঞ্চ নিজের ব্যবসা বাণিজ্য বরবাদ করে তোমাদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তিসহ দ্বীনের সোজা পথ দেখাবার চেষ্টা করছে। এখন এ সুস্পষ্ট অজ্ঞতা ছাড়া আর কি হতে পারে যে তোমরা তার থেকে পলায়ন করছ এবং ধর্মব্যবসায়ীদের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছ?(২০)

এ প্রসংগে শুধু একটি আয়াত পাওয়া যায় যা নিয়ে কিছু বির্তকের সৃষ্টি হতে পারে। তা হলো ঃ–

قُلْ لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى - (الشورىٰ: ٢٣)

–হে নবী (সঃ), বল–আমি তোমাদের নিকটে কোনই পারিশ্রমিক চাইনা। চাই শুধু নৈকট্যের ভালোবাসার জন্যে– (শূরা ঃ ২৩)।

এ আয়াতে – قُرْبٰى

শব্দ যে ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ করতে গিয়ে তফসীরকারদের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য হয়েছে। এক দল একে আত্মীয়তার অর্থে নিয়েছেন। তারা আয়াতের অর্থ এরূপ বলেছেন ঃ– "এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। কিন্তু এটা অবশ্যই চাই যে তোমরা (অর্থাৎ কুরাইশগন) অন্ততঃ সে আত্মীয়তার প্রতি ত খেয়াল রাখবে যা তোমাদের ও আমার মধ্যে রয়েছে। তোমাদের ত উচিত ছিল আমার কথা মেনে নেয়া। কিন্তু যদি না–ই মান, ত এ অন্যায় করোনা যে সমগ্র আরবের মধ্যে সবচেয়ে অধিক তোমরাই আমার শত্রুতায় উঠে পড়েলেগেছ।"

এ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর তফসীর। একে অনেক রাবীর বরাত দিয়ে ইমাম অহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, ইবনে জারীর, তাবারানী, বায়হাকী, ইবনে সা'দ প্রমুখ মনীষীগণ নকল করেছেন। আর এ তফসীর করেছেন মুজাহিদ, ইকরাম, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবু মালেক, আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম, দাহ্হাক, আতা বিন দীনার এবং অন্যান্য প্রখ্যাততফসীরকারগণ।

অন্য একটি দল قُرْبٰى

কে নৈকট্যের অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা এ আয়াতের অর্থ এ ভাবে করেছেন ঃ আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের নিকটে এ ছাড়া অন্য কোন পারিশ্রমিক চাইনা যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের অভিলাষ সৃষ্টি হোক। অর্থাৎ তোমরা ঠিক হয়ে যাও। এই হলো আমার পারিশ্রমিক। এ তফসীর হযরত হাসান বাসরী থেকে বর্ণিত। এর সমর্থনে কাতাদার একটা উক্তিও উধৃত আছে। বরঞ্চ তাবারানীর এক বর্ণনায় এ ধরনের উক্তি ইবনে আব্বাসের (রাঃ) প্রতিও আরোপ করা হয়েছে। স্বয়ং কুরআন মজিদের অন্য এক স্থানে এ বিষয়টিই এভাবে বলা হয়েছে ঃ–

قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔

(الفرقان: ٥٧)

–তাদেরকে বলে দাও ঃ এ কাজের জন্যে আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক এই যে, যার ইচ্ছা সে যেন তার রবের পথ অবলম্বন করে – (ফুরকান ঃ ৫৭)।

অপর একটি দল

قربى কে আত্মীয় স্বজনের অর্থে গ্রহণ করেছেন। আয়াতের অর্থ তাঁদের মতে ঃ আমি এ কাজের জন্যে তোমাদের নিকটে এ ছাড়া আর কোন পারিশ্রমিক চাইনা যে, তোমরা আমার আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসবে। তারপর এ দলের কিছু লোক আত্মীয় স্বজন বলতে গোটা বনী আবদুল মুত্তালিবকে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ আবার একে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন। এ তফসীর সাঈদ বিন জুবাইর এবং আমর বিন শুয়াইব করেছেন বলে বর্ণিত আছে কোন কোন বর্ণনায় একে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন হুসাইন (রাঃ) অর্থাৎ হযরত যয়নুল আবেদীনের তফসীর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ তফসীর গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। প্রথম কথা এই যে যখন মক্কায় এ সূরা শুরা নাযিল হয়, তখন হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতেমার (রাঃ) মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। সন্তানাদির ত প্রশ্নই ওঠেনা। তারপর বনী আবদুল মুত্তালিবের সকলেই নবীর (সঃ) সহযোগী ছিলনা। বরঞ্চ তাদের মধ্যে কতিপয় ত প্রকাশ্য দুশমন ছিল। আবু লাহবের দুশমনি ত দুনিয়ার সবাই জানে। দ্বিতীয়তঃ নবী (সঃ) এর আত্মীয়তা শুধু বনী আবদুল মুত্তালিব পর্যন্তই সীমিত ছিলনা। তার মাতা পিতা এবং বিবির দিক দিয়ে কুরাইশদের সকল পরিবারে তার আত্মীয়তা ছিল। আর এসব পরিবারে তার উন্নতমানের সাহাবীও ছিলেন এবং চরম দুশমনও ছিল। অতএব হুযুরের (সঃ) জন্যে এ কি করে সম্ভব ছিল যে এসব আত্মীয় বর্গের মধ্যে শুধু বনী আবদুল মুত্তালিবকে তাঁর আত্মীয় বলে উল্লেখ করে ভালোবাসার দাবী তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রাখতেন?

তৃতীয় কথা যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই যে, একজন নবী যে উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ করেন, সে স্থান থেকে এ পারিশ্রমিক চাওয়া– "আমার আত্মীয়দেরকে ভালোবাস"–এমন এক নিম্নস্তরের দাবী যে, কোন রুচিবান লোক এ ধারণাও করতে পারেনা যে আল্লাহতায়ালা তার নবীকে এমন কথা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ কথা ঘোষণা করেছেন। কুরআন পাকে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের যেসব কাহিনী বর্ণিত আছে, সেসবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, নবীর পর নবী আগমন করতঃ তাদের জাতিকে সম্বোধন করে এ কথাই বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কাছে কোনই পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিক ত আল্লাহর দায়িত্বে। (ইউনুস ঃ ৭২, হুদ ঃ ১৯, ৫১, শুয়ারা ঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০ দ্রষ্টব্য)।

সূরায়ে ইয়াসিনে নবীর সত্যতা পরীক্ষার মানদন্ড এ বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর দাওয়াতে একেবারে নিঃস্বার্থ (আয়াত–২১)। স্বয়ং নবী (সঃ) এর যবান মুবারক দিয়ে একথা বার বার বলানো হয়েছে, –"আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চাইনা।" উপরে আমরা তা উধৃত করেছি। অতঃপর এ কথা বলার আর অবকাশ কোথায়, "আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়ার যে কাজ করছি তার বিনিময়ে তোমরা আমার আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাস?" এ কথা আরও অপ্রাসংগিক মনে হয় যখন আমরা দেখি যে এ ভাষণে আহলে ঈমানকে সম্বোধন করা হচ্ছেনা, বরঞ্চ করা হচ্ছে কাফেরদেরকে। আগাগোড়া তাদেরকে সম্বোধন করেই কথা বলা হচ্ছে এবং সামনেও তাদেরকে লক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে। এ ধারাবাহিক ভাষণে বিরুদ্ধবাদীদের নিকটে কোন রকমের পারিশ্রমিক চাওয়ার প্রশ্নই বা কি করে উঠতে পারে? পারিশ্রমিক ত তাদের কাছে চাওয়া যায় যারা সে কাজের কিছু আদর–কদর করে যা তাদের জন্যে করা হয়। কাফেরগণ হুযুরের এ কাজের কি মর্যাদাই বা দিচ্ছিল যার জন্যে তিনি তাদেরকে বলতে পারতেন, "যে খেদমত আমি করছি তার জন্যে আমার আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসবে।" তারা ত বরঞ্চ এটাকে অপরাধ গণ্য করে তার জীবন নাশের চেষ্টা করছিল। (২১)

দাওয়াতের সূচনায় আখেরাত বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব

মক্কা মুয়ায্যামায় প্রথম যখন নবী (সঃ) ইসলামী তবলিগের সূচনা করেন তখন তার বুনিয়াদ ছিল তিনটি বিষয়। এক ঃ আল্লাহর সাথে আর কাউকে খোদায়ীতে শরীক মানা যাবেনা। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদকে (সঃ) আল্লাহতায়ালা তাঁর রসূল মনোনীত করেছেন। তৃতীয়তঃ এ দুনিয়া একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারপর এক দ্বিতীয় জগত অস্তিত্ব লাভ করবে। সেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করে সে দেহসহ পুনরুত্থিত করা হবে যে দেহসহ তারা দুনিয়ার কাজকর্ম করেছে। তারপর তাদের আকীদাহ–বিশ্বাস ও কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। এ হিসাব নিকাশে যারা মুমেন ও সৎ প্রমাণিত হবে, তারা চিরকালের জন্যে বেহেশ্‌তে যাবে এবং যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্যে দোজখে থাকবে।

এর মধ্যে প্রথমটি যদিও মক্কাবাসীদের জন্যে বড়ো অসহনীয় ছিল, তথাপি তারা কখনো আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। তারা একথা মানতো যে তিনি মহান রব, স্রষ্টা এবং রিজিকদাতা ছিলেন। তারা একথাও মানতো যে যাদেরকে তার দেবদেবী বলে গণ্য করতো তারাও আল্লাহরই সৃষ্ট। এজন্যে বিতর্ক শুধু এ ব্যাপারে ছিল যে খোদার গুণাবলীতে, এখতিয়ার এবং খোদায়ীতে এসব দেবদেবীর অংশীদারিত্ব ছিল কিনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কাবাসী মানতে প্রস্তুত ছিলনা। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা যে, নবুয়ত দাবী করার পূর্বে হুযুর (সঃ) যে চল্লিশ বছর তাদেরই মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, এ সময়ের মধ্যে তারা কখনো তাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক অথবা ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে অন্যায় পথ অবলম্বনকারী পায়নি। তারা স্বয়ং তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং চারিত্রিক মহত্ব স্বীকার করতো। এ জন্যে তার বিরুদ্ধে শত বাহানা তালাশ এবং অভিযোগ আরোপ করা সত্ত্বেও একথা অন্যকে বিশ্বাস করানো ত দূরের কথা নিজের পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে তিনি অন্যান্য ব্যাপারে ত সত্যবাদী কিন্তু শুধু রেসালাতের দাবীতে (মাযায়াল্লাহ) মিথ্যাবাদী। এভাবে প্রথম দুটি বিষয় তাদের জন্যে ততোটা জটিল ছিলনা যেমন ছিল, তৃতীয় বিষয়টি। এ বিষয়টি যখন তাদের সামনে পেশ করা হলো, তখন সবচেয়ে বেশী তার জন্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হলো। এতে সবচেয়ে বেশী বিস্ময় প্রকাশ করা হলো এবং অবান্তর ও অবাস্তব বলে সর্বত্র চর্চা শুরু হলো। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে আনার জন্যে তাদের মনে আখেরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল করা একেবারে অপরিহার্য ছিল। কারণ এ বিশ্বাস ব্যতীত হক ও বাতিলের ব্যাপারে তাদের চিন্তাচেতনা সঠিক হওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। এছাড়া ভালো ও মন্দের মানদন্ড বদলানো এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে এক ধাপ অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিলনা, যে পথে ইসলাম চালাতে চাইতো। এ কারণেই মক্কায় প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে বেশীর ভাগ আখেরাতের বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করার জন্যে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। অবশ্যি তার জন্যে যুক্তি প্রমাণ এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যার জন্যে তাওহীদের ধারণাও আপনাআপনি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে। সেইসাথে মাঝে মাঝে রসূল (সঃ) এবং কুরআন সত্য হওয়ার প্রমাণও সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। (২২)

নির্দেশিকা

১। গ্রন্থকার কর্তৃক পরিবর্ধন
২। তাফহীমুল কুরআন, ১ম খন্ড, ভূমিকা
৩। " " ২য় খন্ড, নহল, টীকা ১২২-১২৩
৪। " বনী ইসরাইল, টীকা ৫৭-৬১
৫। " আনয়াম, টীকা-৬৯
৬। " আনয়াম, টীকা-৭১
৭। আ'লা, টীকা-১০
৮। আন্য়াম, টীকা ২৪-২৫
৯। আবাসা, ভূমিকা ও টীকা-২০১
১০। আন্‌কাবুত, টীকা-৮১
১১। আ'রাফ, টীকা-১৫
১২। হামীম সিজদা, টীকা-৩৬
১৩। হামীম সিজদা, টীকা-৩৭
১৪। " হামীম সিজদা, টীকা-৩৮-৩৯
১৫। হামীম সিজদা, টীকা-৪০
১৬। ইউসুফ, টীকা-৭৩
১৭। " মুমেনূন, টীকা-৭০
১৮। সাবা, টীকা-২৮-২৯
১৯। সোয়াদ, টীকা-৭২
২০। " তূর, টীকা-৩১
২১। " শুরা, টীকা-৪১
২২। " সূরা নাবার ভূমিকা
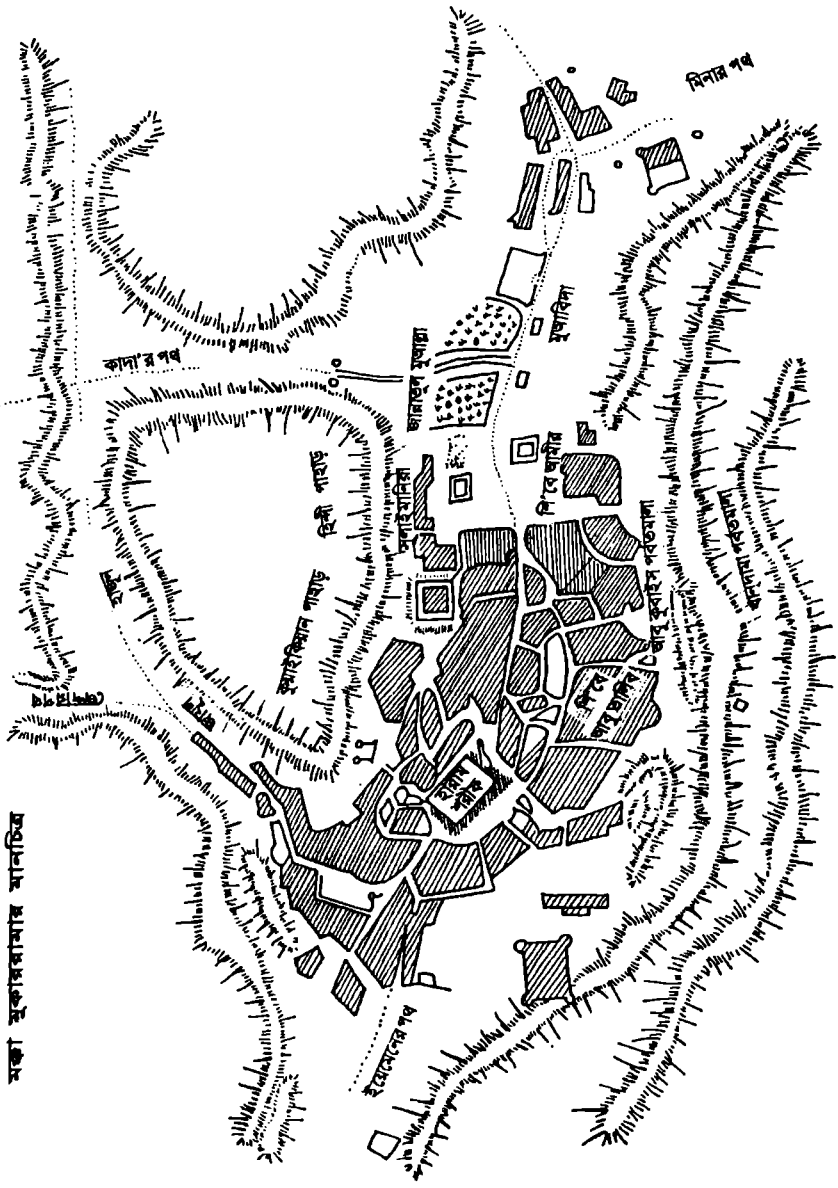
মক্কা মুকাররমার মানচিত্র

৪র্থ খন্ড আরম্ভ

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকৃত স্বরূপ

মুশরিকদের শত্রুতার কারণ ও তাদের ব্যর্থতার কারণ

এখন আমরা সে আলোচনার দ্বিতীয় অংশ পরিবেশন করতে চাই যা পূর্ব অধ্যায়ে শুরু করা হয়েছিল। আমরা বলেছি যে, হুযুর (সা)কে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর সংগী সাথীদেরকে ইসলামের দাওয়াত ছড়াবার ব্যাপারে কোন্ সব হেদায়েত দেয়া হয়েছিল যাতে করে তাঁরা জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের বিরোধিতার মুকাবেলা নৈতিকতার হাতিয়ার দিয়ে করতে পারেন। হিকমত, উদারতা, ধৈর্য ও সহনশীলতার দ্বারা তাদের মন জয় করতে পারেন। হঠকারিতা, অন্ধবিদ্বেষ এবং একগুঁয়েমির পাহাড় ন্যায়সংগত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ভেঙে চুরমার করে হকের দাওয়াতকে সম্মুখে অগ্রসর করাবার পথ বের করতে পারেন এবং জনগণের মধ্য থেকে বেছে বেছে তাদেরকে দলে ভিড়াতে পারেন যাদের মধ্যে সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যকে মেনে চলার গুণাবলী পাওয়া যেতো।

তারপর আমরা বলতে চাই যে, নবী (সা) যে দাওয়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন তার প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল, তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী কি ছিল। এমন কি কারণ ছিল যার জন্যে সর্ব প্রথম কুরাইশ এবং তারপর আরবের অন্যান্য লোক তার বিরোধিতায় লেগে গেল? তারপর এ দাওয়াতের এমন কোন্ শক্তি ছিল যা শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদেরকে স্তব্ধ করে দিয়ে এমন বিরাট সাফল্য লাভ করলো যার নজীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে বিধায় একে আমরা সাতটি শিরোনামায় বর্ণনা করব। তা হলো ঃ-

১। তৌহীদের শিক্ষা এবং শির্কের খন্ডন।
২। রেসালাতে মুহাম্মদীর উপর ঈমানের দাওয়াত।
৩। কুরআন আল্লাহর বাণী-এর উপর ঈমানের দাওয়াত।
৪। আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাওয়াত।
৫। নৈতিক শিক্ষা।
৬। বিশ্বজনীন মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠা।
৭। নবী এবং অনবীর কর্মপদ্ধতির পার্থক্য।

প্রথম অনুচ্ছেদ

তৌহীদের শিক্ষা ও শির্কের খন্ডন

দাওয়াতে ইসলামীর দফাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী দফা হচ্ছে তৌহীদের স্বীকৃতি ও শির্কের খন্ডন। যদিও নবী (সা) স্বয়ং নবুওয়তের পূর্বে তৌহীদে বিশ্বাসী ও শির্ক অস্বীকারকারী ছিলেন এবং তাঁর সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী আরববাসীদের মধ্যেও এ আকীদার লোক পাওয়া যেত, কিন্তু বিরাট পার্থক্য রয়েছে দু'ধরনের লোকের মধ্যে। এক ধরনের লোক শুধু তৌহীদ মেনে নেয়ার এবং শির্ক অস্বীকার করার আকীদাহ পোষণ করে এবং বড়োজোর তা প্রকাশ করাই যথেষ্ট মনে করে। আর একধরনের লোক এ আকীদার প্রচার ও প্রসারের জন্যে দাঁড়িয়ে যায় এবং শির্ক পরিহার করে তৌহীদ মেনে নেয়ার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে দাওয়াত দিতে থাকে। তারপর সে সরল আকীদাহ বিশ্বাস এবং এ প্রকাশ্য দাওয়াত ও তবলীগের মধ্যে যে জিনিস বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে তা এই যে, যে ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব কাঁধে বহন করে সে বারবার শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণসহ শির্কের এক একটি দিকের খন্ডন করতে থাকে এবং বিস্তারিতভাবে শুধুমাত্র খোদার একত্বই যুক্তিসহ প্রমাণ করে না, বরঞ্চ এ একত্বের অর্থ ও মর্ম এবং তা মেনে নেয়ার অনিবার্য দাবীগুলিও এক একটি করে বর্ণনা করে মানুষকে এ কথা বলে, "এ বিশদ ব্যাখ্যাসহ আল্লাহর তাওহীদের উপর ঈমান আন।"

এটাই ছিল সে কাজ যা নবী (সা) নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পর করেছিলেন। আর এটাই কাফেরদের সাথে তাঁর বিরোধিতার প্রথম কারণ। কারণ এর প্রত্যেকটি কথাই তাদের আকীদা, বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং শত শত বছরের পুঞ্জীভূত ধ্যান ধারণার সাথে ছিল সাংঘর্ষিক।

তৌহীদের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা

আরবের মুশরিক সমাজে আসল প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে নয় বরঞ্চ তাঁর একত্ব মেনে নেয়া সম্পর্কেই ছিল। তারা আল্লাহকেই নিজেদের এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা বলে মানতো। তাঁকে রব এবং ইলাহ মেনে নিতেও তারা অস্বীকার করতো না। তাঁর বন্দেগী করাতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না। অবশ্য যে গোমরাহিতে তারা লিপ্ত ছিল, তা ছিল এই যে, খোদায়ী এবং প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট-এ কথা তারা মনে করতো না। সেই সাথে তারা আরও অনেক উপাস্যকেও খোদার অংশীদার মনে করতো। আল্লাহর এবাদতের সাথে তাদেরও এবাদতের প্রতি তারা বিশ্বাসী ছিল।(১) তাদের অবস্থা এই ছিল যে-

و اذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وحْده وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَار هِمْ نُفُوْرًا- (بنى اسرائيل ٤٦)

-এবং (হে নবী) যখন তুমি কুরআনে তোমার একমাত্র রবের কথা বল, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। (বনী ইসরাইলঃ ৪৬)

অর্থাৎ এটা তাদের জন্যে অসহনীয় ছিল যে তুমি শুধু একমাত্র আল্লাহকেই প্রভু গণ্য করছ এবং তাদের বানানো বহু প্রভু ও খোদার কোন উল্লেখই তুমি করছ না। এ ওহাবীসুলভ (আজকালের পরিভাষায়) আচরণ তাদের এক মুহূর্তও মনঃপূত হচ্ছে না যে মানুষ শুধুমাত্র 'আল্লাহ আল্লাহ' জপ করবে। না বুযর্গানের জন্যে খরচপত্রের কোন উল্লেখ, আর না আস্তানায় ফয়েজ হাছিল করার কোন স্বীকৃতি। আর না ঐসব ব্যক্তিত্বের প্রতি কোন প্রশংসাসূচক অভিনন্দন যাদের প্রতি তাদের ধারণায়, আল্লাহতায়ালা তাঁর খোদায়ী বন্টন করে দিয়েছিলেন। তারা বলে, এতো এক অদ্ভুত লোক যে, তার মতে ভবিষ্যতের জ্ঞান বলতে একমাত্র আল্লাহর, কুদরত বলতে একমাত্র আল্লাহর, কর্মকুশলতা এবং এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। তাহলে আমাদের এসব আস্তানায় যারা আছে তারা কি কিছুই নয়? অথচ তাদের কাছে আমরা জ্ঞানলাভ করি, তাদের ইচ্ছায় রোগীর আরোগ্য লাভ হয়, ব্যবসা বাণিজ্য জমজমাট হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। তাহলে এরা কি কিছুই নয়?(২)

কুরআনের অন্যত্র তৌহীদের প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধা এবং শির্কে নিমজ্জিত থাকার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

وَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ - (الزمر ٤٥)

এবং যখন একাকী আল্লাহর উল্লেখ করা হয় তখন আখেরাত অবিশ্বাসকারীরা মর্মজ্বালা অনুভব করে এবং তিনি ছাড়া যখন অন্যান্যদের উল্লেখ করা হয় তখন হঠাৎ আনন্দে তাদের মন নেচে ওঠে। (যুমার ঃ ৫৪)

দুনিয়াতে মুশরিকসূলভ রুচিপ্রকৃতি যাদের তাদের প্রায় সকলের কাছে একথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তারা মুখে বলে, আমরা আল্লাহকে মানি। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, শুধু একমাত্র আল্লাহর উল্লেখ করলে তাদের চেহারা বিকৃত হতে থাকে। তখন তারা বলে, "এ লোকটি বুযর্গ এবং অলী আল্লাহদের কিছুতেই মানে না। সে জন্যেই শুধু আল্লাহ আল্লাহ করে।"

আর যদি অন্যান্যদের নাম উল্লেখ করা হয় তাহলে আনন্দে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাদের এ কর্মকান্ডে একথা প্রকাশ পায় যে তাদের অনুরাগ ও মহব্বত কার প্রতি।(৩)

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ و يَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ - (الصّٰفّٰت ٣٥-٣٦)

-তাদের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তখন তারা গর্ব ভরে বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবির খাতিরে আমাদের খোদাদেরকে পরিত্যাগ করব? (সাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৬)

নবীর (সা) এ কথার উপর তাদের বড়ো আপত্তি ছিলঃ

اَجَعَلَ الاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ - (ص ٥)

-এ লোকটি কি সকল খোদার পরিবর্তে শুধুমাত্র এক খোদাকে গণ্য করে বসলো? এ ত বড়োই আজব কথা! (সোয়াদ ঃ ৫)

এ সমাজে এবং এ ধরনের চিন্তাধারার লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বারবার ঘোষণা করেন আল্লাহই একমাত্র ইলাহ ও রব। খোদায়ী এবং প্রভুত্ব-কর্তৃত্বে আর কারো অংশীদারিত্ব নেই।

اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا - (طه ٩٨)

-তোমাদের খোদা ত সেই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। প্রতিটি বিষয়ের উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যপ্ত। (তাহা ঃ ৯৮)

بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَ هُنَّ - (الانبياء ٥٦)

-বরঞ্চ তোমাদের রব তিনিই যিনি আসমান ও জমিনের রব এবং যিনি তা পয়দা করেছেন। (আম্বিয়া ঃ ৫৬)

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ - (الصّفّت ٤-٥)

-প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব মাত্র একজন। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের তিনি রব এবং পূর্বদিকগুলিরও তিনি রব। (সাফ্‌ফাত ঃ ৪-৫)

অর্থাৎ যিনি বিশ্ব প্রকৃতির মালিক ও প্রভু তিনিই মানবজাতিরও খোদা (মাবুদ ও ইলাহ) এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি মাবুদ হতে পারেন এবং তাঁরই মাবুদ হওয়া উচিত। একথা একেবারে ভ্রান্ত যে বিশ্ব প্রকৃতি এবং তোমরাসহ বিশ্ব প্রকৃতির রব (অর্থাৎ মালিক, শাসক, মুরব্বী ও প্রতিপালক) ত কেউ হবে এবং ইলাহ (এবাদতের হকদার) হবে আর কেউ।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَّ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ - قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ -

(ص ٦٥ تا ٦٨)

-(হে নবী!) বলে দাও। আমি ত শুধু সাবধানকারী। ঐ এক খোদা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি সকলের উপরে বিজয়ী, যিনি আসমান, জমিন এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর রব। তিনি মহা প্রতাপশালী এবং বড়ো ক্ষমাশীল। (হে নবী!) বল যে এ এমন এক সংবাদ যার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (সোয়াদ ঃ ৪-৫)

و قَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ - (النحل ٥١)

-আল্লাহ বলেছেন-দু'জন ইলাহ (খোদা ও মাবুদ) বানাইও না। খোদা ত মাত্র একই জন। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় কর। (নহল ঃ ৫১)

و هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّ فِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَّهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ - (الزُّخْرُفْ ٨٤)

-এবং তিনিই একজন আসমানেও খোদা এবং জমিনেও খোদা। এবং তিনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (যুখরুফ ঃ ৫৪)

وَ لَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- (القصص :٨٨)

-এবং আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন মাবুদকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কেউ খোদা নেই। শুধু তাঁর সত্তা ব্যতীত প্রতিটি বস্তু ধ্বংসশীল। শাসন- কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর দিকেই সবকিছু প্রত্যাবর্তনকারী। (কাসাস ঃ ৮৮)

মুশরিকগণ হুযুরকে (সা) জিজ্ঞেস করে, যে রবের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছ তাঁর বংশ পরিচয় বলে দাও। তিনি কিসের থেকে হয়েছেন? কার কাছে থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার পেয়েছেন? তাঁর পরে এ উত্তরাধিকার কে লাভ করবে?

তার জবাবে তৌহীদের এমন সুস্পষ্ট, সার্বিক অথচ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বয়ান করা হয়-যা অন্তর প্রদেশে তীরবেগে প্রবেশ করে। শির্কের কোন লেশ মনের মধ্যে স্থান পেতে পারে না। যার এক একটি শব্দ তৌহীদের ধারণা সুস্পষ্টরূপে পেশ করে। সেই সাথে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, চারটি সংক্ষিপ্ত ও অলংকারপূর্ণ বাক্যে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোন শ্রোতার সাধ্য ছিল না যে, তা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে দেবে এবং মুখে উচ্চারিত না করে পারবে। এরশাদ হলোঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ و لَمْ يُوْلَدْ -و لَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ - (اخلاص)

-(হে নবী তাদের কথার জবাবে) বলে দাও ঃ তিনি আল্লাহ, এক ও একক। আল্লাহ সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন এবং সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান। এবং তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই।

প্রথম বাক্যের অর্থ এই যে, আমার যে রব সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করছ এবং যাঁকে আমি এক খোদা বলে মানি এবং চাই যে অন্যেও মেনে নিক, তিনি কোন অভিনব অথবা আমার কল্পিত খোদা নন। বরঞ্চ তিনিই সে খোদা যাকে তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্ বল, যার এ ঘরকে (কাবা) তোমরা বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) বল, মাত্র চল্লিশ বছর আগে আবরাহার আক্রমণের সময় যাঁর কাছে তোমরা দোয়া করছিলে যেন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন এবং সে সময় তোমরা তোমাদের অন্যান্য খোদাকে ভুলে গিয়েছিলে। যাঁর সম্পর্কে তোমরা স্বয়ং স্বীকার কর যে, তোমাদের জমিন ও আসমানের এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর তিনি স্রষ্টা।

তারপর আল্লাহতায়ালা সম্পর্কে বলা হলো যে তিনি এক ও একক। প্রত্যেক আরববাসী জানতো যে এখানে আল্লাহকে ওয়াহেদ واحد বলার পরিবর্তে আহাদ বলার অর্থ কি। واحد (এক) শব্দটি আরবী ভাষায় প্রত্যেক ঐ বস্তুটির জন্যে বলা হয়-যা কোন বিশেষ দিক দিয়ে এক হয়, তা অসংখ্য দিক দিয়ে তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বহুত্ব পাওয়া যাক না কেন। যেমন এক বাড়ী, এক মানুষ, এক পরিবার, এক জাতি, এক দেশ, এক দুনিয়া। তার বিপরীত আহাদ শব্দ গুণ হিসাবে কারো জন্যে ব্যবহৃত হওয়া কারো একত্ব বর্ণনা করা এক অসাধারণ ব্যবহার ছিল যার কোন নজীর সূরা ইখলাস নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি।[১]

অতএব আল্লাহকে 'আহাদ' বলার একথা প্রকাশ করে যে, তিনি সব দিক দিয়ে এক ও একক। তিনি দেবদেবীসমূহের কোন একটিরও প্রজাতি নন যে তার সমপ্রজাতি অন্যান্য সত্তাও খোদা হবে। বরঞ্চ অস্তিত্বে তিনি তুলনাবিহীন ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একাকী এবং খোদায়ীর দিক দিয়েও একেবারে একাকী। তাঁর মধ্যে কোন দিক দিয়েই কোন বহুত্ব নেই। তিনি উপাদানমূলক অংশাবলী থেকে গঠিত কোন অস্তিত্ব নন, যা বিভাজ্য ও বন্টনযোগ্য, যার আকার আকৃতি থাকে, যা কোন স্থানে অবস্থানরত, যার থেকে কিছু বের এবং যার মধ্যে কিছু প্রবেশ করে। যার কোন বর্ণ হয়, যার কোন অংগপ্রত্যংগ হয়, যা কোন দিকের মুখাপেক্ষী এবং যার মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়। সকল প্রকারের বহুত্ব থেকে পাক-পবিত্র তিনি এক খোদায়ী সত্তা-যিনি সকল দিক দিয়ে এক ও একক। যখন তিনি 'আহাদ' তখন খোদায়ী ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বে তাঁর কোন অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, এখতিয়ার ও অধিকারে কেউ তাঁর অংশীদার নয়। জগতের অস্তিত্ববান সৃষ্টিনিচয়ের কোনটিই তার সদৃশ বা অনুরূপ নয়।

তারপর বলা হয়েছে যে তিনি মুখাপেক্ষীহীন। 'সামাদ' শব্দটি আরবী ভাষায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ছিল এবং প্রত্যেক আরববাসী তার অর্থ জানতো। তা এমন একটি ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হতো যে কারো মুখাপেক্ষী নয় এবং যার দিকে লোক প্রয়োজন পূরণের জন্যে ধাবিত হতো।

---

১ উল্লেখ্য যে, কুরআনে আল্লাহতায়ালার জন্যে শুধু ওয়াহেদ واحد শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। বরঞ্চ তার সাথে অন্য কোন শব্দ সংযোগ করতঃ আল্লাহতায়ালার এক হওয়ার মর্যাদাকে দুনিয়ার অন্যান্য বস্তুর কোন একটির এক হওয়ার মর্যাদা থেকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যেমন الله الواحد القهار অথবা الها واحدا কিন্তু সূরা ইখলাসে احد শব্দ আল্লাহর জন্যে নিরংকুশভাবে গুণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যবহার আল্লাহর সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট-গ্রন্থকার।

যে ব্যক্তি অন্যান্য থেকে উচ্চতর এবং কেউ তার চেয়ে উচ্চতর নয়। যার আনুগত্য করা হতো এবং যাকে ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত করা যেতো না। যার মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই, যে নির্দোষ, যার উপর বিপদ আসে না, যে আপন মর্জিমত সবকিছু করে, যার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা যায় না এবং কর্তৃত্ব করার গুণাবলী যার মধ্যে তাকেই 'সামাদ' বলা হতো। তা ফাঁপা বা শূন্য গর্ভ নয় এমন দৃঢ় পূর্ণগর্ভ যার থেকে কিছু বেরয় না এবং কিছু প্রবেশও করে না। কিন্তু আল্লাহতায়ালার জন্যে নিছক 'সামাদ' নয়, বরঞ্চ 'আস্ সামাদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ এই যে, আর যতো কিছু তা ত একদিক দিয়ে 'সামাদ' হতে পারে এবং অন্য বহু দিক দিয়ে 'সামাদ' নয়। কিন্তু সব দিক দিয়ে পূর্ণ 'সামাদ' শুধুমাত্র আল্লাহ।

তারপর বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন সন্তান নেই। আর না তিনি কারো সন্তান। এ কথাটি সে সকল মুশরেকী ধ্যান-ধারণা খন্ডন করে যার ভিত্তিতে মনে করা হতো যে, খোদাদেরও কোন প্রজাতি আছে যার মধ্যে সেরূপ বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা চলে যেমন মানুষের চলে থাকে। এ ধারণার মূলোৎপাটন করে মানুষকে বলে দেয়া হলো যে, ঐ এক খোদা আদি ও অনন্তকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর পূর্বে কোন খোদা ছিল না যার থেকে তিনি পয়দা হয়েছেন আর না তাঁর পরে কোন খোদা আছে এবং হতে পারে যা তাঁর থেকে পয়দা হয়।

শেষে বলা হয়েছে যে কেউ তার 'কুফু' নেই। কুফুর অর্থ তুলনা' সদৃশ, সমমর্যাদাসম্পন্ন, সমকক্ষ ও সমান। এ কথার দ্বারা লোকদেরকে বলে দেয়া হলো যে, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে কেউ নেই, না কখনো ছিল এবং না কখনো হতে পারে যে আল্লাহর মতন, অথবা তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা তাঁর গুণাবলী, কাজকর্ম এবং ক্ষমতা এখতিয়ারে তাঁর সাথে কোন প্রকারের সাদৃশ্য রাখে।

তৌহীদের যুক্তি প্রমাণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুশরিক সমাজে তৌহীদের এ সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ বলিষ্ঠতার সাথে অনস্বীকার্য যুক্তি প্রমাণসহ তা প্রমাণিত করেছেন।

১. সকল নবী তৌহীদের শিক্ষা দিতেন

এ প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি এ ছিল যে, তাঁর পূর্বে দুনিয়ায় যতো নবী এসেছিলেন তাঁরা সকলেই তৌহীদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং শির্ক থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। বস্তুতঃ কুরআনে সামগ্রিকভাবে সকল নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ(النحل ٣٦)

-প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমরা একজন করে নবী পাঠিয়েছি এ শিক্ষাসহ যে- আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের[১] বন্দেগী থেকে দূরে থাক। (নাহাল ঃ ৩৬)

---

১. তফসীর শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম ইবনে জারীর তাবারী তাগুতের, ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেছেন ঃ প্রত্যেক সে সত্তা- যে আল্লাহর মুকাবিলায় বিদ্রোহ করে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার বন্দেগী করা হয়, তা

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - (الانبياء ٢٥)

-এবং (হে নবী) তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রসূল পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এ অহী করিনি যে, 'আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। অতএব তোমরা আমারই বন্দেগী করো'। (আম্বিয়া ঃ ২৫)

অতীতের সমস্ত উম্মত সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَ مَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ - (البينة ٥)

-এবং তাদের এছাড়া আর কোন আদেশ করা হয়নি যে, তারা আল্লাহর বন্দেগী করবে- নিজেদের দ্বীনকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং একেবারে একমুখী হয়ে- এবং নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই হচ্ছে একেবারে সঠিক দ্বীন। (আল্ বাইয়েনাহ্ ঃ ৫)

তারপর এক একজন নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের শিক্ষা এই ছিল। হযরত নূহ (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), হযরত শুয়াইব (আঃ) প্রমুখ নবীগণের প্রত্যেকে তাঁর জাতিকে সর্বপ্রথম এ শিক্ষাই দিতেন-

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ -

-হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের খোদা নেই। (আ'রাফ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, হুদ ঃ ৫০, ৬১, ৮৪, আল মুমেনুন ঃ ২৩, ৩২)

হযরত ইয়াকুব মরণের সময় তাঁর সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করছেন- আমার পরে তোমরা কার বন্দেগী করবে? তারা জবাব দেন, আমরা সেই একই খোদার বন্দেগী করবো যিনি আপনার, আপনার বাপ দাদা ইব্রাহীম ও ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহ্ ছিলেন। (বাকারাহঃ ১৩৩) হযরত ইউসুফ তাঁর জেলের সাথীদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ - مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَ اٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ

বন্দেগীকারী শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বাধ্য হয়ে তার বন্দেগী করুক অথবা স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে তার বন্দেগী করুক- (অর্থাৎ যার বন্দেগী করা হবে) সে তাগুত। সে কোন মানুষ হোক, শয়তান, দেবদেবী অথবা আর কোন কিছু হোক। (জামেউল বয়ান ফী তফসীরুল কুরআন-৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩ গ্রন্থাকার)।

ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ-

(يوسف ٣٩-٤٠)

-হে আমার জেলখানার সাথীগণ! ভিন্ন ভিন্ন বহু খোদা কি ভালো, না এক আল্লাহ যিনি সকলের উপরে বিজয়ী? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছ। তারা কয়েক নাম ব্যতীত আর কিছুই নয়- যে নাম তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদা রেখেছে। আল্লাহ তাদের সপক্ষে কোন সনদ নাযিল করেননি। প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তাঁর হুকুম এই যে, তিনি ছাড়া আর কারো বন্দেগী তোমরা করবে না। এটাই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ইউসুফ ঃ ৩৯-৪০)

হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম অহী নাযিল হয়-

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ و اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ-(طه ١٤)

-আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। অতএব, তুমি আমারই এবাদত করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম করো। (তা-হা ঃ ১৪)

তারপর বনী ইসরাইল যখন গোবৎস্য পূজা শুরু করলো তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদের উপর ভয়ানক ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাদের তৈরী উপাস্য প্রতিমা জ্বালিয়ে দিয়ে বল্লেন- اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-(طه ٩٨)

-তোমাদের সত্যিকার মাবুদ তো একমাত্র আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। (তা-হা ঃ ৯৮)

হযরত ঈসা (আঃ) বনী ইসরাইলদেরকে বারবার এ কথা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّى و رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ-

(ال عمران-٥١، مريم ٣٦، الزُّخْرُف ٦٤)

-প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। অতএব তোমরা তাঁর এবাদত করো। এটাই সোজা পথ। (আলে ইমরান ঃ ৫১, মরিয়ম ঃ ৩৬, যুখরুফ ঃ ৬৪)

يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّى و رَبَّكُمْ ط اِنَّه مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ و مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ-(المائده ٧٢)

-হে বনী ইসরাইল! আল্লাহর বন্দেগী করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো তার জন্যে আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিলেন এবং তার অবস্থান জাহান্নাম। আর এমন জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (মায়েদাহ ঃ ৭২)

আরবের মুশরিকদের জন্যে সাধারণতঃ এবং কুরাইশ মুশরিকদের জন্যে বিশেষভাবে সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি তাই ছিল যা কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাহিনীতে পেশ করা হয়েছে। কারণ আরবের সকল মুশরিক তাঁকে তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করতো। তাদের দ্বীনকে তাঁরই প্রদর্শিত দ্বীন গণ্য করতো। তাঁর সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক থাকার কারণে এবং তাঁর তৈরী বায়তুল্লাহর পৌরহিত্য করার কারণেই কুরাইশদের যতো গর্ব অহংকার ও প্রভাব প্রতিপত্তি। কুরআন পাকে বিশদভাবে কুরাইশ এবং আরববাসীকে বলা হয়েছে যে, নমরুদের রাজ্য (ইরাক) থেকে তোমাদের পূর্বপুরুষ ও ধর্মীয় নেতার বেরিয়ে আসা এ বিবাদের ভিত্তিতেই হয়েছিল যে, তাঁর পিতা, তাঁর জাতি এবং তাঁর দেশের সরকার সকলেই মুশরিক ছিল। তিনি অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) এ শির্কের প্রকাশ্য খন্ডন করেন, জাতিকে প্রকাশ্য তৌহীদের দাওয়াত দেন, দেবদেবী ভেঙে চুরমার করেন যার জন্যে তাঁকে বিরাট অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তার থেকে জীবিত অবস্থায় ও নিরাপদে বের করে আনেন। তারপর তিনি দেশ ত্যাগ করে কান্আন ভূখন্ডের দিকে বেরিয়ে পড়েন। তারপর মক্কায় পৌঁছে এ আল্লাহর ঘর এজন্যে নির্মাণ করেন যে, এখানে যেন এক খোদা ব্যতীত আর কারো এবাদত করা না হয়। তিনি তাঁর সন্তানদের জন্যে দোয়া করেন যে, তারা যেন পৌত্তলিক পূজার পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত না হয়। এ কাহিনীর বিশদ বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলিষ্ঠ এবং সার্থকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তা পাঠ করে মানুষ ধারণা করতে পারে যে, মক্কায় যখন রসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে এসব শুনিয়েছিলেন তখন কুরাইশ এবং সাধারণ মুশরিকগণ কতোখানি আলোড়িত হয়ে থাকবে। কথা দীর্ঘায়িত না করে এখানে আমরা শুধু আয়াতগুলো তরজমা সন্নিবেশিত করছিঃ

-"এবং ইব্রাহীমের ঘটনা স্মরণ কর যখন সে তার পিতা আযরকে বলেছিল,- আপনি কি প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে এবং আপনার কওমকে সুস্পষ্ট গুমরাহির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

...ইব্রাহীম বল্লো, হে আমার জাতির লোকেরা! আমি সেসব থেকে বিরাগভাজন হয়ে পড়েছি যাদেরকে তোমরা খোদার শরীক বলে গণ্য করো। আমি ত একনিষ্ঠ হয়ে সেই সত্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি যিনি আসমান জমিন পয়দা করেছেন এবং আমি শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত কখনোই নই। তার কওম তার সাথে ঝগড়া শুরু করে। সে বলে, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আমার সাথে ঝগড়া করছো অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন? আমি তোমাদের নির্ধারিত শরীকদের ভয় করি না। হাঁ তবে আমার রব কিছু করতে চাইলে তা অবশ্যই হতে পারে। আমার রবের জ্ঞান সর্বব্যাপী। তারপরও তোমরা সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছ না? তোমাদের নির্ধারিত শরীকদের আমি কেন ভয় করবো যখন তোমরা আল্লাহর সাথে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভয় করছো না অথচ খোদার শরীক হওয়া সম্পর্কে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি? তাহলে বলো, যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে, আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে কে অধিকতর ভীতিহীনতা এবং প্রশান্তির অধিকারী?" (আনয়াম ঃ ৭৪-৮১)

-"এবং (হে মুহাম্মদ), এ কিতাবে ইব্রাহীমকে স্মরণ করো। অবশ্যই সে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ও নবী ছিল। (এদেরকে সে সময়ের ঘটনা শুনাও) যখন সে তার পিতাকে বলেছিল, আব্বা! আপনি কেন সে সবের এবাদত করেন, যারা না শুনে এবং না দেখে আর

না আপনার কোন কাজ করে দিতে পারে? আব্বা! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান রয়েছে যা আপনার কাছে নেই। আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সোজা পথ বলে দেব। আব্বা! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। আব্বা! আমার ভয় হয় যে, আপনি রহমানের আযাবে লিপ্ত হয়ে না পড়েন এবং শয়তানের সাথী হয়ে থাকেন।"

"পিতা বলে, ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের খোদাসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? তুমি বিরত না হলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবো। তুমি চিরদিনের জন্যে আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও।"

"ইব্রাহীম বলে, আপনার প্রতি সালাম, আমি আমার রবের কাছে দোয়া করি যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন। আমার রব আমার উপর বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকেও পরিত্যাগ করছি এবং ঐসব সত্তাকেও যাদেরকে আপনারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে ডাকেন। আমি ত আমার রবকেই ডাকবো। আশা করি আমি আমার রবকে ডেকে বিফলকাম হবো না।" (মরিয়ম ঃ ৪১-৪৮)

"এবং ইব্রাহীমের তাঁর পিতার জন্যে দোয়া সেই ওয়াদা মোতাবিক ছিল যা সে তার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার থেকে দায়মুক্ত হয়ে গেল।" (তওবাঃ ১১৪)

"এর আগে আমরা ইব্রাহীমকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমরা তাকে ভালোভাবে জানতাম। সে ঘটনা স্মরণ করো যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, এসব কেমন মূর্তি যার প্রতি তোমরা অনুরক্ত হয়ে পড়ছো? জবাবে তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের এবাদত করতে দেখেছি। সে বলে তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদাও সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিল। তারা বলে, তুমি কি তোমার আপন চিন্তা-ভাবনা আমাদের সামনে পেশ করছ, না ঠাট্টা করছো? সে বলে, না, বরঞ্চ তোমাদের রব প্রকৃতপক্ষে সেই যিনি আসমান-জমিনের রব এবং যেগুলো তিনি পয়দা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং খোদার কসম, তোমাদের অসাক্ষাতে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতিমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার সিদ্ধান্ত করেছি। বস্তুতঃ সে সেগুলোকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলো এবং তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড়ো তাকে অক্ষত রাখলো যাতে করে তারা তার দিকে ধাবিত হয়।

"(তারা এসে তাদের প্রতিমাগুলোর দূরবস্থা দেখে) বল্লো, কে আমাদের খোদাদের সাথে এমন আচরণ করলো? বড়ো জালেম ছিল সে। (কতিপয় লোক) বলতে লাগলো, আমরা একটি যুবককে এদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছি। আর সে ইব্রাহীম। তারা বল্লো, তাহলে তাকে সকলের সামনে ধরে আন যেন তারা দেখে যে তার কি করা যায়। (ইব্রাহীম এলে পরে) লোকে বল্লো ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের খোদাদের সাথে এ আচরণ করেছ? সে বল্লো, বরঞ্চ এদের এ সর্দারই এ কাজ করেছে। একে জিজ্ঞেস করো না সে যদি কিছু বলে। এ কথা শুনে তারা তাদের বিবেকের তাড়নায় তাদের নিজেদের মনকে বলে, তোমরা নিজেরাই বড় জালেম (যে এসব অসহায় মূর্তিগুলোর পূজা কর)। তারা হতভম্ব হয়ে বল্লো, তুমিতো জান যে এরা কথা বলতে পারে না। ইব্রাহীম বল্লো, তোমরা তাহলে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পূজা করো যারা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। তোমাদের উপর এবং তোমাদের এ

খোদাদের উপর ধিক্ আল্লাহকে ছেড়ে যাদের পূজা করো।"

"তারা বল্লো, জ্বালিয়ে দাও একে এবং সমর্থন করো তোমাদের খোদার যদি তোমাদের কিছু করতে হয়। আমরা বল্লাম হে আগুন! শীতল হয়ে যাও এবং নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও ইব্রাহীমের জন্যে। তারা চাচ্ছিল ইব্রাহীমের ক্ষতি করতে কিন্তু তাদেরকে ব্যর্থকাম করে দিলাম।" (আম্বিয়া ঃ ৫১-৭০)

"এবং এদেরকে ইব্রাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দাও, যখন সে তার পিতা এবং আপন কওমকে বল্লো, এ তোমরা কোন্ সব বস্তুর এবাদত করছো?"

"তারা বল্লো- এসব কিছু মূর্তি যেসবের আমরা পূজা করি এবং তাদের সেবায়ই আমরা লেগে থাকি। সে বল্লো, এরা কি তোমাদের কথা শুনতে পায় যখন তোমরা তাদেরকে ডাক? অথবা এ কি তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা জবাব দিল, (এসব তো আমরা জানি না) কিন্তু আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপ করতে দেখেছি। ইব্রাহীম বল্লো, তোমরা কি কখনো (চোখ খুলে) দেখেছ যে এসব আসলে কি যাদের বন্দেগী তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদা করে আসছ? আমার ত এসব দুশমন, শুধু রাব্বুল আলামীন ব্যতীত, যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তারপর তিনিই আমার পথ প্রদর্শন করেন। যিনি আমাকে পানাহার করান। যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন এবং তারপর দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন। আর যার কাছে এ আশা করি যে, বিচারের দিনে তিনি আমার ভুলত্রুটি মাফ করে দেবেন।" (শুয়ারা ঃ ৬৯-৮২)

"এবং আমরা ইব্রাহীমকে পাঠালাম। যখন সে তার কওমকে বল্লো, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাঁকেই ভয় করো। এ তোমাদের জন্যে মংগলদায়ক যদি তোমরা জান। আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তোমরা পূজা করছ তারা নিছক মূর্তি এবং তোমরা একটি মিথ্যা রচনা করছ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের পূজা করছ তারা তোমাদেরকে কোন রিযিক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর কাছে রিযিক চাও। তাঁরই বন্দেগী কর এবং শুকরিয়া আদায় কর। তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।....তার জাতির জবাব এ ছাড়া আর কিছু ছিল না, একে মেরে ফেল অথবা জ্বালিয়ে দাও। কিন্তু আল্লাহ তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন। নিশ্চিতরূপে এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। এবং ইব্রাহীম বল্লো, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে দুনিয়াতে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার উপায় বানিয়ে নিয়েছ। কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের প্রতি অভিশাপ করবে। আগুন তোমাদের গন্তব্যস্থল হবে এবং কেউ তোমাদের সাহায্যকারী হবে না। তারপর লূৎ ইব্রাহীমের কথা মেনে নিল এবং ইব্রাহীম বল্লো, আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। তিনিই মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞ।" (আনকাবুতঃ ১৬-২৬)

"এবং নূহেরেই পথের অনুসারী ছিল ইব্রাহীম। যখন সে ত্রুটিমুক্ত মন নিয়ে তার রবের সামনে এলো। যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বল্লো, এসব কোন বস্তুর এবাদত তোমরা করছ? আল্লাহকে ছেড়ে কি মিথ্যা রচিত খোদা তোমরা চাও? রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? তারপর সে তারাগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো এবং কওমের লোকদেরকে বল্লো, আমার শরীর খারাপ। তারপর তারা (তাকে ছেড়ে নিজেদের মেলায়) চলে গেল। তারপর সে চুপে চুপে তাদের প্রতিমাগুলোর মন্দিরে ঢুকে পড়ে বল্লো,

তোমরা খাওয়া দাওয়া করছ না কেন? তোমাদের কি হয়েছে যে, কথাও বলছ না? তারপর সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ডান হাতে খুব আঘাত করলো।"

"(ফিরে এসে কওমের) লোকেরা দৌড়ে তার কাছে এলো। সে বল্লো, তোমরা কি তোমাদের নিজেদের খোদাই করা বস্তুর পূজা করো? বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালাই তোমাদেরকে পয়দা করেছেন এবং এসব বস্তুকেও যা তোমরা বানাও। তারা বল্লো, এর জন্যে এক আগুন প্রজ্জ্বলিত কর এবং তাকে সে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো। তারা তার বিরুদ্ধে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছিল এবং আমরা তাদেরকে লাঞ্ছিত করলাম এবং ইব্রাহীম বল্লো, আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি অর্থাৎ হিজরত করছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।" (সাফফাত ঃ ৮৩-৯৯)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে দেশের বাদশাহের সামনে পেশ করা হলো। কারণ সে রব হওয়ার দাবীদার ছিল। আর তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা কুরআন এভাবে নকল করছে ঃ

"যখন ইব্রাহীম বল্লো, আমার রব তো তিনি যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সে বল্লো, জীবন ও মৃত্যু আমারই এখতিয়ারে। ইব্রাহীম বল্লো, আচ্ছা, আল্লাহ ত সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। এ কথা শুনে সে কাফের হতবাক হয়ে রইলো। (বাকারা ঃ ২৫৮)

এভাবে শির্কের বিরোধিতা এবং তৌহীদের দাওয়াতের কারণে ইব্রাহীমের (আঃ) জন্যে তাঁর জন্মভূমি সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি তাঁর দেশ, আপন কওম, আপন পরিবার, এমনকি আপন পিতাকে পরিত্যাগ করে হিজরতের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন তখন যাবার সময় তিনি এবং তার সাথে ঈমানদারগণ পরিষ্কার ভাষায় তাদের কওমকে বলে দিল-

"আমরা তোমাদের প্রতি এং তোমাদের এসব খোদার প্রতি, যাদেরকে তোমরা খোদাকে ছেড়ে পূজা কর, একেবারে বিরাগভাজন হয়ে পড়েছি। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (মুমতাহেনা ঃ ৪)

সেই সাথে কুরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কায় এসে তাঁর বলে দেয়া স্থানে এ খানায়ে কাবা নির্মাণ করেন ত তা এ জন্যে করা হয়নি যে, তাকে প্রতিমা মন্দির এবং মুশরিকদের তীর্থস্থান বানানো হবে, এখানে গায়রুল্লাহর এবাদত হবে এবং গায়রুল্লাহর জন্যে কুরবানী করা হবে।

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَ الْقَائِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ (الحج ٢٦ تا ٢٨)

"এবং স্মরণ কর সেই সময়-যখন আমরা ইব্রাহীমের জন্যে এ ঘরের (খানায়ে কাবা) স্থান মনোনীত করে দিই (এ হেদায়েতসহ) যে আমার সাথে অন্য কোন জিনিস শরীক করবে না এবং আমার ঘর তাওয়াফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্যে পাক রাখবে। তারপর মানুষকে হজ্বের জন্যে সাধারণ অনুমতি দেবে যেন তারা দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে করে আসতে পারে এবং সে সব সুবিধা লাভ করে যা তাদের জন্যে রয়েছে। তারপর কিছু নির্দিষ্ট দিনে ঐসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।" (হজ্ব ঃ ২৬-২৮)

উপরন্তু কুরআনে মানুষকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মক্কার অধিবাসীদের জন্যে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোয়া করেছিলেন তা কি ছিল।

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِىْ وَ بَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ط فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ابراهيم ٣٦،٣٥)

"হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেক লোককে গোমরাহ করেছে, অতএব যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার এবং যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, তুমি তো ক্ষমাকারী ও রহমকারী।" (ইব্রাহীম: ৩৫-৩৬)

হযরত ইব্রাহীমের জন্যে এ দৃষ্টান্ত কুরাইশ এবং আরবের মুশরিকদের ধর্মের মেরুদন্ড চূর্ণকারী ছিল। এর জন্যে তারা তো আর্তনাদ করতে পারতো কিন্তু এ অস্বীকার করতে পারতো না। কারণ তাদের মধ্যে এ কথা সর্বস্বীকৃত ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মুশরিক ও মূর্তি পূজক ছিলেন না। কাবা তিনি শুধু আল্লাহর এবাদতের জন্যে বানিয়েছিলেন এবং তার বহু পরে শির্ক আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। তাদের ঐতিহ্যে এ কথা সংরক্ষিত ছিল যে, মক্কায় শির্ক কখন শুরু হয় এবং কোন মূর্তি কখন কোথা থেকে আনা হয়। এ জন্যে কুরআন প্রকাশ্যে মানুষকে দাওয়াত দেয়-

فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

"অতএব একনিষ্ঠ হয়ে ইব্রাহীমের পন্থা-পদ্ধতি অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (আলে ইমরান ঃ ৯৫)

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط وَ اللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"ইব্রাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশী হকদার তারা যারা তার তরিকা অনুসরণ করে এবং এ নবী (মুহাম্মদ সঃ) এবং তার অনুসারীগণ। আল্লাহ ঈমান আনয়নকারীদের সমর্থক ও সাহায্যকারী।" (আলে ইমরান ঃ ৬৮)

২. মুশরিকদের মনের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ

তৌহীদের জন্যে দ্বিতীয় শক্তিশালী প্রমাণ এ পেশ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের উপর কোন কঠিন সংকট এসে পড়লে তারা মৃত্যু অথবা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তখন তারা তাদের সকল বানাওটি খোদাকে ভুলে যায় এবং একমাত্র আল্লাহর নিকটেই দোয়া করতে থাকে। কুরআন মজিদে তাদের এ অবস্থা ফলপ্রসূ উপায়ে বর্ণনা করে তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা হয় যে, তোমাদের নিজেদের মনেই শির্ক ভ্রান্ত হওয়ার এবং তৌহীদ সত্য হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যা বিপদ পরীক্ষার সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে। তারপর সে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা তার উপর গাফলতির পর্দা টেনে দাও।(৪)

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ - (الانعام ٤٠-٤١)

-(হে নবী), এদের বল, একটু চিন্তা করে বল, যদি কখনো আল্লাহর আজাব তোমাদের উপর এসে যায়, অথবা শেষ মুহূর্ত তোমাদের উপর এসে যায়, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে কি তোমরা ডাক? বল যদি তোমরা (তোমাদের শির্কের ব্যাপারে) সত্যবাদী হও। সে সময়ে তোমরা আল্লাহকেই ডাক। তারপর তিনি চাইলে সে বিপদ দূর করে দেন যার থেকে বাঁচার জন্যে তোমরা তাঁকে ডাকছিলে এবং সে সময় তাদেরকে ভুলে যাও যাদেরকে তোমরা খোদায়ীতে শরীক করছিলে। (আনয়াম ঃ ৪০-৪১)

আবু জাহেলের পুত্র একরামা (রাঃ) এসব নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণের পর ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেন। যখন মক্কা নবী (সা)-এর হাতে বিজিত হয়, তখন একরামা জিদ্দার দিকে পলায়ন করেন এবং একটি নৌকায় চড়ে আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হন। পথে ভয়ানক ঝড় শুরু হয় এবং নৌকাটি বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রথম প্রথম ত যতো সব দেবদেবী ছিল তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কাকুতি মিনতি করা হলো। কিন্তু ঝড়ের গতিবেগ যখন বেড়ে গেল এবং যাত্রীদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, নৌকাটি ডুবে যাবে। তখন সকলেই বলতে লাগলো যে, এখন এ সময়ে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ডাকা যায় না। তিনি চাইলেই আমরা বেঁচে যেতে পারি। সে সময়ে একরামার চোখ খুলে গেল এবং তাঁর মন ঘোষণা করলো যে, যদি এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী না থাকে, তাহলে অন্যত্রই বা কেন হবে? এটাই ত সেই কথা যা আল্লাহর সে নেক বান্দাহ আমাদেরকে বিশ বছর যাবত বুঝাচ্ছেন। আর আমরা অযথা তাঁর সাথে বিবাদ করে আসছি।

এ ছিল একরামার (রাঃ) জীবনের এক সিদ্ধান্তকর মুহূর্ত। তিনি তখনই খোদার কাছে এ অংগীকার করেন যে, এ তুফান থেকে বেঁচে গেলে তিনি সোজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে নিজের হাত সমর্পণ করবেন। বস্তুতঃ তিনি তাঁর অংগীকার পালন করেন এবং পরবর্তীতে তিনি শুধু মুসলমানই হলেন না, বরঞ্চ তাঁর অবশিষ্ট জীবন ইসলামের জন্য জিহাদে অতিবাহিত করেছেন।(৫)

এ যুক্তি প্রমাণ কুরআনের স্থানে স্থানে পেশ করা হয়েছে। প্রবন্ধ দীর্ঘায়িত না করে আমরা শুধু আয়াতগুলোর তরজমা পেশ করবো।

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে জলেস্থলে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করে বাতাসের অনুকূলে সানন্দে সফর করতে থাকো, অতঃপর শুরু হয় প্রচন্ড ঝড় এবং চারিদিক থেকে তরংগের আঘাত লাগতে থাকে এবং যাত্রীগণ বুঝতে পারে যে, তারা তুফানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে তখন সকলেই তাদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে নির্ভেজাল করে তাঁকে এই বলে ডাকে ঃ "যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করো তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে যাবো।" কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন সেসব লোকই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে জমিনে বিদ্রোহ করা শুরু করে।" (ইউনুস ঃ ২২-২৩)

"তোমাদের সত্যিকার খোদা ত তিনি, যিনি সমুদ্রে তোমাদের নৌকা পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অর্থাৎ জীবিকা অনুসন্ধান করতে পারো। প্রকৃতপক্ষে তিনি তোমাদের উপর বড়োই মেহেরবান। আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ এসে পড়ে, তখন ঐ একজন ব্যতীত আর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা সব হারিয়ে যায়। কিন্তু তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলে পৌঁছিয়ে দেন, তখন তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ প্রকৃতপক্ষে অকৃতজ্ঞ।" (বনী ইসরাইল ঃ ৬৬-৬৭)

"আর লোকের অবস্থা এই যে, যখন তারা কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন নিজেদের রবের দিকে ধাবিত হয়। তারপর যখন তিনি তাঁর রহমতের কিছুটা আস্বাদন তাদেরকে দেন তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে কতিপয় লোক তাদের রবের সাথে অন্যকে শরীক করতে শুরু করে। (অর্থাৎ অন্যান্য খোদাদের কাছে তাদের নযর-নিয়ায পৌঁছাতে থাকে)। এতে করে আমার কৃত অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (রূম ঃ ৩২-৩৩)

"এবং যখন কোন মানুষের উপর কোন বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁকে ডাকে। তারপর যখন তার রব তাঁর নিয়ামত দিয়ে তাকে ভূষিত করে তখন সে সেই বিপদের কথা ভুলে যায় যার জন্যে সে প্রথমে (তার রবকে) ডাকছিল এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ গণ্য করতে থাকে যাতে করে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।" (যুমার ঃ ৮)

অর্থাৎ নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েই ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ অন্যান্যকেও এ কথা বলে পথভ্রষ্ট করে যে, 'যে বিপদ আমার উপর এসেছিল তা অমুক হযরত, অমুক বুযর্গ, অমুক দেবদেবীর সদকা মানত করার ফলে দূর হয়েছে।' এতে অন্যান্য অনেক লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য কাল্পনিক খোদার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক জাহেল এভাবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে করে জনসাধারণের পথভ্রষ্টতায় ইন্ধন যোগাতে থাকে।(৭)

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এভাবে মুশরিকদের শিরা উপ-শিরায় আঘাত করে তাদের মধ্যে তৌহীদের সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। আরব ভূখন্ড বিপদ আপদে পরিপূর্ণ ছিল। দেশের সাধারণ নিরাপত্তাহীনতা প্রত্যেকের জন্য ছিল অত্যন্ত আশংকাজনক। রোগের কোন ওষুধ ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা দূর -দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও ছিল না।

মরুভূমির ভয়ানক ধূলিঝড়ে মানুষ জ্ঞানহারা হয়ে পড়তো। এ অবস্থায় প্রত্যেক মুশরিক তার জীবনে কোন না কোন সময়ে এমন বিপদের সম্মুখীন হতো যে সে সময় সে সকল দিক থেকে নিরাশ হয়ে এক লাশরীক আল্লাহর সামনে তার দোয়ার হাত প্রসারিত করতো এবং মনে করতো যে এ সময়ে সে পবিত্র সত্তাব্যতীত কেউ তার সাহায্য করতে পারে না। বিশেষ করে সামুদ্রিক সফরে ত এ ধরনের ঘটনা প্রায় ঘটতো। স্বয়ং কুরাইশদের উপর আবরাহার হামলার সময় এ অবস্থা দেখা গেছে। সকল বানাওটি খোদাদের পরিত্যাগ করে এক আল্লাহকেই তারা সাহায্যের জন্যে ডেকেছিল। কুরআন নাযিলের সময় এমন বহু লোক জীবিত ছিল যারা এ ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল। সুরা ফীলে এদিকেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, "সে সময়ে তোমাদের সত্যিকার রব ছাড়া আর কে ছিল যে ষাট হাজার আক্রমণকারীদের নির্মূল করে তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল?" আর এ দিকেই সূরা কুরাইশে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে,- "সেই মহান খোদার বন্দেগী করো যাঁর ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করে তোমরা ধ্বংস থেকে বেঁচে গেছ এবং তোমরা আরবে এ নিরাপত্তা, নির্ভরতা ও সুখসাচ্ছন্দ্য লাভ করেছ। এ নিয়ামতদাতা সেই আল্লাহ, সে সব মাবুদ নয় যাদেরকে তোমরা তাঁর ঘরে একত্র করে রেখেছ এবং যাদের সম্পর্কে তোমরা স্বয়ং জান যে, তারা তোমাদেরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারতো না।

৩. প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে যুক্তি প্রমাণ

উপরের দু'টি যুক্তি প্রমাণের সাথে কুরআনের স্থানে স্থানে বিস্তারিতভাবে বিশ্ব প্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনা থেকে এ বিষয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, এ গোটা সৃষ্টি জগতের খোদা একই জন এবং একই হতে পারে। এখানেও আমরা শুধু আয়াতসমূহের তরজমা পেশ করছি।

"হে লোকেরা! বন্দেগী করো তোমাদের সেই রবের যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদেরকে পয়দা করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা (অন্যান্যদের বন্দেগী করার পরিণাম থেকে) বেঁচে যাবে। সেই প্রভু যিনি তোমাদের জন্যে জমিনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন। আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর তার থেকে হরেক রকমের ফসল উৎপন্ন করেছেন-যা তোমাদের জীবিকায় পরিণত হয়েছে। অতএব তোমরা জেনে বুঝে অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়ো না।" (বাকারা ঃ ২১-২২)

"তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। অতঃপর তোমরা মানুষরূপে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে থাক এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরই প্রজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া-অনুকম্পা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চিতরূপে এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, তোমাদের ভাষা এবং বর্ণের বিভিন্নতা রয়েছে। অবশ্য এ সবের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে। এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে তোমাদের রাত ও দিনের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহে জীবিকার অনুসন্ধান। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা (মনোযোগসহ কথা) শুনে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ-স্ফূরণ দেখান ভয় ও আশা উভয়ের সাথে। এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন

এবং তার দ্বারা মৃত জমিনকে জীবিত করেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্যে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও যে আসমান ও জমিন তাঁর আদেশে স্থিতিশীল হয়ে আছে। অতঃপর যখনই তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে ডাক দেবেন, তখন একই ডাকে তোমরা অকস্মাৎ বেরিয়ে আসবে। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর বান্দাহ। সবই তাঁর অনুগত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তাঁর পুনরাবৃত্তি করবেন। এবং এটা তাঁর জন্যে সহজতর। আসমান ও জমিনে তাঁর গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ।" (রুম ঃ ২০-২৭)

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে পয়দা করেছেন। অতঃপর আরশে (সৃষ্টি জগতের সাম্রাজ্যের সিংহাসন) সমাসীন হন। যিনি রাতকে দিনের উপর প্রসারিত করে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি পয়দা করেছেন। সকলেই তাঁর অনুগত। সাবধান! সৃষ্টিও তাঁরই এবং হুকুম শাসনও তাঁরই। আল্লাহ বড়ো বরকতশালী। সমগ্র জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।" (আ'রাফ ঃ ৫৪)

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকল শ্রেণীর জোড়া পয়দা করেছেন। জমিন থেকে উৎপন্নশীল বস্তুগুলোর মধ্যেও এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যেও এবং ঐসব বস্তুর মধ্যেও যা মানুষ দেখতে পায় না এবং মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন হলো রাত যার উপর থেকে আমরা দিনকে সরিয়ে দিই। তখন আঁধার ছেয়ে যায়। এবং সূর্য তার গন্তব্যের দিকে গতিশীল। এ মহাজ্ঞানীর স্থিরীকৃত হিসাব। এবং চাঁদের জন্যে আমরা মনযিলসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছি। অবশেষে সে শুষ্ক খেজুর শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের এমন শক্তি নেই যে, চাঁদকে ধরে ফেলে। আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সবই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে। লোকের জন্যে ইহাও একটি নিদর্শন যে, আমরা তাদের বংশকে যাত্রীপূর্ণ নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এবং (পরে) এ ধরনের আরো নৌকা পয়দা করে দিই যার উপরে এরা আরোহণ করে। আমরা চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি। তারপর তাদের আবেদন শুনার কেউ থাকবে না। আর না তাদেরকে কোনভাবে বাঁচাতে পারবে। ব্যস্ আমাদেরই রহমত যা তাদেরকে ওপারে পৌঁছিয়ে দেয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় জীবন উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়।" (ইয়াসীন ঃ ৩৬-৪৪)

"তাঁর কাজ ত শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন হুকুম দেন- 'হয়ে যাও' এবং হয়ে যায়। অতএব পবিত্র তিনি যাঁর হাতে সব জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (ইয়াসীন ঃ ৮২-৮৩)

"(হে মুহাম্মদ), বল, আল্লাহকে ছাড়া আর কোন রব কি আমি তালাশ করব–অথচ প্রত্যেক জিনিসের রব ত একমাত্র তিনি?" (আনআম ঃ ১৬৪)

"জমিনে বিচরণকারী কোন প্রাণী এমন নেই যার রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে নেই এবং যার সম্পর্কে যিনি জানেন না যে, সে কোথায় আছে এবং কোথায় তাকে (মরণের পর) সোপর্দ করা হয়। সব কিছুই একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।" (হুদ ঃ ৬)

"তিনিই আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে পয়দা করেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হন। জমিনে যা কিছু যায় এবং যা কিছু তার থেকে বেরোয়, তার জ্ঞান তাঁর রয়েছে এবং যা কিছু আসমান থেকে নামে এবং আসমানে উঠে তার জ্ঞানও তাঁর আছে। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সংগে রয়েছেন এবং যে কাজই তোমরা কর তা তিনি

দেখেন। আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনি এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় (শেষ মীমাংসার জন্যে) ফিরিয়ে দেয়া হয়। তিনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে রূপান্তরিত করেন এবং তিনি মনের অবস্থাও ভালোভাবে জানেন।" (হাদীদ ঃ ৪-৬)

"তিনি আসমান ও জমিনের সকল কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা করেন। তারপর তার রিপোর্ট উপরে তাঁর কাছে এমন এক দিনে যায় যার পরিমাণ তোমাদের হিসাবে এক হাজার বছর। তিনিই সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও দয়াবান।

"তিনি যা কিছু বানিয়েছেন তা খুব সুন্দর করে বানিয়েছেন। মানুষের সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে করেছেন। পরে তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মত।" (সেজদা ঃ ৫-৮)

"বীজ ও ফলের আঁটি (জমীনের অভ্যন্তরে) দীর্ণকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি জীবনকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবন্ত থেকে বের করে আনেন। এ সমস্ত কাজ সম্পাদনকারী ত আল্লাহ। তাহলে কিভাবে তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছ? রাতের আঁধার বিদীর্ণ করে তিনিই প্রভাত আনয়ন করেন এবং রাতকে তিনি প্রশান্তিময় বানিয়েছেন। তিনি সূর্য ও চাঁদের উদয়াস্তের হিসাব নির্ধারিত করে রেখেছেন। এসবই সেই মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানীর স্থির সিদ্ধান্ত। এবং তিনিই তোমাদের জন্যে তারকারাজিকে মরুভূমি ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ জেনে নেয়ার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। দেখ, আমরা নিদর্শনাবলী স্পষ্ট করে বয়ান করেছি তাদের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে। এবং তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্যে আছে একটি অবস্থানের জায়গা এবং একটি ফিরে যাওয়ার স্থান। এসব নিদর্শন আমরা সুস্পষ্ট করে দিয়েছি তাদের জন্য যারা বুঝে-সুজে কাজ করে।" (আনআম ঃ ৯৫-৯৮)

"(হে নবী), তাদেরকে বল, কে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা রদ করে দেয়ার কোন প্রকার ক্ষমতা এখতিয়ার রাখে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ করতে চান?" (ফাত্‌হ ঃ ১১)

"এবং যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ বিপদ দূর করতে পারে এবং যদি তিনি তোমার জন্যে কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর কল্যাণ প্রতিরোধ করার কেউ নেই।" (ইউনুস ঃ ১০৭)

"আল্লাহ মানুষের জন্যে যে রহমতের পথ খুলে দেন তা বন্ধ করে দেয়ার কেউ নেই এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন তা খুলে দেবারও কেউ নেই)... আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি যে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দেয়? কোন খোদা তিনি ছাড়া নেই। অতঃপর তোমরা কোথা থেকে প্রতারিত হচ্ছো?" (ফাতের ঃ ২-৩)

"আল্লাহ হুকুম শাসন পরিচালনা করছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই।" (রা'দ ঃ ৪১)

"যদি আল্লাহ ছাড়া আসমান ও জমিনে অন্যান্য খোদাও হতো, তাহলে জমিন ও আসমানের ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতো। আরশের মালিক আল্লাহ ঐসব বিষয় থেকে পাক পবিত্র যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করছে। তিনি তাঁর কাজের জন্যে কারো কাছে দায়ী নন এবং সকলে তাঁর কাছে দায়ী। এরা কি তিনি ছাড়া অন্যকে খোদা বানিয়ে রেখেছে? এদের বল, তোমাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ কর।" (আম্বিয়া ঃ ২২-২৪)

"আল্লাহ কাউকে তাঁর পুত্র বানাননি। আর না তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন খোদা আছে।

যদি এমনটা হতো তাহলে প্রত্যেক খোদা তাঁর সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। তারপর একে অপরের উপর কর্তৃত্ব চালাতো। তিনি পবিত্র ওসব থেকে যা তারা আরোপ করে।" (মুমেনুন ঃ ৯১)

"হে নবী) এদের বল, যদি তাঁর সাথে অন্যান্য খোদা হতো, যেমন তারা বলে, তাহলে তারা আরশে মালিকের স্থানে পৌছবার অবশ্যই চেষ্টা করতো। তিনি পবিত্র, অতি মহান ও উচ্চতর ওসব থেকে যা তারা বলছে।" (বনী ইসরাইল ঃ ৪২-৪৩)

এগুলো হচ্ছে ওসব আয়াতগুলোর কিছু যার মধ্যে তৌহীদের এমন মজবুত দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যার মধ্যে সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধিও আছে সে স্বীকার না করে পারে না যে, জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত এ সৃষ্টিজগতের বিরাট ব্যবস্থাপনা এক খোদা ব্যতীত চলতে পারে না। তিনি বানিয়েছেন বলে এসব নির্মিত হয়েছে এবং তিনিই চালাচ্ছেন বিধায় এসব কিছু চলছে। এর মধ্যে যে হিকমত, প্রজ্ঞা, শক্তি, দয়া অনুকম্পা ও প্রতিপালন ক্ষমতা; যে সুশৃংখলা ও নিয়মানুগতা (REGULARITY) এবং সৃষ্টি জগতের অসংখ্য অগণিত বস্তু নিচয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তা স্পষ্ট এ কথা বলে দেয় যে, এসব কিছু এক খোদার খোদায়ী ছাড়া হতে পারে না। এর মধ্যে অন্য কারো সামান্যতম খোদাসূলভ ক্ষমতা এখতিয়ারের কোন সম্ভাবনা নেই। নতুবা এ ব্যবস্থাপনা এমন নিয়মিতভাবে এমন বিজ্ঞতা ও সামঞ্জস্য সহকারে কখনোই চলতে পারতো না। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, স্রষ্টা যখন তিনি, রিযিক দাতাও তিনি, লাভ-লোকসান পৌছাবার কর্তৃত্বও তাঁরই এবং সকল ক্ষমতা এখতিয়ারের মালিক তিনি। তখন আর কে আছে যার মাবুদ হওয়ার অধিকার আছে? তারপর তাঁর সৃষ্টির অধীনে অন্যের হুকুম-শাসন চলতেই বা পারে কি করে? মানুষ কারো বন্দেগী করলে এটা মনে করেই করে যে, তার কোন প্রকারের ক্ষমতা এখতিয়ার রয়েছে, লাভ-লোকসান পৌছাবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে তার কোনই ক্ষমতা এখতিয়ার নেই তখন কেউই এমন বোকা গর্দভ হতে পারে না যে অযথা তার বন্দেগী করবে।

৪. শিরক খন্ডন করার যুক্তি প্রমাণ

যেমন বলিষ্ঠভাবে কুরআনে তৌহীদ প্রমাণ করা হয়েছে, তেমন বলিষ্ঠতার সাথে শির্কেরও খন্ডন করার দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এতে করে শির্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এখানেও আমরা শুধু কুরআনের আয়াতের তরজমা পেশ করবো।

"সাবধান থাক। আসমানবাসী হোক অথবা পৃথিবীবাসী, সবই আল্লাহতায়ালার মালিকানাধীন। এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শরীকদেরকে ডাকছে, তারা আন্দাজ-অনুমানের অনুসারী এবং নিছক কল্পনা বিলাসী।" (ইউনুস ঃ ৬৬)

"তাঁকে ছেড়ে আর যাদের বন্দেগী তোমরা করছ তারা কিছু নয়। কিছু নামমাত্র যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদা রেখে দিয়েছ। তাদের খোদার শরীক হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কোন সনদ নাযিল করেননি।" (ইউসুফ ঃ ১৪০)

"অতএব তুমি, (হে নবী)। যেসব মাবুদদের এরা এবাদত করে তাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ে পড়বে না। এরা তো (একেবারে অন্ধের মতো) ঠিক সেভাবেই পূজা পাঠ করে যাচ্ছে যেমনভাবে তাদের বাপ-দাদা করতো।" (হুদ ঃ ১০৯)

"এবং যখন এদেরকে বলা হয়, ঐ জিনিসের অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আমরা ত সে জিনিসেরই অনুসরণ করবো যা করতে আমাদের বাপ-

দাদাকে দেখেছি। এরা কি বাপ-দাদার (অন্ধ অনুসরণ করতে থাকবে) শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে ডাকে না কেন?" (লুকমান ঃ ২১)

"এর পূর্বে আমরা কি এমন কোন কিতাব এদেরকে দিয়েছিলাম যার সনদ (তাদের ফেরেশতা পূজার জন্যে) এরা তাদের কাছে রাখে? না, বরঞ্চ এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক পদ্ধতিতে চলতে দেখেছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলবো। (হে মুহাম্মদ) এভাবে তোমার পূর্বে যে জনপদে আমরা কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি, এর সচ্ছল লোকেরা এ কথাই বলতো, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক পদ্ধতিতে চলতে দেখেছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করেই চলছি। প্রত্যেক নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করে। তোমরা কি সেই পথেই চলতে থাকবে যে পথে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছ তার থেকে সঠিক পথ আমি বলে দিই না কেন? তারা সকল নবীকে এ জবাবই দিয়েছে। যে দ্বীনের প্রতি আমাদেরকে ডাকার জন্যে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করছি।" (যুখরুফ ২১-২৪)

"এরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী করে যাদের (মাবুদ হওয়া সম্পর্কে) আল্লাহ কোন সনদ নাযিল করেননি। আর না এদের কাছে (তাদের খোদায়ীতে অংশীদার ও এবাদতের হকদার হওয়ার) কোন জ্ঞান আছে।" (হজ্ব ঃ ৭১)

এসব আয়াতে এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের নিকটে অন্যান্যদেরকে খোদার শরীক এবং এবাদতের হকদার গণ্য করার কোন দলিল প্রমাণ নেই। তারা নিছক বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করছে। শুধু আন্দাজ অনুমান দ্বারা এ কথা মনে করে আছে যে, অমুক অমুক সত্তা খোদায়ীর এখতিয়ার ও ক্ষমতার মধ্য থেকে কোন অংশ লাভ করেছে তার কারণে তারা তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে। অথচ খোদা কখনো কোনভাবেই তাদেরকে একথা বলেননি যে, তিনি তাঁর এখতিয়ারের মধ্যে অমুক অংশ অমুক সত্তাকে দিয়েছেন। তাদের কাছে সরাসরি এমন কোন জ্ঞান নেই যে, অমুক হযরত বুযর্গ অথবা অমুক দেবদেবী খোদার এখতিয়ারসমূহের এই এই এখতিয়ার লাভ করেছে। এই সাথে কুরআনে বারবার শির্ক ভ্রান্ত ও অবাস্তব হওয়ার দলিলও পেশ করা হয়েছে।

"আচ্ছা তিনি কে যিনি আসমান জমিন পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তার দ্বারা সুন্দর বাগান উৎপন্ন করেছেন যার বৃক্ষরাজী উৎপন্ন করা তোমাদের সাধ্যে ছিল না? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন খোদা কি (এসব কাজে) অংশীদার আছে? নেই। বরঞ্চ এসব লোকই সত্য সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে এবং তিনি কে যিনি জমিনকে আবাসস্থল বানিয়েছেন এবং তার মধ্যে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার মধ্যে পাহাড়-পর্বতের পেরেক গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দু'টি ভান্ডারের (মিষ্টি ও লবণাক্ত) মধ্যে পর্দার অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন খোদা এসব কাজে শরীক আছে কি? না, বরঞ্চ এদের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞানহীন। এমন কে আছেন যিনি অসহায়ের দোয়া শুনেন যখন সে তাঁকে ডাকে? এবং কে তার কষ্ট দূর করেন? কে তোমাদেরকে জমিনের খলিফা বানান? আল্লাহর সাথে (এসব কাজে) অন্য কোন খোদা শরীক আছে কি? তোমরা কমই চিন্তা-ভাবনা কর। কে তোমাদেরকে মরুভূমি ও সমুদ্রের আঁধারে পথ দেখান? কে বাতাসকে কে তাঁর রহমতের (বর্ষণের) আগে সুসংবাদসহ পাঠান? আল্লাহর সাথে অন্য কোন খোদা কি আছে (যে

এসব কাজ করে)? তারা যেসব শির্ক করে তার থেকে আল্লাহ অতি উচ্চ ও মহান। কে সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করেন। কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দেন? আল্লাহর সাথে (এসব কাজে) অন্য কোন খোদা অংশীদার আছে কি? (হে নবী) এদেরকে বল, তোমরা তোমাদের শির্কে যদি সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণ পেশ কর।" (নমল ঃ ৬০-৬৪)

"তিনি বড়ো বরকতশালী যিনি এ ফুরকান তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন যাতে করে সে দুনিয়াবাসীদের জন্যে সতর্ককারী হয়। তিনি জমিন ও আসমানের বাদশাহীর মালিক-যিনি কাউকে পুত্র বানাননি। বাদশাহীতে যার সাথে কেউ শরীক নেই। যিনি প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন । তারপর তার এক তকদীর নির্ধারিত করেছেন। মানুষ তাঁকে ছেড়ে এমন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে যা কিছু পয়দা করে না বরঞ্চ তাদেরকেই পয়দা করা হয়। যে লাভ লোকসানের কোন এখতিয়ার রাখে না। যে না মৃত্যু ঘটাতে পারে, না জীবিত করতে পারে। আর না মৃতকে পুনরায় জীবিত করে উঠাতে পারে (ফুরকান ঃ ১-৩)

সূরায়ে নাহলের ৩ থেকে ১৬ আয়াতে আল্লাহতায়ালার বহু সৃষ্টি কৌশল বয়ান করার পর বলা হয়েছে, "যে সৃষ্টি করে এবং যে মোটেই কিছু সৃষ্টি করতে পারে না" উভয়ে কি সমান হতে পারে? তোমরা কি সম্বিত ও চেতনা ফিরে পাবে না? (১৭ আয়াত)

"(হে নবী) এদেরকে জিজ্ঞেস করঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রব কে? বল আল্লাহ। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাঁকে ছেড়ে তোমরা কি অন্যান্যকে করিতকর্মা গণ্য করেছ যারা স্বয়ং নিজেদেরই লাভ-লোকসান করার এখতিয়ার রাখে না? এদেরকে বলঃ অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কি কখনো সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার সমান হতে পারে? এসব লোক যাদেরকে আল্লাহর শরীক গণ্য করে রেখেছে তারাও কি কিছু আল্লাহর মতো সৃষ্টি করেছে। যার কারণে এদের জন্যে সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহজনক হয়েছে? এদেরকে বলঃ আল্লাহ-ই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক-সকলের উপরে বিজয়ী।" (রা'দ ঃ ১৬)

"হে নবী! এদেরকে বলঃ তোমরা কি তোমাদের ওসব শরীকদেরকে দেখেছ যাদেরকে তোমরা খোদাকে ছেড়ে ডাক? আমাকে বল তারা জমিনে কি পয়দা করেছে? আসমানে তাদের কি কোন অংশীদারিত্ব আছে? অথবা আমরা কি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যার ভিত্তিতে তারা (তাদের শির্কের জন্যে) কোন সনদ রাখে? কিছুই না। বরঞ্চ এ জালেমরা একে অপরকে নিছক প্রতারণার টোপ দিচ্ছে।" (ফাতের ঃ ৪০)

"এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আসমানসমূহ ও জমিন কে পয়দা করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! এদেরকে বলঃ তাহলে তোমাদের কি ধারণা যে যদি আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চান, তাহলে তোমাদের দেবীগণ-আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তোমরা ডাক-তাঁর প্রেরিত ক্ষতি থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার উপর মেহেরবাণী করতে চান তাহলে এরা তাঁর মেহেরবাণীকে ঠেকিয়ে রাখবে? (তারা এমনটি করতে পারবে একথা যদি তারা বলতে না পারে) তাহলে তাদেরকে বলঃ আল্লাহ-ই আমার জন্যে যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তার উপরেই ভরসা করে।"(যুমার ঃ ৩৮)

মুশরিকগণ বলতো, আমাদের মাবুদ আল্লাহর নিকটে আমাদের জন্যে নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আমাদের সুপারিশকারী। এজন্যে আমরা তাদের এবাদত করি। তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করি, সাহায্যের জন্যে তাদেরকে ডাকি যাতে তারা আমাদের সাহায্যকারী

হয়, আমাদের উপকার করে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচায়। তাদের এ ধারণারও বিশদভাবে খন্ডন কুরআনে করা হয়েছে।

"এসব লোক আল্লাহকে ছেড়ে তাদের এবাদত করে যা এদের কোন লাভ-লোকসান করতে পারে না। এরা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (হে নবী) এদের বলঃ তোমরা কি আল্লাহকে সে বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি আসমানসমূহেও জানেন না এবং জমিনেও জানেন না? তিনি পবিত্র ও উচ্চতর ঐ শির্ক থেকে যা এসব লোক করে।" (ইউনুস ঃ ১৮)

এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের জন্যে অন্য কতিপয় পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে রেখেছে (তারা বলে)ঃ "আমরাতো তাদের এবাদত শুধু এজন্যে করি যে,আমাদেরকে তারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে।" "আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যকার ঐসব বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে। আল্লাহ্ এমন কাউকে হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও সত্য অস্বীকারকারী হয়।" (যুমার ঃ ১৩)

"এসব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য খোদা বানিয়ে রেখেছে যাতে করে তারা এদের সাহায্যকারী হয়। কেউ সাহায্যকারী হবে না। তারা সকলে তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং আখেরাতে উল্টো তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।" (মরিয়ম ঃ ৮১-৮২)

"এসব লোক আল্লাহকে ছেড়ে কিছু অন্য খোদা বানিয়ে রেখেছে এবং এরা আশা করে যে, তারা এদের সাহায্য করবে। তারা এদের কোনই সাহায্য করতে পারে না। বরঞ্চ এসব লোক উল্টো তাদের জন্যে সার্বক্ষণিক লস্কর হয়ে আছে (যার বদৌলতে তাদের খোদায়ী চলছে)।" (ইয়াসীন ঃ ৭৪-৭৫)

"কে এমন আছে যে আল্লাহর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে?" (বাকারাহ ঃ ৫৫)

"হে নবী! (এ মুশরিকদের) বলঃ তাদেরকে তোমরা ডেকে দেখ না যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের মাবুদ মনে করে বসে আছ। তারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন বস্তুর মালিকও নয়। না আসমানে না জমিনে, না জমিন ও আসমানের খোদায়ীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে। না তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী। এবং আল্লাহর ওখানে শাফায়াত কোন কাজে লাগবে না, অবশ্যি তার কথা আলাদা যাকে শাফায়াত করার এবং যার পক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন।"(সাবা ঃ ২২-২৩)

"তার থেকে প্রবঞ্চিত আর কে হতে পারে- যে আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে কোন জবাব দিতে পারে না, বরঞ্চ তারা এর থেকেও বেখবর যে এসব লোক তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে? এবং যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে তখন তারা তাদের প্রার্থনাকারীদের দুশমন হবে এবং এবাদত অস্বীকার করবে।" (আহকাফ ঃ ৫-৬)

"আল্লাহকেই ডাকা সঠিক। এখন আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে এরা ডাকছে তারা এদের ডাকের কোন জবাব দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকার দৃষ্টান্ত এমন যে কোন ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে পানির কাছে আবেদন জানাচ্ছেঃ "তুমি আমার মুখের মধ্যে এসে যাও।" অথচ পানি তার কাছে পৌছতে পারে না। এমনি কাফেরদের দোয়াও অর্থহীন, একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর মাত্র।" (রা'দ ঃ ১৪)

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। সে তার ঘর বানায় এবং সকল ঘর থেকে অধিক দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায়, যদি তারা কোন জ্ঞান রাখতো।" (আনকাবুত ঃ ৪১)

"হে লোকেরা! একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনো। আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করেনি। তারা সকলে মিলে এটা করতে চাইলেও পারবে না। বরঞ্চ মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিয়ে গেলে তা উদ্ধার করতেও পারে না। যারা সাহায্য চায় তারাও দুর্বল এবং যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তারাও দুর্বল। তারা মোটে আল্লাহর মর্যাদাই বুঝলো না যেমন বুঝা উচিত ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী ত একমাত্র আল্লাহ।" (হজ্ব ঃ ৭৩-৭৪)

"এরা তাদেরকে খোদার শরীক গণ্য করে যারা কোন কিছুই পয়দা করেনি, বরঞ্চ তাদেরকেই পয়দা করা হয়? তারা না এদেরকে সাহায্য করতে পারে, আর না নিজেদের সাহায্য করতে সক্ষম।" (আ'রাফ ঃ ১৯১-১৯২)

সূরা নহলের আয়াত ৬৫ থেকে আয়াত ৭২ পর্যন্ত মানুষের প্রতি আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ অনুকম্পা ও তাঁর নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ-

"লোক (এসব কিছু দেখে শুনেও) কি বাতিলকে মানে এবং আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ অনুকম্পা অস্বীকার করে? এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত করে যাদের আসমান থেকে রিযিক দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই, আর না জমিন থেকে। আর এ কাজ তারা করতেই পারে না।" (নহল ঃ ৭২-৭৩)

"আল্লাহকে ছেড়ে এরা কি কতিপয় সত্তাকে শাফায়াতকারী বানিয়ে রেখেছে? এদের বলঃ তারা কি শাফায়াত করবে তাদের এখতিয়ারে কিছু না থাকলেও? এবং তারা না বুঝলেও? বলঃ শাফায়াতের পুরো ব্যাপারটি আল্লাহর এখতিয়ার। আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" (যুমার ঃ ৪৩-৪৪)

"তোমাদের আশেপাশে বহু জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা নিদর্শনাবলী পাঠিয়ে বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝিয়েছি যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে। তারপর কেনইবা ওসব সত্তা তাদেরকে মদদ করলো না যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আল্লাহরই নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে মাবুদ বানিয়েছিল? বরঞ্চ (আযাব আসার সময়) তারা তাদের থেকে কেটে পড়েছে। এ ছিল তাদের মিথ্যা ও কাল্পনিক আকীদার পরিণাম যা তারা রচনা করে রেখেছিল।" (আহকাফ ঃ ২৭-২৮)

সূরা ফাতেরে আয়াত ১১ থেকে আয়াত ১৩ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অলৌকিকত্ব বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ "ঐ আল্লাহ (এসব কাজ যাঁর দ্বারা হচ্ছে) তোমাদের রব। বাদশাহী একমাত্র তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা তৃণখন্ডের মতো কোন জিনিসেরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে সে ডাক তারা শুনতে পাবে না। শুনলেও তার কোন জবাব দিতে পারবে না। এবং কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ক অস্বীকার করবে।" (ফাতের ঃ ১৩-১৪)

"আল্লাহই সঠিকভাবে ফয়সালা করেন। এখন যাদেরকে (এ মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে, তারা কোন কিছুর ফয়সালা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-ই সব কিছু শুনেন ও দেখেন।" (মুমেন ঃ ২০)

তারপর লোকদেরকে বলা হয় যে, যারা ইজ্জত (কোন সাহায্যকারী শক্তির সাহায্য) চায়, তার কোন সুপারিশকারী, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম তালাশ করার এবং নযর-নিয়ায পেশ করার প্রয়োজন নেই। তার উপায় মাত্র একটি-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا - اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ-

(فاطر ١٠)

যে কেউ ইজ্জত-সম্মান চায় (তার জেনে রাখা উচিত যে) ইজ্জত পুরোপুরি আল্লাহর। তার দিকে যে জিনিস উপরে উত্থিত হয় তা শুধু পবিত্র কথা এবং নেক আমল তাকে উপরে উঠায়। (ফাতের ঃ ১০)

মুশরিকরা আল্লাহর সন্তানের কথা বলেছে এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে গণ্য করে ও তাদের এবাদত করে। এ বিষয়ে কুরআনে কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করে এ বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করেছে।

এসব লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে পয়দা করেছেন। এবং এরা তাঁর জন্যে না জেনে বুঝেই পুত্র-কন্যা রচনা করেছে। এরা যেসব কথা বলে তার থেকে তিনি পাকপবিত্র ও মহান। তিনি ত আসমান ও জমিনের অস্তিত্বদানকারী। তাঁর সন্তানাদি কি করে হতে পারে যখন তাঁর কোন জীবন সঙ্গিনী নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু পয়দা করেছেন এবং প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান রাখেন। ইনিই হচ্ছেন আল্লাহ-তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন খোদা নেই-তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর। তিনি সব জিনিসের দায়িত্বশীল। (আনয়াম ঃ ১০০-১০২)

"এরা বলে রহমানের সন্তান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ! তারা অর্থাৎ ফেরেশতারা ত বান্দাহ্ যাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁর সামনে তারা উঁচু গলায় কথা বলতে পারে না। বরঞ্চ তাঁর হুকুম মেনে চলে। যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে তাও তিনি জানেন এবং যা তাদের জ্ঞানের অগোচরে সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত। যার পক্ষে আল্লাহ্ সুপারিশ শুনতে রাজী এমন ছাড়া আর কোন সুপারিশ তারা করে না। তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত। তাদের মধ্যে যদি কেউ এমন কথা বলে বসেঃ "আল্লাহ ছাড়া আমিও খোদাঃ, তাহলে তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দিব। এমন প্রতিদান আমরা জালেমদের দিয়ে থাকি।"
(আম্বিয়া ঃ ২৬-২৯)

"এসব লোক তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে কিছুকে তাঁর অংশ মনে করে নিয়েছে। আসলে মানুষ স্পষ্টতই বড়ো অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টিসমূহ থেকে নিজের জন্যে কন্যা বেছে নিয়েছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন? অথচ ব্যাপার এই যে, যাদেরকে এরা দয়ালু খোদার সন্তান বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন এ লোকদের মধ্যে কাউকে দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। আল্লাহর ভাগে কি সেসব সন্তান এলো যাদেরকে অলংকার দিয়ে লালন-পালন করা হয়-এবং তারা তর্কেও নিজেদের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে পারে না। দয়াবান আল্লাহর বান্দাহ ফেরেশতাদেরকে যে এরা মেয়েলোক মনে করেছে, তাদের দেহের গঠন কি তারা দেখেছে? তাদের সাক্ষ্য নেয়া হবে এবং তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।"
(যুখরুফ ঃ ১৫-১৯)

"অতঃপর এদেরকে একটু জিজ্ঞেস কর- তাদের মন একথায় সায় দেয় কিনা যে তোমাদের রবের জন্যে ত হবে কন্যা সন্তান আর এদের (বা তোমাদের) জন্যে হবে পুত্র সন্তান? আমরা ফেরেশতাদেরকে মেয়েলোক বানিয়েছি এবং এরা কি চাক্ষুষ দেখা কথা বলছে? ভালোভাবে শুনে রাখ, প্রকৃতপক্ষে এরা মনগড়া কথা বলছে যে আল্লাহ্‌র সন্তান আছে। আর বাস্তবে এরা মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ্ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন? তোমাদের হয়েছে কি? কি ধরনের মতামত ব্যক্ত করছ? তোমাদের কি সম্বিৎ ফিরে আসছে না? তারপর তোমাদের নিকটে এসব কথার কোন সনদ থাকে তাহলে সে গ্রন্থ পেশ কর। (যার মধ্যে এসব লেখা আছে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সাফফাত ঃ ১৪৯-১৫৭)

"তোমরা কখনো কি এই লাৎ, ওয্যা এবং তৃতীয় আর এক দেবী মানাতের বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছ? পুত্র তোমাদের জন্যে আর কন্যা আল্লাহ্‌র জন্যে? এতো বড়ো প্রতারণামূলক বন্টন! আসলে এসব কিছুই নয়। ব্যস শুধু কয়েকটি নাম যা তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদার পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ এদের জন্যে কোন সনদ নাযিল করেননি (যাতে তিনি স্বয়ং বলেছেন যে এগুলো আমার কন্যা)। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এসব লোক নিছক কুসংস্কার ও আন্দাজ অনুমানের অনুসরণ করছে এবং প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েছে। অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হেদায়েত এসেছে।"
(নজম ঃ ১৯-২৩)

শির্কের এক একটি দিকের খন্ডন করার সাথে মুশরিকদেরকে কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের মাবুদগুলোর জন্যে কাজ এছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমরা তাদের সামনে নযর-নিয়ায পেশ করবে এবং পূজা-পার্বন করতে থাকবে এবং তাদের কাছে এ দোয়া চাইবে যেন তারা দুনিয়ায় তোমাদের মনষ্কামনা পূরণ করতে থাকে। তোমাদের এমন কোন মাবুদ নেই যে তোমাদের এ হেদায়েত দেবে যে দুনিয়ায় জীবন-যাপনের সঠিক মূলনীতি কি এবং ভুল কি, কোন পন্থা সঠিক এবং কোনটা ভ্রান্ত। অথচ এবাদতের হকদার যদি কেউ হয় তাহলে সেই হতে পারে যে বান্দাহদের ও পূজারীদের পথ প্রদর্শনও করবে।

"এদেরকে জিজ্ঞেস কর তোমাদের নির্ধারিত শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সত্যের দিকে পথ দেখায়? যে হকের দিকে পথ দেখায় সে কি অধিকতর অনুসরণযোগ্য, না সে যে নিজেই পথ পায় না? যদি তাকে পথ দেখানো হয়ত আলাদা কথা। প্রকৃত ব্যাপার এই যে এদের অধিকাংশই আন্দাজ অনুমানের পেছনে চলছে। অথচ অনুমান সত্যের প্রয়োজন কিছুই পূরণ করতে পারে না।" (ইউনুস ঃ ৩৬)

এভাবে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা শির্ক একেবারে নির্মূল করে মানুষকে ভালোভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, শির্ক এমন গোনাহ্ যা আল্লাহ্ কখনো মাফ করেন না, যতক্ষণ না মানুষ তার থেকে তওবা করে। এ গোনাহের সাথে মানুষ তার নিজের ধারণা মতে যতোই নেক কাজ করুক না কেন, সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

"আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার গোনাহ্ আল্লাহ্ কখনো মাফ করেন না। এছাড়া আর যতো গোনাহ্, তিনি ইচ্ছা করলে তা মাফ করে দিতে পারেন। আল্লাহ্‌র সাথে যে আর কাউকে শরীক গণ্য করবে সে বিরাট মিথ্যা আরোপ করলো এবং বিরাট গোনাহের কাজ করলো।" (নিসা ঃ ৪৮)

"হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলঃ তারপর হে নির্বোধেরা! তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া আর কারো বন্দেগী করতে আমাকে বলছ? অথচ তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি এ অহী পাঠানো হয়েছিল যে, যদি তোমরা শির্ক কর তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা ব্যর্থকাম হয়ে পড়বে। অতএব তোমরা আল্লাহরই বন্দেগী কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।" (যুমার ঃ ৬৪-৬৬)

৫. তৌহীদের দাবী

তৌহীদকে সত্য এবং শির্ককে সকল দিক দিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করার সাথে সাথে কুরআনে এ কথাও সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহকে এক ও লা শরীক রব ও মাবুদ মেনে নেয়ার পর-

(১) অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত বন্দেগী করা যাবে না।

و مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ و الانْس الاَّ لِيعْبُدُوْنِ - (الذاريات ٥٦)

-আমি জ্বিন ও মানুষকে আর কারো এবাদতের জন্যে নয় বরঞ্চ এ জন্যে পয়দা করেছি যে তারা শুধু আমার এবাদত করবে। (যারিয়াত ঃ ৫৬)

لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ و لاَ لِلْقَمرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ - (حم السجده - ٣٧)

-না সূর্যকে সিজদা কর না চাঁদকে। বরঞ্চ সেই আল্লাহকে সিজদা কর যিনি তাদেরকে পয়দা করেছেন, যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা একমাত্র তাঁরই এবাদতকারী হও। (হামীম সাজদাহ ঃ ৩৭)

انَّا اَنْزَلْنَا الَيْك الْكتب بِالْحقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ اَلاَ لِلّه الدِّيْنُ الخَالِصُ - (الزُّمَر ٢-٣)

(হে মুহাম্মদ)! আমরা এ কিতাব সত্যরূপে তোমার প্রতি নাযিল করেছি। অতএব তুমি আল্লাহরই এবাদত কর দ্বীনকে তাঁর জন্যে বিশুদ্ধ করে। সাবধান! বিশুদ্ধ দ্বীন আল্লাহরই অধিকার। (যুমার ঃ ২-৩)

قُلْ اِنِّى نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ - (المؤمن ٦٦)

- বলে দাও, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের এবাদত করতে যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া ডাক। (মুমেন ঃ ৬৬)

(২) এও অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে দোয়া করা যাবে না। অতি প্রাকৃতিক হিসাবে অভাব পূরণকারী কাজ সম্পন্নকারী মনে করে কারো সাহায্য ভিক্ষা করা যাবে না।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ (الفاتحة)

-হে আল্লাহ! একমাত্র তোমারই আমরা এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি।

و لاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَيَنْفَعُكَ و لاَيَضُرُّكَ ـ (يُونس ١٠٦)

-এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না, যে তোমার উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ـ (القصص ٨٨)

-এবং আল্লাহর সাথে আর কোন মাবুদকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না। তিনি ছাড়া প্রকৃত মাবুদ আর কেউ নেই।

و قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ- (المومن ٦٠)

-আর তোমাদের যে রব বলেন,-আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। যারা গর্বভরে আমার এবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুমেন-৬০)।[১]

و اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ـ (البقرة ـ ١٨٦)

এবং যখন আমার বান্দাহ্ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাকে বলো যে আমি নিকটেই আছি।[২] দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার দোয়ার জবাব দিই। (বাকারাহ ঃ ১৮৬)[৩]

---

(১) এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দোয়া এবং এবাদতের মর্ম একই। যে ব্যক্তি কারো কাছে যদি দোয়া প্রার্থনা করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে তার এবাদত করে-গ্রন্থকার।

(২) অর্থাৎ আমার কাছে দোয়া করার জন্যে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আমি সরাসরি দোয়া শুনি-গ্রন্থকার।

(৩) জবাবের অর্থ এ নয় যে, দোয়াকারী সে জবাব শুনতে পাবে। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, সকল আবেদন-নিবেদনের প্রত্যুত্তরে পদক্ষেপ গ্রহণ আমিই করি-গ্রন্থকার।

(৩) এটাও অপরিহার্য যে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে 'আলেমুল গায়েব'। অন্য কারো সম্পর্কে এমন ধারণা করা যাবে না যে সে সৃষ্টিজগতের গোপন প্রকাশ্য সকল রহস্য অবগত আছে এবং অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের জ্ঞান তার রয়েছে।

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوتِ وَ الاَرْضِ الْغَيْبَ الاَّ اللّٰهُ - (النمل ٦٥)

বল, আসমান ও জমিনে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপ্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (নমল ঃ ৬৫)

و عِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا الاَّ هُوَ و يَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِ وَ الْبَحْرِ - و مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ الاَّ يَعْلَمُهَا و لاَحَبَّةٍ فِى ظُلُمتِ الاَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَّ لاَ يَابِسٍ الاَّ فِى كِتبٍ مُّبِيْنٍ - (الانعام - ٥٩)

-তাঁরই হাতে রয়েছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। স্থলভাগে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা তিনিই জানেন। কোন গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে তা তিনি জানেন। জমিনের গভীর অন্ধকারে কোন বীজ এমন নেই আর কোন শুষ্ক ও সিক্ত এমন নেই যা একটি সুস্পষ্ট দপ্তরে সন্নিবেশিত নেই। (আনয়াম ঃ ৫৯)

(৪) এটাও অনিবার্য যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে অথবা কোন আস্তানায় কোন পশু জবাই অথবা কুরবাণী করা যাবে না। এমন প্রতিটি পশু হারাম হবে যা জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। অথবা আল্লাহর সাথে আর কারো নাম নেয়া হয়েছে। কুরআনে চার স্থানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম নেয়া হয়েছে তা হারাম (বাকারাহ ঃ ১৭৩, মায়েদা-৩, আনয়াম ঃ ১৪৫, নহল ১১৫)। সূরা মায়েদায় একথারও বিশদ বর্ণনা আছে যে, গায়রুল্লাহর জন্যে নজর হিসাবে কুরবানী করার জন্যে মুশরিকরা যেসব আস্তানা বানিয়ে রেখেছিল, সেখানে জবাই করা পশুও হারাম। (আয়াত ঃ ৩)

অতঃপর আনয়ামে পরিষ্কার বলা হয়েছে -

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - (ايت ١١٨)

-অতএব খাও ঐ পশুর গোশত থেকে যা (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।

وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّه لَفِسْقٌ - (ايت ١٢١)

-এবং খেয়ো না এমন কোন পশুর গোশত যার উপর (জবাইয়ের সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। কারণ এ খোদাদ্রোহিতা।

(৫) এটাও অপরিহার্য যে, যে খোদা সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে (নৈতিকতা, তাহযিব, তামাদ্দুন, সামাজিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন ও বিচার বিভাগ, যুদ্ধ সন্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে) মেনে নিতে হবে। তাঁর আইনই হবে আইন, তাঁর মুকাবিলায় অন্য কারো আইন রচনার এখতিয়ার থাকবে না। তিনি যা হারাম করেছেন তাই হারাম এবং তিনি যা হালাল করেছেন তাই হালাল। কারো এমন অধিকার নেই যে, সে নিজের পক্ষ থেকে হালাল ও হারাম নির্ধারণ করবে। মানুষ ব্যক্তি এবং দল হিসাবে না স্বাধীনভাবে তার মর্জি চালাবে, আর না এক খোদা ব্যতীত অন্য কারো মর্জিমত রচিত আইন-কানুন মেনে নেবে। মানুষের সকল ব্যাপারে ফয়সালা করার এখতিয়ার আল্লাহর, বান্দার নয়।

و مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ -
(الشورى ١٠)

তোমাদের মধ্যে যে বিষয়েই মতানৈক্য হোক, তা ফয়সালা করা আল্লাহর কাজ।
(শুরা : ১০)

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَم يَاذَنْ بِهِ اللّٰهُ - (الشُورى - ٢١)

-এসব লোক কি খোদার এমন শরীক রাখে যারা তাদের দ্বীনেরই অনুরূপ এমন শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (শুরা : ২১)

এ আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, এখানে শরীক বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়নি যাদের কাছে দোয়া করা হয়, যাদেরকে নযর-নিয়ায দেয়া হয়, যাদের সামনে পূজাপার্বন করা হয়। বরঞ্চ অনিবার্যরূপে এর অর্থ হচ্ছে সেইসব মানুষ যাদেরকে লোক হুকুম শাসনে শরীক বলে গণ্য করে। যাদের বর্ণিত চিন্তাধারা, আকীদাহ-বিশ্বাস, মতবাদ ও দর্শনের প্রতি মানুষ বিশ্বাস করে, যাদের দেয়া মূল্যবোধকে তারা মেনে চলে, যাদের উপস্থাপিত নৈতিক মূলনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদন্ড স্বীকার করে নেয় এবং যাদের রচিত আইন, কর্মপদ্ধতি ও ঐতিহ্য নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে, ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, সংস্কৃতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনে, বিচারালয়ে, রাজনীতি ও সরকার পরিচালনায় এমনভাবে অবলম্বন করে যেন এটাই তাদের শরীয়ত যার অনুসরণ তাদের করতে হবে।(৮)

اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ و رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحِ ابْنَ مَرْيَمِ - و مَا اُمِرُوْا الاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-
(التوبه - ٣١)

-তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের আলেম ও পীর দরবেশদেরকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবে মসীহ ইবনে মরিয়মকেও। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো বন্দেগী

করার হুকুম তাদেরকে দেয়া হয়নি, যে আল্লাহ ছাড়া বন্দেগী পাওয়ার অধিকারী আর কেউ নেই। তারা যেসব শিরক করে তার থেকে তিনি পাক পবিত্র। (তওবা ঃ ২১)

হাদীসে আছে হযরত আদী (রাঃ) বিন হাতেম পূর্বে ঈয়াসী ছিলেন। তিনি যখন নবী (সা)-এর দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হলেন তখন অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন এও করেন "এ আয়াতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আমরা আমাদের আলেম ও দরবেশগণকে খোদা বানিয়ে নিয়েছি-এর প্রকৃত মর্ম কি?"

জবাবে হুজুর (সা) বলেন, এ কি ঠিক নয় যে, তারা যা হারাম গণ্য করতো তা তোমরা হারাম মেনে নিতে এবং যা হালাল গণ্য করতো তা হালাল মেনে নিতে? তিনি বলেন, এ ত আমরা অবশ্যই করতাম। নবী (সা) বলেন, ব্যস্ এটাই তাদেরকে খোদা মেনে নেয়া হলো।

এর থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতীত যারা মানুষের জীবনের জন্যে জায়েয নাজায়েযের সীমারেখা নির্ধারণ করে তারাই প্রকৃতপক্ষে খোদায়ীর আসনে আপন গর্বভরে সমাসীন হয়। যারা তাদের এ শরীয়ত রচনার অধিকার স্বীকার করে নেয়, তারা তাদেরকে খোদা বানিয়ে নেয়।(৯)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلاً - قُلْ آاللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ - (يونس ٥٩)

-হে নবী তাদেরকে বল, তোমরা কখনো চিন্তা করে দেখেছ কি যে যেসব জীবিকা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নাযিল করেছিলেন তার মধ্যে তোমরা স্বয়ং কিছু হারাম এবং কিছু হালাল গণ্য করে নিয়েছ? এদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না আল্লাহর প্রতি তোমরা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করছ? (ইউনুস ঃ ৫৯)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ - (النمل ١١٦)

আর এই যে তোমাদের মুখ থেকে এ মিথ্যা হুকুম জারি করা হচ্ছে যে এ হারাম, এ হালাল, ত এ ধরনের হুকুম জারি করে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে তারা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। (নমল ঃ ১১৬)

وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .... هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - (المائده ٤٤ - ٤٥ - ٤٧)

এবং যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের........ তারাই জালেম...... তারাই ফাসেক। (মায়েদা ঃ ৪৪-৪৭)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ ـ (الجاثيه ٢٣)

তুমি কি দেখেছ সে ব্যক্তিকে যে তার প্রবৃত্তিকে তার খোদা বানিয়ে নিয়েছে (অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী হয়েছে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করা শুরু করেছে)। (জাসিয়া ঃ ২৩)

এভাবে রসূলুল্লাহ (সা) যে তৌহীদের শিক্ষা পরিবেশন করছিলেন তার দাবী শুধু এই ছিল য়ে, মানুষ যেন এক খোদা ব্যতীত আর কারো পূজা অর্চনা না করে। কারো কাছে দোয়া না চায় এবং কারো নামে কুরবানী না করে, তার শিক্ষা এটাও ছিল যে, লোকে যেন তাদের সকল রসম-রেওয়াজ, সকল নিজের রচিত অথবা অপরের রচিত আইন-কানুন ও নিয়মনীতি পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকে আইনদাতা মেনে নেয়। এবং তাঁর প্রদত্ত আইন মেনে চলে। এ ব্যাপারে স্বয়ং নবীও (সা) কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর প্রতিও এ আদেশ ছিল যে, তিনিও যেন আল্লাহর নাযিল করা আইন মেনে চলেন এবং নিজের মর্জি মতো কোন কিছুকে হালাল অথবা হারাম না করেন।

اِتَّبِعْ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ـ (الانعام ـ ١٠٦)

হে মুহাম্মদ (সা), আনুগত্য কর ঐ জিনিসের যা অহীর মাধ্যমে তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি পাঠানো হয়েছে।

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ـ
(التحريم ـ ١)

- হে নবী, তুমি কেন সে জিনিসকে হারাম করছ যা আল্লাহ তোমার জন্যে হালাল করেছেন?

এছিল এক সার্বিক বিপ্লবের দাওয়াত যা শুধু ধর্মই নয়, বরঞ্চ যা গোটা জীবন ব্যবস্থাকে বদলাতে চাচ্ছিল। এতে আরবের মুশরিকদের মধ্যে ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ করে কুরাইশদের স্বার্থে যে বিরাট আঘাত লাগছিল তাতে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ স্বয়ং তাদের গোত্র এবং আপন শহর থেকে এ দাওয়াত উত্থিত হওয়ায় তারা তাদের ধ্বংসই দেখতে পাচ্ছিল।(১০)

কুরাইশদের বিরোধিতার বড়ো ও বুনিয়াদী কারণ

কুরআন মজিদে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াত কবুল করতে কুরাইশরা যে বিপদের আশংকা করছিল তা ছিল নিম্নরূপ ঃ-

و قَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ـ
(القصص ٥٧)

তারা বলে, যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়েত অনুযায়ী চলা শুরু করি তাহলে আমাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হবে)। (কাসাস ঃ ৫৭)

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানতে পারা যায় যে, এটাই ছিল কুরাইশদের সত্যকে অস্বীকার করার বুনিয়াদী কারণ। একথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দেখা দরকার যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে সময় কুরাইশদের মর্যাদা কি ছিল যা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা তারা করেছিল।

প্রথমত ঃ যে জিনিসটি আরব দেশে তাদেরকে গুরুত্ব দান করেছিল তা হচ্ছে এই যে, আরবের বংশ তালিকা অনুযায়ী তারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর বলে প্রমাণিত ছিল। এর ভিত্তিতে তাদের পরিচয় আরববাসীদের দৃষ্টিতে পীরজাদাদের পরিবারের মর্যাদা লাভ করতো। অতঃপর কুসাই বিন কিলাবের চেষ্টা তদবীরে যখন তারা কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লী হয়ে পড়লো এবং মক্কা তাদের আবাসভূমি হলো, তখন তাদের গুরুত্ব আগের থেকে অনেক বেড়ে গেল। কারণ এখন তারা আরবের সর্ববৃহৎ তীর্থস্থানের পুরোহিত হয়ে পড়লো। সকল আরব গোত্রের ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন তারা লাভ করলো। আরবের কোন গোত্র এমন ছিল না যে, হজ্বের কারণে তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতো না। এই কেন্দ্রীয় মর্যাদানুযোগে তারা ক্রমশঃ ব্যবসায় উন্নতি করতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে রোম ও ইরানের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক ব্যবসা ক্ষেত্রে তাদেরকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করে। সে সময়ে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার সাথে রোম, গ্রীস, মিসর ও শাম দেশের যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো তার সকল ইরান অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সর্বশেষ পথ ছিল লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ইরান-ইয়ামেন অধিকার করার পর সে পথও বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার এছাড়া আর কোন পথ রইলো না যে, আরব ব্যবসায়ীগণ একদিকে রোমের অধিকৃত অঞ্চলের পণ্য দ্রব্যাদি আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরে পৌঁছাবে এবং অন্যদিকে এসব বন্দর থেকে প্রাচ্যের পণ্য দ্রব্য রোমের অধিকৃত অঞ্চলে পৌঁছাবে। এর ফলে মক্কা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ ব্যবসার একচেটিয়া তখন কুরাইশদের ছিল। কিন্তু আরবের বিশৃংখল ও অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশে পণ্য দ্রব্যাদির অবাধ চলাচল সম্ভব ছিল না। তবে যেসব উপজাতি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজপথ গিয়েছে, তাদের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক থাকলেই শুধু এসব পথে পণ্য দ্রব্যাদি চলাচল সম্ভব ছিল। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ সর্দারগণ শুধু নিজেদের ধর্মীয় প্রভাবকে যথেষ্ট মনে করত না। এজন্যে তারা সকল উপজাতির সাথে চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ ছিল। ব্যবসার মুনাফার একটা অংশ তাদেরকে দেয়া হতো এবং উপজাতি শায়খ ও সর্দারদের উপঢৌকন দিয়েও খুশী রাখা হতো। সুদী কারবারের এমন এক জালও বিস্তার করে রাখা হয়েছিল যার ফলে সকল প্রতিবেশী উপজাতিদের ব্যবসায়ী মহল ও সর্দারগণ জড়িত হয়ে পড়েছিল।

এমন অবস্থায় যখন নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে তৌহীদের দাওয়াত দেয়া হয়, তখন পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় গোঁড়ামি অপেক্ষা যে জিনিসটি নবীর বিরুদ্ধে কুরাইশদের উত্তেজনার কারণ ছিল তা এই যে, এ দাওয়াতের কারণে তারা তাদের স্বার্থকে বিপন্ন মনে করছিল। তারা মনে করছিল যে, ন্যায়সঙ্গত যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা শির্ক ও পৌত্তলিকতা ভ্রান্ত এবং তৌহীদ সঠিক প্রমাণিত হলেও ওসব পরিত্যাগ করে এটা গ্রহণ করা তাদের জন্যে মারাত্মক হবে। এমন করলে তৌহীদ গ্রহণ করলে সমগ্র আরব তাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। তাদেরকে কাবার পৌরহিত্য থেকে বেদখল করা হবে। পৌত্তলিক গোত্রদের সাথে চুক্তিকৃত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যার বদৌলতে তাদের ব্যবসায়ী দিনরাত তাদের বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করে। এভাবে এ নতুন দ্বীন তাদের ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তিও

বিনষ্ট করবে এবং সেই সাথে অর্থনৈতিক সাদৃশ্যও। বরঞ্চ এটাও অসম্ভব নয় যে সকল আরব উপজাতি তাদেরকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতেও বাধ্য করবে।

এখানে দুনিয়া পূজারীদের অদূরদর্শিতার আজব চিত্র মানুষের সামনে ফুটে ওঠে। রসূলুল্লাহ (সা) বার বার এ আশ্বাস দেন যে, আমার উপস্থাপিত কালেমা তোমরা মেনে নিলে আরব আজম তোমাদের অধীন হয়ে যাবে। কিন্তু তারা এর মধ্যে তাদের মরণই দেখতে পায়–তারা মনে করতো, যে ধনদৌলত ও প্রভাব প্রতিপত্তি তাদের রয়েছে, এ দাওয়াত কবুল করার সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যাবে-আরব ও আজম তাদের পদানত হওয়া তো দূরের কথা। তাদের আশংকা ছিল যে, এ কালেমা কবুল করা মাত্র এ ভূখন্ডে তারা এমন সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়বে যে, চিল ও কাক যেভাবে গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তেমন এ ভুখন্ড থেকে তাদেরকে উৎখাত করে দেয়া হবে এবং কোথাও তাদের আশ্রয় জুটবে না। তাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা সে অবস্থা দেখতে পারতো না যখন মাত্র ক'বছর পরই সমগ্র আরব মুহাম্মদ (সা) এর অধীন একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হতে যাচ্ছিল। অতঃপর উক্ত পুরুষের জীবনে ইরান, ইরাক, শাম, মিশর সবই এক একটি করে এ রাজ্যের অধীন হতে যাচ্ছিল এবং এ কথার পর এক শতাব্দী অতীত হওয়ার পূর্বেই কুরাইশদের প্রতিনিধিগণ সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত এবং কাফকাজ থেকে ইয়ামেনের সমুদ্রতীর পর্যন্ত দুনিয়ার এক বিরাট অংশের উপর শাসন করতে থাকে।

তার আপত্তির জবাবে কুরআন

কুরআন মজিদ তাদের ওসব ওজর আপত্তির যে জবাব সূরায়ে কাসাসে দিয়েছে তা দেখুন যে তা ছিল কত প্রভাব বিস্তারকারী ঃ

اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حرمًا امِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمرتُ كُلِّ شَيءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا و لٰكِنَّ اَكْثَرهُمْ لاَ يعْلَمُوْنَ

-(القصص ٥٧)

-ব্যাপার কি এ নয় যে, আমরা একটি নিরাপদ হারামকে তাদের বাসস্থান বানিয়ে দিয়েছি যেখানে সব রকমের ফল আমদানি হয় আমাদের পক্ষ থেকে রিযিক হিসাবে? তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (কাসাস ঃ ৫৭)

এ আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের ওজরের প্রথম জবাব। এর অর্থ এই যে, হেরেমের পূর্ণ নিরাপত্তা ও তার কেন্দ্রীয় মর্যাদার বদৌলতে সারা দুনিয়ার পণ্যদ্রব্য এ অনুর্বর উপত্যকায় আমদানি হচ্ছে, তা কি তোমাদের কোন চেষ্টা তদবীরের ফলে হয়েছে? আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রস্তরময় পর্বতপুঞ্জের মাঝে এ পানি ও তৃণ লতাহীন উপত্যকার জনৈক আল্লাহর বান্দাহ তাঁর বিবি ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি পাথরের উপর পাথর রেখে একটি হুজরা নির্মাণ করে উচ্চস্বরে বলেন, "আল্লাহ এটাকে হেরেম বানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘরের দিকে আস এবং এর তওয়াফ করো।'

এখন এ আল্লাহর প্রদত্ত বরকত ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পঁচিশ শতাব্দী যাবত এ স্থানটি আরবের কেন্দ্র স্থল হয়ে আছে। ভয়ানক নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশেও দেশের মধ্যে এ স্থানটিই এমন যেখানে নিরাপত্তা আছে। আরবের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ তার তওয়াফের জন্যে আসে। এ নিয়ামতের

সুফল তো এই যে, তোমরা আরববাসীদের সর্দার হয়ে পড়েছ এবং দুনিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ তোমাদের হাতে রয়েছে। তোমরা কি মনে কর যে, যে খোদা তোমাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন, তার থেকে বিমুখ ও তাঁর বিদ্রোহী হয়ে তোমরা ত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে, কিন্তু তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করা মাত্রই ধ্বংস হয়ে যাবে? তারপর বলা হলোঃ

وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَ كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ - (القصص ٥٨)

-এবং কত জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি যার লোকজন তাদের জীবন-জীবিকার জন্যে ভয়ানক গর্বিত ছিল। এখন দেখ, তাদের ঘরদোর খালি পড়ে আছে যার মধ্যে তাদের পরে কম লোকই বসবাস করেছে। অবশেষে আমরাই এসবের উত্তরাধিকারী হলাম।"
(কাসাস ঃ ৫৮)

এ ছিল তাদের ওজর আপত্তির দ্বিতীয় জবাব। এর অর্থ এই যে, যে ধন দৌলত ও স্বাচ্ছন্দে তোমরা গর্বিত এবং হারাবার আশংকায় তোমরা বাতিলের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে এবং সত্য পথ থেকে মুখ ফেরাতে চাচ্ছ, এসব কিছু এক সময়ে আদ, সামুদ, সাবা. মাদইয়ান এবং কওমে লূতের লোকেরাও লাভ করেছিল। এসব কি তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পেরেছে? আসলে জীবনের মান উন্নয়নই তো একটি লক্ষ্যবস্তু নয় যে মানুষ হক ও বাতিল থেকে বেপরোয়া হয়ে ব্যস্ শুধু তার পেছনেই লেগে থাকবে এবং সত্য পথ এজন্যে কবুল করতে অস্বীকার করবে যে, তা করলে এ লক্ষ্যবস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। তোমাদের নিকটে এর কি কোন নিশ্চয়তা আছে যে, যে গোমরাহি ও পাপাচার অতীতের সচ্ছল জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছে, তার উপরে জিদ ধরে বসে থেকে তোমরা বেঁচে যাবে? তাদের মতো পরিণাম কি তোমাদের হবে না? তারপর বলা হচ্ছেঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا - وَ مَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلاَّ وَ اَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ - (القصص :٥٩)

-এবং তোমার রব জনপদগুলো ধ্বংস করেননি যতোক্ষণ না তাদের কেন্দ্রে একজন রসূল পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনায়। ওসব জনপদের অধিবাসী জালেম না হলে আমরা জনপদ ধ্বংস করি না। (কাসাস ঃ ৫৯)

এছিল তাদের ওজরের তৃতীয় জবাব। আগে যেসব জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের লোকজন জালেম ছিল কিন্তু খোদা তাদের ধ্বংসের পূর্বে তাঁর রসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তাঁর সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও যখন তারা তাদের ভ্রষ্টতা থেকে বিরত হলো না তখন তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। এ অবস্থার সম্মুখীন এখন তোমরা হয়েছ। তোমরাও জালেম হয়ে পড়েছ। তোমাদের সতর্ক করে দেয়ার জন্যে একজন রসূলও এসে

গেছেন। এখন তোমরা কুফর ও নাস্তিকতা অবলম্বন করে তোমাদের সুখ সম্ভোগ ও সচ্ছলতা রক্ষা করতে পারবে না, বরঞ্চ উল্টো বিপন্ন করবে। যে ধ্বংসের আশংকা তোমরা করছ তা ঈমান আনার কারণে হবে না, হবে অস্বীকার করার কারণে। তারপর এরশাদ হলোঃ

وَ مَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا - وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ - اَ فَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ - (القصص ٦٠-٦١)

-তোমাদেরকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী ও তার সৌন্দর্য শোভা। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে তা এর থেকে উৎকৃষ্টতর এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমরা কি বিবেক বুদ্ধি খাটাও না? যাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং যে প্রতিশ্রুত বস্তু অবশ্যই লাভ করবে সে কি তার মত হতে পারে যাকে আমরা শুধু দুনিয়ার সামগ্রী দিয়েছি এবং যাকে কিয়ামতের দিন শাস্তির জন্যে উপস্থাপিত করা হবে? (কাসাস ঃ ৬০-৬১)

এ হলো তাদের ওজরের চতুর্থ জবাব। এ জবাব বুঝবার জন্যে প্রথমে দু'টি জিনিস হৃদয়ংগম করতে হবে।

প্রথম এই যে, দুনিয়ার জীবনের মেয়াদ কয়েক বছরের বেশী নয়। নিছক একটি সফরের সাময়িক স্তর। প্রকৃত চিরস্থায়ী জীবন ভবিষ্যতে আসবে। বর্তমান সাময়িক জীবনে মানুষ যতোই সামগ্রী জমা করুক এবং যতোই আনন্দ-সম্ভোগের জীবন যাপন করুক না কেন, তা অবশ্যই শেষ হবে এবং এখানকার যাবতীয় সামগ্রী এখানেই ছেড়ে যেতে হবে। এ আনন্দ-সম্ভোগের মুকাবিলায় একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটাকেই অগ্রাধিকার দেবে যে, এখানে কয়েক বছর বিপদ মুসিবত ভোগ করবে কিন্তু এখান থেকে এমন পুণ্য অর্জন করে যাবে যা পরবর্তী চিরন্তন জীবনে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ হবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, আল্লাহর দ্বীন মানুষের কাছে এ দাবী করে না যে, এ দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী থেকে কোন ফায়দা হাসিল করবে না এবং তারা সৌন্দর্যশোভা অযথা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। তার দাবী শুধু এই যে, দুনিয়ার উপরে আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেবে। কারণ দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত অনন্তকালীন। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ নিকৃষ্ট এবং আখেরাতের সুখ শান্তি উৎকৃষ্ট। এজন্যে দুনিয়ার সে সব সামগ্রী ও সৌন্দর্যশোভা মানুষের অবশ্যই লাভ করা উচিত যা আখেরাতের স্থায়ী জীবনের সাফল্য দান করে। অথবা নিদেনপক্ষে তাকে যেন সেখানকার স্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন যদি এসে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার সাফল্য এবং আখেরাতের সাফল্য যদি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তখন মানুষের কাছে দ্বীনে হকের দাবী এই যে, এবং সুস্থ বিবেকের দাবীও তাই যে, মানুষ দুনিয়াকে আখেরাতের জন্যে কুরবান করবে এবং এ দুনিয়ার সাময়িক সুখ সম্ভোগের খাতিরে সে পথ কখনোই অবলম্বন

করবে না যার দ্বারা চিরকালের জন্যে তার পরিণাম মন্দ হয়।

এ দু'টোকে সামনে রেখে দেখুন, আল্লাহ্ উপরের বাক্যগুলোতে কি বলছেন। তিনি এ কথা বলছেন না ব্যবসা-বাণিজ্য উঠিয়ে ফেল, কারবার বন্ধ করে দাও। আমাদের পয়গম্বরকে মেনে নিয়ে দারিদ্রবরণ কর। বরঞ্চ তিনি বলছেন, এ দুনিয়ার যে ধন দৌলতের মধ্যে ডুবে আছ তা অতি অল্প এবং অল্প সময়ের জন্যে এ দুনিয়ার জীবনে তার থেকে ফায়দা হাসিল করতে পার। তার বিপরীত আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা এর তুলনায় গুণ ও পরিমাণের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী। এজন্যে তোমরা বোকামি করবে যদি সাময়িক জীবনের সীমিত নিয়ামত ভোগ করার জন্যে এমন আচরণ কর যার পরিণাম আখেরাতের চিরন্তন ক্ষতির আকারে তোমাদের ভোগ করতে হয়। তোমরা স্বয়ং তুলনা করে দেখ, সাফল্যলাভকারী কি সে ব্যক্তি যে কঠোর পরিশ্রম ও প্রাণান্তকর চেষ্টাসহ তার রবের আনুগত্য করে এবং তারপর চিরদিনের জন্যে তার নিয়ামত দ্বারা ভূষিত হয়, অথবা সে যাকে অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করে খোদার আদালতে পেশ করা হবে- তা সে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে কিছু দিনের জন্যে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ উপভোগ করার সুযোগ লাভ করুক না কেন। শেষে বলা হয়েছে ঃ

و يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ـ (القصص ٦٣)

-এবং (এরা যেন ভুলে না যায়) সেদিন যখন তিনি এদেরকে ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীক যাদেরকে তোমরা ধারণা করেছিলে? (কাসাস ঃ ৬৩)

এ কথাও এ চতুর্থ জবাব প্রসংগেই বলা হয়েছে। এর সম্পর্ক উপরের আয়াতের শেষ বাক্যের সাথে। এতে বলা হয়েছে যে, নিছক নিজের দুনিয়াবী স্বার্থের খাতিরে শির্ক, পৌত্তলিকতা এবং নবুওয়ত অস্বীকারের যে গোমরাহীতে পড়ে থাকার এরা জিদ ধরছে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে তার কি ভয়াবহ পরিণাম তাদের দেখতে হবে। এর থেকে এ অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যে, মনে কর দুনিয়ায় তোমাদের উপর কোন বিপদ যদি নাই আসে এবং এখানকার ক্ষণস্থায়ী জীবনে খুব আনন্দ সম্ভোগ করলে, তারপরও যদি আখেরাতে তার পরিণাম এ ধরনের হয়, তাহলে নিজে নিজেই চিন্তা করে দেখ এটা কি মুনাফার সওদা যা তোমরা করছ, না একেবারে লোকসানের সওদা?(১১)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

রেসালাতে মুহাম্মদীর উপর ঈমানের দাওয়াত

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ ছিল যে, এক ও লা-শরীক আল্লাহকে একমাত্র মাবুদ ও একমাত্র শাসক ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বের মালিক মেনে নেয়ার পর একথাও মেনে নিতে হবে যে রসূলই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পয়গম্বর যার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা মানুষকে হেদায়েত দান করেন, হুকুম-আহকাম প্রদান করেন, এবাদতের পন্থাপদ্ধতি শিক্ষা দেন, সঠিক আকিদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেন, আমল আখলাকের সঠিক ও ভ্রান্ত মূলনীতির পার্থক্য শিক্ষা দেন। তারপর নিজের সেসব আইন-কানুনও পাঠিয়ে দেন যার অনুকরণ-অনুসরণ মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে করতে হয়। এজন্যে আল্লাহর তৌহীদের উপর ঈমান আনার পর লোকের জন্যে এ পরিহার্য যে, তারা রসূলের রেসালাতের উপর ঈমান আনবে। তাঁকে আল্লাহর মর্জির একমাত্র প্রতিনিধি মেনে নেবে। সকলের আনুগত্য পরিহার করে তাঁরই আনুগত্য করবে। অন্যান্য সকল আনুগত্য পরিত্যাগ করে ঐসব আহকাম ও হেদায়েতের অনুসরণ করবে যা রসূল তাঁর প্রেরণকারী এক খোদার পক্ষ থেকে দেন। এভাবে এ রেসালাতের বিশ্বাস সেই বিরাট বিপ্লবকে বাস্তব রূপ দান করছিল যা আল্লাহর তৌহীদ স্বীকার করিয়ে ইসলাম মানব জীবনে সংঘটিত করতে চাইতো। কারণ তৌহীদ মেনে নেয়ার পর যখন মানুষ এ কথায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এখন তাকে আল্লাহরই এবাদত বন্দেগী করতে হবে এবং তারই হেদায়েত অনুযায়ী চলতে হবে। তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, সে তার এ বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করবে কিভাবে? কিভাবে সে জানতে পারবে যে, আল্লাহর এবাদত বন্দেগীর সঠিক পন্থা কি এবং তাঁর সে হেদায়েত কি যা এখন মেনে চলতে হবে। কুরআন বলে সে পন্থা পদ্ধতি চিরকালই এই ছিল যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে তাঁর রসূল বানিয়ে তাঁকে এমন সব বিষয়ের জ্ঞান দান করেন যার উপর আমল করা তাঁর মর্জি মোতাবেক। তাঁর বন্দেগী করার এ ছাড়া অন্য কোন বাস্তব পন্থা নেই যে, রসূলের রেসালত মেনে নিয়ে তারই অনুকরণ-অনুসরণ করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, কুসংস্কার ও ধ্যান-ধারণা, দ্বীন ও ধর্ম, রেসেম-রেওয়াজ ও রীতিনীতি এবং বিভিন্ন বাতিল খোদার দাসত্ব আনুগত্যে বিভক্ত মানবতা একই কেন্দ্রে একীভূত হয়ে যায় এবং সেই দ্বীন বাস্তবে কায়েম হয়ে যায় যার উপর মানব জাতিকে একত্র ও একীভূত করা ইসলামী দাওয়াতের উদ্দেশ্য।

এ প্রসংগে কুরআন মজিদের শিক্ষা নিম্নক্রমানুসারে যদি দেখা যায়, তাহলে বিষয়টি পুরোপুরি হৃদয়ংগম করা যায়।

সৃষ্টির সূচনাকালে নবী প্রেরণের ঘোষণা

নবুওয়ত সম্পর্কে প্রথম যে কথাটি কুরআনে বলা হয়েছে, তা এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতির সূচনা লগ্নেই আদম সন্তানদের এই বলে সাবধান করে দেয়া হয় যে, রসূলগণের মাধ্যমে যে হেদায়েত তাদের নিকটে পাঠানো হবে তার আনুগত্য তাদেরকে করতে হবে।

يٰبَنِىْ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

(الاعراف ٣٥-٣٦)

-হে আদম সন্তানেরা! যদি তোমাদের কাছে স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকে (অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে) এমন রসূল আসে যে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে, তাহলে যে কেউ নাফরমানী থেকে দূরে থাকবে এবং নিজের আচরণ সংশোধন করবে তার জন্যে ভয়ভীতি ও দুঃখ কষ্টের কোন কারণ থাকবে না। আর যারা আমাদের আয়াত প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার মুকাবিলায় বিদ্রোহ করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (আ'রাফ ঃ ৩৫-৩৬)

রসূলদের মানা না মানার উপর মানুষের সাফল্য ও ক্ষতি নির্ভরশীল

একথাই সূরা বাকারা ৩৮-৩৯ আয়াত এবং সূরা তা'হা ১২৩-১২৪ আয়াতে বলা হয়েছে, যেখানে পৃথিবীতে আদম ও হাওয়া আলায়হিসসালামকে পাঠানোর উল্লেখ আছে। এখানে এ খবরই দেয়া হয়নি যে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে রসূল পাঠানো হবে, বরঞ্চ এ সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে, তাদের সাফল্য ও ক্ষতি নির্ভর করে এ বিষয়ের উপর যে তারা রসূলগণের হেদায়েত কবুল করে তাকওয়া ও সংশোধনের পথ অবলম্বন করেছে কি না! না করলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করবে এবং জাহান্নামের শাস্তিও ভোগ করবে। বস্তুতঃ স্থানে স্থানে দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতির উপর আযাব আসার কারণ এই বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নিকটে আগত রসূলগণের কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। যেমন ঃ

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ - وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (المؤمن :٢١-٢٢)

-এবং এরা কি জমিনে চলাফেরা করে দেখেনি যাতে করে তারা ঐসব লোকের পরিণাম দেখতে পেতো যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে? তারা এদের থেকে (কুরাইশ থেকে) অধিক শক্তিশালী ছিল এবং অনেক বেশী শক্তিশালী নিদর্শনাদি পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে। তারপর আল্লাহ তাদের পাপের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাবার কেউ ছিল না। এ পরিণাম তাদের এ জন্যে হয়েছিল যে, রসূলগণ

তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করে। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চিতরূপে তিনি বড়ো শক্তিশালী এবং শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর।

প্রায় একই ধরনের কথা সূরা ফাতের ২৫-২৬ আয়াত এবং এবং সূরা তাগাবুন ৫-৬ আয়াতেও বলা হয়েছে। কুরআন ঐসব জাতির গল্প কাহিনীতে ভরপুর যারা তাদের যমানার রসূলগণকে অস্বীকার করেছে এবং অবশেষে দুনিয়াতেই তারা শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে।

তারপর আখেরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওখানে মানুষের উপর আল্লাহর যুক্তি প্রমাণ এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তাদের কাছে রসূল পাঠিয়ে হক ও বাতিলের পার্থক্য এবং সত্য সরল পথ পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে মানেনি এবং তাঁদের আনুগত্য করেনি। এ জন্যে তারা এখন শাস্তির যোগ্য।

انَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ـ

(النساء ١٦٣ـ١٦٤)

-হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার নিকটে সেভাবেই অহী পাঠিয়েছি যেভাবে নূহ এবং তারপর আগমনকারী নবীদের প্রতি...এসব রসূল সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল যাতে তাদের পাঠিয়ে দেয়ার পর লোকের কাছে আল্লাহর মোকাবিলায় কোন যুক্তি বাকী না থাকে। (নিসা ঃ ১২৩-১২৪)

অর্থাৎ এসব পয়গম্বরের কাজ এ ছিল যে, যারা তাদের আনীত শিক্ষার উপর ঈমান এনে নিজের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম তদানুযায়ী পরিশুদ্ধ করেছে তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর যারা ঈমান আনেনি এবং চিন্তা ও কাজের ভ্রান্ত পথে চলা পরিত্যাগ করেনি, তাদেরকে ভয়াবহ পরিণামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এসব পয়গম্বর পাঠানোর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মাধ্যমে সত্য পথ পরিষ্কার করে বলে দিয়ে মানবজাতির উপর তাঁর যুক্তি প্রমাণ চূড়ান্ত করতে চাইতেন যাতে করে আখেরাতের আদালতে কোন কাফের ও অপরাধী এ ওজর পেশ করতে না পারে যে, তাদের প্রকৃত সত্য বলে দেয়ার কোন ব্যবস্থাপনা করা হয়নি এবং এখন তাদেরকে বেখবর অবস্থায় পাকড়াও করা হচ্ছে।

আখেরাতের উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, রেসালাতের অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীদের সকল আমল সেখানে বিনষ্ট হয়ে যাবে যে আমল তারা নেক মনে করতো। তারপর যখন তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকানো হবে তখন তাদেরকে বলা হবে-রসূলগণের মাধ্যমে তোমাদের জন্যে সকল যুক্তি ও দলিল প্রমাণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ জন্যে এখন তোমরা শাস্তি ভোগ করছ এবং প্রকৃত পক্ষে এ শাস্তিরই তোমরা যোগ্য।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَّضُرُّوا

اللّٰهَ شَيْئًا و سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ - (محمد ٣٢)

-যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে[১] এবং আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে[২] ও রাসূলের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এমন অবস্থায় সত্য পথ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছিল, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। বরঞ্চ আল্লাহই তাদের সকল কর্মকান্ড বিনষ্ট করে দেবেন। (মুহাম্মদ ঃ ৩২)

এমন অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন-

يمعْشَرَ الْجِنِّ و الانْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ ايتِىْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذَا - قَالُوْا شَهِدْنَا عَلى اَنْفُسِنَا - و غَرَّتْهُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيَا و شَهِدُوْا عَلى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كفِرِيْنَ - ذلِكَ اَن لَّمْ يَكُنْ رَّبُّك مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غفِلُوْنَ - (الانعام ١٣٠-١٣١)

-হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমাদের কাছে কি স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকেই সে রসূল আসেননি যে তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতো এবং এ দিনের পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় দেখাতো? তারা বলবে, “আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।” দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু আখেরাতে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তাঁরা কাফের। এ সাক্ষ্য তাদের থেকে এ জন্যে নেয়া হবে যেন এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের রব জুলুম সহকারে জনপদগুলোকে ধ্বংস করেননি এমন অবস্থায় যে জনপদবাসী হক সম্পর্কে বেখবর ছিল। (আনয়াম ঃ ১৩০-১৩১)

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيْرٌ - قَالُوْا بَلى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا

---

১. অর্থাৎ রাসূল (সা) এবং তার আনীত শিক্ষাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে -গ্রন্থকার।
২. মূলত 'সাদ্দু আন সাবীলিল্লাহ' বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাদ্দ' শব্দটি আরবী ভাষায় সকর্মক ও অকর্মক দু অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে এ বাক্যের অর্থ এও হয় যে, স্বয়ং আল্লাহর পথ অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকে। আবার এ অর্থও হয় যে, তারা অন্যদের এ পথে আসতে বাধা দেয়। বিরত রাখারও কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। এক, ব্যক্তি জোরপূর্বক কাউকে ঈমান আনতে বিরত রাখে। দ্বিতীয়ত, ঈমান আনয়নকারীর ওপর এমন যুলুম নির্যাতন চালায় যে, তার ঈমানের ওপর টিকে থাকা এবং অনান্যদের এ ধরনের ভীতিজনক অবস্থায় ঈমান আনা কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, তারা আল্লাহর দ্বীন এবং তা উপস্থাপনকারী রসূলের বিরুদ্ধে লোকদেরকে প্রতারিত করেও এমন ওয়াসওয়া অন্তরে ঢেলে দেয় যে, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর পথে আসতে বিরত থাকে। এছাড়া প্রত্যেক কাফির সমাজ আল্লাহর পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক শক্তি। কারণ তারা তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, রসম রেওয়াজ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর দ্বারা দ্বীনে হক সম্প্রসারণে শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে- গ্রন্থকার।

وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ - وَ قَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ - فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ - (الملك :٨ تا ١١)

-যখনই কোন একদল মানুষ তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার কর্মচারীগণ বলবে, তোমাদের নিকটে কি কোন সাবধানকারী আসেনি?[১] তারা বলবে, হ্যাঁ সাবধানকারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি এবং তোমরা বড়োই গোমরাহিতে লিপ্ত আছ। তারপর তারা বলবে, হায়রে, যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতাম তাহলে এ জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করতে হতো না। এভাবে তারা তাদের পাপের স্বীকৃতি দেবে। এসব জাহান্নামবাসীর উপর অভিসম্পাৎ। (মূলক ঃ ৮-১১)

এ বক্তব্যের সাথে মিলে যায় এমন কথা সূরা যুমারের ৭১-৭২ আয়াতে বলা হয়েছে। এর থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামে রেসালাতের গুরুত্ব এতো বেশী যে, তা মানা না মানার উপর দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য নির্ভরশীল।

সকল জাতির কাছে নবী এসেছিলেন এবং তাঁদের দাওয়াত একই ছিল

কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানব জাতির সূচনা থেকেই সকল জাতির মধ্যে নবী আগমন করতে থাকেন। তাঁদের সকলের দ্বীন ছিল এক। সকলের দাওয়াতও ছিল এক। সকলের আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল এক। তাঁদের সকলের দাবী এই ছিল যে, মানুষ আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচুক এবং তাঁর আনুগত্য করুক।

وَ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِیْهَا نَذِیْرٌ - (فاطر - ٢٤)

-কোন উম্মত এমন অতীত হয়নি যার কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। (ফাতের ঃ ২৪)

وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - (الرعد ٧)

প্রত্যেক জাতির জন্যে একজন পথ প্রদর্শক ছিল। (রা'দ ঃ ১৭)

وَ مَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ - (الشعراء ٢٠٨)

---

[১] এ প্রশ্নের ধরণটা এমন হবে না যে, জাহান্নামের কর্মচারীগণ তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে চাইবে যে, তাদের কাছে কোন সাবধানকারী এসেছিল কি না। বরঞ্চ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয়নি। এ জন্যে তারা তাদের মুখ দিয়ে এ কথা স্বীকার করাতে চাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বেখবর রেখেছিলেন না তাদের কাছে নবী পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানেনি। এ জন্যে যে শাস্তি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে তার জন্যে তারা যোগ্য -(গ্রন্থকারের টীকা)।

-আমরা এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্যে সাবধানকারী আসেনি।
(শুয়ারা ঃ ২০৮)

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ - (النحل ٣٦)

-আমরা প্রত্যেক জাতির জন্যে একজন রসূল (এ দাওয়াত দেয়ার জন্যে) পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের বন্দেগী থেকে দূরে থাক। (নহল ঃ ৩৬)

হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর নাম নিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের প্রত্যেকে আপন জাতির কাছে এ কথা বলেছে- فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ -আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (দেখুন আলে ইমরানঃ ৫০, শুয়ারাঃ ১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪২, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯, যুখরুফঃ ৬৩, নূহ ঃ ৩)

নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য

তারপর বলা হয় সকল নবীর আগমনের উদ্দেশ্য এ ছিলঃ-

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ -
(الحديد ٢٥)

-আমরা আমাদের নবীদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও মীযান যাতে মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে। (হাদীদ ঃ ২৫)

ইনসাফের উপর কায়েম হওয়ার অর্থ নিজের সাথে, খোদার সাথে এবং এমন প্রতিটি মানুষের সাথে ইনসাফ যার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যায়। আপন সমাজের মধ্যে, প্রতিটি লেনদেনে, আপন তাহজিব ও তামাদ্দুনে, রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায়, বিচারালয়ে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পর্কে ইনসাফ। মোটকথা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে সকল দিক দিয়ে জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও দিকে ইনসাফ কায়েম করাই সকল নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাত

নবুওয়ত ও রেসালাতের ইতিহাস এবং তার যথার্থতার এ পটভূমিতে প্রথমে কুরাইশকে, তারপর আরববাসীকে এবং অতঃপর গোটা দুনিয়াকে এ কথা বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) ঐসব রসূলেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁর পূর্বে পাঠানো হতে থাকে। তিনি এমন দ্বীন নিয়ে এসেছেন যা মানব জাতির জন্মসূচনা থেকে সকল নবীরই দ্বীন ছিল। সেই দ্বীনকে সকল ভেজাল ও বিকৃতি থেকে পাক পবিত্র করে তার প্রকৃত ও খাঁটি রূপ ও আকৃতিকে পেশ করার জন্যে- নবী মুহাম্মদের (সা) আগমন হয়েছিল। এখন খোদার দ্বীন, তাঁর শরীয়ত, তাঁর আইন-কানুন এবং তাঁর হুকুম-আহকাম এমন যা নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে নয়, বরঞ্চ খোদার প্রেরিত অহীর ভিত্তিতে পেশ করছেন। তাঁর আনুগত্য খোদার আনুগত্য এবং তাঁর নাফরমানী খোদার নাফরমানী। অতএব মানুষের শুধু এ

কথার উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট নয় যে, তিনি খোদার রসূল। বরঞ্চ ঈমান আনার পর সকলের আনুগত্য পরিহার করে দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর (রসূলের) আনুগত্য করতে হবে। কারণ, তাঁর হেদায়েত থেকে মুখ ফেরানোর অর্থ সেই খোদার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো যিনি তাঁকে রসূল হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

হুযুরের (সা) আগমনের পূর্বে আরববাসী একজন নবীর প্রতীক্ষা করছিল

উল্লেখ্য যে, আরববাসী তাদের চারপাশের ঈসায়ী, ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধঃপতিত নৈতিক অবস্থা ও তাদের অপকর্মাদি লক্ষ্য করে স্বয়ং এ কথা বলতো, "এসব জাতির নিকটে যে জিনিস এসেছিল তা যদি আমাদের কাছে আসতো -(অর্থাৎ রেসালাত এবং খোদার প্রেরিত হেদায়েত), তাহলে আমরা এদের সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর উন্নত হওয়ার পরিচয় দিতাম।"

কুরআনে এ কথা প্রচার করা হয়েছে কিন্তু এমন কেউ ছিল না যে, এ কথা অস্বীকার করে।

و اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الاُمَمِ - فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرَانِ اسْتِكْبَارًا فِى الاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّءِ و لاَ يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهِ - (فاطر ٤٢ - ٤٣)

এসব লোক (কুরাইশ ও আরববাসী) কড়া কড়া কসম খেয়ে বলতো, যদি কোন সাবধানকারী (অর্থাৎ রসূল) তাদের কাছে আসতো তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতো। কিন্তু যখন সাবধানকারী তাদের নিকট এসে গেল তখন তার আগমন সত্য দ্বীন থেকে পলায়ন ব্যতীত আর কিছু বৃদ্ধি করেনি। এরা দুনিয়াতে আরো বেশী গর্ব অহংকার করতে লাগলো (তাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে) নিকৃষ্টতম কলাকৌশল অবলম্বন করতে লাগলো। অথচ এ কলাকৌশল যারা অবলম্বন করে এ তাদেরকেই ধ্বংস করে। (ফাতের ঃ ৪২-৪৩)

و اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَكَفَرُوْا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ - (الصّفّت ١٦٧ تا ١٧٠)

-এসব লোক আগে ত বলতো হায়রে, যদি আমাদের নিকট সে যিকির (আল্লাহর নসিহতের পয়গাম) থাকতো যা অতীতের জাতিগুলো পেয়েছিল, তাহলে আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হতাম। কিন্তু তা এলো, এখন এরা তা মানতে অস্বীকার করলো। এখন শীঘ্রই এর পরিণাম এরা জানতে পারবে। (সাফফাত ঃ ১৬৭-১৭০)

এর থেকে জানা গেল যে, রসূলের আগমন তাদের ঈপ্সিত অভিলাষ ছিল। কিন্তু সে নিয়ামত যখন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন তারা বিরোধিতা, জিদ ও হঠকারিতা করা শুরু করলো।

হুযুর (সা) নবীগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর জ্ঞানের উৎস সেই অহী যা ছিল সকল নবীর

এ সত্যতাকে সামনে রেখে দেখুন যে হুযুরের রেসালাতের পরিচিতি কুরআন কিভাবে করালো এবং তাঁর কি মর্যাদা পেশ করলো-

يس ، وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (يس ١ تا ٤)

-কুরআন হাকিমের কসম, হে মুহাম্মদ, তুমি নিশ্চিতরূপে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। সত্য সঠিক পথের উপর। অর্থাৎ তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তোমার রেসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ বিজ্ঞতাপূর্ণ কুরআন তুমি পেশ করছ। (ইয়াসীন ঃ ১-৪)

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا - (الشورٰى ٧)

-এবং এভাবে আমরা (হে মুহাম্মদ) এ আরবী কুরআন তোমার প্রতি অহী করেছি যাতে তুমি জনপদের কেন্দ্র (মক্কা) এবং তার চার ধারে অবস্থানকারীদেরকে সাবধান করতে পার। (শুরা ঃ ৭)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًانِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - (الاعراف ١٥٨)

হে মুহাম্মদ, বলে দাও হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্যে খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল-যে খোদা আসমান ও যমিনের বাদশাহীর মালিক। (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا - (الفرقان - ١)

তিনি বড়ো বরকতপূর্ণ যিনি এ কুরআন (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী) তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন যেন দুনিয়াবাসীদেরকে সাবধান করতে পারে। (ফুরকান ঃ ১)

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ، وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ

و سُلَيْمٰنَ ، وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ـ (النساء ١٦٣)

-হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি সেভাবেই অহী প্রেরণ করেছি যেভাবে নূহ এবং তার পরবর্তীদের নিকটে প্রেরণ করেছি এবং যেভাবে অহী প্রেরণ করেছি ইব্রাহিম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) এবং ইয়াকুব সন্তানদের উপর এবং ঈসা (আঃ), আইয়ুব (আঃ), ইউনুস (আঃ), হারুন (আঃ) এবং সুলায়মানের (আঃ) উপর এবং আমরা দাউদকে (আঃ) যবুর দান করি। (নিসা ঃ ৬৩)

নবী মুহাম্মদের (সা) প্রেরণের উদ্দেশ্য

ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, (সুরা হাদীদ আয়াত-২৫) তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য তাই, যা ছিল সমস্ত নবীর প্রেরণের উদ্দেশ্য। তথাপি কুরআন মজিদে বিশেষভাবে তাঁকে রসূল হিসাবে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য বিশদভাবে কুরাইশ ও আরববাসীর কাছে বয়ান করা হয়েছে। তা আমরা ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করছি।

তাঁর নবুওয়ত চিরন্তন ও বিশ্বজনীন

তিনি কোন এক বিশেষ জাতির জন্যে নন এবং আপন যুগের সকল মানুষের জন্যেও নন, বরঞ্চ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্যে রসূল- যাদের যাদের নিকটে তাঁর পয়গাম পৌঁছে।

وَ اُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ و مَنْۢ بَلَغَ ـ (الانعام ١٩)

-এবং এ কুরআন আমার উপর অহীর মাধ্যমে এ জন্যে পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদেরকে এবং যার যার কাছে এ পৌঁছে তাদেরকে সাবধান করে দেব। (আনয়াম ঃ ১৯)

তিনি সকল বিকৃতিমুক্ত বিশুদ্ধ দ্বীন পেশকারী

তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের আনীত শিক্ষার খন্ডন নয়, বরঞ্চ তার সত্যতা স্বীকারকারী। তাঁর উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার মধ্যে পরবর্তীকালে যেসব মিশ্রণ ঘটেছিল, তা ছেঁটে ফেলে দিয়ে সেই প্রকৃত দ্বীন তার বিশুদ্ধ আকারে পেশ করবেন যা সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে মানবজাতির জন্যে খোদার নির্ধারিত একই দ্বীনে হক ছিল।

তিনি যে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষার খন্ডন করতে নয় বরঞ্চ সত্যতা স্বীকারকারী ছিলেন এ কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বয়ান করা হয়েছে। যেমন ঃ

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ و صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ (الصّٰفّٰت ٣٧)

-বরঞ্চ (মুহাম্মদ সঃ) সত্যসহ আগমন করেছেন এবং তিনি খোদা প্রেরিত সকল নবীর সত্যতা স্বীকার করেন। (সাফফাত ঃ ৩৭)

و مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
و لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ و تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ

لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (يُونس :٣٧)

-এবং এ কুরআন সে জিনিস নয়-যা খোদার অহী ব্যতীত স্বয়ং রচনা করা যায়। বরঞ্চ ইতিপূর্বে যা কিছু এসেছিল এ হচ্ছে সে সবের সত্যতার স্বীকৃতি এবং আল কিতাবের (খোদার পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক কিতাব) বিশদ বিবরণ। এর রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই। (ইউনুস ঃ ৩৭)

'কিতাবের বিশদ বিবরণ' এর মর্ম এই যে, ঐ সব মৌলিক শিক্ষা ও হেদায়েত যা খোদার কিতাবের মাধ্যমে প্রথমে এসেছিল তার সারাংশ এ কিতাবে এসে গেছে। বরঞ্চ এর মধ্যে তা অধিকতর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কথাও কুরআন মজিদের স্থানে স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর যারা ওয়ারিস হয়েছিল, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বহু কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। এ জন্যে হুযুর (সা)-এর কাজ এটাও যে তিনি তাদেরকে আলাদা করে খোদার শরিয়তে যা প্রকৃত হারাম তাকে হারাম এবং যা প্রকৃত হালাল তাকে হালাল করবেন।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ - (البقره - ٧٩)

-অতএব ধ্বংস তাদের জন্যে যারা স্বয়ং নিজের হাতে একটি কিতাব লেখে এবং তারপর বলে যে এ আল্লাহর পক্ষ থেকে। (বাকারাহ ঃ ৭৯)

و اِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ و يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ و يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ - (ال عمران ٧٨)

-তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে জিহ্বা উলটপালট করে যাতে তোমরা বুঝে নাও যে, তারা যা কিছু পড়ছে তা কিতাবেরই মূল বচন। অথচ তা কিতাবের মূল বচন নয়। তারা বলে যে এ আল্লাহর পক্ষ থেকে। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। (আলে ইমরান ঃ ৭৮)

এর ভিত্তিতে নবী (সা) এর উপর এ দায়িত্ব আরোপিত হয় যে সকল ভেজাল থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ দ্বীনে হকের শিক্ষা পেশ করবেন। আর যা কিছু তার মধ্যে হারাম আছে তাকেই হারাম এবং যা কিছু তার মধ্যে হালাল আছে তাকে হালাল গণ্য করবেন।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ - رَسُوْلٌ مِنَ

اللّٰه يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ-
(البينة ١-٣)

-আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা (তাদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন এমন রসূল যিনি (সকল ভেজাল থেকে মুক্ত) পবিত্র সহিফা পড়ে শুনাবে যার মধ্যে একেবারে সত্য সঠিক বক্তব্য লিখিত আছে। (বাইয়েনাহ ঃ ১-৩)

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ و يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ و يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ ويَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ-(الاعراف ١٥٧)

-(এ উম্মী নবী) তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে। তাদের জন্যে পাক জিনিস হালাল করে এবং নাপাক জিনিস হারাম করে। (অর্থাৎ তাদের ইচ্ছাকৃত হালাল ও হারাম রহিত করে) এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে ফেলে এবং সে বাধাবন্ধন খুলে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিল। (আ'রাফ ঃ ১৭৫)

কথা ও কাজের দ্বারা আহকামে ইলাহীর ব্যাখ্যাদান ও তাযকিয়ায়ে নফস

নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপরে শুধু এ দায়িত্বই ছিল না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান তাঁকে দেয়া হয় তা তিনি লোকের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেবেন। বরং এ কাজের দায়িত্বও ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ সব হুকুম-আহকামের যে মর্ম তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল তদনুযায়ী নিজের কথা ও কাজের দ্বারা দ্বীনের আকায়েদ, আহকাম, হেদায়েত, আইন-কানুন প্রভৃতির ব্যাখ্যা করবেন এবং তার ভিত্তিতে লোকের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিকৃত জীবনধারাকে পরিশুদ্ধ ও সুশৃংখল করবেন।

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه و قُرْاٰنَه فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَه ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه-(القيمة ١٧ تا ١٩)

-এ কুরআন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। অতএব, হে নবী! যখন আমরা তা পড়ি তখন তুমি তার পাঠ শুনতে থাক। তারপর তার মর্ম বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের দায়িত্ব। (কিয়ামাহ ঃ ১৭-১৯)

و اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ-(النحل ٤٤)

-এবং (হে নবী) এ যিকির (অর্থাৎ কুরআন) আমরা তোমার প্রতি এ জন্যে নাযিল করেছি যে, তুমি লোকের কাছে সেই শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে থাকবে যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে। (নমল ঃ ৪৪)। ×

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ ايتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - الجمعه ٢)

-তিনিই সেই আল্লাহ যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রসূল স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত করেছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমগ্ন ছিল। (জুমুয়া ঃ ২)

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِه ايتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمتِ اِلَى النُّوْرِ - (الحديد ٩)

-তিনিই সেই আল্লাহ যিনি বান্দাহ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনতে পারে। (হাদীদ ঃ ৯)

দ্বীনে হককে সমগ্র জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করা

নবী মুহাম্মদের (সা) আগমনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই দ্বীন ও হেদায়েতকে সকল প্রকার আনুগত্য এবং জীবনের সকল পন্থা পদ্ধতির উপর বিজয়ী করা যা তিনি খোদার পক্ষ থেকে এনেছেন। কুরআনের তিনটি স্থানে এ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুরা তওবা ও সাফ-এ বলা হয়েছে ঃ

-তিনিই সেই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হেদায়েত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন যেন সে তা সকল প্রকার দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে পারে-*

তা মুশরিকদের জন্যে যতোই অসহনীয় হোক না কেন। (তওবা ঃ ৩৩, সাফ্ ঃ ১৮)

× এ নির্দেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সেই পলিসি বর্ণনা করেন যার অনিবার্য দাবী এ ছিল যে, যিক্‌র-এর সাথে একজন মানুষকে পয়গম্বর হিসাবে পাঠানো হোক। 'যিক্‌র' তো ফেরেশতাদের মাধ্যমেও পাঠানো যেতে পারতো এবং ছাপিয়ে সরাসরি মানুষের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়া আল্লাহর সাধ্যের অতীত ছিল না। কিন্তু এতে করে প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে প্রয়োজন ছিল যে, একজন যোগ্যতম ব্যক্তি তা নিয়ে আসবেন। কোন কিছু কেউ বুঝতে না পারলে তা তাকে বুঝিয়ে দেবেন। কারো মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হলে তা তিনি দূর করে দেবেন। কারো কোন আপত্তি-অভিযোগ থাকলে তার তিনি জবাব দেবেন। যারা মানবে না, বিরোধিতা করবে ও প্রতিবন্ধক হবে তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন-যা যিক্‌র আনয়নকারীর জন্যে মানানসই হবে। আর যারা মেনে নেবে তাদেরকে জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও দিক সম্পর্কে হেদায়েত দেবেন। তাদের সামনে নিজের জীবনকে নমুনা হিসাবে পেশ করবেন। অতঃপর তাদেরকে তরবিয়ত দিয়ে সমগ্র দুনিয়ার সামনে এমন এক আদর্শ সমাজ গঠন করে দেখাবেন যার সামগ্রিক ব্যবস্থা এ যিক্‌রের ইচ্ছারই প্রতিফলন হবে। -গ্রন্থকারের টীকা

* আয়াত দু'টিতে 'আদ্দীন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার তরজমা আমরা করেছি-'সর্বজাতীয় দ্বীন।' আরবী ভাষায় দ্বীন শব্দটি যে জীবন ব্যবস্থা বা জীবন পদ্ধতির জন্যে ব্যবহৃত হয়, যার প্রতিষ্ঠাতাদেরকে কর্তৃত্বশীল ও আনুগত্যের অধিকারী মেনে নিয়ে তাদের আনুগত্য করা হয়। অতএব রসূলের আগমনের উদ্দেশ্য এ আয়াতে এই বলা হয়েছে যে, যে হেদায়েত ও দ্বীনে হক খোদার পক্ষ থেকে তাঁর রসূল নিয়ে এসেছেন,

নবী মুহাম্মদের (সা) উপর ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের আদেশ

এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে মানুষকে এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে এবং এমনসব লোকের আনুগত্য পরিহার করবে যারা আল্লাহ থেকে উদাসীন ও আনুগত্যের সীমা লংঘনকারী।

فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ النُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا، وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (التغابن ٨)

-অতএব ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর এবং সেই নূরের উপর যা আমরা নাযিল করেছি। এবং তোমরা যা কিছু করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। (তাগাবুন ঃ ৮)

فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ- (الاعراف ١٥٨)

-অতএব ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান রাখে এবং তাঁর আনুগত্য কর যাতে তোমরা সত্য সঠিক পথ পেয়ে যাও। (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ - (الاعراف ٣)

-মেনে চল সেই হেদায়েত যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে পাঠানো হয়েছে এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের আনুগত্য করো না।*-(আ'রাফ ঃ ৩)

তাকে দ্বীন জাতীয় সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থার উপর তিনি বিজয়ী করবেন। অন্য কথায় রসূলের আগমন এ জন্যে হয়নি যে, যে জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যকে কর্তৃত্বশীল (AUTHORITY) ও আনুগত্যের অধিকারী মেনে নিয়ে চালু আছে, রসূলের আনীত দ্বীন তার অধীন হয়ে তার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তুষ্ট থাকবে। বরঞ্চ রসূল তো দুনিয়া ও আসমানের বাদশাহ, প্রতিনিধি এবং সে জন্যে স্বীয় বাদশার সত্য ব্যবস্থাকে সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করতে চান। অন্য কোন ব্যবস্থা দুনিয়ায় থাকলে তাকে খোদায়ী ব্যবস্থার অধীনে তার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়েই থাকতে হবে। যেমন জিযিয়া আদায় করলে যিম্মীগণ তাদের জীবন ব্যবস্থা মেনে চলতে পারে। -গ্রন্থাকারের টীকা

* অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্যে তোমাদের যে পথ নির্দেশনার প্রয়োজন, নিজের ও সৃষ্টিজগতের রহস্য এবং নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্যে তোমাদের যে জ্ঞানের প্রয়োজন। আপন ধর্ম, নৈতিকতা, তাহযিব, সামাজিকতা ও তামাদ্দুন সঠিক বুনিয়াদের উপর কায়েম করার জন্যে যেসব মূলনীতির তোমরা মুখাপেক্ষী সেসবের জন্যে তোমাদের শুধুমাত্র সেই হেদায়েত মেনে চলা উচিত যা আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর নাযিল করা হেদায়েত পরিহার করে অন্য কোন পথপ্রদর্শকের শরণাপন্ন হওয়া এবং নিজেদেরকে তার আনুগত্যের অধীন করে দেয়া মানুষের জন্যে মূলতঃ একটি ভুল পদ্ধতি যার পরিণাম সর্বদা ধ্বংসের রূপপরিগ্রহ করেছে এবং সর্বদা করবে। এখানে আউলিয়া (পৃষ্ঠপোষক) শব্দ এ মর্মে ব্যবহার করা হয়েছে যে, মানুষ যার কথায় চলে তাকে প্রকৃত পক্ষে তার অলী বা পৃষ্ঠপোষক বানানো হয়-(গ্রন্থকারের টীকা)।

وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ (النساء ٦٤)

-আমরা যে রসূল পাঠিয়েছি তা এ জন্যে যে খোদার নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।[১] (নিসা ঃ ৬৪)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ـ (النساء ٨٠)

-যে রসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য করে। (নিসা ঃ ৮০)

وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ (الحشر ٧)

-যা রসূল তোমাদেরকে দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে তার থেকে দূরে থাক। (হাশর ঃ ৭)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ يَخْشَ اللّٰهَ وَ يَتَّقْهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ (النور ٥٢)

-এবং যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নাফরমানি থেকে দূরে থাকে, এমন লোক সফলকাম। (নূর ঃ ৫২)

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ـ (الاحزاب ٣٦)

-কোন ঈমানদার পুরুষ অথবা নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ের ফয়সালা করে দেন, তাহলে তারপর নিজের ব্যাপারে তার স্বয়ং (অন্য কোন) ফয়সালা করার অধিকার রাখবে। যারা আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করলো তারা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত হলো। (আহযাব ঃ ৩৬)

---

১. অর্থাৎ খোদার পক্ষ থেকে রসূল এ জন্যে আসেননি যে ব্যস তার রেসালাতের উপর ঈমান আন এবং তারপর আনুগত্য যার ইচ্ছা তার কর। বরঞ্চ রসূলের আগমনের উদ্দেশ্যই এই হয় যে জীবনের যে আইন-কানুন তিনি নিয়ে আসেন, সকল আইন পরিহার করে শুধু তারই আইন মেনে চলতে হবে। খোদার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ তিনি দেন, অন্যান্য সকল নির্দেশ পরিহার করে তা মেনে চলতে হবে। যদি কেউ তা না করে তাহলে তার রসূলকে রসূল বলে মেনে নেয়ার কোন অর্থ হয় না। -(গ্রন্থকারের টীকা)।

وَ لاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوه وَكَانَ اَمْرُه فُرُطًا ـ (الكهف : ٢٨)

-এবং এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার মনকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে বিমুখ করে দিয়েছি এবং যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও যার কর্মপদ্ধতি সীমালংঘন করে। (কাহাফ ঃ ২৮)

وَلاَ تُطِيْعُوْا اَمْرَا الْمُسْرِفِيْنَ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ ـ (الشعراء ١٥١ ـ ١٥٢)

-এবং ঐসব লাগামহীন লোকদের আনুগত্য করো না যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোন সংস্কার সংশোধন করে না। (১) (শু'য়ারা ঃ ১৫১-১৫২)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّهَ و اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّهَ لاَيُحِبُّ الْكفِرِيْنَ ـ (ال عمران ٣٢)

-হে নবী, বলে দাও যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর। আর সে যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তাহলে সে যেন মনে রাখে) আল্লাহ এমন কাফেরদের পছন্দ করেন না ।
(আলে ইমরান ঃ ৩২)

এখন আইন কানুন তাই যা আল্লাহ মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে দিয়েছেন

এভাবে নবী মুহাম্মদের (সা) রেসালাতের ঘোষণা এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণের সাথে সাথে এও ঘোষণা করা হয় যে, এখন খোদার আইন তাই যা মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। এতে কারো মতবিরোধ করার অধিকার নেই। এর বিরুদ্ধে যা কিছু তা জাহেলিয়াত এবং তাগুতের বন্দেগী। রসূল (সা) খোদার নিয়োজিত শাসক যাঁর কাজ এই যে, লোকের কায়কারবারের মীমাংসা খোদার নাযিল করা হেদায়েত অনুযায়ী করবেন।

ثُمَّ جَعَلْنكَ عَلى شَرِيْعَةٍ مِنَ الاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ (الجاثيه ١٨)

-অতঃপর (বনী ইসরাইলের পর) হে নবী, আমরা তোমাকে দ্বীনের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট রাজপথের (শরীয়ত) উপর কায়েম করে দিয়েছি। অতএব তুমি এ পথেরই

---

১. অর্থাৎ তোমাদের সেসব আমীর-ওমরা, সমাজপতি, নেতা ও শাসকদের আনুগত্য পরিহার কর যাদের নেতৃত্বে তোমাদের এ ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা চলছে। এরা সীমালংঘনকারী। নৈতিকতার সকল সীমালংঘন করে লাগামহীন হয়ে পড়েছে। তাদের দ্বারা কোন সংস্কার সংশোধন সম্ভব নয়। তারা যে ব্যবস্থা চালাবে তাতে বিশৃংখলা-অরাজকতা অনিবার্য। তোমাদের কল্যাণের কোন পথ যদি থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে তোমরা তোমাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি কর এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আল্লাহর নবীর আনুগত্য কর -(গ্রন্থকারের টীকা)।

অনুসরণ কর এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা কোন জ্ঞান রাখে না। (জাসিয়া ঃ ১৮)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ - (الحج ٦٧)

-প্রত্যেক উম্মতের জন্যে আমরা একটা এবাদতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি-যা তারা অনুসরণ করে। অতএব, হে মুহাম্মদ (সা), এ ব্যাপারে তারা যেন তোমার সাথে ঝগড়া না করে। তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াত দাও। নিশ্চিতরূপে তুমি সঠিক পথে রয়েছ। (হজ্ব ঃ ৬৭)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ - (النساء ١٠٥)

-হে নবী! আমরা এ কিতাব সত্যসহ তোমার উপর নাযিল কিরেছি যাতে যে সঠিক পথ আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন তদনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর। (নিসা ঃ ১০৫)

কুরআন মজিদে স্থানে স্থানে মানব সমাজের জন্যে যেসব রীতিনীতি বর্ণনা করা হয়েছে তার জন্যে "আল্লাহর সীমারেখা" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ এমন সীমারেখা যার ভেতরে থাকারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর কোথাও কঠোরভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে এসব সীমারেখার নিকটেও যাওয়া না হয়। কোথাও বলা হয়েছে, এসব অতিক্রমকারী জালেম। কোথাও বলা হয়েছে, এসব অতিক্রমকারী নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করে। কোথাও এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, সীমালংঘনকারীদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা বাকারার ১৮৭, ২২৯, ২৩০ নং আয়াত, সূরা নিসার ১৩ ও ১৪ নং আয়াত, সূরা মুজাদিলার ৪ নং আয়াত, সূরা তওবার ৯৭ নং আয়াত এবং সূরা তালাকের ১ নং আয়াত দ্রঃ)

এর থেকে জানা গেল যে, যেসব আইন নবী (সা) এর মাধ্যমে মানব জাতিকে দেয়া হয়েছে তার গুরুত্ব কতখানি। তারপর পরিষ্কার ভাষায় সাবধান করে দেয়া হয়েছে ঃ-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ - (المائده ٥٠)

-তবে কি এরা জাহেলিয়াতের ফয়সালা কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে ভালো হুকুম-ফয়সালা আর কার হতে পারে? (মায়েদা ঃ ৫০)

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَ قَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِه وَ يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيْدًا - (النساء ٦٠)

-তারা চায় যে তাদের বিষয়াদির ফয়সালা করাবার জন্যে তারা তাগুতের শরণাপন্ন হবে। (১) অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করার জন্যে। শয়তান চায় যে তাদের পথভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যায়। (নিসা ঃ ৬০)

দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার আপোস ও নমনীয়তার অবকাশ নেই

রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, খোদার দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোস ও নমনীয়তা হতে পারে না। কোন আকীদাহ-বিশ্বাস, কোন নীতি, কোন রীতিপদ্ধতি এবং কোন হুকুমের মধ্যে কারো খাতিরে সামান্যতম রদবদলও হতে পারে না। যে মানতে চায়, তাকে সেই পরিপূর্ণ দ্বীন মেনে নিতে হবে যা রসূলুল্লাহ (সা) পেশ করেছেন। আর যে মানতে চায় না সে না মানুক। যে মানবে তার নিজেরই মঙ্গল হবে আর না মানলে তার নিজেরই ক্ষতি। এখানে দরকষাকষি ও লেনদেনে বুঝাপড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ - وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ - (القلم ٩-٨)

-(অতএব হে নবী), মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যানকারীদের চাপের মুখে কখনো নতি স্বীকার করো না। তারা চায় যে তুমি কিছুটা নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (অর্থাৎ তুমি ইসলামের তবলিগের কাজে কিছুটা ঢিল দাও তাহলে তারাও তোমার বিরোধিতায় কিছুটা নমনীয়তা অবলম্বন করবে। অর্থাৎ তুমি তাদের গুমরাহির সুযোগ দিয়ে নিজের দ্বীনের মধ্যে কিছুটা রদবদল কর, তাহলে তারা তোমার সাথে আপোস করে নেবে)।

وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ايَتُنَا بَيِّنتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْانٍ غَيْرِ هذَا اَوْ بَدِّلْهُ - قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَه مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحى اِلَيَّ - (يونس ١٥)

-এবং যখন তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে শুনিয়ে দেয়া হয়, তখন যারা আখেরাতে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তারা বলে, এটা বাদ দিয়ে অন্য

---

(১) এখানে তাগুত বলতে সুস্পষ্টরূপে সেই শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করে এবং সে বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যে না আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে আর না আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের হেদায়েতকে চূড়ান্ত সনদ বলে মেনে নেয়- গ্রন্থকার।

কোন কুরআন নিয়ে আস অথবা এতে কিছু রদবদল কর।[১] (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বল, আমার এ অধিকার নেই যে, আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করি। আমি ত ব্যস্ সেই অহীরই অনুসারী যা আমার নিকটে পাঠানো হয়। (ইউনুস : ১৫)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ - فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ - (الكهف ٢٩)

-এবং বলে দাও, এ হচ্ছে হক তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। এখন যার মন চায় সে মানবে, না চায় না মানবে। (কাহাফ : ২৯)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِه ط وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - (النمل ٩٢)

-তারপর যে হেদায়েত গ্রহণ করবে, সে তার মংগলের জন্যেই করবে এবং যে পথভ্রষ্ট তাকে বলে দাও, আমিত নিছক সাবধানকারী। (নমল : ৯২)

কুরাইশ এবং আরবের মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া

উপরের এ বিশদ বর্ণনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের দ্বিতীয় দফাটি অর্থাৎ মানুষের পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদের (সা) রিসালাতের স্বীকৃতি আদায় করা এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে তৈরী করা যে তারা আকায়েদ ও এবাদত থেকে শুরু করে জীবনে প্রতিটি বিভাগে সকল ব্যাপারে তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করবে-এ বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব এই যে, এসব ব্যতীত দ্বীন কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রসূলের প্রতি ঈমান এবং বাস্তবে তাঁর আনুগত্য ব্যতীত তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অর্থহীন। চিন্তা করলে মানুষ এ কথা বুঝতে পারে যে, আল্লাহর তাওহীদ মেনে নেয়া

---

১. মুশরিকদের এসব বক্তব্য প্রথমতঃ এ ধারণার ভিত্তিতে ছিল যে নবী (সা) যা কিছু পেশ করছেন তা খোদার পক্ষ থেকে নয়। বরঞ্চ এসব তার নিজের মনগড়া। এসব খোদার প্রতি আরোপ করে পেশ করার অর্থ এই যে তাঁর কথার গুরুত্ব বাড়বে। দ্বিতীয়তঃ তাদের কথার অর্থ এই, তুমি তাওহীদ, আখেরাত এবং নৈতিক বাধা নিষেধের এসব কি বলছ? তুমি যদি পথ দেখাবার জন্যে এসে থাক তাহলে এমন কিছু পেশ কর যার দ্বারা জাতির কল্যাণ হয় এবং তাদের পার্থিব উন্নতি চোখে পড়ে। তথাপি তুমি যদি তোমার এ দাওয়াত একেবারেই বদলাতে না চাও, তাহলে নিদেনপক্ষে এর মধ্যে কিছুটা সহজসাধ্যতা ও উপযোগিতা সৃষ্টি করে দাও, যাতে তোমার ও আমাদের মধ্যে কমবেশী একটা বুঝাপড়া হতে পারে। আমরা তোমার কিছু মেনে নেব এবং তুমিও আমাদের কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওহীদে আমাদের কিছু শির্কের জন্যে, তোমার খোদা পুরস্তির মধ্যে আমাদের কিছু আত্মপূজা ও দুনিয়া পরস্তির জন্যে এবং তোমার আখেরাতের আকীদার মধ্যে কিছু আমাদের এসব আশা-আকাংখার কিছু অবকাশও যেন থাকে যাতে দুনিয়াতে আমরা যা খুশী করতে পারি। আখেরাতে আমাদের কোন না কোনভাবে অবশ্যই নাজাত হবে। তারপর তোমার এই যে অটল নৈতিক মূলনীতি, তা ত আমাদের জন্যে অগ্রহণযোগ্য। এসবের মধ্যে কিছু আমাদের কুসংস্কারের জন্যে, কিছু আমাদের রেসম-রেওয়াজের জন্যে, কিছু আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় স্বার্থের জন্যে এবং কিছু আমাদের মনের অভিলাষের জন্যেও স্থান থাকা উচিত। এমন যেন না হয় যে, দ্বীনের যে সব দাবী, তার একটা যথাযথ পরিমন্ডল তোমার ও আমাদের সম্মতিক্রমে ঠিক হয়ে যায় এবং এতে আমরা খোদার হক আদায় করে দেব। তারপর আমাদের যেন স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হয় যেন যেভাবে ইচ্ছা দুনিয়ার কাজ কাম আমরা চালাব। কিন্তু তুমি এ নিষ্ঠুরতা করছ যে, গোটা জীবন ও সকল বিষয়াদি তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদাহ এবং শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে বেঁধে দিতে চাচ্ছ- গ্রন্থকার।

আরবের সাধারণ মুশরিকদের জন্যে যতোটা কঠিন ছিল, তার চেয়ে ঢের কঠিন ছিল রেসালাত মেনে নেয়া। প্রথমতঃ এটাত তাদের জন্যে কোন সহজ ব্যাপার ছিল না যে, যে ব্যক্তি চল্লিশ বছর যাবত তাদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করে আসছেন, তাঁর সম্পর্কে তারা এ কথা মেনে নেবে যে তিনি হঠাৎ আল্লাহর রসূল নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর কাছে অহী আসা শুরু হয়েছে। যারা যুগ যুগ ধরে লাগামহীন স্বাধীনতায় অভ্যস্ত, তাদের জন্যে এখন এক ব্যক্তির নিরংকুশ আনুগত্য এবং তাদের গোটা জীবনে তাঁর প্রদত্ত আইন পুরোপুরি মেনে চলা কম কঠিন ব্যাপার ছিল না। এর চেয়ে অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল ঐসব সর্দারদের জন্যে যারা নিজেদের গোত্র ও দলের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছিল। কঠিন ছিল ঐসব ধর্মীয় নেতাদের জন্যে যারা সারাদেশে বিরাট বিরাট শির্কের কেন্দ্র স্থাপন করে ব্যবসা জমজমাট করে রেখেছিল। কঠিন ছিল ঐসব গণকদের জন্যে যারা ভবিষ্যদ্বক্তার দাবীদার ছিল এবং হারানো বস্তুর সন্ধান পেতে এবং ভবিষ্যতের অবস্থা জানতে লোক যাদের শরণাপন্ন হতো। তাদের প্রত্যেকের জন্যে রেসালাত ছিল সুস্পষ্ট মৃত্যুর পয়গাম। তা কবুল করাত দূরের কথা, ঠান্ডা মাথায় তা শুনাও তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না। মোট কথা, যাদের যাদের স্বার্থ পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থা বহাল থাকার সাথে জড়িত ছিল তাদের জন্যে এ আশংকা দেখা দিয়েছিল যে, যদি মানুষ নবী মুহাম্মদের (সা) রেসালাত মেনে নেয় এবং এ কথা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অনুগত হয়ে যায় যে, তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা আসমান ও যমীনের খোদার পক্ষ থেকে, তাহলে সমাজে তাদের বাতি আর কোন দিন জ্বলবে না। অতএব এসব লোক আপন আপন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর যে, রেসালাতের এ দাওয়াত কিছুতেই চলতে দেয়া যাবে না। কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে, একবার যদি জনসাধারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত পদপ্রদর্শকের অনুসরণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দ্বীন ও আইনের আনুগত্য মেনে নেয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাদেরকেও অস্ত্রসংবরণ করতে হবে এবং নেতৃত্ব করার পরিবর্তে অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

একদিকে ছিল এ অসুবিধাগুলো এবং অন্যদিকে তাদের জন্যে যে ভয়ানক অসুবিধা ছিল তা হলো এই যে, রেসালাতের দাবী নিয়ে তাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি দাঁড়িয়েছেন, যিনি তাদের জাতির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। যার নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব গোটা জাতি স্বীকার করে। যাঁকে পাঁচ বছর আগে সমগ্র জাতি সর্বসম্মতিক্রমে 'আল্ আমীন' উপাধিতে ভূষিত করে। যিনি রেসালাতের দাবী পেশ করার পূর্বাহ্নে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে যখন তাদেরকে বলেছিলেন, যদি আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে একটি সৈন্য দল তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত, তাহলে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে? তখন সকলে এক বাক্যে বলেছিল, হাঁ আমরা মেনে নেব, কারণ আমরা তোমাকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনিনি।

এরপর তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করা এবং মানুষকে এ কথা বিশ্বাস করানো কোন সহজ কাজ ছিল না যে, যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি এতো বড়ো মিথ্যা দাবী করবেন যে, খোদা তাঁকে রসূল নিযুক্ত করেছেন এবং খোদার বাণী তাঁর উপর নাযিল হয়?

এ সম্পর্কে কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لاَ

يُكَذِّبُوْنَكَ وَ لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ
(الانعام ٣٣)-

-হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা জানি যে এসব লোক যা বলছে তাতে তোমার মনঃকষ্ট হয়। কিন্তু এরা তোমাকে মিথ্যা বলছে না, বরঞ্চ এসব জালেমরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছে। (আনয়াম ঃ ৩৩)

এ কথা এ সত্যের প্রতিই ইংগিত যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত নবী মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর আয়াত শুনানো শুরু করেননি, তাঁর জাতির সকল লোক তাঁকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মনে করতো। তাঁর সততার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করলো তখন যখন তিনি তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী পৌঁছাতে শুরু করলেন। এ দ্বিতীয় পর্যায়েও এমন কেউ ছিল না যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে মিথ্যা বলার সাহস করতো। তাঁর চরম দুশমনও কোন দিন তাঁর প্রতি এ অভিযোগ করেনি যে, তিনি দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলার দোষে দোষী হয়েছেন। তাঁর প্রতি তারা যতো মিথ্যা আরোপ করেছে তা করেছে নবী হওয়ার কারণে। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুশমন ছিল আবু জাহল। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার সে (আবু জাহল) নবীকে (সা) বলে -

اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَ لٰكِنْ نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهٖ -

আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না, বরঞ্চ তুমি যা নিয়ে এসেছো তা মিথ্যা মনে করি।[১]

বদর যুদ্ধের সময় আখ্‌নাস বিন্ শারীক নিভৃতে আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে তুমি ও আমি ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি নেই। সত্যি করে বল দেখি, মুহাম্মদকে (সা) সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

সে জবাবে বলে, খোদার কসম মুহাম্মদ একজন সত্যবাদী লোক। সারা জীবন কোন মিথ্যা বলেনি। কিন্তু 'লেওয়া' (পতাকাবাহীর মর্যাদা), হিজাবাত (খানায়ে কাবার চাবি বহনকারীর মর্যাদা), সিকায়াত (হাজীদেরকে পানি পান করাবার মর্যাদা) এবং নবুওত সব কিছুই যদি বনী কুসাই-এর অংশে যায় তাহলে বলো, অবশিষ্ট সমগ্র কুরাইশের কাছে আর কি রইলো?[২]

এ সবের ভিত্তিতে আল্লাহ্ তায়ালা নবী করিমকে (সা) সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, মিথ্যা আরোপ তোমার প্রতি নয়, বরঞ্চ আমার প্রতি করা হচ্ছে। আর আমি সহনশীলতার সাথে তা সহ্য করে যাচ্ছি এবং অবকাশের উপর অবকাশ দিচ্ছি, এখন তুমি অস্থির হচ্ছ কেন?

---

১ ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং হাকেম এ রেওয়ায়েত হযরত আলী (রাঃ) থেকে নকল করেছেন -গ্রন্থকার।

২. ইবনে জারীর তাঁর তফসীরে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আখনাস বিন শারীক-নবী করিমের (সা) নানার বংশ বনী যোহরার সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যদিও সে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে এসেছিল, কিন্তু সে এবং বনী যোহরার কোন লোক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি -গ্রন্থকার।

ওজর আপত্তি, অভিযোগ এবং আজিব ধরনের দাবী-দাওয়া

এ দ্বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার পর কুরাইশ এবং অন্যান্য মুশরিকদের জন্যে এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না যে, হুযুরের (সা) রেসালাত না মানার জন্যে নানান ধরনের ওজর আপত্তি করবে, বিভিন্ন প্রকারের ও বিপরীতমুখী অভিযোগ উত্থাপন করবে এবং আজিব আজিব মুজেযা দেখাবার দাবী করবে। কিন্তু যেমন তৌহীদের ব্যাপারে আপনারা দেখেছেন যে, শির্কের খন্ডনের জন্যে বরং খোদার একত্ব প্রমাণের জন্যে এমন সব অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির এসব সত্য অস্বীকার করার কোন অবকাশই রইলো না। ঠিক তেমনি রেসালাতের বিরুদ্ধে মুশরিকদের যাবতীয় কূটকৌশলের মুকাবিলা এমন যুক্তিযুক্ত পন্থায় করা হলো যে, যার মধ্যে সামান্য পরিমাণেও বিবেক বুদ্ধি ছিল, সে স্বীকার না করে পারলো না, তা সে জিদ ও হঠকারিতার সাথে বিরোধিতা করতে থাক না কেন।(১২)

হুযুরের (সা) মানুষ হওয়ার উপরে আপত্তি

তাদের প্রথম আপত্তি এ ছিল যে, তারা বলতো, আমরা এমন একজন মানুষকে খোদার রসূল কিভাবে মেনে নিতে পারি যে, আমাদেরই মত একজন মানুষ? সে খানাপিনা করে, সন্তানাদি রাখে এবং পার্থিব ঐসব কাজকাম করে যা অন্যান্য লোক করে থাকে। কুরআনে তাদের এসব ওজর আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ و اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

-(الانبياء - ٣)

আর এ জালেমরা পরস্পর কানাঘুষা করে এবং বলে, এ ব্যক্তি তো তোমাদেরই মতন একজন মানুষ মাত্র। তোমরা কি দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পা দেবে? (আম্বিয়া ঃ ৩)

এসব কানাঘুষা মক্কার কাফেরদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ পরস্পর বসে করতো, নবীর দাওয়াতের মুকাবিলা যাদের করতে হতো, তারা বলতো, এ লোক নবীতো কিছুতেই হতে পারে না। কারণ সেত আমাদেরই মতন একজন মানুষ, খায় দায়, বাজারে ঘুরাফেরা করে, বিবি বাচ্চা রাখে। তার মধ্যে এমন ব্যতিক্রমধর্মী কি আছে যা তার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং আমাদের তুলনায় তাকে খোদার সাথে অসাধারণ সম্পর্কের অধিকারী বানায়? অবশ্যি তার কথাবার্তায় এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাদু আছে। সে জন্যে যে ব্যক্তিই তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং তার নিকটে যায়, সে তার অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যে যদি নিজেদের মঙ্গল চাও, তাহলে তার কোন কথা শুন না এবং তার সাথে মিলামিশাও করো না। কারণ তার কথা শুনা এবং তার নিকটে যাওয়ার অর্থ দেখে শুনে যাদুর ফাঁদে পা দেয়া।(১৩)

و قَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ و يَمْشِىْ فِى الاَسْوَاقِ - لَوْ لاَ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ معه نَذِيْرًا - اَوْ يُلْقى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَه جَنَّةٌ يَاْكُلُ مِنْهَا

و قَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا
-(الفرقان ٨-٧)

-এবং তারা বলে, এ কেমন রসূল যে, খানা খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে? কেন তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠানো হলো না যে তার সাথে থাকতো এবং (অস্বীকারকারীদেরকে) ভয় দেখাতো? আর কিছু না হলে তো অন্ততঃপক্ষে তার জন্যে কোন ধন-ভান্ডার অবতীর্ণ করা হতো, অথবা তার কোন বাগান হতো যার থেকে নিশ্চিন্ত মনে রুজি রোজগার করতো?

জালেমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুকৃত লোকের পেছনে লেগে গেছো। (ফুরকান ঃ ৭-৮)

তাদের মতলব ছিল এই যে, প্রথমতঃ মানুষের রসূল হওয়াটাই একটা আজব কথা। খোদার পয়গাম নিয়ে এলে ত কোন ফেরেশতা আসতো, না রক্ত-মাংসের কোন মানুষ যার বাঁচার জন্যে আহারের প্রয়োজন হয়। আর যদি মানুষকেই রসূল বানানো হয়ে থাকতো, তাহলে তো নিদেনপক্ষে বাদশাহ ও দুনিয়ার বড়ো লোকদের মতো কোন ব্যক্তিত্ব তার হওয়া উচিত ছিল, যাকে দেখার জন্যে চক্ষু অধীর হতো এবং অতিকষ্টে তার নৈকট্য লাভ ভাগ্যে ঘটতো। তা না হয়ে একজন সাধারণ মানুষকে খোদাওন্দে আলমের পয়গম্বর বানিয়ে দেয়া হলো যে বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ায়? পথ চলতে প্রতিদিন যার সাথে দেখা হয় এবং আমাদের চেয়ে তার মধ্যে অসাধারণ কিছু পাওয়া যায় না, তাকে কে মর্যাদার চোখে দেখবে? অন্য কথায় তাদের মতে, রসূল প্রেরণের প্রয়োজন থাকলে সাধারণ মানুষের হেদায়েতের জন্যে নয়, বরঞ্চ বিস্ময়কর কিছু দেখাবার জন্যে অথবা আড়ম্বর ও ঠাটবাট দ্বারা প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টি করার জন্যে।

তারপর তারা বলতো যে, মানুষকেই যদি নবী বানানো হতো তাহলে তার সাথে একজন ফেরেশতা দেয়া হতো যে সর্বদা হাতে ডান্ডা নিয়ে থাকতো এবং মানুষকে বলতো, এর কথা মেনে নাও, নইলে এই দেখ খোদার আযাব বর্ষণ করলাম। এত বড়ো আজব কথা যে, বিশ্বস্রষ্টা একজনকে নবুওয়তের মহান মর্যাদায় ভূষিত করে এমনি একাকী ছেড়ে দেবে আর ও বেচারা মানুষের গালি আর পাথর খেতে থাকবে।

তাদের সর্বশেষ দাবী ছিল এই যে, নিদেনপক্ষে আল্লাহ মিয়া তো এতোটুকু করতে পারতেন যে, তাঁর রসূলের জীবিকার কোন সুন্দর ব্যবস্থা করতেন। এ কেমন কথা যে, এ খোদার রসূল আমাদের সাধারণ ধনী ব্যক্তিদের চেয়েও অনেক অপদার্থ। খরচের জন্যে না কোন পয়সা কড়ি আছে, আর না ফলমূল খাওয়ার কোন বাগান। আর ওদিকে তার দাবী হচ্ছে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পয়গম্বর।

এসব আবোল তাবোল বলার পর তারা বলতো, এ ব্যক্তিকে যাদু করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ তার উপর যাদু করেছে এবং তার ফলে সে পাগল হয়েছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উপরে তাদের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে তারা তাঁকে যাদুকর বলতো। এখন তারা বলছে তাঁকে যাদু করা হয়েছে। কবি হওয়ার অপবাদও ছিল যার উল্লেখ পরে করা হচ্ছে।(১৪)

এসব ওজর আপত্তির জবাব

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ـ (الرعد ٣٨)

-তোমাদের পূর্বেও আমরা বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে বিবি, বাচ্চা-সন্তানাদি দিয়েছিলাম। (রা'দ ঃ ৩৮)

এ হলো ওসব প্রশ্নের জবাব যা তারা নবীর (সা) কাছে করতো যে, এত ভালো নবী যার বিবি-বাচ্চা আছে। আচ্ছা, নবীদেরও কি যৌন বাসনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে নাকি? বলা হলো, আগেও যেসব নবী রসূল পাঠানো হয়েছিল, তাদেরও তো বিবি-বাচ্চা ছিল। হযরত নূহকে (আঃ) স্বয়ং তোমরা তো নবী বলে মান। তার যদি সন্তান-সন্তুতি না থাকতো তাহলে তার বংশ থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করলে কিভাবে? হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর পয়গম্বর হওয়া তো তোমাদের কাছে সর্বস্বীকৃত। তোমাদের কুল ও বংশ তো তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট কর। তাদের সন্তান-সন্তুতি যদি না থাকে তোমরা বনী ইসমাঈল কোথা থেকে হতে?(১৫)

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ وَ مَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ـ (الانبياء ٨٧)

-এবং (হে নবী মুহাম্মদ)! তোমার পূর্বেও আমরা মানুষকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি যাদের উপর আমরা অহী পাঠাতাম। তোমাদের যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস কর। তাদেরকে আমরা এমন কোন দেহ দান করিনি যা আহার করতো না এবং না তারা চিরজীবী ছিল। (আম্বিয়া ঃ ৭-৮)

-অর্থাৎ এই যে, ইহুদী সম্প্রদায় যারা ইসলাম দুশমনিতে তোমাদের সাথে একাত্ম এবং তোমাদেরকে ইসলাম বিরোধিতার কলাকৌশল শিক্ষা দেয় তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর মুসা (আঃ) এবং বনী ইসরাঈলের নবী কে ছিলেন? তাঁরা কি মানুষ ছিলেন না অন্য কোন সৃষ্টি?(১৬)

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَ بَالَ اَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ ذٰلِكَ بِاَنَّه كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ـ (التغابن ٥-٦)

-তোমাদের কাছে তাদের কি কোন খবর পৌঁছেনি যারা এর আগে কুফর করেছে এবং দুষ্কর্মের কুফল ভোগ করেছে? এবং (ভবিষ্যতে) আখেরাতে তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। এ পরিণাম ফলের অধিকারী তারা এ জন্যে হয় যে, তাদের কাছে তাদের রসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতে থাকে, কিন্তু তারা বলে, মানুষ কি আমাদের হেদায়েত দেবে? এভাবে তারা মানতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আল্লাহও তাদের থেকে বেপরোয়া হয়ে যান। আর আল্লাহ্ ত আসলেই বেপরোয়া এবং আপন সত্তায় সপ্রশংসিত। (তাগাবুন ঃ ৫-৬)

অর্থাৎ নবীগণ এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন যা তাঁদের আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছিল। তাঁরা যে কথাই বলতেন তা একেবারে বিবেকসম্মত এবং তা পেশ করতেন প্রকৃষ্ট যুক্তি প্রমাণসহ। তাঁদের শিক্ষার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। বরঞ্চ তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলতেন সত্য কি এবং মিথ্যা কি। জায়েয কি এবং না জায়েয কি। কোন্ পথে মানুষের চলা উচিত এবং কোন্ পথে চলা উচিত নয়। কিন্তু এ কথা বলে তাঁদের কথা মানতে অস্বীকার করে- এখন কি মানুষ আমাদের হেদায়েত করবে? এবং এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। কারণ মানব জাতির সঠিক কর্মপন্থা জানার এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে তাদের স্রষ্টা তাদেরকে সত্য জ্ঞান দান করবেন। আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে জ্ঞান দানের বাস্তব পন্থা এ ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না যে, তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কতিপয় ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করে অন্যান্যকে পৌঁছিয়ে দেয়ার খেদমত তাঁদের উপর সোপর্দ করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নবীগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠান যাতে তাঁদের সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ্ করার ন্যায়সঙ্গত কারণ না থাকতে পারে। কিন্তু তারা এ কথা মানতেই একেবারে অস্বীকার করে যে, মানুষ খোদার রসূল হতে পারে। তারপর তাদের হেদায়েত লাভের আর কোন উপায় রইলো না। এ ব্যাপারে পথভ্রষ্ট মানুষের অজ্ঞতা ও মুর্খতার এক বিস্ময়কর চিত্র আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় যে, মানুষের পথ নির্দেশনা গ্রহণ করতে তারা কোন দিন ইতঃস্ততঃ করেনি। এমনকি কতিপয় মানুষেরই পথ নির্দেশনায় কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমাকে তারা মাবুদ বানিয়ে নেয়। স্বয়ং মানুষকে তারা খোদা, খোদার অবতার এবং খোদার পুত্র বলেও মেনে নিয়েছে। তারপর পথভ্রষ্টকারী নেতাদের অন্ধ অনুসরণে তারা এমন সব বিচিত্র পথ অবলম্বন করেছে যারা মানবীয় তাহযিব, তামাদ্দুন ও চরিত্র বিনষ্ট করে রেখেছে। কিন্তু খোদার রসূল যখন তাদের নিকটে সত্য নিয়ে আগমন করলেন এবং তারা সকল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে থেকে পক্ষপাতহীন সত্য তাদের সামনে পেশ করলেন, তখন তারা বল্লো, এখন মানুষ কি আমাদের হেদায়েত দেবে? এর অর্থ ছিল এই যে, মানুষ যদি পথভ্রষ্ট করে তাহলে তা শিরোধার্য। কিন্তু যদি সে সত্য পথ দেখায় তাহলে তার পথ নির্দেশনা গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব যখন তারা আল্লাহর প্রেরিত হেদায়েত থেকে বিমুখ হলো, তখন আল্লাহরও কোন পরোয়া রইলো না যে তারা কোন্ ধ্বংস গহ্বরে পতিত হচ্ছে। তাদের দ্বারা আল্লাহর কোন স্বার্থ আটকা পড়েনি যে, তারা তাঁকে খোদা মানলে তিনি খোদা থাকবেন, নইলে খোদায়ী সিংহাসন তাঁর হাতছাড়া হবে। তিনি তাদের এবাদতের না মুখাপেক্ষী ছিলেন, আর না তাদের প্রশংসা গীতির। তিনি তো তাদের নিজেদের মংগলের জন্যে তাদেরকে সুপথ দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা যখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তখন আল্লাহও

তাদের থেকে বেপরোয়া হয়ে গেলেন। তারপর না তিনি তাদের হেদায়েত দান করলেন, আর না তাদের হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। না তাদেরকে ধ্বংস গহ্বরে পতিত হওয়া থেকে বাঁচালেন, আর না তাদের নিজেদের উপর ধ্বংস আসা থেকে তাদের বিরত রাখলেন। কারণ তারা স্বয়ং তাঁর হেদায়েত ও পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী ছিল না।(১৭)

و ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا - قل لو كان فى الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا - (بنى اسرائيل:٩٤-٩٥)

-মানুষের সামনে যখন কোন হেদায়েত এসেছে তখন তার উপর ঈমান আনতে তাদেরকে কোন কিছু বাধা দেয়নি তাদের এ কথা ব্যতীত-"আল্লাহ কি মানবকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন?" তাদেরকে বল, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো, তাহলে অবশ্যই আমরা আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে তাদের জন্যে পয়গম্বর করে পাঠাতাম। (বণী ইসরাইল ঃ ৯৪-৯৫)

অর্থাৎ পয়গম্বরের কাজ শুধু এতোটুকু নয় যে, এসে শুধু খোদার পয়গাম শুনিয়ে দেবেন। বরঞ্চ তাঁর কাজ এটাও যে, সেই পয়গাম অনুযায়ী মানব জীবনের সংস্কার সংশোধন করবেন। মানুষের অবস্থাকে সেই পয়গামের মূলনীতির সাথে তাঁকে সংগতিশীল করতে হয়। তাঁকে স্বয়ং তাঁর জীবনে ঐসব মূলনীতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হয়। যে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য অগণিত মানুষ তাঁর পয়গাম শুনার ও বুঝার চেষ্টা করে তাদের মন মানসিকতার গ্রন্থি উন্মোচন করতে হয়। যারা তাঁর পয়গাম মেনে নেয় তাদেরকে সংগঠিত করতে হয় এবং তাদের তরবিয়ত দিতে হয় যাতে সে পয়গামের শিক্ষা অনুযায়ী একটি সমাজ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে। যারা তা অস্বীকার করে, বিরোধিতা করে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদের মুকাবিলায় সংগ্রাম করতে হয় যাতে অনাচারের সমর্থক শক্তিসমূহ পর্যুদস্ত করা যায় এবং তারা সংস্কার কাজের দিকে ধাবিত হয় যে কাজে আল্লাহ তায়ালা নবী প্রেরণ করেছেন। এ সকল কাজ যখন মানুষের মধ্যেই করণীয় তখন তার জন্যে মানুষ ছাড়া আর কাকে পাঠানো যেতো? ফেরেশতা বড়োজোর এতোটুকু করতো যে, আসতো এবং পয়গাম পৌঁছিয়ে চলে যেতো। মানুষের মধ্যে মানুষের মতোই অবস্থান করে মানুষের মতো কাজ করা এবং মানব জীবনে খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী সংস্কার করে দেখানো কোন ফেরেশতার সাধ্যের কাজ ছিল না। এ কাজের শুধু মানুষই উপযোগী হতে পারতো।(১৮)

و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من اهل القرى - (يوسف ١٠٩)

-হে মুহাম্মদ (সা), তোমার পূর্বে আমরা যে পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম তারা সকলে এ জনপদেরই অধিবাসী মানুষ ছিল যাদের প্রতি আমরা অহী পাঠিয়েছিলাম। (ইউসুফঃ ১০৯)

এখানে একটি বিরাট বিষয়কে একই বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। তাকে বিশদভাবে বলতে গেলে এমনিভাবে বলা যায়-

হে নবী! এসব লোক তোমার কথায় এ জন্যে মনোযোগ দেয় না যে, কাল যে ব্যক্তি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করলো, তাদেরই মধ্যে শৈশব থেকে যৌবনে পৌছলো এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌছলো, তার সম্পর্কে আমরা কিভাবে এ কথা মেনে নিতে পারি যে, হঠাৎ একদিন খোদা তাঁকে তাঁর দূত নিযুক্ত করেছেন?

কিন্তু এ কোন অভিনব বিষয় নয় যে, দুনিয়ায় প্রথমবার তাঁকে এর সম্মুখীন হতে হলো। এর পূর্বেও খোদা তাঁর নবী পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন। তারপর এটাও কখনো হয়নি যে, হঠাৎ কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি কোন শহরে আবির্ভূত হলো এবং সে বল্লো, আমাকে পয়গম্বর করে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু যাদেরকেই মানুষের সংস্কার সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে তাঁরা সকলেই আপন আপন জনপদের অধিবাসী ছিলেন। মাসীহ, মূসা, ইবরাহীম, নূহ আলাইহিমুস সালাম তাহলে কে ছিলেন? সেই সেই শহর থেকেই তাঁরা আবির্ভূত হন যেখানে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তারা কি অন্য কোথাও থেকে এসেছিলেন?(১৯)

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ - قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ -(يونس ٢)

মানুষের জন্যে এ কি বড়ো আশ্চর্যজনক হয়েছে যে আমরা স্বয়ং তাদেরই মধ্যে একজনের প্রতি অহী পাঠিয়েছে মানুষকে সাবধান করার জন্যে এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে এ সুসংবাদ দেবে যে তাদের জন্য তাদের রবের নিকটে সত্যিকার ইজ্জত সম্ভ্রম রয়েছে? (এ জন্যেই কি) অস্বীকারকারীগণ বল্লো, এ ব্যক্তিতো প্রকাশ্য যাদুকর? অর্থাৎ এতে আশ্চর্যের কি আছে? মানুষকে সাবধান করার জন্যে মানুষ নিযুক্ত করা হবে না তো কি ফেরেশতা, অথবা জিন অথবা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর যদি মানুষ সত্যের প্রতি উদাসীন হয়ে ভ্রান্ত উপায়ে জীবনযাপন করে তাহলেতো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক তাকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেবে, না বরঞ্চ তার হেদায়াতের কোন ব্যবস্থা করবে? অথবা খোদার পক্ষ থেকে তার ইজ্জত-সম্মান হওয়া উচিত যা সে মেনে নেবে অথবা সে প্রত্যাখ্যান করবে? অতএব যারা বিস্ময় প্রকাশ করছে তাদের ভেবে দেখা উচিত যে কোন্ জিনিসের উপর তারা বিস্ময় প্রকাশ করছে।

তারপর সাবধানকারীকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করা তো তাদের চিন্তা করা উচিত যে এ অপবাদ তাঁর উপর খাটে কিনা। কোন ব্যক্তি উচ্চাংগের ভাষণদানের মাধ্যমে লোকের মন মস্তিষ্ক জয় করছে, তার উপর এ অভিযোগ করার জন্যে এ কথা যথেষ্ট নয় যে সে যাদু করছে। এটা দেখা উচিত যে, এ ভাষণে সে কোন্ কথা বলছে। কোন্ স্বার্থে সে তার বক্তৃতা শক্তি ব্যবহার করছে। তারপর ঈমান আনয়নকারীদের উপর তার ভাষণের যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা কোন ধরনের? যে বক্তা অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যাদুকরী

ভাষণের শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন বাচাল, লাগামহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য ও সততার কোন খেয়াল না করে সে এমন সব কথা বলে ফেলে যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে- তা যতোই মিথ্যা, অতিরঞ্জিত এবং অবান্তর হোক না কেন। তার কথার মধ্যে বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে এমন কিছু যা জনসাধারণকে প্রতারিত করে। তার কথার মধ্যে সাজানো গোছানো চিন্তার পরিবর্তে থাকে অসংগতি ও অসামঞ্জস্য। তার কথায় ভারসাম্য না হয়ে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। সে তো তার বাজিমাৎ করার জন্যে বেহায়াপনা করে অথবা তারপর পরস্পর লড়াই ঝগড়া করার জন্যে এবং একদলকে আর একদলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে বক্তৃতার আফিং খাইয়ে দেয়। তার প্রভাবে লোকের মধ্যে না কোন নৈতিক মান সৃষ্টি হয়, না তাদের জীবনে কোন কল্যাণকর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর না কোন সৎ চিন্তা অথবা বাস্তব সৎ পরিবেশ পরিস্থিতি অস্তিত্ব লাভ করে। বরঞ্চ মানুষ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু এখানে তোমরা দেখছ পয়গম্বর যে বাণী পেশ করেন, তার মধ্যে বিজ্ঞতা আছে, এক সুসমঞ্জস্য চিন্তা পদ্ধতি আছে, চরম ভারসাম্য এবং সত্য ও সত্যবাদিতার কঠিন বাধ্যবাধকতা আছে। প্রতিটি শব্দ মাপ-জোক করা, প্রতিটি কথা অতি মুল্যবান। তাঁর ভাষণে তোমরা খোদার সৃষ্টির সংস্কার ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারবে না। তিনি যা বলেন তার মধ্যে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয় অথবা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। তিনি শুধু চান যে, মানুষ যে অবহেলা ঔদাসিন্যে মগ্ন আছে তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেন এবং তাদেরকে এমন পথে নিয়ে আসেন যাতে তাদের নিজেদের কল্যাণ রয়েছে। তারপর তাঁর ভাষণের যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা যাদুকরী ভাষণদানকারী ভাষণের প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এখানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেছে তার জীবন সুশৃংখল হয়েছে। সে পূর্বাপেক্ষা মহত্তর চরিত্রের লোক হয়েছে। তার কর্মপদ্ধতির মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে। এখন তোমরাই ভেবে দেখ, যাদুকর কি এ ধরনের কথা বলে এবং তার যাদু কি এমন সুফল সৃষ্টি করতে পারে?(২০)

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - (بنى اسرائيل ٥٥)

-আমরা কতিপয় পয়গম্বরকে কতিপয় থেকে উন্নততর মর্যাদা দান করেছি এবং দাউদকে আমরা যবুর দান করেছি। (বনী ইসরাইল ঃ ৫৫)

যে প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে তাতে হযরত দাউদকে (আঃ) যবুর কিতাব দানের পৃথকভাবে উল্লেখ এ জন্যে করা হয়েছে যে, তিনি বাদশাহ ছিলেন এবং সেই সাথে নবীও ছিলেন। নবী মুহাম্মদের (সা) সমসাময়িক লোকেরা যে কারণে তাঁর নবুওয়ত মানতে অস্বীকার করছিল, তা তাদের নিজেদের মতে এ ছিল যে, তিনি সাধারণ মানুষের মতো বিবি-বাচ্চা রাখতেন, খানাপিনা করতেন, বাজারে চলাফেরা করে কেনাবেচা করতেন এবং সে সমূদয় কাজই করতেন যা অন্যান্য দুনিয়াদার লোক মানবীয় প্রয়োজনে করতো। মক্কার কাফেরদের বক্তব্য ছিল এই "তুমি একজন দুনিয়াদার লোক। খোদাপ্রাপ্তির সাথে তোমার কি সম্পর্ক? খোদাপ্রেরিত লোক তো তারা হয়, যাদের দৈহিক প্রয়োজনের কোন

হুশ জ্ঞান থাকে না। ব্যস্ এক কোণায় বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে। কোথায় সে, আর কোথায় তার ডালভাতের চিন্তা"? এর জবাবে বলা হচ্ছে যে, একটা পরিপূর্ণ বাদশাহী ব্যবস্থাপনা অপেক্ষা দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে? এতদসত্ত্বেও হযরত দাউদকে (আঃ) নবুওয়ত এবং কিতাব দান করা হয়েছিল।(২১)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ و مَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَ لاَبِكُمْ - اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحى اِلَىَّ وَمَا اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (الاحقاف ٩)

(হে নবী, এদেরকে বলে দাও) আমি তো কোন অভিনব রসূল নই। আমি জানি না যে আমার সাথে কি আচরণ করা হবে। আর না জানি যে তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আমি তো ব্যস সেই অহীর অনুসরণ করি যা আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং আমি একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী ব্যতীত কিছু নই। (আল-আহকাফ ঃ ৯)

এ এরশাদের পটভূমি এই যে, যখন নবী (সা) নিজেকে খোদার রসূল হিসাবে পেশ করলেন, তখন মক্কাবাসী বিভিন্ন রকমের সমালোচনা শুরু করে। তারা বলতো এ কেমন রসূল যে, তার বিবি বাচ্চা রয়েছে, বাজারে চলাফেরা করে, খানাদানা খায়, আমাদের মতোই জীবন যাপন করে। আসলে তার মধ্যে এমন বিশেষ কি আছে যার জন্যে সে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্নতর যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশেষভাবে এ ব্যক্তিকে খোদা তাঁর রসূল বানিয়েছেন। তারপর তারা বলে, যদি এ ব্যক্তিকে খোদা রসূলই বানাতেন তাহলে তিনি তার আর্দালী করে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন। সে ঘোষণা করতো যে এ হচ্ছে, খোদার রসূল। আর তার সামনে সামান্য বেয়াদবী গোস্তাখী করলে তাকে বেত্রাঘাত করতো। এ কেমন করে হতে পারে যে, খোদা কাউকে তাঁর রসূল নিযুক্ত করলেন তারপর তাকে এভাবে মক্কার অলিগলিতে ঘুরাফেরা করতে এবং জুলুম অত্যাচার সহ্য করতে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিলেন? আর কিছু না হোক, অন্ততঃ খোদা তাঁর রসূলের জন্যে এক রাজকীয় প্রাসাদ এবং একটি প্রস্ফুটিত বাগান তৈরী করে দিতেন। তাহলে এটা হতো না যে তাঁর রসূলের বিবি অর্থহীন হয়ে অনাহারে রয়েছে অথবা এমন হতো না যে তার তায়েফ যাওয়ার জন্যে কোন সওয়ারী নেই।

তারপর তারা নবী (সা) এর নিকটে বিভিন্ন রকমের মুজেযার দাবী করে। ভবিষ্যতের কথাও তাঁর কাছে জানতে চাইতো। তাদের ধারণায় কোন ব্যক্তির খোদার রসূল হওয়ার অর্থ এই যে, সে অতি মানবীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাঁর অঙ্গুলী হেলনে পাহাড় স্থানচ্যুত হবে এবং মরুভূমি সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান তার থাকবে এবং অপ্রকাশ্য প্রতিটি বস্তু তার কাছে সুস্পষ্ট হবে।

এসব কথার জবাবে বলা হলো, তাদেরকে বলে দাও। আমি অভিনব রসূল তো নই। আমাকে রসূল নিয়োগ করা দুনিয়ার ইতিহাসে কোন প্রথম ঘটনা নয় যে তোমাদের এ কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে, রসূল কেমন হয় এবং কেমন হয় না। আমার পূর্বে অনেক রসূল এসেছেন। আমি তাদের থেকে ভিন্নতর নই। দুনিয়ার এমন কোন্ নবী রসূল এসেছেন যাঁর বিবি-বাচ্চা ছিল না? অথবা তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতেন না? কোন্ রসূলের সাথে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছে, যে তাঁর রেসালতের ঘোষণা

করতো এবং তাঁর আগে আগে ডান্ডা হাতে চলতো? কোন রসূলের জন্যে রাজপ্রসাদ ও বাগবাগিচা তৈরী করা হয় এবং কে খোদার দিকে আহবান করার জন্যে নির্যাতন ভোগ করেননি যেমন আমি করছি? এমন কোন রসূল ছিলেন যিনি আপন এখতিয়ারে মোজেযা দেখাতে পারতেন এবং আপন জ্ঞানে সব কিছু জানতে পারতেন? তাহলে আমার রেসালত যাচাই করার জন্যে তোমরা কোথা থেকে এ অভিনব মানদন্ড নিয়ে আসছ?

তারপর তাদের জবাবে এ কথাও বলা হলো, আমি জানি না আগামীকাল আমার সাথে কি আচরণ করা হবে এবং তোমাদের সাথেই বা কি করা হবে। আমি তো শুধু সেই অহী মেনে চলি যা আমার নিকটে পাঠানো হয়। অর্থাৎ আমি ভবিষ্যদ্বক্তা নই যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু আমার নিকটে সুস্পষ্ট হবে এবং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান আমি লাভ করব। তোমাদের ভবিষ্যত তো দূরের কথা আমার নিজের ভবিষ্যত আমার জানা নেই। অহীর মাধ্যমে যে বস্তুর জ্ঞান আমাকে দেয়া হয় শুধু ততোটুকুই আমি জানি। তার অতিরিক্ত জ্ঞান রাখার দাবী আমি কখন করেছি? এমন ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকারী কোন্ রসূল দুনিয়ায় ছিলেন যে, তোমরা আমার রেসালাত যাচাই করার জন্যে আমার ভবিষ্যত জ্ঞানের পরীক্ষা করছ? রসূলের এ কাজ কখন থেকে হয়েছিল যে তিনি হারানো জিনিসের সন্ধান দেবেন এবং বলে দেবেন গর্ভবতী স্ত্রীলোক ছেলে না মেয়ে প্রসব করবে অথবা এ কথা বলবে রোগী আরোগ্য লাভ করবে, না মরবে?(২২)

হুযুরকে (সা) কেন নবী বানানো হলো?

তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ এ ছিল যে, খোদার যদি নবী পাঠাবারই প্রয়োজন ছিল এবং মানুষের মধ্য থেকেই কাউকে পাঠাতে হতো, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ (সা) বিন আব্দুল্লাহকেই কি পাওয়া গেল? মক্কা এবং তায়েফের বড়ো বড়ো লোক কি সব মরে গিয়েছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কাউকে বেছে নেয়া গেল না? তাদের বক্তব্য ছিল।

ءَاُنْـزِلَ عَـلَـيْـهِ الـذِّكْـرُ مِـنْ بَـيْـنِـنَـا ـ(ص ٨)

-আমাদের মধ্যে কি শুধু এই এক ব্যক্তিই ছিল যার উপর যিকির (খোদার পয়গামের নসিহত) নাযিল করা হলো? (সোয়াদ ঃ ৮)

و قَـالُـوْا لَـوْلاَ نُـزِّلَ هـذَا الْـقُـرْاٰنُ عَـلـى رَجُلٍ مِّـنَ الْـقَـرْيَـتَـيْـنِ عَـظِـيْـمٍ ط اَهُـمْ يَـقْـسِـمُـوْنَ رَحْـمَـت رَبِّـك ط نَـحْـنُ قَـسَـمْـنَـا بَـيْـنَـهُـمْ مَـعِـيْـشَـتَـهُـمْ فِـى الْـحَـيـوةِ الـدُّنْـيَـا و رَفَـعْـنَـا بَـعْـضَـهُـمْ فَـوْقَ بَـعْـضٍ دَرَجـتٍ يَـتَّـخِـذَ بَـعْـضُـهُـمْ بَـعْـضًـا سُـخْـرِيًـا ط و رَحْـمَـةُ رَبِّـك خَـيْـرٌ مِّـمَّـا يَـجْـمَـعُـوْنَ ـ(الـزُّخْـرُفْ :٣١-٣٢)

-এবং তারা বলে, এ কুরআন দুটি শহরের বড় লোকদের কোন একজনের উপর কেন নাযিল করা হলো না? তোমার রবের রহমত কি এসব লোক বন্টন করে? দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন যাপনের উপকরণ তো তাদের মধ্যে আমরাই বন্টন করি। এবং তাদের মধ্য

থেকে কিছু লোককে অন্যান্য লোক থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছি যাতে একে অপরের খেদমত গ্রহণ করতে পারে। এবং তোমার রবের রহমত ঐসব ধন সম্পদ থেকে অধিকতর মূল্যবান যা এসব বড়ো লোকেরা সঞ্চয় করে। (যখরুখ ঃ ৩১-৩২)

দু'টি শহরের অর্থ মক্কা ও তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিল, সত্যিই খোদার যদি কোন রসূল পাঠাবার দরকার থাকতো এবং তিনি যদি তার উপর তাঁর কিতাব নাযিল করার ইচ্ছা রাখতেন, তাহলে আমাদের এ শহর দুটির মধ্যে কোন এক বিরাট ব্যক্তিকে এ কাজের জন্যে বেছে নিতেন। রসূল বানাবার জন্যে আল্লাহ্ মিয়া পেলেন এমন ব্যক্তি যিনি এতিম হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর অংশে কোন উত্তরাধিকার ছিল না। ছাগল চড়িয়ে তিনি যৌবন কাটান। এখন তাঁর দিনকাল চলছে বিবির পয়সায় ব্যবসা করে। তিনি কোন গোত্রপতিও নন। অথবা কোন পরিবারের নেতাও নন। মক্কায় অলীদ বিন মুগীরা এবং ওতবা বিন রাবিয়ার মতো কি কোন খ্যাতনামা সর্দার ছিল না? তায়েফে ওরওয়া বিন মাসউদ, হাবীব বিন আমর, কিনানা বিন আবেদ আমর এবং আবেদ ইয়ালীলের মতো ধনবান ব্যক্তি কি ছিল না? এসব ছিল তাদের যুক্তি। প্রথমে তো তারা এ কথাই মানতে রাজি ছিলনা যে, কোন মানুষ রসূল হতে পারে। কিন্তু যখন কুরআন বারবার যুক্তি দিয়ে তাদের এ ধারণা খন্ডন করলো এবং তাদেরকে বলা হলো যে ইতিপূর্বেও বরাবর মানুষই রসূল হয়ে আসতে থাকেন এবং মানুষের হেদায়াতের জন্যে মানুষই রসূল হতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ নয়। আর যে রসূলই দুনিয়াতে এসেছেন, হঠাৎ আসমান থেকে অবতরণ করেননি। বরঞ্চ মানুষের জনপদেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাজারে চলাফেরা করতেন। বিবি বাচ্চা রাখতেন। পানাহার থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ সব কথার পর তারা পাঁয়তারা বদল করে বলতে লাগলো আচ্ছা ঠিক আছে, মানুষই রসূল হোক। কিন্তু নিশ্চয়ই তার কোন বড়ো লোক হওয়া উচিত। ধনবান হবে, প্রভাবশালী হবে, দলপতি হবে। মানুষের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রভাব হবে। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়ইহি ওয়া সাল্লাম এ মর্যাদার জন্যে কিভাবে উপযোগী হতে পারে?

এসব অভিযোগের জবাবে কয়েকটি শব্দে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে।

প্রথম কথা এই যে, তোমার রবের রহমত বন্টন করার দায়িত্ব কবে এদের উপর অর্পণ করা হয়? আল্লাহ তার রহমত কার উপর বর্ষণ করবেন, কার উপর করবেন না, এ বিষয়টি কি এরা নির্ধারণ করে দেবে? (এখানে রহমত বলতে তাঁর সাধারণ রহমত যার মধ্য থেকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পায়।)

দ্বিতীয়ত নবুওয়ত তো এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। দুনিয়ার জীবন যাপনের যে সব সাধারণ উপায় উপকরণ রয়েছে, তার বন্টনের দায়িত্বও আমরা নিজ হাতে রেখেছি। অন্য কারো দায়িত্বে দিইনি। আমরা কাউকে সুন্দর কাউকে কুশ্রীঃ কাউকে মিষ্টভাষী, কাউকে কর্কশভাষী, কাউকে সুস্থ, কাউকে বিকলাংগ, অথবা অন্ধ অথবা বধির, কাউকে ধনী কাউকে গরীব, কাউকে উন্নত জাতির এক ব্যক্তি কাউকে গোলামে অথবা অনুন্নত জাতির এক ব্যক্তি হিসেবে সৃষ্টি করি। এ জন্মগত ভাগ্য নির্ধারণে কেউ সামান্যতম হস্তক্ষেপও করতে পারে না। যাকে আমরা যা কিছু বানিয়ে দিয়েছি, তাই সে হতে বাধ্য। আর এ বিভিন্ন জন্মগত অবস্থার যে প্রতিক্রিয়াই কারো ভাগ্যে হোক, তা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই। তার মানুষের মধ্যে জীবিকা, শক্তি, সম্ভ্রম, খ্যাতি, ধন সম্পদ, শাসন ক্ষমতা প্রভৃতির বন্টনও আমরাই করছি। আমাদের পক্ষ থেকে যার ভাগ্যের উন্নয়ন হবে তার

ভাগ্য বিপর্যয় কেউ করাতে পারবে না। আবার আমাদের পক্ষ থেকে যার অধপতন এসে যায়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। আমাদের সিদ্ধান্তের মোকাবিলায় মানুষের সকল কলাকৌশল ও চেষ্টা তদবীর ব্যর্থ হয়ে যায়। এ বিশ্বজনীন খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় কি এরা সিদ্ধান্ত করতে চলেছে যে বিশ্ব জগতের মালিক কাকে তাঁর নবী বানাবেন আর কাকে বানাবেন না?

তৃতীয় কথা এই যে, এ খোদায়ী ব্যবস্থাপনার এ স্থায়ী নিয়ম পদ্ধতি বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে যে, সবকিছু একজনকে অথবা সবকিছু সকলকে যেন না দেয়া হয়। চোখ খুলে দেখ, তোমরা সকল দিকেই মানুষের মধ্যে শুধু বৈষম্যই দেখতে পাবে। কাউকে আমরা কোন কিছু দিয়ে থাকলে, অন্য কোন জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছি, তা অন্য কাউকে দান করেছি? এটা এ বিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা হয়েছে যে, কোন মানুষ যেন অন্য মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন না থাকে। বরঞ্চ প্রত্যেকে কোন না কোন ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হয়। এখন এ নির্বুদ্ধিতার ধারণা কেমন করে তোমাদের পেয়ে বসলো যে, যাকে আমরা রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব দিয়েছি তাকে নবুওয়তও দান করতে হবে? এভাবে তোমরা কি একথাও বলবে যে, বিবেক, জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, ক্ষমতা, রাষ্ট্র শক্তি এবং অন্যান্য সকল গুণাবলী একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রে সমাবেশ করা হোক এবং যে ব্যক্তি একটি জিনিসও পায়নি, তাকে অন্য কোন কিছুও যেন দেয়া না হয়?

শেষ বাক্যে রবের রহমত এর অর্থ তার বিশেষ রহমত অর্থাৎ নবুওয়ত। এর অর্থ এই যে, তোমরা তোমাদের যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে তাদের ধনদৌলত, ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে বিরাট কিছু মনে করছ, তারা সে ধন-দৌলতের যোগ্য নয়, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয়েছে। এ ধন-দৌলত তাদের সে ধন-দৌলত অপেক্ষা অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং এ যোগ্যতার মানদন্ড অন্য কিছু। তোমরা যদি এ কথা মনে করে থাক যে, তোমাদের প্রত্যেকে প্রভাব প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার যোগ্য তাহলে এ তোমাদের মানসিকতার চরম অবনতি। আল্লাহর কাছে এমন নির্বুদ্ধিতার আশা কেন করছ।(২৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ ايٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ج فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ -

(المؤمن ٥٦)

-প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা তাদের নিকটে আগত কোন সনদ ও দলিল প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে, তাদের মন গর্ব অহংকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু যে বড়ত্বের গর্ব তারা করে সে পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারবে না। অতএব আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সব দেখেন ও শুনেন। (মু'মিন ঃ ৫৬)

অর্থাৎ এদের অযৌক্তিক বিরোধিতা এবং অসংগত কূটতর্কের প্রকৃত কারণ এ নয় যে, আল্লাহতায়ালার আয়াতসমূহে যেসব সত্যতা ও কল্যাণকর কথা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছিল না বিধায় নেক নিয়তের সাথে তা বুঝার জন্যে তারা

আলোচনা করছে। বরঞ্চ তাদের এ আচরণের প্রকৃত কারণ এই যে, তাদের আত্ম-অহংকার এটা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয় যে, তারা বিদ্যমান থাকতে আরবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব মেনে নেয়া হবে এবং অবশেষে একদিন স্বয়ং তাদেরকেও এ ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, যার তুলনায় তারা নিজেরা নিজেদেরকে নেতৃত্বদানের অধিকতর হকদার মনে করে। এ জন্যে তারা তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে যাতে নবী মুহাম্মদের (সা) কথা কিছুতেই চলতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে যে কোন জঘন্যতম পন্থা অবলম্বন করতেও তারা দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে বড়ো বানিয়েছেন সে বড়ো হয়েই থাকবে। আর এ ছোটো লোকেরা তাদের বড়ত্ব কায়েম রাখার যে চেষ্টা করছে তা অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।(২৪)

يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ - (النحل ٢)

-তিনি এ রূহ অর্থাৎ নবুওয়তের অহী যার উপরে ইচ্ছা করেন আপন নির্দেশে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করেন। (নাহল ঃ ২)

এ কথা কাফেরদের সেসব ওজর আপত্তির জবাব যা তারা হুযুর (সা) সম্পর্কে করতো। তারা বলতো যদি খোদাকে কোন নবীই পাঠাতে হতো, তাহলে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সা) কি একমাত্র ব্যক্তি ছিল? মক্কা ও তায়েফের বড়ো বড়ো সর্দারগণ কি মৃত্যুবরণ করেছিল যে, তাদের কারো উপর নজর পড়লো না? এ ধরনের বেহুদা আপত্তি অভিযোগের জবাব এ ছাড়া আর কি হতে পারতো? আর এ ধরনের জবাবই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে যে, খোদা তার কাজ স্বয়ং জানেন। তোমাদের সাথে পরামর্শ করার তার প্রয়োজন নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাকেই তিনি নিজের কাজের জন্যে বেছে নেন।(২৫)

তাঁর কথা সত্য হলে জাতির মহান ব্যক্তিগণ ঈমান আনতেন

মুশরিকদের আর একটি অভিযোগ ছিল যে, যা কিছু নবী মুহাম্মদ (সা) পেশ করছেন তা যদি সত্য হতো তাহলে কতিপয় নির্বোধ যুবক, কতিপয় গোলাম এবং কতিপয় দরিদ্র লোক নয়, বরঞ্চ জাতির বিরাট ও মহান ব্যক্তিগণ ঈমান আনতেন।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ - وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ - (الاحقاف ١١)

-যারা মানতে অস্বীকার করেছে তারা ঈমানদারদেরকে বলে, এ ব্যক্তি যদি সত্য হতো, তাহলে এসব লোক এ ব্যাপারে আমাদের আগে যেতে পারতো না। যেহেতু তারা হেদায়েত গ্রহণ করতে পারলো না, সেজন্যে তারা এখন ত অবশ্যই বলবে, এ ত সেই পুরানো মিথ্যা কথা। (আহকাফ ঃ ১১)

নবী (সা) এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করে তোলার জন্যে কুরাইশ সর্দারগণ যে যুক্তি পেশ করতো, এ তার মধ্যে একটি। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এ কুরআন যদি

সত্য হতো এবং নবী (সা) সত্য বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকতেন, তাহলে কওমের সর্দার, গোত্রপতি এবং সম্মানিত ব্যক্তিগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তা গ্রহণ করতেন। এ কি করে হয় যে, কিছু অনভিজ্ঞ ছেলে ছোকরা এবং কিছু নিম্নমানের গোলাম ত একটা সংগত জিনিস মেনে নিল, কিন্তু জাতির মহান ব্যক্তিগণ, যাঁরা বিজ্ঞ ও বিশ্ববিশ্রুত এবং যাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর জাতি আস্থাশীল তারা প্রত্যাখ্যান করলো? এ প্রতারণামূলক যুক্তি দিয়ে তারা জনসাধারণের মধ্যে এ প্রত্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করছিল যে, এ নতুন দাওয়াতের মধ্যে অবশ্যই খারাপ কিছু আছে। এ জন্যেই ত জাতির মহান ব্যক্তিগণ তা মেনে নিচ্ছেন না। অতএব তোমরাও তার থেকে দূরে থাক।

এসব পর্যালোচনা যা বলা হলো তার অর্থ এই যে, এসব লোক তাদের নিজেদেরকে হক ও বাতিলের মানদন্ড স্থির করে রেখেছে। তারা মনে করে যে, যে হেদায়েত তারা মেনে নেবে না, তা অবশ্যই গোমরাহী হওয়া উচিত। কিন্তু তারা একে 'অভিনব মিথ্যা' বলার সাহস করতো না। কারণ এর আগেও আম্বিয়া (আঃ) এ শিক্ষাই পেশ করতে থাকেন। আর যেসব আসমানী কিতাব আহলে কিতাবের নিকটে রয়েছে তা সব এ আকীদাহ বিশ্বাস ও হেদায়েতেই পরিপূর্ণ। এ জন্যে এসব লোক একে প্রাচীন বা জরাজীর্ণ মিথ্যা বলে। যারা হাজার হাজার বছর যাবত এসব তত্ত্ব পেশ করে তা মেনে চলেছেন তাঁরা যেন এদের দৃষ্টিতে জ্ঞান বিবেক বর্জিত ছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেকের অধিকারী যেন একমাত্র এরাই।(২৬)

ইবনে আব্বাসের (রা) বর্ণনা অনুযায়ী কুরাইশ সর্দারগণ নবী (সা)কে বলতো, বেলাল (রা), সুহাইব (রা) আম্মার (রা), খাব্বা (রা) এবং ইবনে মাসউদ (রা) এর মতো লোক তোমার কাছে উঠা-বসা করে। তাদের সাথে ত আমরা বসতে পারি না। এদের তাড়িয়ে দাও। তাহলে আমরা তোমার কাছে এসে জানতে পারি যে, তুমি কি বলতে চাও। রোমের কায়সার হারকিউলাস নবী পাক (সা) এর পত্র পাওয়ার পর আবু সুফিয়ানকে ডেকে নবী (সা) সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। জবাবে আবু সুফিয়ান যা বলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল

تَبِعَهُ مِنَّا الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنَ -

আমাদের মধ্যে দুর্বল ও অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোক তার আনুগত্য মেনে নেয়। অর্থাৎ তাদের যেন চিন্তার ধরনটাই এ ছিল যে, জাতির বড়ো লোকেরা যা সত্য বলে স্বীকার করে তাই শুধু সত্য। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে তারাই একমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল। এখন রইলো দরিদ্র ও বিত্তহীন লোক। ত এদের বিত্তহীন হওয়াই এ কথার প্রমাণ যে, তারা নির্বোধ ও অবিবেচক। এ জন্যে তাদের কোন কথা মেনে নেয়া এবং বড়োলোকদের তা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ এই যে, তা একেবারে অর্থহীন।

ঠিক এ ধরনের কথাই হযরত নূহের (আঃ) জাতির সর্দারগণ তাকে বলেছিল। যেমন, সমাজের নিকৃষ্টতম শ্রেণীর লোক তোমাকে মেনে চলছে। এমন অবস্থায় কি আমরা তোমাকে মানতে পারি? সূরা হুদের ২৭ নং আয়াতে তাদের এ কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, আমরা ত দেখছি যে তোমাকে ত শুধুমাত্র ঐসব লোক না বুঝেই মেনে চলছে যারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের।(২৭)

হুযুরের (সা) প্রতি এ অভিযোগ যে তিনি তাঁর প্রাধান্য চান

সূরা সোয়াদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার যখন নবী (সা) কুরাইশ সর্দারদের কাছে তাঁর দাওয়াত পেশ করেন ত সমবেত লোকজন অন্যান্য অভিযোগের সাথে এ কথাও বলেঃ

اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ـ

-এ কথা ত অন্য কোন উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এ দাওয়াত এ জন্যে দেয়া হচ্ছে যে আমরা যেন মুহাম্মদের (সা) অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর তার হুকুম শাসন চালান।(২৮)

প্রকাশ থাকে যে, এ ছিল নিছক একটা অভিযোগ সন্দেহ অবিশ্বাস ব্যতীত যার কোন ভিত্তি ছিল না। সে জন্যে তার কোন জবাব না দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে যে, প্রাচীনকালেও যেসব আল্লাহর বান্দাহ মানুষের সংস্কার সংশোধনের জন্যে আবির্ভূত হয়েছেন তাদের প্রতিও এ ধরনের অভিযোগ করা হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)কে ফেরাউনের পারিষদগণ বলেছিলঃ

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِى الْاَرْضِ ـ

-(হে মূসা!) তুমি কি এ জন্যে এসেছ যে, তুমি আমাদেরকে সেসব রীতিপদ্ধতি থেকে ফিরিয়ে দিতে চাও যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি এবং যমীনে তোমাদের দু'ভাইয়ের আধিপত্য কায়েম হয়ে যাক। (ইউনুস ঃ ৭)

এ কথা হযরত নূহকেও (আঃ) তার জাতির সমাজপতিগণ বলেছিল-

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ـ(المؤمنون ٢٤)

-এ ব্যক্তি ত তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। সে চায় তোমাদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে। (মুমেনুন ঃ ২৪)

সত্যের বিরোধী যারা তাদের বিরোধিতার এক অতি প্রাচীন অস্ত্র এই যে, যে ব্যক্তিই সংস্কার সংশোধনের চেষ্টা করেছে তার প্রতিই এ অভিযোগ আরোপ করেছে-"আর কিছু না, এ শুধু ক্ষমতা লাভের অভিলাষী"।

এ অভিযোগই ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুণ (আঃ) এর বিরুদ্ধে করেছে। সে বলতো, তোমরা এ জন্যে ময়দানে নেমেছ, যেন দেশে তোমাদের আধিপত্য কায়েম হয়। হযরত ঈসা (আঃ) এর বিরুদ্ধেও এ অভিযোগ করা হয় যে, এ ব্যক্তি ইহুদীর বাদশাহ হতে চায়। কুরাইশ সর্দারগণ নবী মুহাম্মদের (সা) সম্পর্কে এ সন্দেহই পোষণ করতো। বস্তুতঃ তারা কয়েকবার নবী (সা) এর সাথে এ ধরনের দরকষাকষি করেছে যে, যদি তুমি ক্ষমতা লাভের অভিলাষী হয়ে থাক, তাহলে বিরোধিতা ছেড়ে দাও এবং ক্ষমতাসীনদের দলভুক্ত হয়ে যাও। তাহলে তোমাকে আমরা বাদশাহ বানিয়ে দিচ্ছি।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা সারা জীবন দুনিয়া ও তার আনন্দ সম্ভোগ এবং প্রভাবপ্রতিপত্তির জন্যে সকল শক্তি নিয়োজিত করে তাদের এ ধারণা করা বড়ো কঠিন বরঞ্চ অসম্ভব যে, এ দুনিয়ার বুকে কোন মানুষ নিষ্ঠার সাথে এবং নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তারা যেহেতু আপন ক্ষমতা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি

কায়েমের জন্যে প্রতারণামূলক ও মুখরোচক শ্লোগানসহ জনকল্যাণের মিথ্যা ওয়াদা দিনরাত জনগণের সামনে করতে থাকে, এ জন্যে এ মিথ্যাচার ও ধোঁকাবাজি তাদের কাছে এক স্বভাবসিদ্ধ বস্তু হয়ে পড়ে এবং তারা মনে করে ধোঁকা প্রতারণা ব্যতীত সত্যতা ও নিষ্ঠা সহকারে জনকল্যাণের নামই নেয়া যেতে পারে না। এ নাম যে ব্যক্তিই নেয় সে নিশ্চয়ই তাদেরই মত একজন। মজার ব্যাপার এইযে, 'ক্ষমতার অভিলাষ'-এ অভিযোগ সমাজ সংস্কারকদের বিরুদ্ধে হরহামেশা ক্ষমতাসীন দল ও তাদের তোষামোদকারী সেবাদাসরাই করে এসেছে। তারা যে ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আছে তা যেন তাদের জন্মগত অধিকার। তা লাভ করার জন্যে এবং গদিতে টিকে থাকার জন্যে তারা যা কিছু করছে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা যেতে পারে না।

এখানে এ কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, যে ব্যক্তি প্রচলিত জীবন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্যে সংগ্রাম করবে এবং তা মোকাবিলায় সংস্কারমূলক দৃষ্টিভংগী ও ব্যবস্থা পেশ করবে, তার জন্যে এ অপরিহার্য যে, সংস্কারের পথে যে শক্তিই প্রতিবন্ধক হবে তা দূর করার চেষ্টা করবে এবং সেসব শক্তিকে ক্ষমতাসীন করবে যা সংস্কারমূলক দৃষ্টিভংগী ও ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারবে। উপরন্তু এ ধরনের লোকের দাওয়াত যখন সাফল্যমন্ডিত হবে, তখন তার স্বাভাবিক ফল এ হবে যে, সে তখন জনগণের নেতৃত্বদানের মর্যাদা লাভ করবে। তখন নতুন ব্যবস্থার ক্ষমতার চাবিকাঠি হয় তার নিজের হাতে হবে অথবা তার সমর্থক ও অনুসারীদের হাতে। নবীগণ এবং দুনিয়ার সংস্কারকদের মধ্যে এমন কে আছে, যাঁর উদ্দেশ্য তার দাওয়াতকে কার্যত বাস্তবায়িত করা ছিল না? এমনই বা কে আছেন, যাঁর দাওয়াতের সাফল্য প্রকৃতপক্ষে তাঁকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেনি? তাহলে এটাই কি তার উপর এ অভিযোগ আরোপ করার জন্যে যথেষ্ট যে, সে ক্ষমতা লাভের অভিলাষী ছিল এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নেতৃত্ব লাভ যা সে এখন লাভ করেছে? একমাত্র বিদ্বেষাত্মক হকের দুশমন ব্যতীত আর কেউ এর হাঁ-সূচক জবাব দিতে পারবে না। সত্য কথা এই যে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্যে ক্ষমতা হস্তগত করা এবং কোন মহান উদ্দেশ্যের জন্যে ক্ষমতা হস্তগত করায় আকাশ পাতাল ফারাক রয়েছে, যেমন ফারাক রয়েছে ডাকাতের ছোরা এবং ডাক্তার-সার্জেনের চাকুর মধ্যে। যদি কেউ ডাকাত ও সার্জেনকে এ জন্যে এক করে দেয় যে, উভয়ে ইচ্ছা করেই দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করে এবং উভয়েই অর্থ হস্তগত করে, তাহলে এটা তার মস্তিষ্কের ত্রুটিই বলতে হবে। নতুবা উভয়ের নিয়ত, কর্মপদ্ধতি এবং উভয়ের ভূমিকার এতো বিরাট পার্থক্য থাকে যে, কোন বিবেকসম্পন্ন লোক ডাকাতকে ডাকাত এবং ডাক্তারকে ডাক্তার মনে করতে ভুল করতে পারে না। (৩০)

ঠিক এই আচরণ হযরত হুদ (আঃ), এর সাথে করা হয়। তাঁর জাতির সমাজপতিগণও জনগণকে সম্বোধন করে বলে-

مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ - (المؤمنون ٣٣-٣٤)

-এ ব্যক্তি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নয়। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায়, তোমরা যা পান কর, তাই সে পান করে। এখন তোমরা যদি তোমাদেরই মতন একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।
(মুমেনূন ঃ ৩৩-৩৪)

জাতির সমাজপতিগণ যখন আশংকা বোধ করলো যে, জনসাধারণ পয়গম্বরের পূতঃপবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং মনমুগ্ধকর কথায় প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তখন আর আমাদের জারিজুরি কার উপর চলবে? সে জন্যে তারা এ ধরনের কথা বলে বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। তারা বলতো, এ খোদার পক্ষ থেকে পয়গম্বরি -টয়গম্বরি কিছু না, শুধু ক্ষমতার লালসা যার জন্যে এসব কথা বলছে। ভাইয়েরা, একটুখানি ভেবে দেখ দেখি, এ ব্যক্তি তোমাদের থেকে কোন্ দিক দিয়ে ভিন্নতর? তোমাদের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ। তোমাদের এবং তার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তাহলে কেন সে লাঠসায়েব হবে আর তোমরা তার হুকুম মতো চলবে?

তাদের এসব প্রচারণায় একথা যেন সর্বস্বীকৃত, মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে তোমাদের সর্দার বা সমাজপতি তা ত হওয়াই উচিত। আমাদের রক্ত-মাংস ও খানাপিনার দিকে লক্ষ্য করার কোন প্রশ্নই আসে না। আলোচ্য বিষয় আমাদের মাতব্বরী নয়। কারণ তা ত আপনা আপনিই কায়েম আছে এবং সর্বস্বীকৃত। আলোচ্য বিষয় হলো এ নতুন সর্দারি মাতব্বরি যা এখন কায়েম হতে চলেছে বলে দেখা যায়।

এভাবে তাদের কথা নূহের জাতির-সমাজপতিদের থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। তাদের নিকটে আপত্তিকর কিছু থাকলে তা "ক্ষমতার ক্ষুধা" যা কোন নবাগতের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে অথবা যা হওয়ার আশংকা হচ্ছে। এখন রইলো তাদের পেট। ত তারা মনে করতো, ক্ষমতা তাদের স্বাভাবিক ক্ষুধা। তাতে যদি বদহজমও হয় ত তাতে দোষ নেই। (৩১)

নবীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে তিনি গণক ছিলেন এবং শয়তান তার নিকটে আসতো

মক্কার কাফেরগণ এ অভিযোগ করতো যে, মুহাম্মদ (সা) একজন গণক ছিলেন। আর যে কুরআন তিনি পেশ করছেন, তা ফেরেশতা নয় বরঞ্চ শয়তান তার কাছে নিয়ে আসে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ -
(الطُّوْر ٢٩)

-অতএব, হে নবী! তুমি সদুপদেশ দিতে থাক। তোমার রবের মেহেরবানীতে না তুমি গণক, না পাগল। (তুর ঃ ২৯)

আরবী ভাষায় কাহেন (كاهن) জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বক্তা, অতি চালাক প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাহেলিয়াতের যুগে এ ছিল এক স্থায়ী পেশা। কাহেনদের দাবী ছিল এবং দুর্বলচিত্ত লোকও মনে করতো যে, তারা ছিল জ্যোতিষী, অথবা আত্মা এবং জ্বিন-শয়তানের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল যার ফলে তারা ভবিষ্যৎ অথবা গোপন খবর জানতে পারতো। কোন কিছু হারিয়ে গেলে তারা বলতে পারতো যে, তা কোথায় আছে। কারো কিছু চুরি হলে বলে দিত কে চুরি করেছে। কেউ তার ভাগ্য জিজ্ঞেস করলে তার ভাগ্যে কি

লেখা আছে তা বলে দেয়া হতো। এসব উদ্দেশ্যে মানুষ তাদের নিকটে যেতো এবং তারা কিছু নযর নিয়ায নিয়ে তাদেরকে অদৃশ্য খবর বলে দিত। তারা (কাহেন) স্বয়ং বস্তির মধ্যে আওয়াজ দিয়ে বেড়াতো। যাতে মানুষ তাদের শরণাপন্ন হতে পারে। তাদের এক বিশেষ ধরনের সাজ-পোশাক হতো যার থেকে তাদেরকে পৃথকভাবে চিনতে পারা যেতো। তাদের ভাষাও সাধারণ কথ্য ভাষা থেকে পৃথক হতো। কিছু কবিতার ছন্দমধুর কণ্ঠে তারা কথা বলতো এবং সাধারণতঃ এমন অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করতো যার থেকে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ মনের কথা বুঝে ফেলতো। কুরাইশ সর্দারগণ জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে নবী (সা) এর উপর কাহেন বা গণক হওয়ার অভিযোগ এ জন্যে করতো যে, তিনি এমন সব গোপন তথ্য ও তত্ত্ব বলে দিতেন যা মানুষের দৃষ্টি বহির্ভূত। নবী (সা) এর দাবী ছিল খোদার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে তাঁর ওপর অহী নাযিল করতেন এবং খোদার যে বাণী তিনি পেশ করতেন তাও ছিল ছন্দমধুর। কিন্তু আরবের কোন ব্যক্তিও তাদের এ অভিযোগের দ্বারা বিভ্রান্ত হতো না। এ জন্যে যে, গণক বা জ্যোতিষীদের পেশা, তাদের সাজ-পোশাক, তাদের ভাষা, তাদের কায়কারবার কারো অজানা ছিল না। সকলেই জানতো যে, তারা কি কাজ করে। কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষ তাদের কাছে যায়। কি কথা তারা তাদেরকে বলে। তাদের ছন্দমিশ্রিত কথা কেমন হয়ে থাকে এবং কি বিষয়ের সাথে তা সংশ্লিষ্ট। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, গণকের কাজ এ মোটেই হতে পারে না যে, সমাজে প্রচলিত একটা ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত অন্য এক ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আবির্ভূত হবে, দিনরাত তার প্রচার প্রসারের জন্যে আত্মনিয়োগ করবে এবং পরিণামে সমগ্র জাতি তার শত্রু হয়ে পড়বে। এ জন্যে রসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি গণক বা জ্যোতিষী হওয়ার অভিযোগ কিছুতেই করা যেতে পারে না। আরবের সবচেয়ে হাবাগোবা লোকও এ অভিযোগে বিভ্রান্ত হতে পারতো না। এ কারণেই এ অভিযোগ খন্ডনের জন্যে কোন যুক্তি পেশ করার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। কারণ এ ছিল স্ববিরোধী। এ শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে-, হে নবী! তুমি তাদের অভিযোগের কোন পরোয়া না করে মানুষকে তাদের কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতার জন্যে সাবধান করে দাও এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত কর। কারণ তুমি গণকও নও এবং পাগলও নও।(৩২)

وما هُو بِقَوْلِ شَيْطنٍ رَّجِيْمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ -
(التكوير ٢٥-٢٦)

-এবং এ কোন বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়। অতঃপর তোমরা কোনদিকে চলেছ?
(তাক্বীরঃ ২৫-২৬)

অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, কোন শয়তান এসে নবী মুহাম্মদের (সা) কানে এসব কথা ফুঁকে দেয়। শয়তানের এ কাজ কি করে হতে পারে যে, সে মানুষকে শিরক, পৌত্তলিকতা, বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা থেকে মুক্ত করে খোদাপরস্তি ও তৌহীদের শিক্ষা দেবে? মানুষের বল্লাহীন হয়ে থাকার পরিবর্তে তাদের মধ্যে খোদার কাছে দায়িত্ব-কর্তব্য ও জবাবদিহির অনুভূতি শয়তান সৃষ্টি করে দেবে? জাহেলী রেসেম রেওয়াজ, জুলুম, চরিত্রহীনতা, দুষ্কৃতি প্রভৃতি থেকে বিরত রেখে পবিত্র জীবন যাপন, সুবিচার, খোদাভীতি এবং মহৎ চরিত্রের পথ নির্দেশনা দেবে? (৩৩)

وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ - وَ مَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ - اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ - (الشُّعراء ٢١٠ تا ٢١٢)

-এ কিতাব শয়তান নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। না এ কাজ তার শোভা পায়, আর না সে তা করতে পারে। তাকে ত এ শোনার থেকেও দূরে রাখা হয়েছে। (শুয়ারা ঃ ৩১০-২১২)

কুরাইশ কাফেরগণ নবী (সা) এর বিরুদ্ধে যে মিথ্যার অভিযান শুরু করেছিল, তাতে বিরাট অসুবিধা ছিল এই যে, কুরআনের আকারে যে বিস্ময়কর বাণী মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল এবং যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করছিল; তা কি ব্যাখ্যা করা যায়। জনগণের মধ্যে তার প্রচার বন্ধ করার কোন সাধ্য তাদের ছিল না। এখন বিরাট সমস্যা এই যে, কুরআন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার এবং তার প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যে কি অবলম্বন করা যায়। তাদের এ বিব্রতকর অবস্থায় তারা জনসাধারণের মধ্যে যেসব অভিযোগ ছড়াচ্ছিলো তার মধ্যে একটি এই যে, মুহাম্মদ (সা) মায়াযাল্লাহ, একজন গণক এবং সাধারণ গণকের ন্যায় এসব বাণী শয়তান তার মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দেয়। এ অভিযোগ তারা সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বলে মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল এই যে, সে বাণী ফেরেশতা নিয়ে আসছে, না শয়তান, তা যাঁচাই করার কোন উপায় কারো নিকটে ছিল না। আর শয়তানের পক্ষ থেকে অনুপ্রবিষ্ট করা হচ্ছে, তা কেউ খন্ডন করতে চাইলেই বা কিভাবে করবে?

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এসব বাণী এবং এ বিষয়বস্তু শয়তানের মুখ থেকে বেরুবেই না। যার জ্ঞান বিবেক আছে, সে স্বয়ং বুঝতে পারে যে, যেসব কথা কুরআন থেকে বলা হচ্ছে তা কি কখনো শয়তানের পক্ষ হতে পারে? তোমাদের বস্তিতে গণক নেই? সে জ্বিন শয়তানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে যেসব কথা বলে তা তোমরা শুন না? তোমারা কি কোনদিন এ কথা শুনেছো যে, কোন শয়তান কোন গণকের মাধ্যমে মানুষকে খোদা পরস্তি ও খোদভীতির শিক্ষা দিয়েছে? শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে বিরত রেখেছে? সততা, সত্যনিষ্ঠা এবং মানুষের সাথে সদাচরণের সদুপদেশ দিয়েছে? এ ধরনের মেজাজ প্রকৃতি কি শয়তানের কোনদিন হয়ে থাকে? শয়তানদের মেজাজ প্রকৃতি ত এই যে, মানুষের মধ্যে অশান্তি বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করবে। শয়তানের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষাকারী গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে মানুষ ত এ জন্যে যায় যে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে পাবে কি না। জুয়া খেলায় কোন পদক্ষেপ লাভজনক হবে। দুশমনকে পরাভূত করতে হলে কোন কৌশল অবলম্বন করা দরকার। তারা এ কথা জানতে চায় অমুকের উট কে চুরি করেছে। এসব কায়কারবার ছাড়া গণক ও তাদের পৃষ্ঠপোষক শয়তানগণ কি কোন দিন মানুষের সংস্কার সংশোধন, নেক কাজের শিক্ষা, অনাচার নির্মূল করার কোন চিন্তা করেছে কি? শয়তান চাইলেও এ কাজ তাদের সাধ্যের অতীত যে, কিছুক্ষণের জন্যেও নিজেদেরকে মানুষের সত্যিকার শিক্ষক ও সংস্কারকের স্থানে অধিষ্ঠিত করে সত্য ও কল্যাণের শিক্ষা দেবে যা কুরআন দিচ্ছে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যেও যদি এ রূপ ধারণ করে, তথাপি তাদের কাজকর্ম এমন নির্ভেজাল হতে পারে না যা তাদের অজ্ঞতা এবং লুকানো শয়তানী স্বভাব প্রকৃতির পরিচয় দেবে না।

যে শয়তানের পক্ষ থেকে প্রেরণা লাভ করে ধর্মীয় নেতা হয়ে বসেছে, তার জীবনে এবং শিক্ষার মধ্যেও অসৎ অভিপ্রায়, অসৎ উদ্দেশ্য ও চারিত্রিক নোংরামির পরিস্ফুরণ ঘটবেই। নির্ভেজাল সত্যনিষ্ঠা এবং খালেস নেকি কখনো শয়তান কারো মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করতে পারে না এবং শয়তানের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ যারা রাখে তারাও এসব গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, কুরআন যখন অহীর মাধ্যমে অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়, তাতে শয়তানের হস্তক্ষেপ করা ত দূরের কথা, যে সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) কুরআনসহ চলতে থাকেন এবং যখন নবী মুহাম্মদ (সা) এর অন্তরে তা নাযিল করেন এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন এক সময়ে এবং কোন এক স্থান থেকেও শয়তানের কান পেতে শুনার কোন সুযোগই হয় না। সে আশপাশ কোথাও থেকে উঁকিঝুঁকি মারতেও পারে না যে, কিছু কথা শুনে নিয়ে বন্ধুদের কাছে আগে ভাগেই বলে দেবে যে, আজ মুহাম্মদ (সা) এ পয়গাম শুনাচ্ছেন অথবা তাঁর ভাষণে অমুক বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।(৩৪)

এ অভিযোগ যে তাঁকে কেউ শিখিয়ে পড়িয়ে দেয়

কুরাইশ কাফেরগণ একদিকে এ কথা বলতো যে, মায়াযাল্লাহ শয়তান নবী (সা) এর মনে কুরআন সঞ্চারিত করে দেয় এবং অপরদিকে ঠিক তার বিপরীত এ অভিযোগ করতো যে, তিনি কারো নিকট থেকে শিখে পড়ে এ কুরআন পেশ করছেন।

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ - (الدُّخان ـ ١٤)

-অতঃপর তারা রসূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলতে লাগলো, এ তো শিখানো পড়ানো পাগল।"-(দুখান ঃ ১৪)

তাদের কথার অর্থ ছিল এই যে, বেচারা ত সাদাসিদে মানুষ ছিলেন। কতিপয় অন্য লোকে তাঁকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছে। গোপনে তারা কুরআনের আয়াতের নামে কিছু রচনা করে একে পড়িয়ে দেয়। তিনি তারপর সাধারণ মানুষের সামনে এসে তা পেশ করেন। তারা ত মজা করে বসে থাকে, আর এ বেচারা গালি ও পাথর খেতে থাকেন। এভাবে একটা বিভ্রান্তিকর কথা বলে দিয়ে তারা সেসব যুক্তি-প্রমাণ, সদুপদেশ, শিক্ষা-দীক্ষা নস্যাৎ করে দিত যা রসূলুল্লাহ (সা) বছরের পর বছর ধরে তাদের সামনে পেশ করতেন। কুরআনে যেসব ন্যায়সঙ্গত কথা বলা হতো তার প্রতি তারা কোন মনোযোগ দিত না, আর না তারা এদিকে লক্ষ্য করতো যে, যে ব্যক্তি এসব বিষয় পেশ করছেন তিনি কোন স্তরের লোক, আর না অভিযোগ করার সময় একথা চিন্তা করার কষ্ট স্বীকার করতো যে তারা কি সব আজেবাজে কথা বলছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তাকে যদি পর্দার আড়াল থেকে শেখাবার এবং পড়াবার কোন লোক থাকতো তাহলে কি করে তা হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত যায়দ বিন হারেসা (রাঃ) এবং অন্যান্য বহু প্রাথমিক মুসলমানের নিকেট গোপন থাকতো? তাঁদের থেকে নিকটতর এবং সার্বক্ষণিক সাথী রসূল (সা) এর আর কেউ ছিল না। তাহলে কি কারণ থাকতে পারে যে, এসব লোকই নবী পাকের (সা) সবচেয়ে বেশী ভক্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন? আসলে পর্দার আড়াল থেকে অন্য লোকের শিখানো পড়ানোর দ্বারা যদি নবুয়তের কাজকর্ম চালানো হতো তাহলে এসব লোকই তাঁর সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা করতেন।

و لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُه بَشَرٌ - لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ و هذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ - (النحل ١٠٣)

-আমাদের জানা আছে, তারা একথা বলে, এ ব্যক্তিকে কেউ শেখায় পড়ায়। অথচ তাদের ইঙ্গিত যে ব্যক্তির প্রতি তার ভাষা কিন্তু আজমী আর এ হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষী। (নহল ঃ ১০৩)

বর্ণনায় বিভিন্ন লোকের নাম বলা হয়েছে যাদের মধ্যে কোন একজন সম্পর্কে মক্কার কাফেরগণ এ ধারণা পোষণ করতো যে সে নবী (সা)কে শেখাতো পড়াতো। এক রেওয়ায়েতে তার নাম জাবার বলা হয়েছে, যে ছিল আমের বিন হাদরামীর এক রোমীয় গোলাম। অন্য রেওয়ায়েতে হুয়াইতিব বিন আব্দুল ওয্যার এক গোলামের কথা বলা হয়েছে, যার নাম ছিল আয়েশ অথবা ইয়াইশ। অন্য এক বর্ণনায় ইয়াসার এর নাম বলা হয়েছে যার কুনিয়াত ছিল আবু ফুকাইহা। সে ছিল মক্কার জনৈকা মহিলার ইহুদী গোলাম। অন্য এক বর্ণনায় বালআন অথবা বালআম নামের এক রোমীয় গোলামের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যে কেউই হোক না কেন, মক্কায় কাফেরগণ দেখতো যে সে তাওরাত এবং ইনজিল পড়তো এবং নবী মুহাম্মদ (সা) এর সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হতো। এজন্য তারা বিনা দ্বিধায় এ অভিযোগ করতো যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সেই রচনা করতো এবং মুহাম্মাদ (সা) তা নিজের পক্ষ থেকে খোদার নামে পেশ করতেন। এর থেকে শুধু এ ধারণাই করা যায় না যে, নবী বিরোধীগণ তাঁর প্রতি অপবাদ রটনায় কতটা নির্ভীক ছিল, বরঞ্চ এটাও জানা যায় যে, মানুষ আপন সমসাময়িক লোকের মর্যাদা নির্ধারণে কতটা অবিচার করে। তাদের সামনে মানবীয় ইতিহাসের এমন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁর নজীর না তৎকালীন দুনিয়ার কোন স্থানে পাওয়া যেত, আর না আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মুকাবিলায় এসব জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকহীন লোকের কাছে একজন আজমী গোলাম তাওরাত-ইনজিলের যা কিছু পড়তে পারতো সেই ছিল যোগ্যতর। তারা ধারণা করতো যে, এ দুষ্প্রাপ্য রত্ন এ কয়লা থেকে আলোকচ্ছটা লাভ করছে।(৩৬)

নবী পাকের অহীর অধিকারী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ

কুরআন মজিদে হযরত মূসার (আ) কাহিনী বর্ণনা করার পর একস্থানে আল্লাহ বলেনঃ-

হে নবী! তুমি সে সময়ে পশ্চিম কোণে (তুরে সীনার পাদদেশে) উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা মূসাকে এ শরীয়তী ফরমান দান করি, আর না তুমি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একজন ছিলে। কিন্তু তারপর থেকে তোমার কাল পর্যন্ত আমরা বহু মানব বংশ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের পরে অনেককাল অতিবাহিত হয়েছে। তুমি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলে না যে, তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনাতে। কিন্তু (সে সময়ের এসব খবর) আমিই পৌঁছাচ্ছি। তুমি তূরের পাদদেশে তখনো ছিলে না যখন আমরা প্রথমবার মূসাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু তোমার রবের এ মেহেরবাণী যে, (তোমাকে এসব তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে) যাতে তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান করে দিতে পার যাদের নিকটে তোমার পূর্বে কোন সাবধানকারী আসেনি। (কাসাস ঃ ৪৪-৪৬)

এ তিনটি কথা রসূলুল্লাহ (সা) এর নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর অহী ছাড়া এসব তথ্য জানার আর কোন উপায় নেই। এ কথা যখন কুরআনে বলা হয়েছিল, তখন মক্কার সকল সমাজপতি ও সাধারণ কাফের এ ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর ছিল যে, যে কোন উপায়ে তারা তাঁকে অনবী এবং মায়াযাল্লাহ মিথ্যা নবী প্রমাণিত করবে। তাদের সহযোগিতার জন্যে ইহুদী ওলামা এবং খৃস্টান সন্ন্যাসীগণ হেজাজের জনপদগুলোতে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু নবী মুহাম্মদ (সা) উর্ধ আকাশ থেকে এসে এ কুরআন শুনিয়ে যেতেন না, বরঞ্চ তিনি এ মক্কারই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাঁর বস্তি ও গোত্রের লোকদের অজ্ঞাত ছিল না, এটাই কারণ যে, যখন এ ধরনের প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের ভাষায় রসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়তের প্রমাণস্বরূপ এ তিনটি কথা বলা হলো তখন মক্কা, হিজাজ এবং গোটা আরবের কোন একটি লোকও দাঁড়িয়ে সে বেহুদা কথা বলতে পারেনি যা আজ ইসলামবৈরী প্রাচ্যবিদগণ বলছেন। যদিও মিথ্যা রচনায় তারা এদের থেকে কিছু কম ছিল না। কিন্তু এমন নির্জলা মিথ্যা তারা কি করে বলতে পারতো যা এক মুহূর্তের জন্যেও চলতো না। তারা কি করে বলতো হে মুহাম্মদ (সা), তুমিতো অমুক অমুক ইহুদী আলেম ও খৃস্টান সন্ন্যাসীদের নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে এনেছ। কারণ তারা সারাদেশের মধ্যে এ উদ্দেশ্যে কারো একজনের নাম বলতে পারতো না। কারো নাম নেয়ার সাথে সাথেই প্রমাণ হয়ে যেতো যে, হুযুর (সা) তার কাছ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ করেননি। তারা কি করে বলতো হে মুহাম্মদ (সা) তোমার নিকটে তো অতীত ইতিহাস-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এক লাইব্রেরী রয়েছে যার সাহায্যে তুমি এসব ভাষণ দিচ্ছ। কারণ লাইব্রেরী ত দূরের কথা, মুহাম্মদ (সা) এর আশপাশ কোথাও থেকে এক টুকরা কাগজও বের করতে পারতো না যার মধ্যে এসব তথ্য লিখিত। মক্কার আবাল বৃদ্ধবণিতা জানতো যে, মুহাম্মদ (সা) ছিলেন নিরক্ষর এবং কেউ এ কথা বলতে পারতো না যে, তিনি কিছু দোভাষীর সাহায্য নিয়েছেন যারা ইরানী, সুরিয়ানী এবং গ্রীক ভাষার বই পুস্তক তরজমা করে করে তাঁকে দিত। তারপর তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো নির্লজ্জ ব্যক্তিও এ দাবী করার সাহস করতো না যে, সাম ও ফিলিস্তিনের বাণিজ্যিক সফরে তিনি এসব তথ্য হস্তগত করে এসেছেন। কারণ এ সফর একাকী হয়নি। মক্কারই বাণিজ্যিক কাফেলা প্রত্যেক সফরে মুহাম্মদ (সা) এর সাথে থাকতো। কেউ এমনটি দাবী করলে শত শত জীবিত সাক্ষ্যদাতা এ সাক্ষ্য দিত যে, তিনি সেখানে কারো নিকট থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাছাড়া তাঁর ইন্তেকালের দু'বছরের মধ্যেই রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধ শুরু করেন। মিথ্যা মিথ্যি একথা যদি কেউ বলতো যে শাম ও ফিলিস্তিনে কোন খৃস্টান সন্ন্যাসী অথবা ইহুদী রাব্বীর সাথে হুযুর (সা) আলাপ আলোচনা করছেন, তাহলে ত রোম সাম্রাজ্য তিলকে তাল বানিয়ে এ প্রচারণা করতে সামান্য দ্বিধাবোধও করতো না যে, মুহাম্মদ (সা) মায়াযাল্লাহ সব কিছু এখানে শিক্ষা করে যান এবং মক্কায় গিয়ে নবী হয়ে পড়েন। মোটকথা, সেকালে যখন কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ কুরাইশ কাফের এবং মুশরিকদের জন্যে মৃত্যু ঘন্টার সমতুল্য ছিল এবং তা মিথ্যা বলে চালিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক প্রাচ্যবিদগণ অপেক্ষা অনেকগুণে বেশী ছিল, তাদের এমন অবস্থায় কোন ব্যক্তিই কোথাও থেকে এমন কোন তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পারেনি যার দ্বারা সে প্রমাণ করতে পারতো যে, মুহাম্মদ (সা) এর নিকটে অহী ব্যতীত এসব তথ্য জানার অন্য কোন উপায় ছিল যা চিহ্নিত করা যায়।(৩৭)

পাগল হওয়ার অভিযোগ

যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ হুযুর (সা) এর বিরুদ্ধে করা হচ্ছিল তার মধ্যে একটি এ ছিল যে, তিনি মায়াযাল্লাহ। পাগল ছিলেন। এ অর্থে তারা তাঁকে যাদুকৃতও বলতো। (তাঁর উপর যাদু করা হয়েছে) তাদের কথার অর্থ এটাও ছিল যে, তাঁর উপর জিনের আসর বা প্রভাব পড়েছে। কুরআনে তাদের এ কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে-

و يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا الِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ - (الصّفّت ٣٦)

"এবং তারা বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির খাতিরে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করব?" (সাফফাত ঃ ৩৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে

و قَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رجُلاً مَّسْحُوْرًا - (الفرقان ٨)

"এবং এ জালেমরা বলে, তোমরা ত যাদুকরা এক ব্যক্তির পেছনে ছুটেছ।

(ফুরকান ঃ ৮)

আর এক স্থানে বলা হয়েছে-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِه جِنَّةٌ - (المؤمنون ٧٠)

"তারা কি বলে যে, এর উপর জ্বিন সওয়ার হয়েছে?

(অর্থাৎ জ্বিনের প্রভাবে সে পাগল হয়েছে।) (মুমেনূন ঃ ৭০)

এসব অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিল একই। কারণ আরববাসীর কাছে পাগল হওয়ার কারণ ছিল দু'টি। হয় কেউ তাকে যাদু করে পাগল বানিয়ে দেবে, অথবা তার উপর জ্বিন সওয়ার হয়েছে।(৩৮)

কুরআন পাকে অভিযোগগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে একথা বলার জন্যে যে, অভিযোগকারীগণ কতটা অন্ধ বিদ্বেষ পোষণ করতো। তাদের যেসব অভিযোগ এখানে এবং অন্যান্য স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে একটিও এমন নয় যা গুরুত্বসহকারে আলোচনার মতো। তার উল্লেখ এ কথা বলার জন্যে করা হয়েছে যে, বিরোধীদের কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ ছিল না এবং কেমন অর্থহীন বেহুদা কথায় একটি যুক্তিপূর্ণ সংস্কারমূলক দাওয়াতের মুকাবিলা করছে। একজন বলছেন ভাইসব! যে শির্কের উপর তোমাদের ধর্ম ও তামাদ্দুনের বুনিয়াদ কায়েম আছে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং তা ভ্রান্ত হওয়ার এই এই যুক্তি। জবাবে শির্ক সত্য ও সঠিক হওয়ার কোন যুক্তি প্রমাণ দেয়া হচ্ছে না। ব্যস্ শুধু বলা হচ্ছে, এ লোকটির উপর যাদু প্রমাণ বড়ো ক্রিয়া করেছে। তিনি বলছেন, তোমাদেরকে দুনিয়ার বুকে লাগামহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নিকটে ফিরে যেতে হবে এবং আপন আপন কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। আর এ সত্যকে প্রমাণ করছে এই এই নৈতিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত কার্যকলাপ। জবাবে বলা হচ্ছে, এ কবির কথা। তিনি বলছেন, আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সত্য শিক্ষা দেয়ার জন্যে এসেছি। আর এ হচ্ছে সেসব শিক্ষা । জবাবে

সেসব শিক্ষার উপর কোন আলোচনা হয় না। ব্যস্ বিনা প্রমাণে এ অভিযোগ করা হয় যে, এসব কোথাও থেকে নকল করে বলা হচ্ছে। তিনি তাঁর রেসালাতের প্রমাণস্বরূপ খোদার অলৌকিক বাণী পেশ করছেন। স্বয়ং নিজের জীবন, সীরাত ও কর্মকান্ড পেশ করছেন। সেই সাথে সেই নৈতিক বিপ্লব পেশ করছেন যা তাঁর প্রভাবে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সূচিত হচ্ছে। বিরোধীরা তার কোনটির প্রতিও লক্ষ্য করছে না। ব্যস্ জিজ্ঞেস করছে, তুমি খানাপিনা কর কেন? বাজারে ঘুরাফেরা কর কেন? তোমার আর্দালী হিসাবে কোন ফেরেশতা নেই কেন? তোমার কাছে কোন ধন ভান্ডার অথবা বাগান নেই কেন? এসব কথা স্বয়ং প্রমাণ করছে যে, এ দু'পক্ষের মধ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কে এবং কে মুকাবিলায় অপারগ হয়ে আবোল তাবোল বকছে।(৩৯)

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَ فُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ - (سبا ٤٦)

-হে নবী (সা)! এদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। খোদার ওয়াস্তে তোমরা একা একা এবং দুই দুইজন মিলে তোমাদের মস্তিষ্ক চালনা কর এবং ভেবে দেখ যে, তোমাদের সাথীর মধ্যে এমন কি আছে যাকে পাগলামি বলে। সে ত এক কঠিন আযাব আসার পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে। (সাবা ঃ ৪৬)

অর্থাৎ সকল প্রকার স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির অভিলাষ এবং বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহর জন্যে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নেক নিয়তের সাথে এবং দুই দুই চার চারজন একত্রে মিলে ভালোভাবে আলাপ, আলোচনা করে যাচাই করে দেখ যে, এমন কি ঘটলো যে, তার ভিত্তিতে তোমরা আজ ঐ ব্যক্তিকে পাগল বলছ যাকে তোমরা কাল পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করতে? নবুওয়তের কিছুকাল পূর্বেরই ত ঘটনা যে কাবা নির্মাণের পর হিজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে যখন কুরাইশ গোত্রগুলো পরস্পরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন তোমরাই তো সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদকে (সা) সালিস মেনে নিলে। তারপর সে এমনভাবে সে ঝগড়া মিটিয়ে দিল যে তোমরা সকলে সন্তুষ্ট হলে। যে ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধি প্রজ্ঞা সম্পর্কে সমগ্র জাতির এ অভিজ্ঞতার পর হঠাৎ এমন কি হলো যে এখন তোমরা তাকে পাগল বলছ? জিদ ও হঠকারিতা ত পৃথক বিষয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই তোমরা অন্তর থেকে কি তাই মনে কর যা তোমরা মুখে বলছ? সে তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি আসার পূর্বে সাবধান করে দিচ্ছে। এটাই কি তার অপরাধ যার জন্যে তোমরা আজ তাকে পাগল বলছ? তোমাদের দৃষ্টিতে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যে তোমাদেরকে ধ্বংসের পথে যেতে দেখে বলে, বাহ্ শাবাশ! বড়ো ভালো কাজ করছ? আর পাগল কি সে ব্যক্তি যে তোমাদের মন্দ অবস্থা আসার পূর্বে সাবধান করে দেয় এবং অশান্তি অনাচারের স্থলে সংস্কার সংশোধনের পথ বলে দেয়?(৪০)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ - (المومنون ٧٠)

তারা কি এ কথা বলে যে এ ব্যক্তিকে জ্বিনে ধরেছে? (মুমেনূন ঃ ৭০)

অর্থাৎ নবী মুহাম্মদকে (সা) অস্বীকার করার কারণ কি তাদের এই যে, তারা সত্যি সত্যিই তাঁকে পাগল মনে করতো? নিশ্চয়ই এ তাদের প্রকৃত কারণ ছিল না। কারণ মুখে

তারা যা কিছুই বলুক না কেন, অন্তরে অন্তরে তারা তাঁর বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা স্বীকার করতো। তাছাড়া, একজন পাগল এবং সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের পার্থক্য কোন গোপন ব্যাপার নয় যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। আসলে একজন হঠকারী ও নির্লজ্জ লোক ছাড়া কে এমন হতে পারে যে, এ কালাম শুনার পর এ কথা বলতে পারে যে এ পাগলের উক্তি? আর এ ব্যক্তির জীবন দেখার পর কে এ অভিমত ব্যক্ত করতে পারে যে, এ একজন মস্তিষ্কবিকৃত লোকের জীবন? আজব ধরনের এ মস্তিষ্কবিকৃতি (অথবা পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষীদের মতে মৃগী রোগ যে সে ব্যক্তির মুখ থেকে কুরআনের মতো মহান কথা বেরয় এবং তিনি এমন এক সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন যা আপন দেশেরই নয়, বরঞ্চ গোটা দুনিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন করে । (৪১)

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ - وَ اِنَّ لَكَ لاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ - وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ - (القلم ٢: تا ٤)

-হে নবী! তুমি তোমার রবের কৃপায় পাগল নও। এবং নিশ্চিতরূপে এমন পুরষ্কার রয়েছে যা অফুরন্ত। এবং নিঃসন্দেহে তুমি চরিত্রের মহান মর্যাদায় ভূষিত। (কলম ঃ ২-৪)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে সম্বোধন প্রকাশ্যতঃ করা হচ্ছে নবী মুহাম্মদকে (সা)। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের অপবাদের জবাব দেয়া। অতএব, কারো মনে এ সন্দেহ যেন না হয় যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছিল হুযুরকে (সা) এ সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে যে তিনি পাগল ছিলেন না। আসলে নবীর মনে এ ধরণের কোন সন্দেহ ছিল না যা দূর করার জন্যে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদেরকে একথা বলে দেয়া যে, "তোমরা যে কুরআনের কারণে তার উপস্থাপনকারীকে পাগল বলছ, সেটাই তোমাদের এ অভিযোগ মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ।

অবশ্যি হুযুরকে (সা) যে বিষয়ে সান্ত্বনা দেয়া হয় তা এই যে, তাঁর জন্যে অফুরন্ত ও অগণিত প্রতিদান রয়েছে। কারণ তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যে চেষ্টা করছেন, তার জন্যে তাঁকে এমন এমন দুঃখজনক কথা শুনতে হচ্ছে। এর পরেও তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

তারপর এ কথা বলা হয়েছে যে, তাঁর মহান চরিত্র এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কাফের মুশরিকগণ তার প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করছে তা একেবারে মিথ্যা। কারণ চারিত্রিক মহত্ব ও মস্তিষ্কবিকৃত এ উভয়বস্তু একত্র হতে পারে না। পাগল তাকেই বলা হয় যার মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে এবং যার মেজাজ প্রকৃতির মধ্যেও ভারসাম্য থাকে না। পক্ষান্তরে মানুষের উচ্চ ও মহান চরিত্র এ কথার সাক্ষ্যদান করে যে, সে সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থ প্রকৃতির লোক। তার মনমস্তিষ্ক ও মেজাজ-প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) এর চরিত্র কেমন ছিল তা মক্কাবাসীদের অজানা ছিল না। এ জন্যে তাদের প্রতি শুধু ইংগিত করাই যথেষ্ট যে মক্কায় প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন লোক যেন চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, তারা কতটা নির্লজ্জ যারা এমন মহান চরিত্রের অধিকারী লোককে পাগল বলছে। তাদের এ প্রগলভতা রসূলুল্লাহর (সা) জন্যে নয়, বরঞ্চ স্বয়ং তাদের জন্যেই ক্ষতিকর ছিল যে, অন্ধ বিরোধিতায় নেশাগ্রস্ত হয়ে তারা নবী (সা) সম্পর্কে এমন সব কথা বলছিল যা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ধারণাই করতে পারতো না। আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার দাবীদারগণের ব্যাপারও ঠিক তেমনি যারা নবী মুহাম্মদের (সা) প্রতি

মৃগীরোগে আক্রান্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করে। কুরআন পাক দুনিয়ার সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং নবী পাকের সীরাতও বিশদ বিবরণসহ লিখিত পাওয়া যায়। প্রত্যেকে স্বয়ং দেখতে পারে যে, যারা এ অতুলনীয় গ্রন্থ উপস্থাপনকারীকে এবং এমন মহান চরিত্রের অধিকারীকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলে, তারা শত্রুতার অন্ধ বিদ্বেষে দিশেহারা হয়ে কি সব প্রগল্‌ভ উক্তি করছে।(৪২)

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (الاعراف ١٨٤)

এরা কখনো কি চিন্তা করে দেখেনি? তাদের সাথীর উপরে পাগলামির কোনই প্রভাব নেই। তিনি ত একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (আ'রাফ ঃ ১৮৪)

সাথী অর্থ নবী মুহাম্মদ (সা)। কারণ তিনি মক্কার লোকদের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যেই জীবন যাপন করেন। শৈশব থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌঁছেন। নবুওয়তের আগে সমগ্র জাতি তাঁকে একজন সুস্থ প্রকৃতি ও সুস্থ মস্তিষ্ক লোক হিসাবে জানতো। নবুওয়তের পর যখন তিনি খোদার পয়গাম পৌঁছাতে শুরু করলেন, তখন হঠাৎ তারা তাঁকে পাগল বলা শুরু করে। উল্লেখ্য যে, এ পাগল আখ্যা ঐসব কাজের উপর দেয়া হয়নি, যা তিনি নবী হওয়ার পূর্বে করতেন। কিন্তু শুধু ঐসব কথার পর দেয়া হয় যার প্রচার তিনি নবী হওয়ার পর শরু করেন। এ জন্যে বলা হচ্ছে যে, তারা কি কখনো এসব চিন্তা করে দেখেছে? এসব কথার মধ্যে কোনটি পাগলের উক্তি? কোন কথাটি তাঁর অন্যায়, অসংগত ও ভিত্তিহীন? যদি এরা আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনার উপর চিন্তা-ভাবনা করতো অথবা খোদার সৃষ্ট কোন বস্তু বিশেষ চিন্তা-গবেষণাসহ দেখতো, তাহলে স্বয়ং জানতে পারতো যে, শির্কের খন্ডন, তৌহীদের স্বীকৃতি, খোদার বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কে যা কিছু তাদের ভাই (নবী মুহাম্মদ) তাদেরকে বুঝাচ্ছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে এ বিশ্বপ্রকৃতির ব্যবস্থাপনা এবং খোদার সৃষ্টির প্রতিটি অণুপরমাণু সাক্ষ্য দিচ্ছে। (৪৩)

কবি হওয়ার অভিযোগ

কুরাইশ কাফেরগণ হুযুরের (সা) বিরুদ্ধে কবি হওয়ার অভিযোগও আরোপ করতো এবং বলতো, আমি কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদদেরকে পরিত্যাগ করব? তার জবাবে বলা হলো-

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ - (الشعراء ٢٢٤)

-এবং কবিদের পেছনে ত পথভ্রষ্ট লোকেরা চলে। (শুয়ারা ঃ ২২৪)

অর্থাৎ কবিদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোক তাদের স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের থেকে একেবারে ভিন্নতর হয় যাদেরকে তোমরা নবী মুহাম্মদের (সা) সাথে দেখছ। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতো প্রকট যে, এক নজরেই বুঝা যায় যে, এরা কেমন লোক এবং তারা কেমন। একদিকে দেখা যায় চরম গাম্ভীর্য, ভদ্রতা, সভ্যতা, সততা ও খোদাভীতি। কথায় কথায় দায়িত্বের অনুভূতি। আচরণে লোকের অধিকার সংরক্ষণ। কাজে-কর্মে পরিপূর্ণ আমানতদারী ও দিয়ানতদারী। মুখ খুল্লে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যেই খোলে। মন্দ কথা মুখ দিয়ে কখনো বেরয় না। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তাদের দেখে পরিষ্কার মনে হয়, এদের

জীবনের একটা পূতঃ পবিত্র ও মহান লক্ষ্য আছে যার চিন্তায় তারা দিনরাত মগ্ন রয়েছে। তাদের সমগ্র জীবন এক মহান উদ্দেশ্যের জন্যে উৎসর্গীত।

অন্যদিকে অবস্থা এই যে, কোথাও প্রেমপ্রণয় নিবেদন ও মদ্যপানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং শ্রোতাগণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন বারাংগনা অথবা কোন গৃহবধূর রূপসৌন্দর্য আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে এবং শ্রোতাগণ তা প্রাণভরে উপভোগ করছে। কোথাও যৌন সহবাসের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে এবং শ্রোতাদের মনে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। কোথাও ভাঁড়ামি করা হচ্ছে অথবা বিদ্রূপাত্মক কথা বলা হচ্ছে এবং চারিদিকে হাসি-ঠাট্টার ঢল নেমেছে। কোথাও কারো প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং শ্রোতাগণ তা উপভোগ করছে। কোথাও কারো অসংগত প্রশংসা করা হচ্ছে এবং হাততালি দিয়ে তা সমর্থন করা হচ্ছে। কোথাও কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা, আক্রোষ, শত্রুতা প্রকাশ করে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং শ্রোতাদের মনে তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। এসব সমাবেশে কবিদের কথা শুনার জন্যে ভয়ানক ভিড় জমে। এ ধরনের বড় বড় কবিদের পেছনে যারা লেগে থাকে, তাদের দেখে কেউ এ কথা মনে না করে পারে না যে, এরা নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার স্রোতে প্রবাহিত। এরা সুখ-সম্ভোগের পূজারী এবং পশু সদৃশ। তাদের মনে কখনো এ ধারণার ছোঁয়া লাগে না যে, দুনিয়ার মানুষের জন্যে জীবনের কোন মহান উদ্দেশ্য আছে না কি। এ উভয় দলের সুস্পষ্ট পার্থক্য যদি নজরে না পড়ে তাহলে সে অন্ধ। আর সব কিছু দেখার পর শুধু সত্যকে হেয় করার মানসে যদি বলে যে মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ কবি ও তাদের অনুচরদের মতোই, তাহলে বলতে হবে তারা মিথ্যা বলার জন্যে সকল সীমালংঘন করেছে। (৪৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ - (الشعراء ٢٢٤)

-তোমরা কি দেখছ না যে, তারা (কবিগণ প্রত্যেক উপত্যকায় পথহারা হয়ে ঘুরছে? (শুয়ারা ঃ ২২৫)

অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট পথ নেই যে সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা করে এবং যার জন্যে তারা তাদের কাব্য প্রতিভা নিয়োজিত করে। বরঞ্চ তাদের চিন্তা রাজ্যের ঘোড়া লাগামহীন ঘোড়ার মতো প্রত্যেক উপত্যকায় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কামনা, বাসনা, স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের প্রত্যেক নতুন প্রবাহ তাদের মুখ থেকে এক নতুন বিষয়বস্তু বের করে আনে যে সম্পর্কে কোন চিন্তা করতে এবং তা বর্ণনা করতে এ বিষয়ের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখা হয় না যে, এ কথা সঠিক ও সত্য কিনা। কখনো চিন্তার এক তরঙ্গ উঠলো ত বিজ্ঞতা ও সদুপদেশের কথা চল্লো। আবার কখনো দ্বিতীয় তরঙ্গ উঠলো ত ঐ একই মুখ থেকে চরম অশ্লীল ও জঘন্য কামনা লালসার মধু বর্ষণ হতে লাগলো। কারো প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে উঠানো হয় এবং কারো প্রতি ক্ষুণ্ন হলে তাকে পাতালপুরিতে পাঠানো হয়। একজন কৃপণকে হাতেমের এবং একজন ভীরু কাপুরুষকে রুস্তম ও ইসকান্দারিয়ারের মর্যাদা দানেও তারা দ্বিধাবোধ করে না, যদি এতে তাদের কোন স্বার্থ জড়িত থাকে। ঠিক এর বিপরীত কারো দ্বারা মনে ব্যথা পেলে, তার পবিত্র জীবনের উপর কলংক আরোপ করতে, তার মান সম্ভ্রম বিনষ্ট করতে, এমনকি তার বংশের প্রতি উপহাস করতেও তারা লজ্জাবোধ করে না। খোদা পরস্তি ও খোদাদ্রোহিতা, বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতা, চারিত্রিক মহত্ব ও চরিত্রহীনতা, পবিত্রতা ও নোংরামি-মলিনতা, গাম্ভীর্য এবং

ছেলেমি, তোষামোদ ও বিদ্রূপ সব কিছুই একই কবির কবিতার পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। কবিদের এসব সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ব্যক্তি অবহিত ছিল, তার মস্তিষ্কে এ অবান্তর কথা কি করে প্রবেশ করতে পারতো যে, এ কুরআন উপস্থাপনকারীর উপর কবি হওয়ার অপবাদ আরোপ করা হোক। অথচ তাঁর কথা ছিল একেবারে মাপাজোকা এবং সুস্পষ্ট। তাঁর পথ ছিল সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তিনি সত্য ও সততা এবং কল্যাণের আহ্বান থেকে দূরে সরে গিয়ে একটি কথাও মুখ থেকে বের করেননি।

কুরআনের অন্য এক স্থানে নবী (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির সাথে কবিতা রচনার কোন সামঞ্জস্যই ছিল না।

و مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ و مَا يَنْبَغِىْ لَهُ ـ (يس ٦٩)

আমরা তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর না এ তার করার কাজ। (ইয়াসিন ঃ ৬৯)

এ এমন এক সত্য যে যারাই নবী মুহাম্মদকে (সা) ব্যক্তিগতভাবে জানতো, তারা সকলেই এ জানতো। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে, কোন কবিতাই পুরাপুরি হুযুরের (সা) মনে ছিল না। কথাবার্তায় কখনো কোন কবির কোন ভালো কবিতা তাঁর মুখ থেকে বেরুলেও তা বেমানানভাবে পড়তেন অথবা তার মধ্যে শব্দের হেরফের হতো।

হযরত হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, একবার বক্তৃতা করতে গিয়ে হুযুর (সা) কবির কবিতা এভাবে আওড়ালেন।

كَفٰى بِالاِسْلاَمِ وَ الشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا ـ

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কবিতার শ্লোক আসলে এমন হবে।

كَفٰى الشَّيْبِ وَ الاِسْلاَمِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا ـ

একবার আব্বাস বিন মিরদাস সুলামীকে নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ কবিতা লিখেছ?

اتجعل نهبى و نهب العبيد و بين الاقرع و عُيينه ـ

তিনি বল্লেন, শেষ কথাটুকু অমন না হয়ে এমন হবে।

بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَ الاقْرع ـ

নবী (সা) বল্লেন, উভয়ের অর্থ ত একই রকম।

হযরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নবী (সা) কখনো তাঁর ভাষণে কবিতা ব্যবহার করতেন কি না। তিনি বলেন, কবিতা অপেক্ষা অন্য কোন জিনিসের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল না। অবশ্যি কখনো কখনো বনী কায়েসের কবির দু'এক ছত্র পড়তেন। কিন্তু শেষেরটুকু আগে এবং আগেরটুকু শেষে পড়তেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ও রকম না এ রকম হবে।

নবী (সা) বলতেন, ভাই, আমিত কবি নই। আর কবিতা রচনা করা আমার কাজও নয়।

আরবের কাব্য সাহিত্য যেসব বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিল তাহলো যৌন কামনা-বাসনা, প্রেম-প্রণয়, মদ্যপান, গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-কলহ, অথবা গর্ব-অহংকার। ধার্মিকতা এবং কল্যাণের কথা তার মধ্যে খুব কমই পাওয়া যেতো। তারপর মিথ্যা, অতিরঞ্জন, অপবাদ, বিদ্রূপ, অসংগত প্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং পৌত্তলিক পৌরাণিক কাহিনী এ কাব্য সাহিত্যের অঙ্গীভূত। এ জন্যে নবী (সা) এ কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে এ রূপ মন্তব্য করেন-

لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ شعراً -

তোমাদের মধ্যে কারো পেট কবিতায় পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা পুঁজে পূর্ণ হওয়া ভালো।

তথাপি কোন কবিতায় ভালো কথা থাকলে নবী (সা) তার প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন-

اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً -

কোন কোন কবিতা বিজ্ঞতাপূর্ণ হয়।

উমাইয়া বিন আবিস সালতের কবিতা শুনে তিনি বলেন-

امَنَ شِعْرُهُ وَ كَفَرَ قَلْبُهُ -

তার কবিতা মুমেন কিন্তু তার মন কাফের।

একবার জনৈক সাহাবী শত খানেক উৎকৃষ্ট কবিতা নবীকে (সা) শুনিয়ে দেন এবং তিনি বলতে থাকেন, বাহ্ ভারি সুন্দর, আরও শুনাও।(৪৫)

وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالاَ يَفْعَلُوْنَ - (الشّعراء ٢٢٦)

এবং তারা এমন কথা বলে যা করে না। (শুয়ারা ঃ ২২৬)

এ ছিল কবিদের আর এক বৈশিষ্ট্য যা নবী (সা) এর কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী ছিল। যারা তাঁকে জানতো তাদের এটা জানা ছিল যে, তিনি যা বলেন তা করেন এবং যা করেন তাই বলেন। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য এমন এক সুস্পষ্ট সত্য ছিল যা তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজের কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। পক্ষান্তরে কবিদের সম্পর্কে কার এ কথা জানা ছিল না যে, তাদের বলা একরূপ এবং করা অন্যরূপ? দান-দক্ষিণা সম্পর্কে এমন জোরালো বয়ান করবে যে মানুষ মনে করবে যে তার চেয়ে দরিয়া-দিল আর কেউ হবে না কিন্তু কার্যকলাপ দেখলে দেখা যাবে যে ভয়ানক কৃপণ। বীরত্বের কথা বলবে কিন্তু স্বয়ং ভীরু-কাপুরুষ। মুখাপেক্ষীহীনতা, তুষ্টি এবং আত্মমর্যাদার কথা বলবে কিন্তু স্বয়ং লোভ-লালসায় নীচতার সর্বনিম্নস্তরে পতিত হবে। অপরের সামান্য দুর্বলতা পাকড়াও করবে কিন্তু স্বয়ং চরম দুর্বলতায় লিপ্ত হবে।(৪৬)

বিরোধীদের অভিযোগে সামঞ্জস্যহীনতা এবং কুরআনের প্রতিবাদ

পূর্বে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মক্কার কাফেরগণ নবী (সা) এর উপরে বিপরীতমুখী অভিযোগ আরোপ করতো এবং কোন একটি অভিযোগও সুনির্দিষ্ট করে করতে পারেনি। কুরআন পাকে তাদের এ দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلاَمَجْنُوْنٍ - اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِه رَيْبَ الْمَنُوْنِ - قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ - اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلاَمُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ - (الطُّور ٢٩ تا ٣٢)

(অতএব হে নবী!) তুমি নসিহত করতে থাক। তোমার রবের অনুগ্রহে না তুমি গণক, আর না পাগল। লোকে কি বলে যে এ ব্যক্তি কবি যার সপক্ষে আমরা কালের বিবর্তনের অপেক্ষা করছি? তাদেরকে বল, আচ্ছা, অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। তাদের বিবেক কি তাদেরকে এ ধরনের কথা বলতে বলছে? অথবা প্রকৃত পক্ষে তারা বিদ্বেষে সীমা অতিক্রম করে গেছে? (তুর ঃ ২৯-৩২)

এ কয়েকটি বাক্য বিরোধীদের সকল প্রচারণার গোমর ফাঁক করে দিচ্ছে। যুক্তি প্রমাণের সার কথা এই যে, কুরাইশ সর্দার ও গোত্রপতিগণ বড় বিবেকবান হওয়ার দাবী করে। কিন্তু তাদের বিবেক কি এ কথা বলে যে, যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বল? যাকে সমগ্র জাতি একজন বিজ্ঞ হিসাবে জানে, তাকে পাগল বল। ভাগ্য গণনার সাথে যে ব্যক্তির দূরতম সম্পর্কও নেই, তাকে অযথা গণক বল। বুদ্ধি-বিবেকের ভিত্তিতেই তারা যদি কোন নির্দেশ দান করে, ত কোন একটি নির্দেশ দিবে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী অনেক নির্দেশ ত এক সাথে দিতে পারে না। এক ব্যক্তি একই সাথে কবি, পাগল এবং ভবিষ্যদ্বক্তা কেমন করে হতে পারে? পাগল হলে ত না গনক হতে পারে আর না কবি। গনক হলে কবি হতে পারে না এবং কবি হলে গনক হতে পারে না। কারণ কবিতার ভাষা এবং তার বিষয়বস্তু পৃথক হয়ে থাকে এবং গণকের ভাষা ও তার বিষয়বস্তু পৃথক। একই কথাকে একই সময়ে কবিতাও বলা এবং গনকের কথাও বলা এমন লোকের কাজ হতে পারে না যে কবিতা এবং গনকের কথার পার্থক্য জানে। অতএব এ পরিষ্কার কথা যে, নবী মুহাম্মদের (সা) বিরোধিতায় এ পরস্পর বিরোধী কথা কোন বিবেকসম্মত কথা নয়। শুধু জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এসব বলা হচ্ছে। জাতির বড় বড় সর্দার ও দলপতিগণ বিদ্বেষবশতঃ নিছক ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বিবেকবান লোক যার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না। (৪৭)

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً - (بنى اسرائيل ٤٨)

(হে নবী)! দেখ কোন্ ধরনের কথা এরা তোমার বিরুদ্ধে বলছে? এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা পথ পাচ্ছে না । (বনী ইসরাইল ঃ ৪৮)

অর্থাৎ এরা তোমার সম্পর্কে কোন একটি অভিমত প্রকাশ করে। বরঞ্চ একেবারে বিভিন্ন ধরনের এবং পরস্পর বিরোধী কথা বলে। কখনো বলে যে তুমি স্বয়ং যাদুকর। কখনো বলে, তোমার প্রতি অন্য কেউ যাদু করেছে। কখনো বলে, তুমি কবি, কখনো বলে তুমি পাগল এবং কখনো বলে তুমি গনক। তাদের এ পরস্পর বিরোধী কথা স্বয়ং এ কথারই প্রমাণ যে, প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। নতুবা তারা এক এক দিন এক

এক বলার পরিবর্তে কোন একটি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতো। উপরন্তু এর থেকে এটাও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তারা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। একটা অভিযোগ করার পর নিজেরাই মনে করে যে, এটা ঠিক হলো না। তখন অন্য আর একটি অভিযোগ করে। তাও ঠিক হলো না মনে করে তৃতীয় এক অভিযোগ তৈরী করে। এভাবে তাদের প্রত্যেক নতুন অভিযোগ পূর্বের অভিযোগ খন্ডন করে। এতে বুঝা যায় যে সত্যতার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। নিছক শত্রুতাবশতঃ একের পর আর একটি অভিযোগ আরোপ করছে। (৪৮)

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ

-(ق:٥)

এরা ত যখনই সত্য এদের কাছে এলো, একেবারে তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। এ কারণেই এখন তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে আছে। (কাফ ঃ ৫)

এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক বিরাট বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর মর্ম এই যে, এরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ এবং ধারণাতীত বলে বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরঞ্চ যে সময় নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর সত্য দাওয়াত পেশ করলেন, তক্ষুণি বিনা দ্বিধায় তাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করলো। তার ফল এই হবার ছিল এবং তাই হলো যে, তারা এ দাওয়াত এবং দাওয়াত উপস্থাপনকারী সম্পর্কে কোন একটি অভিমতে স্থির থাকলো না। কখনো তাকে কবি বলে, কখনো পাগল, কখনো গনক। কখনো বলে, সে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে এসব স্বয়ং রচনা করে এনেছে। কখনো এ অভিযোগ করে যে, তার পেছনে অন্য লোক আছে যারা এসব রচনা করে তাকে দেয়। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা তাদের নীতি বা করণীয় সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে তারা কখনোই পড়তো না যদি তাড়াহুড়া করে প্রথমেই নবীকে (সা) মিথ্যা মনে করে দ্বিধাহীন চিত্তে আগাম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতো যে এ দাওয়াত কোন্ ব্যক্তি পেশ করছে। কোন্ কথা বলছে এবং তার কি যুক্তি পেশ করছে। এ কথা ঠিক যে সে ব্যক্তি তাদের অপরিচিত ছিল না। কোথাও থেকে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। সে তাদের আপন জাতিরই একজন। তাদের নিজস্ব পরীক্ষিত লোক। তার চরিত্র, আচার-আচরণ ও যোগ্যতা তাদের অজানা ছিল না। এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন কোন কথা বলা হলো ত সঙ্গে সঙ্গেই তা গ্রহণ করা না হোক, কিন্তু এমনটিও হওয়া উচিত ছিল না যে শুনামাত্রই তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর সে কথা যুক্তি প্রমাণহীনও ছিল না। তার জন্যে সে রীতিমত যুক্তিপ্রমাণও পেশ করছিল। তা শুনা উচিত ছিল এবং যাচাই করা উচিত ছিল যে, তা কতটা যুক্তিসংগত। কিন্তু এ আচরণ অবলম্বন করার পরিবর্তে যখন তারা জিদের বশবর্তী হয়ে প্রথমে তা মিথ্যা মনে করলো। তখন তার ফল এ হলো যে, প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার দরজা নিজেরাই নিজেদের জন্যে বন্ধ করে দিল এবং চারদিকে পথহারা হয়ে ঘুরাফিরার বহু পথ খুলে দিল। এখন তারা তাদের প্রাথমিক ভুলের সপক্ষে দশটি পরস্পর বিরোধী কথা ত বলতে পারে। কিন্তু এ একটি কথা চিন্তা করতেও প্রস্তুত নয় যে, নবী সত্য হতে পারেন কিনা এবং তিনি যে কথা পেশ করছেন তা সত্য হতে পারে কিনা।(৪৯)

وَ اِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا - اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً - اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلاَ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا - (الفرقان ٤١-٤٢)

হে নবী, এসব লোক যখন তোমাকে দেখে তখন ব্যস তোমার বিদ্রূপ করা শুরু করে দেয় এবং বলে, এই ব্যক্তি যাকে খোদা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? এতো আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে ফেলতো যদি আমরা তাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধায় অটল না হতাম। (কুরআন ঃ ৪১-৪২)

কাফেরদের এ দুটি কথা পরস্পর বিরোধী। প্রথম কথা থেকে জানা যায় যে, তারা নবীকে (সা) হেয় মনে করছে। তাঁকে বিদ্রূপ করে তাঁর মর্যাদাহানি করতে চায়। তাদের দৃষ্টিতে নবী মুহাম্মদ (সা) খুব বড় দাবী করে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় কথায় জানতে পারা যায় যে, তারা তাঁর যুক্তি প্রমাণের বলিষ্ঠতা এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিচ্ছে এবং অজ্ঞাতসারে এ স্বীকারোক্তি করছে, আমরা যদি বিদ্বেষ এবং হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আমাদের খোদাদের বন্দেগীর উপর অবিচল না হতাম, তাহলে এ ব্যক্তি আমাদের পদস্খলন করে ফেলতো। এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কথা স্বয়ং এ কথা প্রমাণ করছে যে, ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কতখানি বেসামাল করে ফেলেছে। হেয় প্রতিপন্ন হয়ে বিদ্রূপও করছে, আবার হীনমন্যতা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ থেকে এমন কথা বের করাচ্ছে যার থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে এ ব্যক্তির দ্বারা তারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছে। (৫০)

বিভিন্ন ধরনের মোজেযার দাবী

অভিযোগের ঝড়-ঝাপটার সাথে সাথে কুরাইশ কাফেরগণ বার বার মোজেযা দেখাবার দাবী করতো। বস্তুতঃ কুরআনের স্থানে স্থানে এ সব দাবীর উল্লেখ আছে এবং তার জবাবও দেয়া হয়েছে।

و قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَلَنَا مِنَ الاَرْضِ يَنْبُوْعًا - اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا - اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً - اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ ط و لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهُ ط قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً - (بنى اسرائيل ٩ تا ٩٣)

এবং তারা বল্লো, "আমরা তোমার কথা শুনব না, যতোক্ষণ না তুমি যমীন বিদীর্ণ করে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেছ। অথবা তোমার জন্যে খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান তৈরী হয়ে যায় এবং তুমি তাতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছ। অথবা তুমি আকাশকে টুকরা টুকরা করে আমাদের উপর ফেলে দিয়েছ যেমন তোমার দাবী। অথবা খোদা ও ফেরেশতাদেরকে মুখোমুখি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছ অথবা তোমার জন্যে সোনার একটি বাড়ি হয়ে যায়। অথবা তুমি আসমানে চড়ে যাবে এবং তোমার চড়াটাও আমরা বিশ্বাস করব না যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে লিখিত কিছু নিয়ে আস যা আমরা পড়তে পারব।" (হে নবী) বল, আমার রব সকল দোষক্রুটির উর্ধে। আমি একজন বাণী বাহক ছাড়া কি আর কিছু? (বনী ইসরাইল ঃ ৯০-৯৩)

মোজেযার দাবীর জবাব এ সূরায় এ আয়াতে-

و ما منعنا ان نرسل بالايت -

দেয়া হয়েছে।* এখন এ দাবীর দ্বিতীয় জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত জবাবের বাকপটুতা প্রশংসার উর্ধে। বিরোধীদের দাবী ছিল, যদি তুমি পয়গম্বর হয়ে থাক তাহলে মাটির দিকে নজর কর এবং সংগে সংগে তা ফেটে গিয়ে ঝর্ণা বেরিয়ে পড়ুক। অথবা অবিলম্বেই একটি সবুজ-শ্যামল নবীন ও যৌবনোচ্ছল বাগান অস্তিত্ব লাভ করুক এবং তাতে ঝর্ণা প্রবাহিত হোক। আসমানের দিকে ইশারা কর এবং তোমাকে যারা মিথ্যা মনে করছে তাদের উপর আসমান ভেঙে পড়ুক। একটা ফুঁক মার এবং চোখের পলকে একটি স্বর্ণপ্রাসাদ তৈরী হয়ে যাক। এক আওয়াজ দাও এবং সংগে সংগে আমাদের সামনে খোদা ও ফেরেশতারা এসে দাঁড়িয়ে যাক এবং এ কথা বলুক যে, তারা মুহাম্মদকে (সা) পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছে। অথবা আমাদের চোখের সামনে আসমানে চড়ে যাও এবং আল্লাহ্ মিয়ার নিকট থেকে আমাদের নামে একটা চিঠি লিখিয়ে আন যা আমরা হাত দিয়ে ছুঁতে পারি এবং চোখ দিয়ে দেখতে পারি।

এমন লম্বা চওড়া দাবীর এ একটি মাত্র জবাব দিয়েই ছেড়ে দেয়া হলো-ওরে বোকার দল! আমি কি কখনো খোদা হওয়ার দাবী করেছিলাম যে তোমরা আমার কাছে এসব দাবী করছ? কখন তোমাদের এ কথা বলেছিলাম যে আমি অসীম ক্ষমতাবান? কখন বলেছিলাম যে যমীন আসমান আমার হুকুমের অধীনে চলছে। আমার দাবী ত আগাগোড়া এই ছিল যে আমি খোদার পক্ষ থেকে বানী বাহক একজন মানুষ। তোমাদের যাচাই করার থাকলে আমার পয়গাম যাচাই করে দেখ। ঈমান আনতে হলে এ পয়গামের সত্যতা ও যৌক্তিকতা দেখে ঈমান আন। অস্বীকার করতে হলে এ পয়গামের ক্রুতি বিচ্যুতি বের করে দেখাও। আমার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে একজন মানুষ হিসাবে আমার জীবন ও কাজকর্ম দেখ। এসব ছেড়ে তোমরা আমার কাছে এ কি দাবী করছ যে, যমীন বিদীর্ণ কর, আসমান নামিয়ে আন? পয়গম্বরীর সাথে এসব কাজের কি সম্পর্ক? (৫১)

---

* সে জবাব ছিল, যে সব মোজেযা কোন নবীর নবুওয়তের প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে তা দেখার পরও কোন জাতি যদি নবীকে মিথ্যা মনে করে, তাহলে তাদের উপর অবশ্যই আযাব নাযিল হয়। তার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। এখন এ আল্লাহর রহমত যে তিনি এমন কোন মোজেযা পাঠাচ্ছেন না। কিন্তু তোমরা এমন নির্বোধ যে তার দাবী করছ। -গ্রন্থকার

و قَالُوْا لَوْلاَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ ايتٌ مِنْ رَّبِّه ط قُلْ انَّمَا الايت عِنْدَ اللّه ط و انَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتبَ يُتْلى عَلَيْهِمْ ط اِنَّ فِى ذلِكَ لَرحْمَةً وَّ ذِكْرى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ (العنكبوت ٥٠ ـ ٥١)

এসব লোকেরা বলে' এ লোকটির প্রতি কেন নিদর্শনাবলী (মোজেযা) অবতীর্ণ করা হয়নি? হে নবী, বলে দাও, "নিদর্শনাবলী ত আল্লাহর নিকটে আর আমি একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী।" এ লোকদের জন্যে এ নিদর্শন কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদের পড়ে শুনানো হয়? প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে রয়েছে রহমত এবং নসিহত ঐসব লোকের জন্যে যারা ঈমান আনে। (আনকাবুত ঃ ৫০-৫১)

অর্থাৎ উম্মী হওয়া সত্ত্বেও নবী মুহাম্মদের (সা) উপর কুরআনের মতো মহাগ্রন্থ নাযিল হওয়া কি স্বয়ং একটি বড় মোজেযা নয় যে তাঁর রেসালাতের উপর ঈমান আনাই যথেষ্ট হবে?

এরপরে আর কোন মোজেযার প্রয়োজন বাকী থাকে কি? পূর্বে মোজেযা যারা দেখেছে তাদের জন্যে ত তা মোজেযা ছিল। কিন্তু এ মোজেযা ত হরহামেশা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। প্রতিদিন তোমাদেরকে পড়ে শুনানো হচ্ছে। হরহামেশা তোমরা তা দেখতে পার। (৫২)

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُّؤْتى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ـ كَلاَّ ط بَلْ لاَّيَخَافُوْنَ الاَخِرَةَ ـ كَلاَّ انَّهُ تَذْكِرَةٌ ـ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَه ـ (المدثر ٥٢ تا ٥٥)

কিন্তু তাদের প্রত্যেকে চায় যে তার নামে প্রকাশ্য চিঠি পাঠানো হোক। কখনো না। আসল কথা এই যে, এরা আখেরাতের ভয় করে না। কখনো না। এ ত একটি নসিহত। এখন যার ইচ্ছা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। (মুদ্দাসসির ঃ ৫২-৫৫)

অর্থাৎ এরা চায় যে, যদি আল্লাহ তায়ালা সত্যি সত্যিই মুহাম্মদকে (সা) নবী নিযুক্ত করে থাকেন তাহলে তিনি মক্কার এক একজন সর্দার ও গোত্রপতির নিকটে এই বলে চিঠি লিখে পাঠান যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদের নবী। তোমরা তার আনুগত্য স্বীকার কর। আর এ চিঠি এমন হওয়া চাই যে তা দেখলে যেন এ বিশ্বাস জন্মে যে এ আল্লাহ তায়ালাই লিখে পাঠিয়েছেন।

কুরআনের অন্য এক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ উক্তি নকল করা হয়েছে, আমরা মানব না, যতোক্ষণ না সে জিনিস স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। (আনয়াম ঃ ১২৪)**

অন্য এক স্থানে তাদের এ দাবী উধৃত করা হয়েছে, তুমি আমাদের সামনে আসমানে উঠে যাও এবং সেখান থেকে লিখিত একটি কিতাব এনে দাও যা আমরা পড়ব।

(বনী ইসরাইল ঃ ১৩)

জবাবে বলা হয়েছিল যে তাদের এ দাবী কখনো পূরণ করা হবে না। তাদের ঈমান না আনার আসল কারণ এ মোটেই নয় যে তাদের দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরঞ্চ আসল কারণ এই যে তারা আখেরাতের ভয়ে ভীত নয়। তারা দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে রেখেছে। তাদের এ ধারণা নেই যে দুনিয়ার জীবনের পর আর একটি জীবনও আছে যেখানে তাদেরকে তাদের কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। এ জিনিসটিই তাদেরকে দুনিয়ায় বেপরোয়া এবং দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। হক ও বাতিলের প্রশ্নকে তারা একেবারে অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন হক তাদের চোখে পড়ে না যা অনুসরণের ফল অবশ্যই ভাল হয়ে থাকে। কোন বাতিলও এমন চোখে পড়ে না যার পরিণাম দুনিয়ায় অবশ্যই মন্দ হয়। অতএব প্রকৃত হক কি এবং বাতিল কি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তারা নিরর্থক মনে করে। বিষয়টি চিন্তার বিষয় হলে শুধু তাদের জন্যে হবে যারা দুনিয়ার বর্তমান জীবনকে এক অস্থায়ী জীবন মনে করে এবং এ কথা স্বীকার করে যে প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন যেখানে হকের পরিণাম অবশ্যই ভালো হবে এবং বাতিলের পরিণাম অবশ্যই মন্দ হবে। এমন লোক ত ঐসব যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ও মহান শিক্ষা দেখে ঈমান আনবে যা কুরআনে পেশ করা হয়েছে। সে নিজের বুদ্ধিবিবেক খাটিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবে যে, কুরআন যে আকীদাহ বিশ্বাস ও কর্মকান্ডকে ভ্রান্ত বলছে তার মধ্যে প্রকৃতই কি ভুল আছে? কিন্তু যে আখেরাত অস্বীকারকারী এবং যে সত্য অনুসন্ধানে মোটেই আগ্রহী নয়, সে ঈমান না আনার জন্যে একদিন নিত্য-নতুন দাবী পেশ করবে। তার কোন দাবী যদি পূরণও করা হয়; তথাপি সে অস্বীকার করার জন্যে অন্য কোন বাহানা তালাশ করবে। এ কথাই সূরা আনয়ামে বলা হয়েছে— হে নবী, যদি আমরা তোমার উপরে কাগজে লিখিত কোন কিতাবও নাযিল করি; এবং মানুষ সেগুলো যদি হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখে, তথাপি যারা সত্য অস্বীকার করেছে তারা এ কথাই বলতো যে এ ত সুস্পষ্ট যাদু। (আনয়াম ঃ ৭) (৫৩)

وَقَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ - وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ

-(الانعام ٨-٩)

-তারা বলে, এ নবীর উপরে কোন ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন? যদি আমরা ফেরেশতা নাযিলও করতাম, তাহলে এখন পর্যন্ত সকল বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়া হতো এবং তাদের আর কোন অবকাশ দেয়া হতো না। আর যদি আমরা ফেরেশতাও নামিয়ে

** সূরা আনয়ামে তার সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ -

আল্লাহ স্বয়ং ভালো জানেন কার দ্বারা এবং কিভাবে তিনি পয়গম্বরীর কাজ নেবেন। -গ্রন্থকার

দিতাম ত মানুষের আকৃতিতে দিতাম। এভাবে তাদেরকে সেই সন্দেহেই ফেলতো যাতে তারা এখন লিপ্ত আছে। (আনয়াম ঃ ৮-৯)

তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এ ব্যক্তিকে যখন পয়গম্বর করে পাঠানো হয়েছে, তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা উচিত ছিল। সে মানুষকে বলতো এ খোদার পয়গম্বর। এর কথা শুন, নইলে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। জাহেল অভিযোগকারীদের কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আসমান-যমীনের স্রষ্টা কাউকে পয়গম্বর নিযুক্ত করবেন এবং এমন অসহায় অবস্থায় মানুষের পাথর ও গালি খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবেন। এমন শক্তিশালী বাদশার দূত এক বিরাট গ্রুপসহ না এলেও নিদেনপক্ষে একজন ফেরেশতা ত তার আর্দালি হিসাবে আসা উচিত ছিল যে তার হেফাজত করতো, তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব সৃষ্টি করতো, তার নিয়োগের নিশ্চয়তা দিত এবং অতি প্রাকৃতিক পন্থায় তার কাজকাম আঞ্জাম দিত।

এর প্রথম জবাব এ দেয়া হয় যে, যদি ফেরেশতা প্রকৃত আকৃতিতে পাঠান হতো; তাহলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় এসে যেতো এবং তখন আর অবকাশ দেয়া হতো না। ঈমান আনার এবং নিজের কর্মপদ্ধতির সংশোধন করার জন্যে যে অবকাশ তোমাদের দেয়া হয়েছে তা ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ বাস্তব সত্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। নতুবা যখন অদৃশ্যের যবনিকা উন্মোচিত হবে তখন অবকাশের আর কোন সুযোগ থাকবে না। তারপর তো শুধু হিসাব গ্রহণের কাজই বাকী থাকবে। এ জন্যে যে দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্যে এক পরীক্ষা কাল এবং পরীক্ষা এ বিষয়ের যে প্রকৃত সত্যকে না দেখে শুধু বিবেক ও চিন্তার সঠিক প্রয়োগ দ্বারা তা প্রত্যক্ষ করতে পারছ কিনা, প্রত্যক্ষ করার পর আপন প্রবৃত্তি ও তার কামনা-বাসনাকে আয়ত্ত করে আপন কাজকর্ম সে সত্য অনুযায়ী সঠিক রাখ কিনা। এ পরীক্ষার জন্যে অদৃশ্য থাকাই অনিবার্য শর্ত। তোমার দুনিয়ার জীবন-যা পরীক্ষার নিমিত্ত অবকাশ, সে সময় পর্যন্তই টিকে থাকবে যতোক্ষণ অদৃশ্য অদৃশ্যই থাকবে। অদৃশ্য যখন প্রকাশ্য রূপ ধারণ করবে, তখন এ অবকাশ অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে এবং পরীক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সময় আসবে। সে জন্যে তোমাদের দাবীর জবাবে এ সম্ভব নয় যে, তোমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে তার প্রকৃত আকৃতিতে প্রকাশিত করা হবে। কারণ আল্লাহ এখনই তোমাদের পরীক্ষার মুদ্দৎ খতম করতে চান না।

তারপর দ্বিতীয় জবাব এ দেয়া হলো যে, যদি ফেরেশতা মানুষের আকৃতি নিয়ে আসতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে সে সন্দেহেরই উদ্রেক হতো, যা এখন নবী সম্পর্কে হচ্ছে, অবশ্যি ফেরেশতাদের আগমনের এ এক রূপ হতে পারতো যে তারা লোকের সামনে তাদের প্রকৃত অদৃশ্য আকৃতিতেই প্রকাশিত হতো। কিন্তু উপরে বলা হয়েছে যে, এখনও সে সময় আসেনি। এখন দ্বিতীয় পন্থা এই রয়ে গেছে যে, তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করেই আসবে। এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যদি তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে আসে, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আসা সম্পর্কেও তোমাদের মধ্যে সে সন্দেহেরই উদ্রেক হবে যেমন মুহাম্মদ (সা) এর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আসা সম্পর্কে হচ্ছে। (৫৪)

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ

قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّ بُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ - (الانعام ٣٧-٣٩)

এসব লোক বলে, এ নবীর উপরে তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন (অনুভূত মোজেযা) কেন নাযিল করা হয়নি? এদেরকে বল, আল্লাহ নিদর্শন অবতীর্ণ করার পূর্ণ শক্তি রাখেন। কিন্তু এদের অধিকাংশই অজ্ঞতায় লিপ্ত। যমীনে বিচরণকারী কোন প্রাণী এবং ডানায় ভর করে শূন্যে উড়ন্ত কোন পাখী দেখ, এ সব তোমাদেরই মত সৃষ্ট জীব। আমরা তাদের ভাগ্য লিখনে কিছু কম করিনি। অতঃপর এ সকলকে তাদের প্রভুর সমীপে একত্র করা হয়। কিন্তু যারা আমাদের নিদর্শনাবলী মিথ্যা গণ্য করে তারা বধির ও বোবা হয়ে অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। (আনয়াম ঃ ৩৭-৩৯)

এ এরশাদের অর্থ এই যে, মুজেযা না দেখাবার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তা দেখাবার শক্তি রাখেন না। বরঞ্চ তার কারণ আর কিছু, যা তোমাদের অজ্ঞতার কারণে বুঝতে পারছ না। তোমাদের যদি নিছক খেল-তামাশার শখ না থাকে, বরঞ্চ প্রকৃতই এ বিষয়টি জানার জন্যে নিদর্শন দেখতে চাইছ যে, নবী (সা) যে জিনিসের দিকে ডাকছেন তা সত্য কিনা, তাহলে চোখ মেলে দেখ, তোমাদের চারধারে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। যমীনের প্রাণী এবং শূন্যে উড্ডীয়মান পাখীর কোন একটির জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। কিভাবে তার গঠন কাঠামো তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নির্মাণ করা হয়েছে। কিভাবে তার সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে তার স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তি দান করা হয়েছে। কিভাবে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিভাবে তাদের এক ভাগ্য নির্ধারিত যার সীমারেখার না আগে পা বাড়াতে পারে আর না পেছনে হটতে পারে। কিভাবে তাদের প্রতিটি প্রাণী এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের স্ব স্ব স্থানে তাদের যথাযথ যত্ন নেয়া হচ্ছে। দেখাশুনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পথ প্রদর্শন করা হচ্ছে। কিভাবে তাদের থেকে একটা নির্ধারিত স্কীম অনুযায়ী কাজ নেয়া হচ্ছে। কিভাবে তাদেরকে একটা নিয়ম পদ্ধতির অধীন করে রাখা হয়েছে এবং কিভাবে তাদের জন্ম, বংশবৃদ্ধি এবং মৃত্যুর ধারাবাহিকতা একটা পরিপূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী চলছে। যদি খোদার অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে শুধু একটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর, তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, খোদার তৌহীদ এবং গুণাবলীর যে ধারণা এ নবী তোমাদের সামনে পেশ করছেন এবং এ ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবন যাপন করার যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি তিনি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, তা একেবারে মোক্ষম সত্য। কিন্তু তোমরা না চোখ খুলে দেখছ, আর না কারো কথা তোমরা শুনতে চাও। অজ্ঞতার অন্ধকারে পড়ে আছ এবং চাচ্ছ যে প্রকৃতির বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়ে তোমাদের মন ভুলানো যাক। (৫৫)

وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

الاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى - (الرّعد ٣١)

এবং কি হতো যদি কুরআন এভাবে অবতীর্ণ করা হতো। যার দ্বারা পাহাড় চলতে শুরু করতো। অথবা যমীন বিদীর্ণ হতো অথবা মুর্দা কবর থেকে উঠে কথা বলতে শুরু করতো? (রা'দ ঃ ৩১)

এ আয়াতের মর্ম বুঝতে হলে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এখানে সম্বোধন কাফেরদের করা হয়নি, বরঞ্চ করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। তারা যখন বারবার কাফেরদের পক্ষ থেকে নিদর্শন দেখবার দাবী শুনছিল তখন তাদের মনের মধ্যে এ অস্থিরতা হচ্ছিল যে, হায় যদি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখানো হতো যার দ্বারা তারা নিশ্চিন্ত হতো। তারপর যখন তারা মনে করছিল যে, এ ধরনের কোন নিদর্শন না আসার কারণে নবী (সা) এর রেসালাত সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সুযোগ কাফেরেরা পাচ্ছে। তখন তাদের এ অস্থিরতা আরও বেড়ে যাচ্ছিল। এ জন্যে মুসলমানদেরকে বলা হলো যে, কুরআনের কোন সূরার সাথে হঠাৎ এমন এমন নিদর্শন যদি দেখানোও হতো, তাহলে কি তোমরা মনে কর এসব লোক ঈমান আনতো? তাদের সম্পর্কে তোমাদের কি এ ভালো ধারণা আছে যে, তারা হক কবুল করার জন্যে একেবারে তৈরী হয়ে আছে, শুধুমাত্র একটা নিদর্শনের অভাব? কুরআনের শিক্ষায়, প্রকৃতি রাজ্যের নিদর্শনাবলীতে, নবীর পূতপবিত্র জীবনে এবং নবীর সাহাবীগণের বিপ্লবী জীবনে যারা সত্যের আলো দেখতে পেলো না, তোমরা কি মনে কর তারা পাহাড়ের গতি ও যমীন বিদীর্ণ হওয়া দেখে এবং মৃত ব্যক্তির কবর থেকে বের হওয়া থেকে কোন আলো লাভ করবে? (৫৬)

হুযুরের (সা) রেসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ

নবী মুহাম্মদের (সা) বিরুদ্ধে কাফেরগণ এ ধরনের যতো অভিযোগ করেছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ মুজেযা দেখাবার জন্যে যতো দাবী করেছে, তার প্রত্যেকটির অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত জবাব দেয়া হয়েছে। যার পর আর এ অবকাশ রাখা হয়নি যে, কোন ব্যক্তি বুদ্ধি বিবেক ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা রেসালাত সন্দেহযুক্ত প্রমাণিত করবে। তারপর রেসালাতের সপক্ষে এমন তিনটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, মক্কা এবং তার চারপাশে বসবাসকারী লোকদের পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। নিম্নে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّ لاَ تَخُطُّهُ

بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ - (العنكبوت : ٤٨)

হে নবী। তুমি এর আগে কোন বই-পুস্তক পড়তে না এবং আপন হাত দিয়ে কিছু লিখতেও না। এমন হলে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

(আনকাবুত ঃ ৪৮)

এ আয়াতে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তি এই যে, নবী (সা) ছিলেন নিরক্ষর। তাঁর দেশবাসী, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন যাদের সামনে তাঁর শৈশব থেকে বার্ধক্যে পৌঁছা পর্যন্ত গোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তারা সকলেই ভালভাবে জানতো যে, তিনি জীবনে কোনদিন কোন বই-পুস্তক পড়েননি এবং কলমও হাতে নেননি। এ প্রকৃত ঘটনা পেশ করে

আল্লাহতায়ালা বলেন, এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, আসমানী কিতাবসমূহের শিক্ষা, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা, বিভিন্ন ধর্মীয় আকীদাহ বিশ্বাস, প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাস, তামাদ্দুন, নৈতিকতা এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান এ নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে বেরুচ্ছে, তা অহী ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তিনি লাভ করতে পারতেন না। তাঁর যদি লেখাপড়ার জ্ঞান থাকতো এবং মানুষ যদি কখনো তাকে কোন বই-পুস্তক পড়তে ও গবেষণা করতে দেখতো, তাহলে বাতিল পন্থীদের সন্দেহ করার কিছু ভিত্তি থাকতো যে এ অহী প্রদত্ত জ্ঞান নয়, বরঞ্চ চর্চা ও সাধনার দ্বারা অর্জন করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর এ নিরক্ষরতা কণামাত্র কোন সন্দেহের বুনিয়াদও রেখে যায়নি। এখন চরম হঠকারিতা ছাড়া তার নবুওয়ত অস্বীকার করার আর কোন কারণ নেই যাকে কোন দিক দিয়েই সংগত বলা যেতে পারে না। (৫৭)

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُه عَلَيْكُمْ وَ لاَ اَدْرٰكُمْ بِه فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِه ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ -(يُونس ١٦)

হে নবী (সা), এদেরকে বল, আল্লাহর ইচ্ছা যদি এই হতো যে, আমাকে নবী করা না হোক, তাহলে এ কুরআন আমি তোমাদের কখনোই শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর কোন সংবাদও দিতেন না। এর আগে তোমাদের ভেতরে একটা জীবন অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি একটু বুদ্ধি বিবেক খাটাবে না? (ইউনুস ঃ ১৬)

নবী মুহাম্মদ (সা) কুরআন তাঁর নিজের মন থেকে রচনা করে খোদার প্রতি আরোপ করছেন, মক্কার কাফেরদের এ ধারণা খন্ডনের এ এক বলিষ্ঠ যুক্তি এবং সেই সাথে নবীর এ দাবীও সমর্থন করছে যে, তিনি স্বয়ং এর রচনাকারী নন, বরঞ্চ খোদার পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাঁর প্রতি নাযিল হচ্ছে। অন্যান্য সকল যুক্তি প্রমাণ ছেড়ে দিলেও নবী মুহাম্মদের (সা) জীবন ত তাদের সামনেই রয়েছে। তিনি নবুওয়তের পূর্বে পূর্ণ চল্লিশ বছর তাদের সামনেই অতিবাহিত করেছেন। তাদের শহরেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের চোখের সামনে শৈশব কাটিয়েছেন, যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং প্রৌঢ়ত্ব লাভ করেছেন। বসবাস, দেখা সাক্ষাৎ, লেনদেন, বিয়েশাদী মোটকথা সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধ তাদের সাথেই ছিল। তাঁর জীবনের কোন একটি দিকও তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন জানা বুঝা, দেখাশুনা বস্তু থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য আর কি হতে পারে?

নবী পাকের (সা) জীবনের দু'টি বিষয় এতো সুস্পষ্ট যে, মক্কার প্রতিটি মানুষ তা জানতো। একঃ এই যে, নবুওয়তের পূর্বে পূর্ণ চল্লিশ বছরের জীবনে তিনি এমন কোন শিক্ষাদীক্ষা ও সাহচর্য লাভ করেননি। যার থেকে এসব জ্ঞান তিনি অর্জন করছিলেন এবং এ জ্ঞানের ঝর্ণাধারা হঠাৎ নবুওয়তের দাবীসহ তার মুখ থেকে উৎসারিত হতে থাকে। এখন কুরআনের ক্রমাগত অবতীর্ণ সুরাগুলোতে যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছে, ইতিপূর্বে এসব বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করতে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে এবং মতামত প্রকাশ করতে তাঁকে কোনদিন দেখা যায়নি। এমনকি এ পূর্ণ চল্লিশ বছরের জীবনে তাঁর অতি অঙ্গরঙ্গ বন্ধু এবং অতি নিকট আত্মীয় পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তায়, চলাফেরায় এমন কিছু অনুভব করেননি যাকে এ মহান দাওয়াতের ভূমিকা স্বরূপ বলা যেতে পারে, যা তিনি হঠাৎ চল্লিশ বছর বয়সে পেশ করা শুরু করেন। তা এ কথারই

সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে, কুরআন তাঁর স্বকপোলকল্পিত বা মনগড়া ছিল না, বরঞ্চ বাইরে থেকে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট এক বস্তু। এ জন্যে যে মানব মস্তিষ্ক তার বয়সের কোন এক স্তরেও এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার পরিবর্ধন ও ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট চিহ্ন তার পূর্ববর্তী স্তরগুলোতে পাওয়া যায় না। এ কারণেই মক্কার কিছু চতুর লোক যখন স্বয়ং অনুভব করলো যে, কুরআনকে নবী মুহাম্মদের (সা) মস্তিষ্কপ্রসূত গণ্য করা একেবারে একটা বাজে অভিযোগ, তখন অবশেষে তারা এ কথা বলা শুরু করলো যে, অন্য কোন লোক আছে যে মুহাম্মদকে (সা) এ কথাগুলো শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথা থেকে অধিকতর অর্থহীন ছিল। কারণ মক্কা কেন, সমগ্র আরবে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন কোন লোক ছিল না যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে এ কথা বলা যেতো যে, এই ব্যক্তি এ কালামের রচয়িতা অথবা হতে পারে। এমন যোগ্যতাসম্পন্ন লোক কোন সমাজে কিভাবে লুক্কায়িত থাকতে পারে?

দ্বিতীয় বিষয়টি যা তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে বিশেষ লক্ষণীয় ছিল তা এই যে, মিথ্যা, ধোঁকা-প্রতারণা, জালজুয়াচুরি, চালাকি-চাতুরি এ ধরনের কোন স্বভাবচরিত্রের কোন লেশমাত্র তাঁর মধ্যে পাওয়া যেতো না। সমাজের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে এ চল্লিশ বছরের একত্রে বসবাসকালে তাঁর মধ্যে এ ধরনের কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পক্ষান্তরে যার যার সংস্পর্শেই তিনি এসেছেন, সে তাঁকে একজন অত্যন্ত সত্যবাদী, নিষ্কলংক, নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত লোক হিসাবেই জানতো। এখন যে ব্যক্তি তাঁর সমগ্র জীবনে কখনো ছোটো খাটো ব্যাপারেও মিথ্যা ও ধোঁকা-প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেননি, তিনি হঠাৎ এতোবড়ো মিথ্যা এবং জালিয়াতির অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যে নিজের মন থেকে কিছু রচনা করলেন এবং জোরে সোরে তা খোদার প্রতি আরোপ করতে থাকলেন, এমন ধারণা করার কোন অবকাশ ছিল কি? এসবের ভিত্তিতেই আল্লাহ বলেন, তাদের এ বেহুদা অভিযোগের জবাবে তাদেরকে বল, আল্লাহর বান্দাহসব! একটু বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে দেখ, আমি বাইর থেকে আগত কোন অপরিচিত লোক নই। বরঞ্চ তোমাদের মধ্যেই এর আগে একটা জীবন অতিবাহিত করেছি। আমার পূর্ববর্তী জীবন দেখার পর তোমরা কিভাবে আমার কাছে এ আশা করতে পার যে, আমি খোদার হুকুম ও শিক্ষা ছাড়া এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারতাম?(৫৮)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - (القصص ٨٦)

হে নবী ঃ তুমি ত কখনোই এ আশা করনি যে তোমার উপর কিতাব নাযিল করা হবে। এত নিছক তোমার রবের মেহেরবানী (যে এ তোমার উপর নাযিল হয়েছে)।

(কাসাস ঃ ৮৬)

এ আর একটি যুক্তি যা নবী মুহাম্মদের (সা) নবুওয়তের সপক্ষে পেশ করা হয়েছে। হযরত মূসাকে (আঃ) নবী বানানো হবে এ ব্যাপারে তিনি একেবারে বেখবর ছিলেন এবং এক বিরাট ও মহান মিশনের জন্যে তাঁকে নিয়োজিত করা হবে, এর কোন ইচ্ছা বাসনা তাঁর মনে থাকা ত দূরের কথা, তার ধারণাও তিনি কখনো করেননি। ব্যস হঠাৎ পথ চলা অবস্থায় তাঁকে টেনে নিয়ে নবী বানিয়ে তাঁর দ্বারা এমন বিস্ময়কর কাজ নেয়া হলো, যা তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের সাথে কোন সামঞ্জস্যই ছিল না। ঠিক এ অবস্থা ছিল নবী মুহাম্মদ

(সা) এর। মক্কার লোকেরা স্বয়ং জানতো হেরা গুহা থেকে যে দিন তিনি নবুওয়তের পয়গাম নিয়ে নামলেন, তার একদিন আগে তাঁর জীবন কি ও কেমন ছিল। তাঁর কাজকাম ও পেশা কি ছিল। তাঁর কথাবার্তা কি ছিল। তাঁর আলাপ-আলোচনার বিষয় কি ছিল। তাঁর আগ্রহ অনুরাগ ও কর্মতৎপরতা কোন্ ধরনের ছিল। তাঁর এ গোটা জীবন সততা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ ছিল। তার মধ্যে চরম মহত্ব ও আভিজাত্য, শান্তিপ্রিয়তা, প্রতিজ্ঞা পালন, অধিকার আদায় এবং জনসেবার প্রেরণা অতিমাত্রায় উল্লেখযোগ্য ছিল। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যার ভিত্তিতে এ অনুমান করা যেতো যে, এ মহান ব্যক্তিটি নবুওয়তের দাবী নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সাথে যারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতো, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধব এদের মধ্যে কেউ একথা বলতে পারতো না যে, তিনি প্রথম থেকেই নবী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হেরা গুহার সেই বিপ্লবী মুহূর্তটির পর হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে যেসব বিষয় ও সমস্যাবলীর কথা বেরুতে শুরু হলো, তা কেউ পূর্বে এসব সম্পর্কে একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে শুনতে পায়নি। কেউ তাঁকে সে বিশিষ্ট ভাষা, সেসব শব্দ এবং পরিভাষা ব্যবহার করতে শুনেনি যা কুরআনের আকারে মানুষ তাঁর কাছে শুনতে থাকে। তিনি কখনো ওয়াজ করতে দাঁড়াননি। কখনো কোন দাওয়াত এবং আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামেননি, বরঞ্চ তাঁর কোন কর্মতৎপরতায় এ অনুমানও করা যেতো না যে, তিনি জনসমস্যা সমাধান অথবা ধর্মীয় সংস্কার অথবা নৈতিক সংস্কারের কোন কাজ করার চিন্তা করছেন। ঐ বিপ্লবী মুহূর্তের একদিন আগেও তাঁর জীবন এমন এক ব্যবসায়ীর জীবন হিসাবে দেখা যেতো যা সাদাসিদে এবং জায়েয পন্থায় জীবিকা অর্জন করছে। আপন সন্তানদের সাথে হাসিখুশী অবস্থায় থাকতেন। মেহমানদের খাতির তাজীম করতেন। গরীবদের সাহায্য এবং আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করতেন। কখনো কখনো এবাদত করার উদ্দেশ্যে নির্জনে বসে পড়তেন। এমন ব্যক্তি হঠাৎ প্রলয় সৃষ্টিকারী ভাষণসহ আবির্ভূত হবেন। এক বিপ্লবী দাওয়াত শুরু করবেন। এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, এক স্থায়ী জীবনদর্শন, চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও তামাদ্দুন নিয়ে সম্মুখে আসবেন-এ এমন এক পরিবর্তন ও বিপ্লব যা মানব মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে কোন কৃত্রিমতা, প্রস্তুতি এবং চেষ্টাচরিত্রের ফলে কিছুতেই সাধিত হতে পারত না। এ জন্যে যে, এ ধরনের প্রত্যেক প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি ক্রমবিকাশের স্তরগুলো অতিক্রম করে এবং এসব স্তর সেসব লোকের অগোচরে থাকে না যাদের মধ্যে সে ব্যক্তি দিনরাত তার জীবন অতিবাহিত করে। যদি নবী (সা) এর জীবন এসব স্তর অতিক্রম করতো, তাহলে মক্কার শতসহস্র মুখ থেকে এ কথা শুনা যেতো- আমরা না বলতাম যে, এ ব্যক্তি একদিন বিরাট কিছু একটা দাবী করে বসবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, মক্কায় কাফেরগণ তাঁর উপর হরেকরকমের অভিযোগ করেছে, কিন্তু শেষোক্ত অভিযোগ করার কোন একজনও ছিল না।

তারপর তিনি যে নবুওয়তের অভিলাষী অথবা প্রত্যাশী ছিলেন না, বরঞ্চ তাঁর অজ্ঞাতে হঠাৎ তিনি এ অবস্থার সম্মুখীন হন তার প্রমাণ সে ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যা হাদিসের গ্রন্থগুলোতে অহীর সূচনাকালীন অবস্থায় বর্ণিত আছে। ইতিপূর্বে রেসালাতের সূচনা শীর্ষক অধ্যায়ে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। (৫৯)

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

কুরআন আল্লাহর বাণী এর উপর ঈমানের দাওয়াত

ইসলামী দাওয়াতের তৃতীয় বুনিয়াদী দফা এই যে, মানুষ কুরআন পাককে আল্লাহ্র কিতাব বলে স্বীকার করবে। তার প্রতিটি কথা সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে মেনে নেবে। এর মধ্যে আকীদাহ বিশ্বাস, চিন্তাধারা, নৈতিকতা, এবাদত-বন্দেগী ও আচার-আচরণ সম্পর্কে যে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে তাকে স্বীয় জীবনের জন্যে মৌলিক আইন গণ্য করবে। প্রতিটি সে বস্তুকে প্রত্যাখান করবে যা তার হেদায়েতের পরিপন্থী। এ আকীদার মধ্যে এ কথাও অনিবার্যরূপে মানতে হবে যে, কুরআন অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী যা অহীর মাধ্যমে নবী (সা) এর উপর নাযিল হয়েছে। এমনটি নয় যে, শুধু অর্থ তাঁর হৃদয়ে গেঁথে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি তাঁর নিজের ভাষায় ও শব্দে তা প্রকাশ করেছেন। বরঞ্চ ব্যাপার এই ছিল যে, এ কিতাব যেসব শব্দ মালায় রসূলুল্লাহর (সা) উপর নাযিল হয়েছিল, তা হুবহু সেই শব্দমালায় সংরক্ষিত করা হয়। এতে না কোন রদবদল করা হয়েছে, না কমবেশী করা হয়েছে। আর বাতিল এর মধ্যে অনুপ্রবেশের কোন পথ পাবে না। এছাড়া, যেহেতু এ সরাসরি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালাম, সেজন্যে এ স্বয়ং রসূলের উপরেও কর্তৃত্বশীল। এ যদিও এসেছে রসূলেরই মাধ্যমে, কিন্তু রসূল তার অধীন। তা মেনে চলার আদেশ তাকে করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কমবেশী করার অধিকার তাঁর নেই। বরঞ্চ তাঁর কাজ এই যে, সবচেয়ে বেশী এবং সকলের প্রথমে তাঁকে এর অনুসরণ করতে হবে এবং এ কালামে ইলাহীর অভিপ্রায় অনুযায়ী দ্বীন অর্থাৎ পূর্ণ জীবন বিধান কায়েম করবেন।

এ বিশ্বাস সে বিপ্লবকে অধিকতর সুদৃঢ় করছিল, যা সংঘটিত করা ইসলামের লক্ষ্য ছিল। এ জন্যে যে খোদার পক্ষ থেকে এক শাশ্বত কিতাব সরবরাহ করা হয়েছিল। যার মধ্যে খোদা স্বয়ং নিজস্ব ভাষায় সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে, হক কি এবং বাতিল কি। এখন মানুষ সর্বদা সকল যুগে এর শরণাপন্ন হয়ে জানতে পারে যে, আপন রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। একজন মানুষকে রসূল বানাবার সাথে একটি কিতাবও তার সাথে নাযিল করা এবং মানুষকে উভয়ের উপর ঈমান আনার এবং উভয়কে মেনে চলার আদেশ করার অর্থ এই যে, মানুষ ও সমাজের মধ্যে যেখানেই এ ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করা হবে, সেখান থেকে স্বেচ্ছাচারিতার স্বাধীনতা লোপ পাবে। ব্যক্তি ব্যক্তি হিসাবে এবং সমাজ সামগ্রিক হিসাবে একজন পথপ্রদর্শক ও আইন গ্রন্থের অধীন হয়ে যাবে। পথপ্রদর্শক দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পরেও আইনগ্রন্থ (কুরআন) এ কথা বলার জন্যে দুনিয়ায় সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। যে আল্লাহতায়ালা কোন্ কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং কি করতে নিষেধ করেছেন। নবীর (সা) পর তাঁর যে সুন্নাত বিদ্যমান থাকবে, (যাকে কুরআনের দৃষ্টিতে কালামে ইলাহীর নির্ভরযোগ্য সরকারী ব্যাখ্যা বলে) তা এ বিষয়ের কোন অবকাশই রাখবে না যে, প্রবৃত্তির দাসগণ অথবা অন্যান্য জীবনদর্শনে বিশ্বাসীগণ আইনগ্রন্থের অপব্যাখ্যা করতে থাকবে।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী তবলিগের সূচনাতেই তৌহীদ এবং রেসালাতে মুহাম্মদীর সাথে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার এবং তাকে আল্লাহর কালাম হিসাবে মেনে নেয়ার দাওয়াত দেয়াও কেন জরুরী ছিল এবং তার গুরুত্ব কি ছিল। এখন আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করব যে, যখন এ কুরআন পেশ করা হয়েছিল, তখন তার কি মর্যাদা বয়ান করা হয়েছিল এবং যারা এ কিতাব মানতে অস্বীকার করেছিল, তাদের সামনে কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার কত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল।

কুরআন খোদার কালাম যার প্রতিটি শব্দ নবীর (সা) উপর অহী করা হয়

এ ছিল প্রাথমিক কথা যা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে কুরআনে এতো অধিক পরিমাণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ বিষয়ের সমস্ত আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। কুরআনের কোথাও এমন একটি শব্দও নেই যার থেকে এ সন্দেহ হতে পারে যে, এ নবী মুহাম্মদের (সা) নিজস্ব কথা। সমগ্র কিতাব এ হিসাবেই পেশ করা হয়েছে যে, এ খোদার নাযিল করা অহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো।

و انزلنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق ـ (المائده ٤٨)

এবং হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব পাঠিয়েছি যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে যা কিছু ইতিপূর্বে এসেছিল এবং বিদ্যমান আছে এ কিতাব সে সবের সত্যতা স্বীকারকারী ও সংরক্ষক। অতএব তোমাদের মধ্যে তদনুযায়ী বিচার ফয়সালা কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। এবং যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লোকের কামনা বাসনার অনুসারী হয়ো না। (মায়েদাহ ঃ ৪৮)

এ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে শুধু এ কথাই বলা হয়নি যে, আল্লাহতায়ালা এ কিতাব নবী মুহাম্মদের (সা) উপর নাযিল করেছেন যা সঠিকভাবে সত্য নিয়ে এসেছে, বরঞ্চ অতিরিক্ত দুটি কথা বলা হয়েছে। একটি এই যে, এ প্রত্যেক সে বস্তুর সত্যতা স্বীকার করছে যা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবগুলোর মধ্যে প্রকৃত এবং সঠিক আকারে বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ এ ঐসব কিতাবের সংরক্ষক, অর্থাৎ ঐসব কিতাবের মধ্যে যে সত্য শিক্ষাসমূহ ছিল তা এর মধ্যে শামিল করে সংরক্ষিত করেছে। তারপর সত্যের পরিপন্থী যেসব কথা সেসবের মধ্যে শামিল করা হয়েছিল তা এ কিতাবের সাহায্যে ছাঁটাই করে পৃথক করে দেয়া হয়েছে।

و بالحق انزلنه و بالحق نزل و ما ارسلنك الا مبشرا و نذيرا ـ (بنى اسرائيل ـ ١٠٥)

এবং এ কুরআনকে আমরা সত্যসহ নাযিল করেছি এবং সত্যসহই এ নাযিল হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন কাজের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে, যে মেনে নেবে তাকে সুসংবাদ দেবে এবং যে মানবেনা তাকে ভয় দেখাবে। (বনী ইসরাইল ঃ ১০৫)

وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ اِلَيْك مِنْ كِتَبِ رَبِّك -(الكهف :٢٧)

এবং হে নবী, তোমার রবের যে কিতাব তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা পড়ে শুনাও। (কাহাফ ঃ ২৭)

اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْك الْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِه ، و مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، و مَا اَنْت عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ -(الزُّمَر ٤١)

হে মুহাম্মদ (সা)! আমরা তোমার উপর এ কিতাব মানুষের জন্যে হকসহ নাযিল করেছি। এখন যে হেদায়েত কবুল করবে সে নিজের মংগলের জন্যে তা করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তার দায়িত্ব তোমার নয়। (যুমার ঃ ৪১)

و كَذلك اَوْحَيْنَا اَلَيْك قُرْانًا عربِيًّا لِّتُنْذِر اُمَّ الْقُرٰى و مَنْ حولَهَا -(الشورى ٧)

এবং এভাবে, হে নবী, আমরা তোমার প্রতি আরবীভাষায় কুরআন অহী করেছি, যাতে তুমি জনপদের কেন্দ্র (মক্কা) এবং তার চারধারে বসবাসকারী লোকদের সাবধান করতে পার। (শুরা ঃ ৭)

تَنْزِيْلُ الْكِتبِ مِنَ اللّهِ الْعزِيْزِ الرَّحِيْمِ - (الاحقاف ١)

এ কিতাব নাযিল হয়েছে সর্বশক্তিমান ও মেহেরবান আল্লাহর পক্ষ থেকে। (আহকাফ ঃ ১)

كتبٌ اَنْزَلْنهُ اَلَيْك مُبرَكٌ لِّيدَّبَّرُوْا ايته و لِيتَذَكَّرَ اُولُوا الاَلْبَابِ -(ص ٢٩)

এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা, হে মুহাম্মদ (সা) আমরা তোমার উপর নাযিল করেছি যাতে মানুষ এর উপর চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। (সোয়াদ ঃ ২৯)

و اِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرْاٰن مِنْ لَّدُنْ حكِيْمٍ عليْمٍ - (النَّمل ٦)

এবং হে মুহাম্মদ (সা) তুমি নিশ্চিতরূপে এ কুরআন এক বিজ্ঞ ও জ্ঞানবান সত্তার পক্ষ থেকে লাভ করছ। (নমল ঃ ৬)

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ، عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۔ (الشعراء ١٩٢ تا ١٩٥)

এবং নিশ্চিতরূপে এ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাযিল করা। একে নিয়ে একজন নির্ভরযোগ্য রুহ্[১] তোমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় যাতে হে মুহাম্মদ (সা) তুমি সতর্ককারীদের (মানবজাতিকে সতর্ককারী নবীগণ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (শুয়ারা ঃ ১৯২-১৯৫)

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ، ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۔ (القيمه ١٦ تا ١٩)

- হে নবী, এ অহী তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে জিহ্বা নাড়াচাড়া করো না। এ মনে করে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। অতএব আমি যখন তা পড়তে থাকি তখন এ পঠন মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক। তার মর্ম বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। (কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯)

এ আয়াতগুলো শুধু একথাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছিল না যে, এ গোটা কিতাবখানি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদের (সা) প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছিল, বরঞ্চ শেষোক্ত দুটি আয়াত এ ব্যাপারে অতি সুস্পষ্ট যে, তার অর্থই শুধু হুযুরের (সা) মনে উদ্ঘাটিত করে দেয়া হয় না যা তিনি তাঁর নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন, বরঞ্চ তার শব্দমালাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়। রূহুল আমীনের (জিব্রিল (আঃ) রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আরবী ভাষায় অহী সহ নাযিল হওয়া, তা হুযুরের সামনে পাঠ করা, নবীর তা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তায়ালার একথা বলা যে, "তুমি মুখস্থ করার চেষ্টা করো না, বরঞ্চ যখন পড়া হয় তখন তা শুনতে থাক। অতঃপর তা মনে করিয়ে দেয়া, পড়িয়ে দেয়া, তার মর্ম বুঝিয়ে দেয়া, সব কিছুই আমাদের দায়িত্ব"- এসব কথা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন অহীর শব্দগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়। নতুবা নবীর হৃদয়ে নিছক অর্থ ও ধারণার উদয় হয়ে থাকলে তা পড়ার, শুনার, মনে করার এবং আরবী ভাষায় তা নাযিল হওয়ার কোনই অর্থ থাকে না।

---

১. এখানে আমানতদার বা নির্ভরযোগ্য রূহ বলতে জিব্রিলকে (আ) বুঝানো হয়েছে যিনি কুরআন নিয়ে নবী মুহাম্মদের (সা) নিকটে আসতেন। এখানে তাঁর নাম নেয়ার পরিবর্তে আমানতদার বা নির্ভরযোগ্য রূহ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বিশুদ্ধ আত্মা, অশরীরি সত্তা এবং এমন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য যে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাঁর কাছে অহী পাঠান ঠিক সেই ভাবেই কোন কম বেশী না করে তা নবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন-গ্রন্থকার।

রসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং কুরআন মেনে চলতে আদিষ্ট

কুরআনে এ কথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) কুরআনের হুকুমের অধীন। তা মেনে চলতে তাঁকে আদেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু রদবদল করা এবং কিছু কমবেশী করার অধিকার তাঁর নেই।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ (الاحزاب ٢)

এবং হে মুহাম্মদ (সা) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অহী করা হয়েছে তা মেনে চল। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (আহযাব ঃ ২)

اِتَّبِعْ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ (الانعام ١٠٦)

হে মুহাম্মদ (সা), যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অহী করা হয়েছে তা মেনে চল। তিনি ছাড়া কোন খোদা নেই এবং মুশরকিদের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাও। (আনয়াম ঃ ১০৬)

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ وَ مَا اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (الاحقاف ٩)

-হে মুহাম্মদ (সা)! তাদেরকে বল, আমি ত শুধু সেই অহীরই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি পাঠানো হয় এবং আমি একজন পরিষ্কার সাবধানকারী ব্যতীত কিছু নই।
(আহকাফ ঃ ৯)

وَ اِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا ـ قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ـ هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ (الاعراف ـ ٢٠٣)

এবং (হে নবী!) যখন তুমি এসব লোকের সামনে কোন নিদর্শন (মুজেযা) পেশ করছ না, তখন তারা বলে, তুমি তোমার নিজের জন্যে কোন নিদর্শন কেন বেছে নাওনি? তাদেরকে বল, আমি ত শুধু সে অহীরই অনুসরণ করি যা আমার রবের পক্ষ থেকে আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে। এ (কুরআনের আয়াত) দূরদর্শিতার আলোক তোমার রবের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত ঐসব লোকের জন্যে যারা তাঁর উপর ঈমান আনে।
(আ'রাফ ঃ ২০৩)

অর্থাৎ আমার কাজ এ নয় যে, যে জিনিসেরই দাবী করা হবে অথবা যে জিনিসের প্রয়োজন আমি স্বয়ং অনুভব করব তা স্বয়ং আমি আবিষ্কার করে অথবা তৈরী করে পেশ করব। আমি ত একজন রসূল এবং আমার কাজ শুধু এই যে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,

তাঁর হেদায়েত অনুযায়ী কাজ করব। মুজেযার পরিবর্তে আমার প্রেরণকারী আমার কাছে যে জিনিস পাঠিয়েছেন তা এই কুরআন। এর মধ্যে দূরদর্শিতার আলোক রয়েছে এবং এর লক্ষণীয় সৌন্দর্য এই যে, যারা তাকে মেনে নেয় তারা জীবনের সঠিক পথ পেয়ে যায় এবং তাদের সুন্দর স্বভাবচরিত্রে আল্লাহর রহমতের নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়।

و اذَا تُتْلى علَيْهِمْ اياتُنَا بينت قَالَ الَّذِيْنَ لاَ يرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيرِ هذَا اَوْ بَدِّلْهُ ط قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَه مِنْ تِلْقَاىءِ نَفْسِيْ ـ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحى اِلَىَّ ج اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عصيْتُ رَبِّيْ عذَاب يَوْمٍ عظِيْمٍ ـ (يونس ١٥)

এবং যখন তাদেরকে আমাদের পরিষ্কার আয়াতগুলো শুনানো হয়, তখন যারা আখেরাতে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে না তারা বলে, এছাড়া অন্য কোন কুরআন অথবা এর মধ্যে কিছু রদবদল কর। হে মুহাম্মদ (সা) এদেরকে বলে দাও, আমার পক্ষ থেকে কোন রদবদল করার কোন অধিকার আমার নেই। আমি ত শুধু সেই অহীরই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি পাঠানো হয়। যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে এক বিরাট দিনের আযাবের ভয় আমি করি। (ইউনুস:১৫)

و لَوْ تَقَوَّلَ علَيْنَا بعْض الاَقَاوِيْلِ ـ لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيمِيْنِ ـ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحدٍ عنْهُ حجِزِيْنَ ـ (الحاقه ٤٤ تا٤٧)

এবং যদি এ (নবী) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে কিছু তৈরী করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে আমরা ডান হাত দিয়ে ধরে তার গলার রগ কেটে দিতাম। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ এতে বাধাদানকারী হতো না। (আল্ হাক্কা ঃ ৪৪-৪৭)

কুরআন সকল দিক দিয়ে সংরক্ষিত এবং তার প্রতিটি কথা অটল

একথাও কুরআনে সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, কুরআনকে প্রতিটি শব্দসহ সংরক্ষিত রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহতায়ালা গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিটি কথা অটল-অপরিবর্তনীয়। এর মধ্যে মিথ্যা অনুপ্রবেশের কোন পথ পাবে না। আল্লাহতায়ালা দিকচক্রবালে এবং মানুষের মধ্যে ক্রমাগতভাবে এমন সব নিদর্শন দেখাতে থাকবেন যার ফলে তার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

اِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر و اِنَّا لَه لَحفِظُوْنَ ـ (الحجر ٩)

আমরাই এ কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই এর সংরক্ষক। (হাজর ঃ ৯)

অর্থাৎ এ সরাসরি আমাদের হেফাজতে রয়েছে। কেউ নির্মূল করতে চাইলে, অথবা দাবিয়ে রাখতে চাইলে পারবে না। কারো দোষারোপ ও সমালোচনায় তার মর্যাদাহানি হবে না। তার দাওয়াত কেউ রুখতে চাইলেও পারবে না। তাকে বিকৃত করা ও রদবদল করার সুযোগ কারো হবে না।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ - (البروج ٢١-٢٢)

-বরঞ্চ কুরআন পাক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে অংকিত। (বুরুজ ঃ ২১-২২)

অর্থাৎ এ কুরআনের লেখা মুছে ফেলা যাবে না। খোদার সেই সংরক্ষিত ফলকে অংকিত যার মধ্যে কোন রদবদল সম্ভব নয়। এর মধ্যে যা লিখে দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই হবে। সমস্ত দুনিয়া মিলিতভাবে তা নাকচ করতে চাইলেও পারবে না।

و انَّه لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لاَّ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِه تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ - (حم السجده ٤٢)

এবং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ কুরআন এক শক্তিশালী কিতাব। বাতিল না তার সামনে থেকে আসতে পারে, না পশ্চাৎ থেকে। এ এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি বিজ্ঞ ও আপনাআপনি প্রশংসিত। (হামীম সাজদা: ৪৬)

সম্মুখ থেকে বাতিলের আসতে না পারার অর্থ এই যে, কুরআনের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে কেউ তার কোন কথা ভুল এবং কোন শিক্ষাকে মিথ্যা ও অন্যায় প্রমাণ করতে চাইলে তা করতে পারবে না। পেছন থেকে না আসার অর্থ এই যে, পরবর্তীকালে এমন কোন সত্য উদ্ঘাটিত হবে না যা কুরআনের উপস্থাপিত তথ্যের পরিপন্থী, এমন কোন জ্ঞান হতে পারে না যা সত্যিকার অর্থে 'জ্ঞান' এবং কুরআনে বর্ণিত জ্ঞান খন্ড করে। কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এমন হতে পারে না যা এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে, কুরআন আকীদাহ বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কে মানুষকে যে পথ প্রদর্শন করেছে তা ভুল।

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الاٰفَاقِ و فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ - (حم السجده ٥٣)

শিগ্‌গির আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দিকচক্রবালে এবং তাদের মধ্যে দেখাব এবং শেষ পর্যন্ত তাদের নিকটে ঐ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন প্রকৃতপক্ষে সত্য। (হামীম সাজদা ঃ ৫৩)

এর দুটি অর্থ। এক ঃ এই যে, সত্বর এ কুরআনের দাওয়াত দুনিয়ার এক বিরাট অংশে ছড়িয়ে পড়বে এবং এসব লোক স্বচক্ষে দেখবে যে, তার বদৌলতে মানব জীবনে কি বিরাট

ধর্মীয়, নৈতিক, মানসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, ঊর্ধজগত এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতোই বাড়তে থাকবে, কুরআন যে সত্য, একথা ততোই সুস্পষ্ট হতে থাকবে।

কুরআন অস্বীকার করা কুফরী

ঈমান বিল কুরআন (কুরআনের উপর ঈমান) ইসলামী দাওয়াতের তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেমন তৌহীদ ও রেসালাতের উপর ঈমান। এ জন্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মানুষকে এ দাওয়াত দেয়া হলো, এ আল্লাহর কালাম, এর উপর ঈমান আন। যে এর উপর ঈমান আনবে না সে কাফের। সূরা বাকারায় প্রাথমিক আয়াতগুলোতে যাদেরকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করা হয়েছে তাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

و الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْك و مَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -(البقره ٤)

এবং যারা ঈমান আনে ঐ কিতাবের উপর যা (হে মুহাম্মদ (সা) তোমার উপর নাযিল হয়েছে এবং ওসব কিতাবেরও উপর যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। (বাকারা ঃ ৪)

و نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ ما هُو شِفَاءٌ وَّ رحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ و لاَ يَزِيْدُ الظّلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا -

(بنى اسرائيل ٨٢)

-আমরা এ কুরআন নাযিল প্রসঙ্গে এমনসব নাযিল করেছি যা এর উপর ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে আরোগ্য এবং রহমত এবং (ঈমান আনেনি এমন) জালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছু নেই। (বনী ইসরাইল ঃ ৮২)

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيتِنَا اِلاَّ الْكفِرُوْنَ -(العنكبوت ٤٧)

-আমাদের আয়াত অস্বীকার শুধু কাফেরগণই করে থাকে। (আনকাবুত ঃ ৪৭)

কাফেরদের প্রতিক্রিয়া

কুরআনকে তার সঠিক মর্যাদাসহ যখন পেশ করা হলো, তখন কুরাইশ কাফের এবং আরবের সাধারণ মুশরিকগণের পক্ষে তা মেনে নেয়া, নবী মুহাম্মদকে (সা) খোদার রসূল মেনে নেয়া অপেক্ষা অধিকতর কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ মুহাম্মদকে (সা) রসূল মেনে নেয়ার পর তাঁর আনুগত্য মেনে নেয়া হলেও এমন আশা করা যেতো যে তাঁর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর তারা এ আনুগত্যের বোঝা মাথার উপর থেকে ফেলে দেবে। কিন্তু এখানে ত একটি কিতাব এমন মর্যাদাসহ পেশ করা হচ্ছিল যে, তার প্রতিটি শব্দ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এ কিতাবকে মুসলমানরা অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করছিল। কারণ নামাযে তার তেলাওয়াত অপরিহার্য। হুযুর (সা) প্রতিটি অহী নাযিল হওয়ার পর তা লিখিয়ে নিতেন। এর থেকে অব্যাহতি লাভের কোন আশা তাদের ছিল না। তারা মনে

করতো যে, তাকে আল্লাহর কালাম মেনে নেয়ার পর তাদের জীবনকে স্থায়ীভাবে একটা নিয়ম-শৃংখলায় বেঁধে দেয়া হবে যার থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ খোদাওন্দে আলম থেকে বিমুখ হওয়া। এ জন্যে তারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এবং নবী মুহাম্মদের (সা) এ কথা কিছুতেই বলতে না পারে এ উদ্দেশ্যে তারা সম্ভাব্য সকল কলাকৌশল অবলম্বন করে।

সকল কিতাবে ইলাহীর প্রতি অস্বীকৃতি

এ ব্যাপারে তাদের সর্বপ্রথম কলাকৌশল ছিল তামাম কিতাবে ইলাহীকে অস্বীকার করা।

و قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلاَ بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ - (سبا ٣١)

এবং অস্বীকারকারীগণ বল্লো' আমরা কিছুতেই না এ কুরআনকে মানব আর না এর পূর্বের কোন কিতাবকে। (সাবা ঃ ৩১)

কিন্তু তাদের এ কথা স্বয়ং আরববাসীগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না। তারা স্বয়ং এ কথা মানতো যে, হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সহিফাগুলো খোদার পক্ষ থেকে নাযিল করা ছিল। বস্তুতঃ কুরআনের দুই স্থানে তার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, তার থেকে জানা যায় তা আরববাসীদের কাছে সর্বস্বীকৃত ছিল যদিও তার কোন এক খন্ডও তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল না। এ কথার উল্লেখ আছে সূরা নজমের ৩৭ আয়াতে এবং সূরা আ'লার ১৯ আয়াতে।

তাছাড়াও আরবে বহুসংখ্যক ইহুদী ও নাসারা বিদ্যমান ছিল যারা কিতাবে ইলাহী বিশ্বাস করতো। আর রসূলুল্লাহ (সা) এর মুকাবিলায় আরবের কাফেরদের প্রয়োজন ছিল এ সব ইহুদী-নাসারার সাহায্য গ্রহণের। সে জন্যে তারা তাদের এ কথার উপর বেশীদিন অবিচল থাকতে পারলো না। (৬০)

নবীর (সা) বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে তিনি স্বয়ং কুরআন রচনা করেছেন

তারপর তারা সবচেয়ে বেশী জোরেসোরে এ অভিযোগ প্রচার করতে থাকে যে, হুযুর (সা) এ কুরআন স্বয়ং রচনা করে আল্লাহর প্রতি আরোপ করেন। এর বিশদ জবাব কুরআনে দেয়া হয়েছে এবং বলিষ্ঠ যুক্তিসহ প্রমাণ করেছে যে, এ কালামে ইলাহী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (السجده ٢)

এ কিতাবের অবতরণ নিঃসন্দেহে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হয়েছে। (সাজদাহ ঃ ২)

কুরআনের বিভিন্ন সূরা এ ধরনের কোন না কোন পরিচয় সূচক বাক্য দিয়ে শুরু হয় যার উদ্দেশ্য কালামের সূচনাতেই এ কথা বলে দেয়া যে, এ কালাম কোথা থেকে আসছে। এ প্রকাশ্যতঃ ঐ ধরনেরই একটি ভূমিকাসুলভ বাক্য যেমন রেডিওর ঘোষণাকারী কোন প্রোগ্রামের সুচনায় বলে থাকেন যে, অমুক স্টেশন থেকে খবর বলা হচ্ছে। কিন্তু রেডিওর

এ মামুলি ধরনের ঘোষণার বিপরীত কুরআনের কোন সূরার সূচনা যখন এ অসাধারণ ঘোষণার দ্বারা করা হয় যে, এ পয়গাম বিশ্বপ্রকৃতির সার্বভৌম প্রভুর পক্ষ থেকে আসছে, তখন এ নিছক ঘোষকের বাণী বর্ণনা করাই হয় না, বরঞ্চ সেই সাথে তার মধ্যে এক বিরাট দাবী, এক জোরদার চ্যালেঞ্জ এবং এক ভয়ানক সতর্কীকরণ শামিল থাকে। এ জন্যে যে, ঘোষণার সাথে সাথেই এমন খবর দেয় যে, এ মানুষের বাণী নয়- খোদাওন্দে আল'মের বাণী। এ ঘোষণা সাথে সাথেই এ বিরাট প্রশ্ন মানুষের সামনে উপস্থাপিত করে- এ দাবী মেনে নেব কি নেব না। যদি মেনে নেই তাহলে চিরদিন তার আগে আনুগ্যতের শির অবনত করতে হবে। অতঃপর তার মুকাবিলায় আমার কোন স্বাধীনতা থাকবে না। আর যদি মেনে না নিই তাহলে এ বিপদ ঘাড়ে নিতে হবে যে, যদি এ সত্যি সত্যিই আল্লাহর কালাম হয় তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করার ফলে চিরকাল দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণেই ভূমিকাসূলভ বাক্যটি ব্যতিক্রমধর্মী হওয়ার ফলে মানুষকে বাধ্য করে যাতে সে সতর্ক হয়ে অতি মনোযোগ সহকারে এ কালাম শুনতে থাকে এবং এ সিদ্ধান্ত করে যে, কালামে ইলাহী হিসাবে তা মেনে নেবে কি না।

এখানে শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়নি যে, এ কিতাব রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। বরঞ্চ পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে বলা হয়েছে যে,

لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

নিঃসন্দেহে এ খোদার কিতাব। এ যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ জোরালো বাক্যটিকে কুরআনের আনুষঙ্গিক পটভূমি এবং স্বয়ং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনাকে সামনে রেখে বিচার কারলে মনে হয় এর ভেতরে দাবীর সাথে যুক্তিও আছে। আর এ যুক্তি মক্কার ঐসব লোকের অগোচরে ছিল না যাদের সামনে এ দাবী করা হচ্ছিল। এ কিতাব উপস্থাপনকারী গোটা জীবন তাদের সামনে ছিল। কিতাব পেশ করার আগের এবং পরের জীবন। তারা জানতো যে ব্যক্তি দাবীসহ এ কিতাব পেশ করছে, সে তাদের জাতির মধ্যে সবচেয়ে অধিক সৎ, পরম গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং চরিত্রবান লোক। তারা এটাও জানতো যে, নবুওয়তের দাবীর একদিন পূর্ব পর্যন্তও কেউ তার কাছে এমন কথা শুনেনি যা নবুওয়তের দাবী করার পর হঠাৎ সে বলা শুরু করে। তারা এ কিতাবের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এবং স্বয়ং মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাচ্ছিল। তারা এটাও জানতো যে, একই ব্যক্তির দু'ধরনের বর্ণনাভঙ্গী সুস্পষ্ট পার্থক্যসহ হতে পারে না। তারা এ কিতাবের অলৌকিক সাহিত্য মাধুর্যও লক্ষ্য করছিল এবং আরবী ভাষী হিসাবে তারা স্বয়ং জানতো যে, তাদের সকল সাহিত্যিক ও কবি অনুরূপ কোন সাহিত্য সৃষ্টি করতে অক্ষম। তারা এ কথাও ভালো করে জানতো যে, তাদের জাতীয় কবি, গণক এবং বক্তাদের বাণী এবং এ বাণীর মধ্যে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তারপর এ বাণী যেসব পূত-পবিত্র বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে তা কত মহান ও উচ্চাংগের। মিথ্যা দাবীদারের কথা ও কাজের মধ্যে যে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকে, এ কিতাবের মধ্যে এবং তার উপস্থাপনকারীর মধ্যে তার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। নবুওয়তের দাবী করে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর নিজের জন্যে, পরিবারের জন্যে অথবা আপন জাতি ও গোত্রের জন্যে কি লাভ করতে চান এবং এ কাজের জন্যে তাঁর কোন ব্যক্তিস্বার্থ নিহিত, বিরোধীরা তা কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারছিল না। তারা এটাও দেখছিল যে, এ দাওয়াতের প্রতি তাদের জাতির কোন সব লোক আকৃষ্ট হচ্ছিল এবং এর

সাথে সংশ্লিষ্ট হবার পর তাদের জীবনে কত বড়ো বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল। এ সব কিছু মিলে স্বয়ং দাবীর সপক্ষে যুক্তি প্রমাণের রূপ ধারণ করছিল। এ জন্যে এ পটভূমিতে এ কথাই বলা যথেষ্ট ছিল যে, এ কিতাবের রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আর অধিক যুক্তি প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। (৬১)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ج بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ - (السجده ٣)

এরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি স্বয়ং এটি রচনা করেছে? না, বরঞ্চ এ সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে যাতে তুমি সাবধান করে দিতে পার এমন এক জাতিকে যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সাবধানকারী আসেনি, সম্ভবতঃ তারা হেদায়াত লাভ করবে। (সাজদা ঃ ৩)

পূর্বে যে ভূমিকাসূলভ বাক্যের উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর মক্কার মুশরিকদের প্রথম অভিযোগের জবাব দেয়া হচ্ছে যা তারা নবী মুহাম্মদ (সা) এর রেসালাত সম্পর্কে করতো। জবাবে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তা নিছক প্রশ্ন নয়। বরঞ্চ এতে চরম বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেসব কথার ভিত্তিতে এ কিতাবের আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সন্দেহাতীত, তা সত্ত্বেও এসব লোক কি সুস্পষ্ট হঠকারী উক্তি করছে যে মুহাম্মদ (সা) নিজে তা রচনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আরোপ করছে? এমন বেহুদা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করতে তাদের লজ্জা করে না? তারা কি একথা অনুভব করতে পারে না যে, যারা নবী মুহাম্মদকে (সা) তাঁর কাজ ও বাণী সম্পর্কে অবহিত এবং যারা এ কিতাবকে বুঝতে পারে, তারা এ বেহুদা অভিযোগ শুনে কি ধারণা করবে?

যেভাবে প্রথম আয়াতে لَا رَيْبَ فِيْهِ - (তাতে সন্দেহ নেই) বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং তারপর কুরআনের কালামে ইলাহী হওয়ার সপক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শন প্রয়োজন মনে করা হয়নি। ঠিক তেমনি, এ আয়াতেও মক্কার কাফেরদের অভিযোগ আরোপের উপর শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে–"এ হচ্ছে হক তোমার রবের পক্ষ থেকে।" এর কারণও তাই যা আমরা ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছি। কে কোন্ পরিবেশে কোন্ মর্যাদাসহ এ কিতাব পেশ করেছিলেন, এসব শ্রোতাদের জানা ছিল। এ কিতাবও তার ভাষা, সাহিত্য ও বিষয়বস্তুসহ সকলের সামনে ছিল। তার প্রভাব ও ফলাফলও মক্কার সেই সমাজের সকলে স্বচক্ষে দেখছিল। এ অবস্থায় এ কিতাবের রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত সত্য হওয়াটা এমন এক বাস্তব ঘটনা ছিল যা অল্প কথায় বর্ণনা করাই কাফেরদের অভিযোগ খন্ডনের জন্যে যথেষ্ট ছিল। এর উপর যুক্তি প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করলে বিষয়টিকে বলিষ্ঠ করার পরিবর্তে তাকে দুর্বল করা হতো। যেমন ধরুন দিনের বেলা সূর্য উজ্জ্বল আলো দান করছে, এমন সময় কোন গোঁয়ার ব্যক্তি বল্লো যে, এ অন্ধকার রাত। তার জবাবে শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট, একে তুমি রাত বলছ? উজ্জ্বল দিন ত চোখের সামনে রয়েছে। তারপর যদি আপনি দিন প্রমাণ করার জন্যে যুক্তিসংগত দলিল প্রমাণ পেশ করতে থাকেন তাহলে জবাবের বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে পারবেন না। বরঞ্চ হ্রাসই করবেন।(৬২)

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (يونس :٣٧)

এ কুরআন এমন জিনিস নয় যা আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচিত হবে। বরঞ্চ এত যা কিছু পূর্বে এসেছিল তার সত্যতার স্বীকৃতি এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ। এ যে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। (ইউনুস ঃ ৩৭)

'যা কিছু পূর্বে এসেছিল তার সত্যতার স্বীকৃতি' অর্থাৎ সূচনাকাল থেকে যে মৌলিক শিক্ষা নবীগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠানো হতে থাকে। এ কুরআন তার থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরঞ্চ ঐসবেরই স্বীকৃতি দান করছে। যদি এ কোন নতুন ধর্ম প্রবর্তকের মানসিক কল্পনার ফসল হতো, তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে এ প্রচেষ্টা দেখা যেতো যে, প্রাচীন সত্যের সাথে কিছু নিজস্ব অভিনব রং মিশিয়ে আপন পৃথক মর্যাদা সুস্পষ্ট করে তুলতো।

'আল কিতাবের বিশদ বিবরণ' এর অর্থ ঐসব মৌলিক শিক্ষা যা সমস্ত আসমানি কিতাবের সারাংশ এর মধ্যে সন্নিবেশিত করে যুক্তি ও সাক্ষ্য প্রমাণসহ। উপদেশ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিশীল করে বর্ণনা করা হয়েছে।(৬৩)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَن يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَيَاْتُوْنَ بِمِثْلِه وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - (بنى اسرائيل ٨٨)

বল যদি মানুষ এবং জ্বিন সকলে মিলিত হয়েও এ কুরআনের অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করে, তবুও তা পারবে না। তারা একে অপরের সাহায্যকারী হোক না কেন। (বনী ইসরাইল ঃ ৮৮)

এ স্থান ব্যতীত কুরআনের অন্যান্য চারটি স্থানেও এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। যথা সূরা বাকারা আয়াত ২৩-২৪, ইউনুস আয়াত ৩৮, হুদ আয়াত ১৩, এবং তুর আয়াত ৩৩, ৩৪। এসব স্থানে এ কথা কাফেরদের এ অভিযোগের জবাবে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজে এ কুরআন রচনা করেছেন এবং অযথা তিনি একে খোদার বাণী বলে পেশ করছেন। উপরন্তু সূরা ইউনুস ১৬ আয়াতে এ অভিযোগ খন্ডন করে বলা হয়েছে-

قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُه عَلَيْكُمْ وَلاَ اَدْرٰكُمْ بِه فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِه - اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ - (يونس ١٦)

হে মুহাম্মদ (সা), এদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যদি চাইতেন যে, আমি যেন কুরআন তোমাদেরকে না শুনাই। তাহলে কিছুতেই শুনাতে পারতাম না। বরঞ্চ এর খবর পর্যন্ত

তোমাদেরকে দিতেন না। আমি ত তোমাদের মধ্যে এক জীবন অতিবাহিত করেছি। তোমরা এতোটুকুও বুঝ না? (ইউনুস:১৬)

এ আয়াতগুলোতে কুরআন কালামে ইলাহী হওয়ার যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তিনটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ কুরআন তার ভাষা, বর্ণনাভংগী, যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু, আলোচনা, শিক্ষা এবং অদৃশ্য জগতের সংবাদ পরিবেশনের দিক দিয়ে একটি মুজেযা (অলৌকিক বস্তু) যার অনুরূপ একটি পেশ করা মানুষের সাধ্যের অতীত। তোমরা বলছ যে একে একজন মানুষ রচনা করেছে। কিন্তু আমরা বলছি যে দুনিয়ার সকল মানুষ মিলিত হয়েও এ ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না। এমনকি যে জিন জাতিকে মুশরিকগণ তাদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে এবং এ কুরআন যে মাবুদ বানাবার মানসিকতাকে চরম আঘাত হেনেছে, ও সে জিন জাতিও যদি কুরআন অস্বীকারকারীদের মদদের জন্যে একতাবদ্ধ হয়ে যায়, তথাপি তারাও কুরআনের মর্যাদা সম্পন্ন কোন গ্রন্থ রচনা করে এ চ্যালেঞ্জ খন্ডন করার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মদ (সা) কোন বহির্জগত থেকে হঠাৎ তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হননি। বরঞ্চ এ কুরআন নাযিলের পুর্বেও চল্লিশ বছর তোমাদের মধ্যে ছিলেন। নবুওয়ত দাবী করার একদিন পূর্বেও তাঁর মুখ থেকে এ ধরনের বাণী, এ ধরনের সমস্যা ও বিষয়বস্তু সম্বলিত কোন বাণী তোমরা শুনেছিলে কি? যদি না শুনে থাক এবং নিশ্চয়ই তা শুননি, তাহলে তোমাদের বিবেক কি এ কথা বলে যে কোন ব্যক্তির ভাষা, ধ্যান-ধারণা, তথ্যাদি, চিন্তাধারা ও বক্তৃতা বিবৃতিতে হঠাৎ এমন বিরাট পরিবর্তন হতে পারে?

তৃতীয়তঃ নবী মুহাম্মদ (সা) তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে আত্মগোপন করেননি, বরঞ্চ তোমাদের মধ্যেই বসবাস করছেন। তোমরা তাঁর মুখ থেকে কুরআনও শুনছ এবং অন্যান্য আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা শুনছ। কুরআনের কথা এবং নবী মুহাম্মদের (সা) কথায় ভাষা ও প্রকাশ ভংগীর এমন বিরাট পার্থক্য যে কোন এক ব্যক্তির এমন ভিন্নতর দু'রকম কথা কখনোই হতে পারে না। এ পার্থক্য শুধুমাত্র সেকালেই সুস্পষ্ট ছিল না যখন নবী মুহাম্মদ (সা) তাঁর জাতির মধ্যে বসবাস করছিলেন। বরঞ্চ আজও হাদীস গ্রন্থাবলীতে তাঁর অসংখ্য বাণী ও ভাষণ বিদ্যমান আছে। তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভংগী কুরআনের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে এতো বিভিন্ন যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোন সূক্ষ্ম সমালোচক এ কথা বলতে সাহস করবেন না যে এ উভয় ধরনের কথা একই ব্যক্তির । (৬৪)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِه مُفْتَرَيتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّهِ اِنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ ـ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ (هود ١٣-١٤)

এরা কি এ কথা বলে যে, পয়গম্বর স্বয়ং এ কিতাব রচনা করেছে? বল, আচ্ছা সেই কথা? তাহলে এ ধরনের রচিত দশটি সূরা তোমরা তৈরী করে আন। আর আল্লাহ ছাড়া

যে তোমাদের মা'বুদ রয়েছে তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডেকে আনতে পার ত নিয়ে এসো যদি (তাদের মা'বুদ মনে করার ব্যাপারে) তোমরা সত্যবাদী হও। এখন তারা যদি তোমাদের সাহায্য করতে না আসে, তাহলে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহর এল্ম থেকে নাযিল হয়েছে এবং জেনে রাখ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই। তারপর তোমরা কি (এ সত্যের প্রতি) আনুগত্যের শির অবনত করছ? (হুদ ঃ ১৩-১৪)

এখানে একই যুক্তি দ্বারা কুরআনের কালামে ইলাহী হওয়ার প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং তাওহীদের প্রমাণও। যুক্তি প্রদর্শনের সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

১। যদি তোমাদের নিকটে এ মানুষের কথা হয়ে থাকে, তাহলে ত মানুষের এরূপ কথা বলার যোগ্যতা থাকা উচিত। অতএব আমি, (মুহাম্মদ (সা) এ কিতাব স্বয়ং রচনা করেছি তোমাদের এ দাবী তখনই সত্য হতে পারে যখন তোমরা এমন একটি কিতাব রচনা করে দেখাবে। কিন্তু বারবার চ্যালেঞ্জ দেয়ার পরও যদি তোমরা সকলে মিলে এর অনুরূপ কোন কিতাব রচনা করতে না পার, তাহলে আমার এ দাবী সত্য যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই। বরঞ্চ এ আল্লাহর এলম দ্বারা নাযিল হয়েছে।

২। অতঃপর এ কিতাবে তোমাদের খোদাদেরও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হয়েছে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এদের বন্দেগী পরিত্যাগ কর। কারণ খোদায়ীতে তাদের কোনই অংশ নেই। তা যদি না মান, তাহলে প্রয়োজন এই যে, তোমাদের খোদাদেরও (যদি সত্যিই তারা খোদা হয়) আমার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে এবং এ কিতাবের অনুরূপ একটি রচনা করার জন্যে তোমাদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তারা এ ফয়সালার মুহূর্তে না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে এবং না তোমাদের মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চার করতে পারে যার দ্বারা তোমরা এ কিতাবের অনুরূপ রচনা করতে পার, তাহলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তোমরা অযথা তাদেরকে খোদা বানিয়ে রেখেছ। নতুবা তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এমন কোন শক্তি নেই এবং খোদায়ীর লেশমাত্র নেই, যার ভিত্তিতে তারা খোদা হওয়ার যোগ্য।(৬৫)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(يونس ٣٨)۔

এরা কি এ কথা বলে যে পয়গম্বর (এ কিতাব) স্বয়ং রচনা করেছে? বল, তোমরা যদি তোমাদের অভিযোগে সত্যবাদী হও, তাহলে অনুরূপ একটি সূরাই রচনা করে আন এবং এক খোদাকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ইচ্ছা সাহায্যের জন্যে ডেকে আন। (ইউনুস ঃ ৩৮)

সাধারণতঃ মানুষ মনে করে যে, এ চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে নিছক কুরআনের ভাষার অলংকার ও সাহিত্যিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে। কুরআনের অলৌকিকত্বের উপর যে ধরনের আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কুরআনের মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উচ্চে। কুরআন তার স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা ও তুলনাহীনতার দাবীর বুনিয়াদ নিছক শাব্দিক ও সাহিত্যিক মাধুর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেনি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভাষার দিক দিয়ে কুরআন অতুলনীয়। কিন্তু যে কারণে এ কথা বলা হয়েছে যে মানব মস্তিষ্ক এ ধরনের কোন কিতাব রচনা করতে পারে না তাহলো তার আলোচ্য বিষয়

৩৫ —

ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকত্বের যে দিক রয়েছে এবং যে কারণে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এ ধরনের রচনা মানুষের সাধ্যের অতীত, তা কুরআন স্বয়ং বিভিন্নস্থানে বর্ণনা করেছে ।(৬৬)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَه ج بَلْ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ ـ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِه اِنْ كَانُوْا صدِقِيْنَ ـ (الطور ٣٣-٣٤)

-এরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন রচনা করেছে? আসল কথা এই যে, এরা ঈমান আনতে চায় না। তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হয় তাহলে তারা এ মর্যদাসম্পন্ন একটি কালাম বানিয়ে আনুক। (তুর ঃ ৩৩-৩৪)

অন্য কথায় এ এরশাদের অর্থ এই যে, কুরাইশের যারা কুরআনকে নবী মুহাম্মদের (সা) নিজস্ব রচিত কালাম বলে স্বয়ং তাদের মন এ কথা বলে যে, এ তাঁর কালাম হতে পারে না। অন্যান্যদের মধ্যে যারা ভাষাবিদ, তারা যে শুধু পরিষ্কার অনুভব করে যে এ মানবীয় বাণী অপেক্ষা অতীব উচ্চ ও মহান। বরঞ্চ তাদের মধ্যে যারা নবী মুহাম্মদকে (সা) জানতো, তারাও কখনো কখনো এ ধারণা করতে পারতো না যে, এ তাঁর (নবীর) নিজস্ব কালাম। অতএব পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআনকে নবী মুহাম্মদের (সা) রচিত যারা বলে, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানই আনতে চায় না। এ জন্যে তারা বিভিন্ন রকমের মিথ্যা বাহানা তৈরী করে যার মধ্যে এ একটি।

কথা শুধু এতোটুকুই নয় যে, এ নবী মুহাম্মদের (সা) কালাম নয়, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে এ মোটেই কোন মানবীয় বাণী বা কালাম নয়। এ রকম বাণী রচনা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। তোমরা যদি একে মানব রচিত কালাম বলতে চাও, তাহলে এ মানের কোন বাণী রচনা করে নিয়ে এসো যা কোন মানুষ রচনা করেছে। এ চ্যালেঞ্জ না শুধু কুরাইশকে, বরঞ্চ দুনিয়ার সকল অবিশ্বাসকারীকে সর্বপ্রথমে এ আয়াতে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর তিনবার মক্কা মুয়ায্যামা এবং শেষবার মদীনা মুনাওয়ারায় এ চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তি করা হয়। (সূরা ইউনুস আয়াত ৩৮, হুদ ঃ ১৩, বনী ইসরাইল ঃ ৮৮, বাকারা ঃ২৩৭ দ্র ঃ)

কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার হিম্মত না সে সময়ে কারো হয়েছে, আর না আজ কারো হয়েছে যে কুরআনের মুকাবিলায় কোন মানব রচিত কিছু নিয়ে আসে।

কিছু লোক এ চ্যালেঞ্জের প্রকৃত ধরন উপলব্ধি না করার কারণে এ কথা বলে যে, কুরআন কেন, কোন ব্যক্তিরই রচনা পদ্ধতির ন্যায় অন্য কেউ কোন গদ্য বা পদ্য সাহিত্য রচনা করতে পারে না। হোমার, রুমী, শেক্সপীয়ার, গেটে, গালেব, রবীন্দ্রনাথ এবং ইকবাল সকলেই এ দিক দিয়ে অতুলনীয়। অবিকল তাদের মতো কোন কিছু রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবদানকারী প্রকৃতপক্ষে এ ভুল ধারণায় রয়েছে যে,

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِه ـ

এর অর্থ কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী অনুযায়ী এ ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করা। বস্তুতঃ এর অর্থ বর্ণনা ভংগীতে সাদৃশ্য নয়। বরঞ্চ অর্থ এই যে, এ মান ও মর্যাদার কোন গ্রন্থ রচনা করে আন যা শুধু আরবীতেই নয়, দুনিয়ার কোন ভাষায় সেসব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য হতে পারে যার ভিত্তিতে এক অলৌকিক বস্তু। সংক্ষেপে কতিপয়

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে যার ভিত্তিতে কুরআন পূর্বেও অলৌকিক ছিল এবং আজও রয়েছে।

১। যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, তার সাহিত্যের এক অতি উচ্চ ও মহান নমুনা এ কুরআন। গোটা কুরআনের মধ্যে কোন একটি শব্দ ও বাক্য এ মানের নিম্নে পাওয়া যাবে না। যে বিষয়বস্তুই আলোচনা করা হয়েছে তা সবচেয়ে উপযোগী ও মানানসই শব্দাবলী ও প্রকাশভঙ্গীতে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বিষয় বারবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকবার নতুন বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তির রুচিহীনতা কোথাও দেখা যায় না। আগাগোড়া সমগ্র গ্রন্থে শব্দমালার গাঁথুনি এমন যে মনে হয় যেন মুক্তার মালা নির্মাণ করা হয়েছে। বক্তব্য এতো প্রভাবশীল যে কোন ভাষাবিদ ব্যক্তি তা শুনে আনন্দে আপ্লুত না হয়ে পারে না। এমনকি অস্বীকারকারী ও বিরোধীর মনেও আনন্দ সঞ্চার করে। চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থ আরবী ভাষা সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা যার সমান ত দূরের কথা যার ধারে কাছেও এ ভাষার কোন কিতাব তার সাহিত্যিক মর্যাদা ও মূল্যসহ পৌঁছতে পারে না। তাই নয়, বরঞ্চ এ মহাগ্রন্থ আরবী ভাষার উপর এমন প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে যে, চৌদ্দটি শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ভাষার অলংকারের মান তাই রয়েছে যা এ গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অথচ এতো সুদীর্ঘ সময় ভাষা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে। দুনিয়ার কোন ভাষা এমন নেই যা বহু শতাব্দী যাবত বানান, বাক্য রচনা, প্রকাশভঙ্গী, ব্যাকরণ এবং শব্দমালা ব্যবহারে একই রকম রয়ে গেছে। কিন্তু শুধুমাত্র এ কুরআনেরই শক্তি যা আরবী ভাষাকে তার আপন স্থান থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। তার একটি শব্দও আজ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়নি। তার প্রতিটি বাগধারা আজও আরবী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। তার সাহিত্য এখনো আরবী ভাষার উচ্চমানের সাহিত্য। দুনিয়ার কোন ভাষায় কি কোন মানব রচিত গ্রন্থ এ মর্যাদার আছে?

২। এ দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র কিতাব যা মানব জাতির চিন্তাধারা, নৈতিকতা, সভ্যতা এবং জীবন পদ্ধতির উপর এতো ব্যাপক, গভীর ও সার্বিক প্রভাব বিস্তার করেছে যে দুনিয়ায় তার কোন নজীর পাওয়া যায় না। প্রথমে তার প্রভাব একটা জাতির মধ্যে বিপ্লব সংঘটিত করে। তারপর সে জাতি দুনিয়ার বৃহত্তর অংশের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করে। দ্বিতীয় এমন কোন গ্রন্থ নেই যা এমন বিপ্লবাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। এ গ্রন্থ শুধু কাগজের পৃষ্ঠায় লিখিত রয়ে যায়নি। বরঞ্চ বাস্তব জগতের তার এক একটি শব্দ, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার রূপ দিয়েছে এবং একটি স্থায়ী সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। দেড় হাজার বছর যাবত তার এ প্রভাব অব্যাহত রয়েছে এবং দিন দিন তার এ প্রভাব বিস্তার লাভ করছে।

৩। যে বিষয়বস্তু এ গ্রন্থ আলোচনা করে তা বহুমুখী ও ব্যাপক বিষয়, যার পরিধি শুরু থেকে আখের পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত। সে বিশ্বজগতের গুঢ়রহস্য তার সূচনা ও পরিণাম এবং তার আইন-শৃংখলা সম্পর্কে আলোকপাত করে। সে বলে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক কে, কি তাঁর গুণাবলী, কি তাঁর এখতিয়ার, প্রকৃত বিষয়ের গুঢ়রহস্য কি যার জন্যে তিনি এ সমগ্র ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন। সে এ বিশ্বে মানুষের মর্যাদা ও তার স্থান সঠিকভাবে বর্ণনা করে বলে যে এ তার স্বাভাবিক স্থান এবং এ তার জন্মগত অধিকার যা পরিবর্তন করার শক্তি তার নেই। সে বলে দেয়, এ স্থান ও মর্যাদার

দিক দিয়ে মানুষের চিন্তা ও কাজের সঠিক পথ কোনটি যা প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সংগতিশীল এবং ভ্রান্ত পথগুলো কি যা সত্যের সাথে সংঘর্ষশীল। যমীন ও আসমানের এক একটি বস্তু থেকে, বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার এক একটি দিক থেকে, মানুষের আপন সত্তা ও অস্তিত্ব থেকে এবং মানুষের সমগ্র ইতিহাস থেকে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সত্যপথের সঠিকতা এবং ভ্রান্ত পথের ভ্রান্তি সে প্রমাণ করেছে। সেই সাথে সে এ কথাও বলে যে, মানুষ ভুল পথে কিভাবে এবং কি কি কারণে পরিচালিত হয় এবং সঠিক পথ, যা হরহামেশা একই ছিল এবং একই থাকবে, কিভাবে জানা যেতে পারে এবং কিভাবে প্রত্যেক যুগে তা তাকে বলা হতে থাকে। সে সঠিক পথ চিহ্নিত করে নীরব থাকে না। বরঞ্চ ঐ পথে চলার জন্যে একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার চিত্র পেশ করে যার মধ্যে আকায়েদ, আখলাক, তাযকিয়ায়ে নফস (আত্মশুদ্ধি), এবাদত বন্দেগী, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রভৃতি মোটকথা, জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে একটা অত্যন্ত সামঞ্জস্যশীল নিয়ম-পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু সে বিশদভাবে বলে যে, এ সঠিক পথ অনুসরণের এবং ভুল পথে চলার কি পরিণাম এ দুনিয়াতে হবে। তারপর এ দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থাপনা শেষ হওয়ার পর পরবর্তী জগতে পরিনাম কি হবে তাও বলা হয়েছে। সে এ দুনিয়া শেষ হওয়ার এবং দ্বিতীয় জগত শুরু হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে। এ পরিবর্তনের সকল স্তর এক একটি করে সে বলে দেয়। অন্য জগতটির পূর্ণ চিত্র দৃষ্টি পথে তুলে ধর। তারপর সে বিশদভাবে বর্ণনা করে যে, মানুষ কিভাবে সেখানে এক দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে, কিভাবে সেখানে তার পার্থিব জীবনের কর্মকান্ডের হিসাব নেয়া হবে, কি কি বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কিভাবে অনস্বীকার্য অবস্থায় তার পূর্ণ 'নামায়ে আমাল' তার সামনে রেখে দেয়া হবে, সেসব প্রমাণ করার জন্যে কেমন বলিষ্ঠ সাক্ষ্য পেশ করা হবে, পুরস্কার ও শাস্তি লাভকারীগণ কেন তা লাভ করবে। পুরস্কার লাভকারীগণ কি ধরনের সম্পদ লাভ করবে এবং শাস্তি লাভকারীগণ কি কি আকারে তাদের কর্মফল ভোগ করবে। এ ব্যাপক বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ গ্রন্থে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা এর ভিত্তিতে নয় যে, এর প্রণেতা কিছু যুক্তি খাড়া করে কিছু ধারণা-অনুমানের এক প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, বরঞ্চ এর ভিত্তিতে যে, তার প্রণেতা প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবতার জ্ঞান রাখেন। তাঁর দৃষ্টি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। সকল বাস্তবতা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। সমগ্র বিশ্বজগত তাঁর সামনে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায়। মানুষ জাতির সূচনা থেকে তার শেষ পর্যন্তই নয়, বরঞ্চ শেষ হওয়ার পর তার দ্বিতীয় জীবন পর্যন্ত সব কিছু তিনি একনজরে দেখছেন এবং ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষের পথ নির্দেশনা করছেন। যেসব তথ্য তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে পেশ করেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটিও ভুল প্রমাণিত করা যায়নি। বিশ্বজগত ও মানুষ সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পেশ করেন, তা সকল ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ঘটনাপুঞ্জের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করে এবং প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় গবেষণার বুনিয়াদ হতে পারে। দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের সকল প্রান্তবর্তী সমস্যাবলীর সমাধান তাঁর কথায় পাওয়া যায় এবং সে সবের মধ্যে এমন যুক্তিসংগত সম্পর্ক রয়েছে যে, তার ভিত্তিতে এক পূর্ণাংগ, সংগতিশীল ও সার্বিক চিন্তার ক্ষেত্র তৈরী হয়। তারপর বাস্তব দিক দিয়ে যে পথ-নির্দেশনা তিনি জীবনের প্রতিটি দিকের জন্যে মানুষকে দিয়েছেন, তা শুধু অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং অতীব পবিত্রই নয়, বরঞ্চ দেড় হাজার বছর যাবত দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে অসংখ্য মানুষ কার্যত তা অনুসরণ করছে। অভিজ্ঞতায় তা সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এমন মর্যাদাসম্পন্ন কোন মানব রচিত গ্রন্থ দুনিয়ায়

বিদ্যমান আছে কি যা এ গ্রন্থের (কুরআনের) মুকাবিলায় উপস্থাপিত করা যেতে পারে?

৪। এ কিতাব সম্পূর্ণ একই সময়ে লিখিত আকারে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। বরঞ্চ কিছু প্রাথমিক হেদায়েতসহ এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করা হয়েছিল এবং তারপর তেইশ বছর পর্যন্ত সে আন্দোলন যে যে স্তর অতিক্রম করে চলতে থাকে সে সবের অবস্থা ও তার প্রয়োজন অনুসারে কিতাবের অংশগুলো আন্দোলনের নেতার মুখে কখনো দীর্ঘ ভাষণে, কখনো বিভিন্ন বাক্যের আকারে প্রকাশ লাভ করতে থাকে। অতঃপর এ মিশন সমাপ্তির পর বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ এ অংশগুলি পূর্ণাংগ আকারে সংকলিত করে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয় যা কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। আন্দোলনের অগ্রনায়কের বর্ণনায় এসব ভাষণ ও কথা তাঁর স্বরচিত নয়, বরঞ্চ খোদাওন্দে আলমের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে। যদি কেউ তাকে স্বয়ং সেই আন্দোলনের নেতার নিজস্ব রচিত গণ্য করে তাহলে সে দুনিয়ার ইতিহাস থেকে এমন কোন নজীর পেশ করুক যে, কোন মানুষ বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত এক বিরাট সামাজিক আন্দোলনের স্বয়ং নেতৃত্বদানকালে কখনো একজন ওয়ায়েজ ও নীতিনৈতিকতার শিক্ষক হিসাবে, কখনো একটি মজলুম জামায়াতের নেতা হিসাবে, কখনো একজন রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে, কখনো যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে, কখনো একজন বিজয়ী বীর হিসাবে, কখনো একজন শরীয়ত প্রণেতা ও আইন প্রণেতা হিসাবে, কখনো একজন বিচারক হিসাবে মোটকথা বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ে বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী হিসাবে যে বিভিন্ন ভাষণ দিয়েছেন অথবা যেসব বক্তব্য রেখেছেন, সে সবের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাংগ, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং চিন্তা ও কাজের এক সার্বিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার মধ্যে কোন বৈষম্য ও বৈপরীত্য পাওয়া যায় না। তার মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই কেন্দ্রীয় চিন্তাধারা কার্যকর আছে। সে ব্যক্তি প্রথম দিন থেকে তাঁর দাওয়াতের যে বুনিয়াদ বর্ণনা করেছেন, শেষ দিন পর্যন্ত সে বুনিয়াদের উপরেই তিনি বিশ্বাস ও কর্মের এমন এক সার্বিক ব্যবস্থা কায়েম করতে থাকেন যার প্রতিটি অংশ অন্যান্য অংশের সাথে পরিপূর্ণ সংগতিশীল। এ সবকিছু দেখার পর কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা মনে না করে পারেন না যে, আন্দোলনের সূচনায় আন্দোলনকারীর সামনে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র প্রকট ছিল। এমন কখনো হয়নি যে, মধ্যবর্তী কোন এক পর্যায়ে তাঁর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যা প্রথমে ছিল না অথবা পরে তা পরিবর্তন করতে হয়েছে। এমন মর্যাদাসম্পন্ন কোন মানুষ যদি কখনো কালাতিপাত করে থাকেন যিনি তাঁর আপন সৃজন শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাহলে তাকে চিহ্নিত করা হোক।

৫। যে নেতার মুখ থেকে এসব ভাষণ এবং কথা বেরুচ্ছিল তিনি হঠাৎ কোথাও থেকে আবির্ভূত হয়ে শুধু এসব শুনাবার জন্যে জনসমক্ষে আসতেন না এবং শুনাবার পর কোথাও উধাও হয়ে যেতেন না। তিনি এ আন্দোলনের পূর্বেও মানুষের সমাজে জীবন যাপন করেছেন এবং তারপরও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হরহামেশা ঐ সমাজেই বসবাস করেছেন। তাঁর আলাপ-আলোচনা ও ভাষণের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী সকলে ভালোভাবে জানতো। হাদীসগুলোতে তার একটা বিরাট অংশ এখনো সংরক্ষিত আছে যা পরবর্তীকালে আরবী ভাষাভাষী লোক স্বয়ং অনায়াসে দেখতে পারেন যে, সে নেতা বা পথপ্রদর্শকের কথার ধরণ কি ছিল। তাঁর আপন ভাষাভাষী, লোক সে সময়েও পরিষ্কার এ কথা মনে করছিল এবং আজও আরবী ভাষাভাষী লোক এ কথা মনে করে যে, এ কিতাবের ভাষা এবং রচনাশৈলী সেই নেতার (মুহাম্মদ (সা) ভাষা ও রচনাশৈলী থেকে

অনেক পৃথক। এমনকি যেখানে তাঁর ভাষণের মধ্যে ঐ কিতাবের কোন অংশ তিনি আবৃত্তি করেন, তখন উভয়ের ভাষায় পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রশ্ন এই যে, দুনিয়ার কোন ব্যক্তি কখনো কি এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে বা হতে পারে যে, বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক ধরন ও স্টাইলে কথা বলার লৌকিকতা দেখাতে থাকবে এবং এ গোমর কখনো ফাঁক হবে না যে, এ দু'ধরনের কথা একই ব্যক্তির? অবশ্যি সমায়িকভাবে কিছু সময়ের জন্যে এ ধরনের কৃত্রিমতা প্রদর্শনে সাফল্য লাভ সম্ভব। কিন্তু ক্রমাগত তেইশ বছর এমনটি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

৬। এ মহান নেতা আন্দোলন পরিচালনার সময়ে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকেন। কখনো দীর্ঘকাল যাবত তিনি আপন প্রতিবেশী এবং স্বগোত্রীয়দের পক্ষ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ, অপমান ও জুলুম-নিষ্পেষণের শিকার হয়েছেন। কখনো তাঁর সঙ্গী সাথীদের উপর এমন নির্যাতন চালানো হয়েছে যে, তাঁরা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো দুশমন তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। কখনো তাঁকেও দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। কখনো তাঁকে চরম আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কখনো যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে যাতে জয়-পরাজয় উভয়ই হয়েছে। কখনো তিনি দুশমনের উপরে বিজয়ী হয়েছেন এবং যারা এক সময়ে তাঁর উপর চরম জুলুম করেছে তারা নতশির হয়েছে। কখনো তিনি প্রভুত্ব কর্তৃত্ব লাভ করেছেন যার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়ে থাকে। এ যাবতীয় পরিস্থিতিতে মানুষের ভাবাবেগ একই রকম থাকে না। ঐ নেতা এ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে যখন কোন কথা বলেছেন, তখন তার মধ্যে সেই ভাবাবেগ প্রকট হয়ে পড়েছে যা এরূপ অবস্থায় মানুষের হয়ে থাকে। কিন্তু খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহীর ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা শুনা গেছে তা একেবারে মানবীয় ভাবাবেগ শূন্য ছিল বলে দেখা গেছে এবং আজও তাই দেখা যায়। কোন বিরাট সমালোচক কুরআনের কোন একটি স্থানেও অংগুলি নির্দেশ করে এ কথা বলতে পারবে না যে সেখানে মানবীয় ভাবাবেগ কার্যকর দেখা যায়।

৭। যে ব্যাপক ও সর্বব্যাপী জ্ঞান এ কিতাবে পাওয়া যায় তা সে সময়ের আরব, রোম, গ্রীস ও ইরান ত দূরের কথা এ বিংশ শতাব্দীর মহাজ্ঞানী ও পন্ডিতগণের কারো মধ্যেই তা পাওয়া যায় না। আজ অবস্থা এই যে, দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের কোন একটি শাখা অধ্যয়নে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়ার পর জানতে পারে যে, সে জ্ঞানের শাখার সর্বশেষ সমস্যাগুলো কি এবং তারপর যখন সে গভীর দৃষ্টিতে কুরআনকে দেখে, তখন সে জানতে পারে ঐসব সমস্যার একটি সুস্পষ্ট জবাব এর মধ্যে রয়েছে। এ ব্যাপারটি কোন এক বিশেষ জ্ঞান পর্যন্ত সীমিত নয়। বরঞ্চ ঐ সকল জ্ঞানের জন্যে সঠিকভাবে প্রযোজ্য যা বিশ্বজগত ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। এ কথা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে আরব মরুর এক নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে এমন ব্যাপক জ্ঞান রাখতেন এবং তিনি প্রত্যেক মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব স্থির করে নিয়েছিলেন?

কুরআন অলৌকিক হওয়ার যদিও আরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে, কিন্তু শুধু এ ক'টি কারণ সম্পর্কেই যদি মানুষ চিন্তা গবেষণা করে তাহলে সে জানতে পারবে যে, কুরআনের অলৌকিক হওয়াটা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যতোটা সুস্পষ্ট ছিল, তার চেয়ে অনেক গুণে এখন বেশী সুস্পষ্ট এবং ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আরও সুস্পষ্ট হতে থাকবে।(৬৭)

সমগ্র কুরআন একই সময়ে নাযিল কেন হয়নি?

উপরে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তার থেকে যদিও কুরআনের কালামে ইলাহি হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কিন্তু কুরাইশ কাফেরগণ তাকে মানব রচিত গ্রন্থ গণ্য করার জন্যে বারবার যে যুক্তির দোহাই দিত তা এই যে, যদি এ খোদার কালাম হতো তাহলে একবারেই সম্পূর্ণ নাযিল করে দেয়া হতো। মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে আমাদের সামনে তা পেশ করার অর্থ এই যে, তা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে রচনা করা হতো। কুরআনে তাদের এ অভিযোগ উধৃত করে অথবা তার প্রতি ইঙ্গিত করে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলা হয়েছে, কেন ক্রমশঃ নাযিল করা হয়েছে এবং ক্রমশঃ নাযিল করার কি গুঢ় রহস্য।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً ـ لاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ـ (الفرقان ٣٢-٣٣)

অস্বীকারকারীগণ বলে, এ ব্যক্তির উপর সমগ্র কুরআন একই সময়ে কেন নাযিল করা হয়নি? হ্যাঁ এমনটি এ জন্যে করা হয়েছে যে, (হে নবী) এটা ভাল করে তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিই এবং এ উদ্দেশ্যে আমরা তা বিশেষ ক্রমবিন্যাসসহকারে পৃথক পৃথক অংশের আকার দিয়েছি। আর (এর মধ্যে বিবেচ্য বিষয় ছিল) এই যে, যদি কখনো তারা তোমার কাছে কোন অদ্ভুত কথা বা প্রশ্ন করেছে তখন তার ঠিক ঠিক জবাব যথাসময়ে তোমাকে বলে দিয়েছি এবং উৎকৃষ্ট পন্থায় কথা পরিস্কার করে দিয়েছি। (ফুরকান ঃ ৩২-৩৩)

এ ছিল মক্কার কাফেরদের বড়ো মনঃপুত অভিযোগ। এটাকে তারা খুব শক্তিশালী অভিযোগ মনে করে ঘন ঘন তার পুনরাবৃত্তি করছিল। কিন্তু কুরআনে এর যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে অভিযোগ একেবারে খন্ডন করা হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বা অভিযোগের অর্থ ছিল এই যে, যদি এ ব্যক্তি স্বয়ং চিন্তা-ভাবনা করে অথবা কাউকে জিজ্ঞেস করে এবং বই-পুস্তক থেকে নকল করে করে এসব বিষয় উপস্থাপিত না করতো, বরঞ্চ প্রকৃত পক্ষেই যদি এ খোদার কিতাব হতো, তাহলে একত্রে একই সময়ে কেন আনা হলো না? খোদা ত জানেন পুরো বিষয়টি কি যা তিনি জানাতে চান। তাঁর নাযিল করার ইচ্ছা থাকলে তো সবকিছু এক সাথেই নাযিল করতেন। এই যে, চিন্তা-ভাবনা করে এখন কিছু এবং কখনো কিছু বলা হচ্ছে, তা এ কথারই সুস্পষ্ট আলামত যে, অহী উপর থেকে আসে না। বরঞ্চ এখানের কোথাও থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে অথবা মনগড়াভাবে তৈরী করে আনা হচ্ছে।

এর জবাবে কুরআনকে ক্রমশঃ কিছু কিছু করে নাযিল করার অনেক তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছেঃ

(১) এমনটি এ জন্যে করা হচ্ছে যে, তা যেন প্রতিটি শব্দসহ স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হয়ে যায়। কারণ তার প্রচার ও প্রসার লিখিত আকারে নয়, বরঞ্চ একজন নিরক্ষর নবীর মাধ্যমে নিরক্ষর শ্রোতাদের মধ্যে মৌখিক বক্তৃতার আকারে করা হচ্ছে।

(২) যেন তার শিক্ষা ভালোভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে থেমে থেমে অল্প অল্প করে কথা বলা এবং একই কথাকে বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করা অধিকতর ফলপ্রদ।

(৩) যাতে তার বলে দেয়া জীবন পদ্ধতির প্রতি মন নিবিষ্ট হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে নির্দেশাবলী ও পথ নির্দেশনা ক্রমশঃ নাযিল করাই অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক। অন্যথায় যদি যাবতীয় আইন-কানুন এবং গোটা জীবন ব্যবস্থা একই সাথে বয়ান করে তা কায়েম করার আদেশ দেয়া হয় তাহলে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। উপরন্তু এও এক বাস্তবতা যে, প্রতিটি আদেশ যদি যথাসময়ে করা হয়, তাহলে তার বিজ্ঞতা ও প্রাণশক্তি ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে যাবতীয় নির্দেশ দফাওয়ারী সংকলিত করে একই সময়ে দিলে তা উপলব্ধি করা যায় না।

(৪) যাতে করে ইসলামী আন্দোলনের সময়ে, যখন হক ও বাতিলের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ চলতে থাকে, নবী ও তাঁর অনুসারীগণের মধ্যে সাহস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। এ জন্যে একবার লম্বা-চওড়া হেদায়েতনামা পাঠিয়ে তাঁদেরকে সারা দুনিয়ার বিরোধিতার মোকাবিলা করার জন্যে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে খোদার পক্ষ থেকে বারবার মাঝে মধ্যে এবং সময়মত পয়গাম আসতে থাকলে তা অধিকতর ফলপ্রদ হয়। এ দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ মনে করে যে, যে খোদা তাদেরকে এ কাজের জন্যে হুকুম দিয়েছেন তিনি তাঁদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে পথ দেখান এবং প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় সম্বোধন করে তাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক সতেজ করেন। এতে উৎসাহ-উদ্যম বাড়ে এবং সংকল্প সুদৃঢ় হয়। প্রথম অবস্থায় মানুষ মনে করে যে, ব্যস সে এবং তার চার ধারে শুধু ঝড়-ঝঞ্ঝা।

অবশেষে নাযিলের ব্যাপারে ক্রমিক ধারা অবলম্বনের আর একটি বিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মজিদের শানে নুযুল-এ নয় যে, আল্লাহতায়ালা হেদায়েত সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনা করতে চান এবং তার প্রচারের জন্যে তিনি নবীকে এজেন্ট বানিয়েছেন। কথা যদি তাই হতো তাহলে সমগ্র গ্রন্থ রচনা করে একবারেই এজেন্টের হাতে তুলে দেয়ার দাবী ন্যায়সঙ্গত হতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার শানে নুযুল এই যে, আল্লাহতায়লা কুফর, জাহেলিয়াত এবং ফিসকের মোকাবিলায় ঈমান, ইসলাম, ইতায়াত (আনুগত্য) ও তাকওয়ার এক আন্দোলন সৃষ্টি করতে চান এবং এর জন্যে তিনি একজন নবীকে আহ্বায়ক ও নেতা হিসাবে আবির্ভূত করেছেন। এ আন্দোলন চলাকালে, একদিকে নেতা ও তাঁর অনুসারীগণকে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা ও হেদায়েত দান তিনি তাঁর দায়িত্বে নিয়েছেন এবং অপরদিকে এ দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন যে, বিরোধীরা কোন ওজর-আপত্তি, কোন সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলে তিনি তা পরিস্কার করে দিবেন। কোন কথার কদর্থ করলে তার সঠিক ব্যাখ্যা করবেন। এ ধরনের বিভিন্ন প্রয়োজনে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব ভাষণ নাযিল হতে থাকে, তার সমষ্টির নাম কুরআন। আর এ আইন গ্রন্থ অথবা চরিত্র ও দর্শন গ্রন্থ নয় বরঞ্চ আন্দোলনের গ্রন্থ। তার অস্তিত্ব লাভের সঠিক স্বাভাবিক পন্থা এই যে, আন্দোলনের সূচনা মুহূর্ত থেকে শুরু করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দোলন যেমন অগ্রসর হতে থাকবে, এ কুরআনও সাথে সাথে সময় ও প্রয়োজন মতো নাযিল হতে থাকবে।(৬৮)

وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ لا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

-قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ - (النحل ١٠١-١٠٢)

-যখন আমরা একটি আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাযিল করি এবং আল্লাহ ভালো জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন, তখন এ লোকেরা বলে, 'তুমি এ কুরআন নিজেই রচনা কর।' আসল কথা এই যে, এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। এদেরকে বল, রুহুল কুদুস সঠিকভাবে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে ক্রমশঃ এ নাযিল করেছেন যাতে ঈমান আনয়নকারীদের ঈমান পাকাপোক্ত করতে পারেন এবং আনুগত্যকারীদেরকে জীবনের বিষয়াদিতে সঠিক পথ দেখান এবং তাদেরকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেন। (নহল ঃ ১০১-১০২)

এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করার অর্থ একটি হুকুমের পর দ্বিতীয় হুকুম পাঠানোও হতে পারে। কারণ কুরআনের হুকুমগুলি ক্রমশঃ নাযিল হয়েছে এবং বারবার একই ব্যাপারে কয়েক বছরের ব্যবধানে পরপর দু'টি তিনটি হুকুম পাঠানো হয়েছে। যেমন মদের ব্যাপার অথবা ব্যাভিচারের শাস্তির ব্যাপার। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। এ জন্যে যে সূরা নহল মক্কী যুগে নাযিল হয়েছে। যতদূর আমাদের জানা আছে, সে যুগে ক্রমিক ধারার হুকুম নাযিলের কোন দৃষ্টান্ত সামনে আসেনি। এ জন্যে আমরা এখানে, ''এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিলের' অর্থ এই মনে করবো যে, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে কখনো একটি বিষয়কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝানো হয়েছে এবং কখনো ঐ বিষয়টি বুঝাবার জন্যে অন্য দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। আবার কখনো ঐ ব্যাপারে দ্বিতীয় দিকটি সামনে আনা হয়েছে। একই বিষয়ের জন্যে কখনো এক যুক্তি পেশ করা হয়েছে এবং কখনো অন্য যুক্তি। একই কাহিনী বারবার বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকবার তা অন্য শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি ব্যাপারের কখনো কোন একটি দিক পেশ করা হয়েছে এবং কখনো সে ব্যাপারের দ্বিতীয় দিক পেশ করা হয়েছে। একটি কথা এক সময় সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং অন্য সময়ে বিস্তারিত। এ জিনিসই ছিল যাকে মক্কার কাফেরগণ এ কথার প্রমাণ গণ্য করতো যে, নবী মুহাম্মদ (সা) মায়াযাল্লাহ, এ কুরআন স্বয়ং রচনা করেছেন। তাদের যুক্তি এই ছিল যে, এ বাণীর উৎস যদি ইলমে ইলাহী হতো, তাহলে সব কথা একসাথে বলে দেয়া হতো। আল্লাহ কি মানুষের মতো জ্ঞানের দিক দিয়ে এতোটা কাঁচা যে চিন্তা করে করে কথা বলবেন? ক্রমশঃ তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন এবং একটি কথা ঠিকমতো কাজে লাগলো না মনে হলে অন্য উপায়ে কথা বলবেন? আসলে এসব তো হচ্ছে মানবীয় জ্ঞানের দুর্বলতা যা তোমার কথায় দেখা যাচ্ছে।

এর জবাবে প্রথমে বলা হয়েছিল যে, এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রুহুল কুদুস' নিয়ে আসছেন। 'রুহুল কুদুস' এর শাব্দিক অর্থ পাক রূহ। অথবা পবিত্রতার রূহ। পরিভাষা হিসাবে এ উপাধি হযরত জিব্রিলকে (আঃ) দেয়া হয়েছে। অন্য জায়গায় (সূরা শুয়ারা) তাঁর জন্যে 'রুহুল আমিন' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমানতদার রূহ। এখানে অহী আনয়নকারী ফেরেশতার নাম নেয়ার পরিবর্তে তাঁর উপাধি ব্যবহারের দ্বারা শ্রোতাদেরকে এ সত্যটির প্রতি সজাগ করে দেয়া হচ্ছে যে, এ বাণী এমন এক 'রূহ' নিয়ে আসছেন যিনি মানবীয় দুর্বলতা ও দোষক্রটির উর্ধে। তিনি খেয়ানতকারী নন যে, আল্লাহ

কিছু পাঠালেন এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু অদল-বদল করে অন্য কিছু বানিয়ে দিলেন। তিনি মিথ্যাবাদী অথবা মিথ্যা অপবাদকারী নন যে স্বয়ং কিছু রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেবেন। তিনি কোন অসৎ বা অর্থলিপ্সু ব্যক্তি নন যে, নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে ধোঁকা প্রবঞ্চনা করবেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে একটি মহান ও পবিত্র আত্মা যা আল্লাহর বাণী পূর্ণ আমানতদারীর সাথে পৌঁছিয়ে দেন।

তারপর বলা হয় যে, তাঁর ক্রমশঃ সে বাণী নিয়ে আসার এবং একই সাথে সবটুকু নিয়ে না আসার কারণ এ নয় যে, আল্লাহতায়ালার জ্ঞানে কোন ক্রটি আছে যেমন তোমরা তোমাদের অজ্ঞতার কারণে মনে করে রেখেছ, বরঞ্চ তার কারণ এই যে, মানুষের উপলব্ধি শক্তি ও ধারণশক্তিতে ক্রটি আছে যে কারণে সে একই সময়ে সকল কথা বুঝতে পারে না, আর এক সময়ে সব কথা বুঝলে তা মনে রাখতে পারে না। এ জন্যে আল্লাহতায়ালার হিকমত বা বিজ্ঞতা এ কথার দাবী করে যে, রুহুল কুদুস (জিব্রিল) এ বাণী অল্প অল্প করে নিয়ে আসবেন। কখনো সংক্ষেপে এবং কখনো বিস্তারিতভাবে বলবে। কখনো এক পদ্ধতিতে কথা বুঝিয়ে দেবে এবং কখনো অন্য পদ্ধতিতে। কখনো এক ধরনের বর্ণনাভঙ্গী অবলম্বন করবে, কখনো অন্য ধরনের। একই কথাকে বারবার বিভিন্ন পন্থায় হৃদয়ে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করবে যাতে বিভিন্ন যোগ্যতা ও শক্তিসম্পন্ন সত্য সন্ধানীগণ ঈমান আনতে পারে এবং ঈমান আনার পর জ্ঞান, বিশ্বাস ও বোধশক্তি মজবুত হয়।

কুরআন ক্রমান্বয়ে অবতরণের দ্বিতীয় তাৎপর্য এই বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান আনার পর আনুগত্যের পথে চলছে, ইসলামী দাওয়াতের কাজে এবং জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় যে ধরনের হেদায়েত তাদের প্রয়োজন হয় তা যথাসময়ে দেয়া হয়। এ কথা ঠিক যে, সময়ের পূর্বে এসব হেদায়েত পাঠানো সংগত হতে পারে না, আর না একই সময় সকল হেদায়েত প্রদান ফলপ্রসূ হতে পারে।

তৃতীয় তাৎপর্য এই যে, অনুগত লোকেরা যেসব প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং যেভাবে তাদেরকে তিক্ত করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করা হচ্ছে, ইসলামী দাওয়াতের পথে বিপদের যে পাহাড় খাড়া করা হচ্ছে, তার কারণে তারা বারবার এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী হচ্ছে যে, সুসংবাদ দানের মাধ্যমে তাদের সাহসবল বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং তাদেরকে শেষ পর্যায়ের সাফল্যের নিশ্চয়তা দান করা হোক যাতে তারা আশান্বিত থাকে এবং মনভাঙ্গা হয়ে না পড়ে।(৬৯)

এ অভিযোগ যে অন্য লোক কুরআন রচনা করে নবীকে দেয়

মক্কায় কাফেরগণ পূর্ববর্তী অভিযোগের একেবারে বিপরীত এক অন্য অভিযোগ এ ধরনের করতো যে, এ কুরআন রচনার কাজে অন্য লোক নবীকে সাহায্য করছে। পুরাতনকালের লিখিত কাহিনী নকল করিয়ে নিয়ে তিনি তাদেরকে শুনাচ্ছেন। আর এ কাজ রাতদিন করা হচ্ছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ نِ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا - وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً

وَّ اَصِيْلاً - قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (الفرقان - ٤ تا ٦)

যারা (নবীর) কথা মানতে অস্বীকার করেছে, তারা বলে, এ কুরআন এক মনগড়া বস্তু যা এ ব্যক্তি নিজে তৈরী করেছে এবং অন্য কিছু লোক এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। তারা বড়ো জুলুম ও ভয়ানক মিথ্যাবাদিতার পর্যায়ে নেমে এসেছে। তারা বলে এ প্রাচীন লোকের লিখিত বিষয় যা এ ব্যক্তি নকল করান এবং তা সকাল-সন্ধ্যা শুনানো হয়। (হে মুহাম্মদ (সা)! তাদেরকে বল যে, একে তিনি নাযিল করেছেন যিনি যমীন ও আসমানের রহস্য অবগত আছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তিনি বড়ো ক্ষমাকারী এবং দয়াশীল। (ফুরকান ঃ ৪-৬)

তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এ ব্যক্তি তো স্বয়ং নিরক্ষর ছিলেন। পড়াশুনা করে নতুন নতুন জ্ঞানলাভ করতে পারেন না, প্রথমে তিনি তো কিছুই শিক্ষা লাভ করেননি। আজ তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা বেরুচ্ছে, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার কোন একটিও তাঁর জানা ছিল না। এখন এসব জ্ঞান কোথা থেকে আসছে? অবশ্যই এ সবের উৎস কতিপয় পূর্ববর্তী লোকের গ্রন্থাদি হবে যার উধৃতি রাতের বেলায় তরজমা ও নকল করানো হয়। সেগুলো তিনি কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শুনে নেন। তারপর তা মুখস্থ করে আমাদেরকে শুনান। কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সম্পর্কে তারা কতিপয় লোকের নামও বলে যারা ছিল শিক্ষিত এবং মক্কার অধিবাসী। তাদের একজনের নাম ছিল আদ্দাস, যে হুয়ায়তিব বিন আব্দুল ওয্যার মুক্ত করা দাস ছিল। দ্বিতীয় ছিল লায়াব, যে আলা বিন আল হাদরামীর মুক্ত করা দাস ছিল। তৃতীয় ছিল জাবর, যে আমের বিন রাবিয়ার মুক্ত করা দাস।

দৃশ্যতঃ এ বড়ো অর্থবহ অভিযোগ মনে হয়। অহীর দাবী খন্ডন করার জন্যে নবীর জ্ঞানের উৎস চিহ্নিত করে দেয়া থেকে অর্থবহ অভিযোগ আর কি হতে পারে? কিন্তু মানুষ প্রথমেই এ কথা ভেবে অবাক হয় যে, এমন বিরাট অভিযোগের জবাবে কোন যুক্তি পেশ করার পরিবর্তে শুধু এতটুকু বলেই প্রসঙ্গ শেষ করে দেয়া হচ্ছে যে, "তোমরা সত্যতার উপর আঘাত করছ, সুস্পষ্ট বেইনসাফীর কথা বলছ, মিথ্যার ঝড় প্রবাহিত করছ এ ত এমন খোদার বাণী যিনি যমীন ও আসমানের রহস্য জানেন।"

প্রশ্ন এই যে, সেই চরম প্রতিবন্ধকতার পরিবেশে যখন এমন জোরদার অভিযোগ পেশ করা হলো, তখন তা এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কেন খন্ডন করা হলো? বিরোধীরাই বা কেন বিস্তারিত জবাব চাইল না? তারা কেন এ কথা বললো না যে, "আমাদের অভিযোগ নিছক জুলুম এবং মিথ্যা বলে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? তারপর নতুন নতুন মুসলমান যারা হচ্ছে তাদের মনে এ অভিযোগের পর কোন সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে না কেন?

মক্কার যে পরিবেশে এ অভিযোগ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা করলে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। প্রথম কথা এই যে, মক্কার যেসব জালেম সর্দার সে সময়ে এক একজন মুসলমানের উপর দৈহিক নির্যাতন চালাতো এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতো তাদের জন্যে এ কাজ মোটেই কঠিন ছিল না যে, তাদের বিরুদ্ধে তারা এ অভিযোগ করতো যে তারা এসব প্রাচীন কেতাবের তরজমা করে নবী মুহাম্মদকে (সা) শুনাতো, তাদের বাড়ীঘর হঠাৎ ঘেরাও করে সেসব মাল-মশলা বের করে আনতে পারতো

এবং জনগণের সামনে এনে হাজির করতে পারতো। এমনকি ঠিক তরজমা করে নবীকে শিক্ষা দেয়ার সময়েও তারা ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু তারা একদিনের জন্যেও এ কাজ করে তাদের অভিযোগের প্রমাণ পেশ করেনি। তারপর এ প্রসঙ্গে যেসব লোকের নাম তারা করতো তারা তো মক্কা শহরেরই অধিবাসী ছিল। তাদের যোগ্যতাও কারো অজানা ছিল না। কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারতো না যে, কুরআন যে মানের গ্রন্থ, তা রচনা করার জন্যে এসব লোক কোন পর্যায়ের কোন যোগ্যতা রাখতো।

উপরন্তু এসব লোক মক্কা শহরেরই কতিপয় সর্দারের মুক্ত করা গোলাম ছিল। আরবের উপজাতীয় জীবনে একজন গোলাম স্বাধীন হওয়ার পরও তার প্রাক্তন প্রভুর পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত বাঁচতে পারতো না। এখন এ কথা কি করে কল্পনা করা যায় যে, এসব দুর্বল লোক তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরাগভাজন হয়ে জুলুম-নির্যাতনের সে ভয়াবহ পরিবেশে নবী মুহাম্মদের (সা) সাথে (মায়াযাল্লাহ) নবুওয়তের এ ষড়যন্ত্রে শরীক হওয়ার সাহস করতে পারতো।

এর চেয়েও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপরে বর্ণিত তিন ব্যক্তি নবী মুহাম্মদের (সা) উপর ঈমান এনেছিলেন এবং নবীর প্রতি সেই শ্রদ্ধাই পোষণ করতেন যা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম করতেন। এ ঈমান আনার কারণে তারাও অন্যান্য সাহাবীদের সাথে নির্যাতন নিষ্পেষনের শিকার হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় কে এ কথা বিশ্বাস করতে পারতো যে যারা স্বয়ং কুরআন রচনায় অংশগ্রহণ করতো তারা সে কুরআনের উপর এবং কুরআন আনয়নকারীর উপর ঈমান আনবে এবং সে অপরাধে নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করবে।(৭০)

কাফেরদের হঠকারিতার এক আজব নমুনা

তাদের প্রত্যেক অভিযোগের যুক্তিসংগত জবাব পাওয়ার পর কাফেরদের হঠকারিতা এক অভিনব রূপ ধারণ করে । তা এই যে, তারা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমরা নবী বলে মেনে নিতাম যদি তিনি এমন ভাষায়, অনর্গল কুরআন শুনাতেন যে ভাষা তাঁর জানা নেই। তার জবাবে বলা হলোঃ-

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ط ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ط قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ط وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ - (حم السجده ٤٤)

-যদি আমরা এক আজমী কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তাহলে এসব লোক বলতো, কেন এর আয়াতগুলো পরিষ্কার করে বয়ান করা হয়নি? কি আজব কথা যে, কথা হলো আজমী ভাষায়, আর বলা হচ্ছে আরবী ভাষা-ভাষীদেরকে, এদের বলে দাও, এ কুরআন ঈমান আনয়নকারীদের জন্যে ত হেদায়েত এবং আরোগ্য। কিন্তু যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্যে এ কানের ছিপি এবং চোখের পট্টি। তাদের অবস্থা এমন যে, যেন তাদেরকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। (হা-মিম আস-সাজদা ঃ ৪৪)

হঠকারিতার এ এক নমুনা যার দ্বারা নবী মুহাম্মদের (সা) মুকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফেরগণ বলতো, মুহাম্মদ (সা) একজন আরব। আরবী তার মাতৃভাষা। তিনি যদি আরবীতে কুরআন পেশ করেন তাহলে কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি তা নিজে রচনা করেননি, বরঞ্চ খোদার পক্ষ থেকে নাযিল করা? তাঁর এ বাণী খোদার নাযিল করা বাণী হিসাবে তখনই মেনে

নেয়া যেতে পারে, যদি তিনি এমন ভাষায় অনর্গল ভাষণ দেয়া শুরু করতেন, যে ভাষা তিনি জানতেন না। যেমন ফার্সী অথবা রোমীয় অথবা গ্রীক। এর জবাবে আল্লাহ বলেন, এখন তাদের আপন ভাষায় কুরআন পাঠানো হয়েছে যা তারা বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের অভিযোগ এই যে, একজন আরবের মাধ্যমে আরবদের জন্যে আরবী ভাষায় এ কুরআন কেন নাযিল করা হলো, কিন্তু অন্য কোন ভাষায় যদিও পাঠানো হতো তাহলে তারা আপত্তি তুলতো, বাঃ মজার ব্যাপার, আরব জাতির মধ্যে একজন আরবকে রসূল বানিয়ে পাঠানো হচ্ছে কিন্তু বাণী তার উপর এমন ভাষায় নাযিল করা হয়েছে যা না রসূল নিজে বুঝেন আর না জাতি।(৭১)

তাদের এ অর্থহীন প্রতিবাদ খন্ডন করাই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরঞ্চ তাদেরকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে তিনি তোমাদের নিজস্ব ভাষায় এমন এক কিতাব নাযিল করেছেন যা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পার এবং সত্য ও মিথ্যা কি তাও জানতে পার।

تَنْزِيْلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ - كِتبٌ فُصِّلَتْ ايتُه قُرْانًا عربِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - بشيْرًا وَّ نَذِيْرًا ج فَاَعْرض اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَيَسْمَعُوْنَ - (حم السجده ٢ تا ٤)

এ রহমান ও রহীম খোদার পক্ষ থেকে নাযিল করা। এ এমন এক কিতাব যার আয়াত সুস্পষ্ট করে বয়ান করা হয়েছে। আরবী ভাষার কুরআন তাদের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে। এ সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা কথা শুনতেই চায় না। (হামীম সাজদা ঃ ২ - ৪)

এখানে প্রথমে একথা বলা হয় হয়েছে যে, এ বাণী খোদার পক্ষ থেকে নাযিল হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা যতোদিন ইচ্ছা বকবক করতে থাক যে এ মুহাম্মদ (সা) স্বয়ং রচনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ বাণী রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত। উপরন্তু এ কথা বলে শ্রোতাদের সাবধান করে দেয়া হয়-তোমরা যদি এ বাণী শুনার পর ভ্রুকুটি কর, তাহলে নবী মুহাম্মদের (সা) বিরুদ্ধে করা হবে না, বরঞ্চ, খোদার বিরুদ্ধেই করা হবে। যদি একে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে একজন মানুষের নয় বরঞ্চ খোদার কথাই প্রত্যাখ্যান করছ। আর যদি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে একজন মানুষের থেকে নয় খোদা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

দ্বিতীয় কথা এ বলা হয়েছে যে, এর নাযিলকারী সেই খোদা যিনি তাঁর সৃষ্টির উপরে বড় মেহেরবান। নাযিলকারী খোদার অন্যান্য গুণাবলীর পরিবর্তে রহমতের গুণের উল্লেখ এ সত্যের দিকে ইংগিত করে যে, তিনি তাঁর দয়া-অনুগ্রহ গুণের দাবী পূরণের জন্যে এ

বাণী নাযিল করেছেন। এর দ্বারা শ্রোতাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয় যে, এ বাণী থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিংবা যদি তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান করে অথবা তাঁর প্রতি ভ্রুকুটি করে, তাহলে সে নিজের প্রতিই শত্রুতা করছে। এ ত এক বিরাট দান যা খোদা সরাসরি তাঁর রহমতের ভিত্তিতে মানুষের হেদায়েত ও কল্যাণের জন্যে নাযিল করেছেন। খোদা যদি মানুষের প্রতি বিমুখ হতেন, তাহলে তাকে আঁধারে ঘুরে বেড়াবার জন্যে ছেড়ে দিতেন এবং তার দেখার বিষয় ছিল না যে সে মানুষ কোথায় কোন গহ্বরে গিয়ে পতিত হচ্ছে। কিন্তু এ তার দয়া অনুগ্রহ যে, সৃষ্টি এবং জীবিকা দানের সাথে তার জীবনকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে জ্ঞানের আলো প্রদর্শন করাও তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করেন। আর এর ভিত্তিতেই এ বাণী তিনি তাঁর এক বান্দাহর উপর নাযিল করছেন। এখন সে ব্যক্তি অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ এবং নিজে নিজের দুশমন আর কে হতে পারে যে, এ রহমতের সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধেই লড়াই করতে অগ্রসর হয়?

তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, এ কিতাবের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট করে বয়ান করা হয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে কোন কথা এমন অবোধগম্য ও জটিল নেই যে, কেউ তা গ্রহণ করতে এই বলে আপত্তি জানাবে যে, এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু তার মাথায় ঢুকছে না। এর মধ্যে ত পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সত্য কি এবং মিথ্যা কি। সঠিক আকীদাহ বিশ্বাস কোন্‌টি এবং ভ্রান্ত কোন্‌টি। সৎ চরিত্র কোন্‌টি এবং অসৎ কোন্‌টি। নেকী বা সৎকর্ম কি এবং অসৎ কর্ম কি। কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে মানুষের কল্যাণ হবে এবং কোন্ পন্থা অবলম্বনে অকল্যাণ হবে। এমন সুস্পষ্ট হেদায়েত যদি কেউ প্রত্যাখ্যান করে অথবা তার প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন না করে, তাহলে সে কোন ওজর দেখাতে পারে না। তার পরিষ্কার অর্থ এই যে সে ভুলের মধ্যেই থাকতে চায়।

চতুর্থ কথা এই যে, এ হলো আরবী ভাষার কুরআন। অর্থাৎ যদি এ কুরআন অন্য কোন ভাষায় অবতীর্ণ হলে আরববাসী এ ওজর পেশ করতে পারতো যে, খোদা যে ভাষায় এ কিতাব পাঠিয়েছেন, সে ভাষায় ত তারা অজ্ঞ। কিন্তু এত তাদের নিজেদেরই ভাষা একে না বুঝার বাহানা তারা করতে পারতো না।

পঞ্চম কথা এ বলা হয়েছে যে, এ কিতাব তাদের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে। অর্থাৎ এর থেকে জ্ঞানবান লোকই উপকৃত হতে পারে। অজ্ঞ লোকদের জন্যে তা তেমনি অকেজো যেমন একটি মূল্যবান রত্ন সেই ব্যক্তির জন্যে অকেজো যে পাথর ও রত্নের পার্থক্য জানে না।

ষষ্ঠ কথা এই যে, এ কিতাব সুসংবাদদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ এমন নয় যে, এ নিছক একটি কল্পনা, একটি দর্শন এবং একটি রচনার নুমনা পেশ করছে যা মানা না মানায় কিছু যায় আসে না। বরঞ্চ ও প্রকাশ্যে সমগ্র দুনিয়াকে হুশিয়ার করে দিচ্ছে যে, একে মেনে নিলে পরিণাম হবে বড়ো চমৎকার এবং না মানলে পরিণাম হবে অতীব ভয়াবহ। এমন কিতাবকে একজন নির্বোধই প্রত্যাখ্যান করতে পারে।(৭২)

কুরআনের দাওয়াতে বাধাদানের জন্যে কাফেরদের কৌশল

উপরে বর্ণিত কলাকৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের শেষ কৌশল এই ছিল যে, তারা প্রকাশ্য হঠকারিতায় নেমে পড়বে। কুরআনের দাওয়াতে বলপূর্বক বাধাদানের চেষ্টা করবে। কুরআন যখন শুনাতে থাকা হবে তখন ভয়ানক হট্টগোল সৃষ্টি করা হবে এবং চারদিক থেকে বিদ্রুপবান নিক্ষেপ করা হবে। কুরআনে তাদের এসব আচরণ এক একটি

করে বর্ণনা করা হয়েছে, যার ফলে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি উপলব্ধি করেছে যে, এমন কাফেরদের নিকটে যুক্তির জবাবে যুক্তি নেই। তারা এখন পরাজিত হয়ে বলপ্রয়োগ করে সত্যের আওয়াজ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

و قَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ و فِى اذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْ بَيْنِنَا و بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عمِلُوْن ـ (حم السجده ٥)

-এবং তারা বল্লো, যে জিনিসের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছ তার জন্যে আমাদের মনের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে। (অর্থাৎ আমাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার কোন পথ খোলা নেই, আমাদের কানে ছিপি রয়েছে। (অর্থাৎ আমরা তা শুনব না।) এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে এক যবনিকা বিদ্যমান (অর্থাৎ আমরা বিচ্ছিন্ন)।

অতএব তুমি তোমার নিজের কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করছি (অর্থাৎ তোমার বিরোধিতায় তৎপর রয়েছি)। (হামীম সাজদা: ৫)

و اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سمِعُوا الذِّكْر و يقُوْلُوْن انَّه لَمجْنُوْنٌ ـ و مَا هُو الاَّ ذِكْرٌ لِّلْعلَمِيْنَ ـ (القلم ٥١-٥٢)

-যখন এসব কাফের নসিহতের বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে তখন এমন মনে হয় তারা তাদের (ক্রোধান্ধ) দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তোমাকে পশ্চাৎপদ করে দেবে। তারা বলে, এ ব্যক্তি ত পাগল। অথচ এ ব্যক্তি সমগ্র জগতবাসীর জন্যে এক নসিহত। (কলম: ৫১-৫২)

و قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهذَا الْقُرْانِ و الْغَوْا فِيْه لَعلَّكُمْ تَغْلِبُوْن ـ (حم السجده ٢٦)

-এ কাফেরগণ বলে, এ কুরআন কখনো শুনবে না এবং হট্টগোল সৃষ্টি করে বিঘ্ন সৃষ্টি কর, সম্ভবতঃ তোমরা বিজয়ী হবে। (হামীম-সাজদাহ ঃ ২৬)

فَمَالِ الَّذِيْن كَفَرُوْا قبلَك مُهْطِعِيْنَ عنِ الْيَمِيْنِ و عنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ـ (المعارج ٣٦-٣٧)

-অতএব হে নবী! কি ব্যাপার কাফেরগণ ডান ও বাম দিক থেকে তোমার দিকে দৌড়ে আসছে? (অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে বিদ্রূপ করার জন্যে ছুটে আসছে)।(৭৩) (মায়ারিজ: ৩৬-৩৭)

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাওয়াত

দাওয়াতে ইসলামীর চতুর্থ দফা আখেরাতের উপর ঈমান আনা। এ একটি সংক্ষিপ্ত কোন দফা নয়, বরঞ্চ এর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত আছে যা মেনে নেয়ার সামষ্টিক নাম ঈমান বিল আখেরাত (আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস)।

প্রথম কথা এই যে, দুনিয়ায় মানুষকে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা খুশী তাই করতে থাকবে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার থাকবে না। বরঞ্চ এ দুনিয়া হচ্ছে পরীক্ষা ক্ষেত্র। এখানে পরীক্ষার জন্যে মানুষকে পাঠানো হয়েছে। তারপর সে এখানে যা কিছুই করে তার জবাবদিহি তাকে আল্লাহর সামনে করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ এ জবাবদিহির জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। দুনিয়ায় কাজ করার জন্যে মানব জাতিকে যতোটা অবকাশ দেয়া হয়েছে, যা শেষ হবার পর কিয়ামত সংঘটিত হবে যখন বিশ্বের এ সকল ব্যবস্থাপনা লন্ডভন্ড হয়ে যাবে। তারপর দ্বিতীয় একটি বিশ্বব্যবস্থা কায়েম করা হবে। সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ অতীত হয়েছে তাদের সকলকে একই সময়ে জীবিত করে নতুন করে সে জগতে উঠানো হবে। এ দ্বিতীয় জীবন দুনিয়ার বর্তমান জীবনের মতো সাময়িক হবে না, বরঞ্চ চিরস্থায়ী হবে। এখানে কখনো মৃত্যুর আগমন হবে না।

তৃতীয়ত ঃ সে সময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্র করে আল্লাহ তায়ালার আদালতে পেশ করা হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তার কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে যা সে নিজের দায়িত্বে দুনিয়ার জীবনে করেছে।

চতুর্থ ঃ দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই করছে, যদিও আল্লাহ তা সরাসরি জানেন, সুবিচারের সকল শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি তার পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক আমলনামা তৈরী করাচ্ছেন। তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজের অসংখ্য সাক্ষ্য ফেরেশতাগণের মাধ্যমে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করা হচ্ছে, তা সেসব সে (মানুষ) প্রকাশ্যেই করুক অথবা গোপনে করুক। বরঞ্চ যে নিয়ত এবং ইচ্ছায় সে কথা বলেছে এবং যে ধারণা বাসনা সে তার হৃদয়ে পোষণ করেছে সে সবের সাক্ষ্য প্রমাণাদি ত সংরক্ষিত করা হচ্ছে। তারপর এ কথার সাক্ষীও আল্লাহ তায়ালা তৈরী করে রেখেছেন যে, মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাবার জন্যে এবং ভ্রান্ত পথগুলোর থেকে মধ্য সঠিক ও সহজ সরল পথ বলে দেয়ার জন্যে তার পক্ষ থেকে পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করে দেয়া হয়েছিল। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার আদালতে এমনভাবে পেশ করা হবে যে মানুষ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

পঞ্চমত ঃ আল্লাহতায়ালার আদালতে কোন প্রকার ঘুষ, অন্যায় অসংগত সুপারিশ এবং সত্যের পরিপন্থী কোন ওকালতি চলবে না। একের বোঝা অন্যের উপর চাপানো হবে না। কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং অতি নিকটাত্মীয় কোন বন্ধু ও আত্মীয়ের বোঝা নিজের কাঁধে বহন করবে না। যেসব প্রকৃত অথবা কাল্পনিক সত্তাকে মানুষ তার অভিভাবক ও সাহায্যকারী

মনে করে তারা তার কোন কাজে আসবে না। মানুষ সেখানে একাকী একেবারে বন্ধুহীন ও সহায়হীন অবস্থায় নিজের কর্মকান্ডের হিসাব নিজেই দিতে থাকবে।

শেষ কথা এই যে, সিদ্ধান্ত পুরোপুরি নির্ভর করবে এ বিষয়ের উপর যে, মানুষ দুনিয়াতে নবীগণের প্রচারিত সত্যকে মেনে নেয়ার পর তদনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালার সঠিকভাবে হুকুম পালন করে চলেছে কিনা। তারপর আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন যাপন করেছে অথবা তা ভুলে গিয়ে সবকিছু দুনিয়ারই জন্যে করেছে। প্রথম অবস্থায় তার জন্যে বেহেশত এবং দ্বিতীয় অবস্থায় জাহান্নাম।

এ আখেরাতের আকীদাহ্ ইসলামী দাওয়াতের জন্যে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেমন তাওহীদ, রেসালাত ও কুরআন করীমকে মানার আকীদাহ। কারণ যে ধরনের চিন্তা ও কাজের দিকে ইসলাম আহবান জানাচ্ছিল এবং যে পথে চলার দাওয়াত দিচ্ছিল, সে পথে এক পা চলাও মানুষের জন্যে সম্ভব নয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দুনিয়াকে পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং নিজেকে খোদার কাছে জবাবদিহিকারী মনে না করেছে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত তার মন থেকে এ ধারণা দূর না হয়েছে যে জীবন ত ব্যস শুধু এ দুনিয়ারই জীবন যেখানে প্রকাশিত ফলাফলই ভালো ও মন্দের প্রকৃত মানদন্ড। যতোক্ষণ সে খাঁটি মনে এ কথা মেনে না নিয়েছে যে আসল এবং চিরন্তন জীবন তাই যা মৃত্যুর পর শুরু হবে এবং ভালো ও মন্দের প্রকৃত মানদন্ড এই যে, কোন পথে চলে মানুষ ঐ দ্বিতীয় জীবনে সাফল্য লাভ করবে এবং কোন পথে চলে মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হবে; ততোক্ষণ সে সত্য পথে চলতে পারবে না। এ আকীদাহ না হলে মানুষ কিছুতেই তাওহীদ, রেসালাত ও ঈমান বিল কুরআন এর দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্যই মনে করবে না। আর যদি কোন কারণে মেনেও নেয় ত খোদার বন্দেগী , রসূলের আনুগত্য এবং কুরআন অনুসরণের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হবে না। এ জন্যে যে, যখন মানুষ একথা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত সকলকে যখন মাটিতে মিশে যেতে হবে এবং তারপর আর কোন দ্বিতীয় জীবন নেই যেখানে খোদা, রসূল এবং কুরআন অনুসরণের জন্যে পুরস্কার এবং অনুসরণ না করার শাস্তি অবশ্যই হওয়ার কথা, তখন সে কখনো নিষ্ঠাসহ নিজেকে সেই নিয়ম-নীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইবে না ইসলাম যার সাথে আবদ্ধ করতে চায়। বরঞ্চ জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে সে সে পন্থাই অবলম্বন করে যাতে দুনিয়ায় কোন সুযোগ-সুবিধা, কোন সুখ সম্ভোগ লাভ করা যায় এবং প্রতিটি সে পথ পরিহার করবে, যার কারণে সে দুনিয়ার জীবনের সুখ সম্ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে অথবা ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে।

কুরাইশগণ আখেরাতকে অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করতো

এ আখেরাতের আকীদার এই গুরুত্ব ছিল যে কারণে কুরাইশ ও আরবের মুশরিকদের সামনে যখন নবী (সা) এ আকীদাহ পেশ করেন তখন তারা সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা অনুভব করে যে, তা মেনে নেয়া হলে তাদের সকল স্বাধীনতা খতম হয়ে যাবে। কোন নিভৃত স্থানে যেখানে দেখার কেউ নেই, সেখানেও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিষিদ্ধ কোন কাজ করা যাবে না। তারা মনে করে, যেখানে তারা কোন অন্যায় সুযোগ-সুবিধা অথবা কোন আনন্দ-সম্ভোগ লাভ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, সেখানেও এ আকীদাহ তাদের হাত বেঁধে দেবে। এ আকীদাহ ত একজন অদৃশ্য সিপাহীকে তাদের প্রত্যেকের পেছনে নিয়োজিত করে দেবে যে কিছুতেই তাদেরকে তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দেবে না। এ কারণেই তারা এর চরম বিরোধিতা করতে শুরু করে। তারা জোরেশোরে মানুষের

মধ্যে এ ধারণা প্রচারের চেষ্টা করে যে, মুহাম্মদ (সা) যা বলছেন, তা একেবারে বিবেকের পরিপন্থী এবং অসম্ভব ও অবাস্তব। এ একেবারে পাগলামি এবং হাস্যকর কথা।(৭৪)

আখেরাতের প্রতি যারা সন্দেহ পোষণ করতো তাদের ধারণা

কুরাইশদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল এমনও ছিল যারা বলতো, আমাদের ত অনুমান হয় যে, হয়তো আখেরাত হবে। কিন্তু এর প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই। এ দলের উল্লেখ কুরআনে শুধু এক স্থানে আছে যাতে জানা যায় যে, এ ধারণা পোষণকারী অতি অল্পই ছিল।

و اذَا قِيْلَ انَّ وعْد اللّٰه حقٌّ وَّ السَّاعةُ لاَرَيْب فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِىْ ما السَّاعةُ انْ نَّظُنُّ الاَّ ظَنًّا وَّ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ - (الجاثيه ٣٢)

-যখন বলা হতো যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না যে, কিয়ামত কি। আমাদের ব্যস শুধু একটা ধারণা আছে, কিন্তু এর প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই। (জাসিয়া: ৩২)

দৃশ্যতঃ এ দল এবং আখেরাত অস্বীকারকারীদের মধ্যে একদিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য এই যে, তারা আখেরাত একেবারে অস্বীকারকারী এ দলটি তার সম্ভাবনার ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ফলাফল ও পরিণামের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ জন্যে যে, আখেরাত অস্বীকার করা এবং তার প্রতি বিশ্বাস না থাকার নৈতিক পরিণাম একই। কোন ব্যক্তি আখেরাত অস্বীকার করে অথবা তার ধারণা রাখে কিন্তু বিশ্বাস করে না, এ উভয় অবস্থায় সে অবশ্যই খোদার কাছে জবাবদিহির অনুভূতি থেকে মুক্ত হবে এবং তার এ অনুভূতির অভাব অবশ্যই তাকে ভ্রান্ত চিন্তা ও কাজে লিপ্ত করবে। শুধুমাত্র আখেরাতের বিশ্বাসই দুনিয়ায় মানুষের আচরণকে সঠিক রাখতে পারে। এ না হলে, সন্দেহ এবং অস্বীকার উভয়ই তাকে একই ধরনের দায়িত্বহীন আচরণের দিকে ঠেলে দেবে। যেহেতু এ দায়িত্বহীন আচরণ আখেরাতের ভয়াবহ পরিণামের প্রকৃত কারণ, সে জন্যে জাহান্নামে যাওয়া থেকে না অস্বীকারকারী বাঁচতে পারে আর না তারা, যারা বিশ্বাস রাখে না।(৭৫)

আখেরাত অস্বীকারকারীদের ধারণা

এ একটি স্থান ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে আখেরাত অস্বীকারকারীদের বক্তব্য নকল করা হয়েছে।

و قَالُوْا مَا هِىَ الاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ و نَحْيَا وما يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرُ - و مَا لَهُمْ بِذٰلِك مِنْ عِلْمٍ - انْ هُمْ الاَّ يَظُنُّوْنَ - وَاِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ ايٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ الاَّ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِابَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صدقِيْنَ - (الجاثيه ٢٤-٢٥)

-এ সব লোক বলে, "জীবন ত ব্যস এ আমাদের দুনিয়ার জীবন মাত্র। এখানেই আমাদের জীবন ও মৃত্যু। কালের চক্র ব্যতীত আর কিছু নেই, যা আমাদের ধ্বংস করতে পারে।" প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এদের কাছে কোন জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারণার ভিত্তিতে এসব কথা বলে। যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত তাদেরকে শুনানো হয়, তখন এদের নিকটে এ ছাড়া আর কোন যুক্তি থাকে না যে, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাকে (জীবিত করে) তুলে আন।" (জাসিয়া: ২৪-২৫)

অর্থাৎ জ্ঞানের এমন কোন উপায় নেই যার দ্বারা তারা এ সত্য জ্ঞান লাভ করেছে যে, এ জীবনের পর মানুষের জন্যে আর দ্বিতীয় কোন জীবন নেই এবং এ কথাও তারা জানতে পেরেছে যে, মানুষের রূহ কোন খোদার হুকুমে কব্জ করা হয় না। বরঞ্চ মানুষ কালচক্রে মৃত্যুবরণ করে নিঃশেষ হয়ে যায়। আখেরাত অস্বীকারকারীগণ এসব কথা কোন জ্ঞানের ভিত্তিতে বলে না। বরঞ্চ নিছক অনুমানের ভিত্তিতে বলে। বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে কথা বলতে গেলে তারা বড়ো জোর এ কথা বলতে পারে যে, মৃত্যুর পর কোন জীবন আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। তারা এ কথা কিছুতেই বলতে পারে না, আমরা জানি যে এ জীবনের পর কোন দ্বিতীয় জীবন নেই।

এভাবে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে তারা একথা জানার দাবী করতে পারে না যে, মানুষের রূহ খোদার হুকুমে বের করা হয় না, বরঞ্চ মানুষ নিছক তেমনভাবে মরে শেষ হয়ে যায় যেমন ঘড়ি চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। তারা বড়ো জোর একথা বলতে পারে, আমরা এ দুটির মধ্যে কোন একটি সম্পর্কেও একথা জানি না যে, প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানবীয় জ্ঞানের নিরিখে যখন মৃত্যুর পর জীবন থাকা বা না থাকার এবং রুহ কবজ হওয়ার অথবা কালচক্রে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার একইরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এর কি কারণ থাকতে পারে যে, তারা আখেরাতের সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে নিশ্চিতরূপে আখেরাত অস্বীকারের সপক্ষে সিদ্ধান্ত করে? এর কারণ এ ছাড়া আর কি কি হতে পারে যে, আসলে বিষয়টির সিদ্ধান্ত তারা যুক্তির ভিত্তিতে না করে আপন প্রবৃত্তির ভিত্তিতে করে? যেহেতু তাদের মন চায় না যে, মৃত্যুর পর কোন জীবন হোক এবং মৃত্যুর অর্থ শূন্য বা অস্তিত্বহীনতা নয়, বরঞ্চ রূহের স্থানান্তর, সে জন্যে তারা তাদের মনের চাহিদাকে নিজস্ব আকীদাহ-বিশ্বাস বানিয়ে নেয় এবং অন্য কথা অস্বীকার করে।(৭৬)

قَالُوْا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ - لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَاؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ - (المؤمنون :٨٢-٨٣)

-এরা বলে, আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাব এবং হাড়-হাড্ডি কংকালে পরিণত হবে, তখন আবার আমাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে? এ সবের ওয়াদা আমরা বহুবার শুনেছি এবং আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাও শুনেছে। এসব প্রাচীন কাহিনী বই আর কিছু না। (মু'মিনুন:৮২- ৮৩)

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ - (الرعد ٥)

- এবং তোমার যদি বিস্ময় প্রকাশ করতে হয়, তাহলে যাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা যায় তাদের কথা, 'যখন আমরা মরে মাটিতে পরিণত হবো, তখন কি আবার আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?" এরা ত সেসব লোক যারা তাদের খোদার সাথে কুফরী করেছে। (রা'য়াদ: ৫)

অর্থাৎ তাদের আখেরাত অস্বীকার এবং তাকে অসম্ভব মনে করা প্রকৃতপক্ষে খোদার কুদরত ও হিকমত অস্বীকার করা। তারা শুধু এতোটুকুই বলে না যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অসম্ভব, বরঞ্চ তাদের এ বক্তব্যের মধ্যে এ ধারণাও প্রচ্ছন্ন যে, মায়াযাল্লাহ, সে খোদা অক্ষম, দুর্বল ও জ্ঞানহীন যিনি তাদেরকে পয়দা করেছেন।(৭৭)

و قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ اَفْتَرى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهِ جِنَّةٌ ـ (سبا ٧-٨)

-কাফেরগণ মানুষকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন একজন লোকের কথা বলব-যে এ খবর দেয় যে, যখন তোমাদের দেহের অনু-পরমাণু বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে? কি জানি এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলছে, অথবা তাকে জ্বিনে ধরেছে। (সাবা ঃ ৭-৮)

কুরাইশ সর্দারগণ নিশ্চিতরূপে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস করতো না। কারণ গোটা জাতি তাঁকে সত্যবাদী বলে জানতো। তাঁর সমগ্র জীবনে কেউ তাঁর মুখে মিথ্যা কথা শুনেনি। এ জন্যে তারা লোকের সামনে তাদের অভিযোগ এ আকারে পেশ করতো, "এ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আবার জীবন রয়েছে এমন অবান্তর কথা যখন মুখ থেকে বের করে তখন তার অবস্থা দুটির কোন একটা অবশ্যই হবে। হয় তো (মায়াযাল্লাহ) এ ব্যক্তি জেনে বুঝেই মিথ্যা কথা বলছেন, অথবা পাগল। কিন্তু এ পাগল বলা কথাটিও তেমনি ভিত্তিহীন যেমন মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা। এ জন্যে যে কোন এক বিবেকহীন ব্যক্তিই একজন পরিপূর্ণ সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে পাগল মনে করতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা এ বেহুদা কথার জবাবে কোন যুক্তি প্রদর্শন জরুরী মনে করেননি এবং কথা শুধু বলেছেন সেই বিস্ময়কর উক্তির জবাবে যা মৃত্যুর পর জীবনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা বলতো।(৭৮)

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ط ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ط قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ـ (النّزعت ١٠-١٢)

- এ সব লোক বলে, সত্যিই কি আমাদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে আনা হবে? যখন আমরা জরাজীর্ণ অস্থিপঞ্জরে পরিণত হবো? বলতে লাগলোঃ এ প্রত্যাবর্তন ত বড়ো ক্ষতিকর হবে। (নাযিয়াত ঃ ১০-১২)

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হলো, হ্যাঁ এমনটিই হবে, তখন তারা ঠাট্টা করে একে অপরকে বলতে লাগলো, "আরে ভাই, সত্যি সত্যিই যদি আমাদেরকে পুনর্বার জীবন্ত

অবস্থায় প্রত্যাবর্তন হতে হয়, তাহলে ত সর্বনাশটা আমাদের হয়েছে। এর পরে ত আমাদের আর কোন মংগল নেই।(৭৯)

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَانَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ـ اَوَ اٰبَاؤُنَا الاَوَّلُوْن قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ الاْخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

ـ(الواقعه ٤٧ تا ٥٠)

-এবং তারা বলতো, আমরা মরে যখন মাটিতে মিশে যাব এবং শুধু অস্থিপিঞ্জর পড়ে থাকবে, তখন কি পুনরায় আমাদেরকে উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে? আমাদের বাপ-দাদাকেও কি এমনি উঠানো হবে যারা পূর্বে অতীত হয়েছেন? (হে নবী) এদেরকে বলে দাও, অবশ্য অবশ্যই আগে ও পরের সকলকেই একদিন একত্রে জমা করা হবে যার সময় নির্ধারিত করা আছে। (ওয়াকেয়া ঃ ৪৭-৫০)

আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি প্রমাণ

আখেরাত অস্বীকারকারীগণ তাদের অস্বীকারের সপক্ষে যেসব কথা বলে সে সবের উল্লেখ করে কুরআন মজিদে স্থানে স্থানে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তার থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। তা সম্ভব মনে করা নয়, বরঞ্চ অসম্ভব মনে করাই বিবেকের পরিপন্থী।

اَوَلَمْ يَرِ الاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ـ و ضرب لَنَا مَثَلاً وَّ نَسِى خَلْقَه ط قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَام و هِىَ رَمِيْمٌ ـ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط و هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ـ(يس ٧٧ تا ٧٩)

-মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাঁকে এক ফোঁটা শুক্র থেকে পয়দা করেছি এবং তারপর সে ঝগড়াটে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত আরোপ করে অথচ নিজের জন্মের কথা ভুলে গেছে। সে বলে, এসব পচে গলে যাওয়া অস্থিপিঞ্জর কে পুনর্জীবিত করবে? তাকে বল, তাকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি তাকে প্রথমবার পয়দা করেছেন এবং তিনি সৃষ্টি করার প্রত্যেকটি কাজ ভালভাবে জানেন। (ইয়াসিন ঃ ৭৭-৭৯)

অর্থাৎ সে একথা ভুলে যায় যে, আমরা নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ থেকে সে প্রাথমিক জীবাণু (MICROB) সৃষ্টিকারী যা তার সৃষ্টির উপায় হয়ে পড়ে। অতঃপর সে জীবাণু লালন পালন করে তাকে এমন এক উন্নত রূপ দান করা হয়েছে যে আজ সে আমাদের সামনে কথার তুবড়ি ছাড়ার যোগ্য হয়েছে। আমাদেরকে তারা সাধারণ সৃষ্টির ন্যায় অক্ষম মনে করে। তারা এ ভুল ধারণায় লিপ্ত যে, মানুষ যেমন মৃতকে জীবিত করতে পারে না, তেমনি আমরাও করতে পারি না। এ জন্যে তারা বলে, এসব গলিত অস্থিপিঞ্জর কে জীবিত করবে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কায় কুরাইশদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি কবরস্থান থেকে একজন মৃত ব্যক্তির একটি গলিত অস্থি নিয়ে আসে এবং সে নবী (সা) এর সামনে তা চুর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'মুহাম্মদ (সা), তুমি বল যে, মৃতকে জীবিত করে উঠানো হবে। এখন বল দেখি, এ গলিত অস্থিগুলোকে কে জীবিত করবে?

তার সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ জবাব এ দেয়া হলো যে, যিনি তাকে প্রথমবার পয়দা করেছেন তিনি তাকে পুনরায় জীবিত করবেন। (৮০)

و قَالُوْا ءَاذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَانَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا - قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا - اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُوْرِكُمْ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ط قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ج فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ مَتى هُوَ ط قُلْ عَسى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا - يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً - (بنى اسرائيل ٤٩ تا ٥٢)

-তারা বলে, আমরা যখন শুধু অস্থিপিঞ্জর ও মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করে উঠানো হবে? তাদের বল, তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও না কেন, অথবা তার চেয়েও কোন কঠিন বস্তু যা তোমাদের ধারণায় জীবন গ্রহণ সুদূর পরাহত, তথাপি তোমরা পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, কে এমন আছে যে, আমাদেরকে পুনরায় জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? জবাবে বল, তিনিই যিনি আমাদেরকে প্রথমবার পয়দা করেছেন। তারা (বিদ্রুপ করে) মাথা হালিয়ে হালিয়ে বলবে, আচ্ছা, তা কখন হবে? তুমি বল আশ্চর্যের কি আছে? সে সময় হয়তো খুবই নিকটবর্তী। যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাক দিবেন, সেদিন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকের জবাবে বের হয়ে আসবে এবং তোমাদের ধারণা এই হবে যে, "অতি অল্প সময় আমরা এ অবস্থায় পড়েছিলাম। (বনী ইসরাইলঃ ৪৯-৫২)

অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুর সময় থেকে শুরু করে কিয়ামতে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত সময়কাল তোমরা মাত্র কয়েক ঘন্টার বেশী মনে করবে না। তোমরা তখন এমন মনে করবে, "আমরা দীর্ঘ নিদ্রায় পড়ে ছিলাম। হঠাৎ হাশরের ময়দানের হট্টগোল আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়েছে। (৮১)

وَيَقُوْلُ الاِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا - اَوَلاَ يَذْكُرُ الاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا - (مريم ٦٦ تا ٦٧)

-মানুষ বলে, সত্যি সত্যিই কি মরে যাওয়ার পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করে বের করে আনা হবে? মানুষের কি স্মরণ নেই যে, আমরা প্রথমে তাকে পয়দা করেছি, যখন সে কিছুই ছিল না?

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ و غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط و نُقِرُّ فِى الاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ و مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى و مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط و تَرَى الاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ و رَبَتْ و اَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ -

(الحج ٥)

-হে লোকেরা! মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তোমাদের মনে যদি কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছি, তারপর শুক্রকীট থেকে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর মাংসপিন্ড থেকে যা আকৃতিসম্পন্নও এবং আকৃতিহীনও হয়। (এসব কথা এ জন্যে বলছি) যাতে তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করে দিতে পারি। আর আমরা যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে ভূমিষ্ট করি। (তোমাদের লালন-পালন করি) যেন যৌবন পর্যন্ত পৌঁছতে পার। তোমাদের মধ্যে কাউকে আবার পূর্বাহ্নেই ডেকে নেয়া হয় আবার কাউকে নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়, যেন সবকিছু জানার পরও কিছুই না জানে। তোমরা দেখ যে যমীন শুষ্ক হয়ে পড়ে আছে। পরে যখনই তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সতেজ হয়, ফুল ফুটে এবং সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে থাকে।

(হজ্ব ঃ ৫)

মাটি থেকে পয়দা করার অর্থ এক ত এই যে, প্রতিটি মানুষকে সেসব উপাদান থেকে পয়দা করা হয় যা সমুদয় মাটি থেকে লাভ করা হয় এবং এ সৃষ্টির সূচনা শুক্র থেকে হয়। অথবা মানব জাতির সূচনা আদম (আঃ) থেকে করা হয়েছে যাঁকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব জাতির পরবর্তী বংশধরের ধারাবাহিকতা শুক্রকীট থেকে শুরু হয়েছে। যেমন সুরায়ে সিজদায় বলা হয়েছে-

و بَدَاَ خَلْقَ الاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَه مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ - (ايت ٧-٨)

-তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা মাটি থেকে। তারপর তার বংশধারা এমন এক বস্তু থেকে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মত। (সিজদা ঃ ৭-৮)

উভয় অবস্থাতেই এ কথা প্রমাণিত যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ একত্র করেই জীবিত মানুষের সৃষ্টি। এ সত্য বর্ণনা করার পর ঐসব বিভিন্ন স্তরের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যার ফলে গর্ভ সঞ্চার হয় এবং মাতৃগর্ভে সন্তান স্থিতি লাভ করে। ওসবের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি যা আজকাল শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। বরঞ্চ ঐসব বড়ো বড়ো বিশিষ্ট পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে যে সম্পর্কে সে সময়ের সাধারণ বেদুঈনগণও অবগত ছিল। অর্থাৎ শুক্রকীট স্থিতিশীল হওয়ার পর প্রথমে জমাট রক্তের আকার ধারণ করে। তারপর একটি মাংস পিন্ডে রূপান্তরিত হয় যার প্রথমে কোন আকার আকৃতি থাকে না। পরে মানুষের আকৃতি সুস্পষ্ট হতে থাকে। গর্ভপাতের বিভিন্ন অবস্থায় যেহেতু মানুষ সৃষ্টির এসব মানুষের পর্যবেক্ষণে আসে, সে জন্যে সে সবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তারপর এ প্রশ্নের জবাব মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, যে খোদা মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করেন এবং তার বিকাশ সাধন করেন, তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে কি করে অসম্ভব হতে পারে?(৮২)

و قَالُوْا ءَاذَا ضَلَلْنَا فِى الاَرْضِ ءَانَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ - بَلْ هُمْ بِلْقَاىِٔ رَبِهِمْ كفِرُوْنَ - قُلْ يَتَوَفّكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ الى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ!

-(السجده ١٠-١١)

এবং এসব লোক বলে, যখন মাটিতে মিশে যাব, তখন কি আবার আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?

আসল ব্যাপার এই যে, এরা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করে। তাদেরকে বলঃ মৃত্যুর যে ফেরেশতা তোমাদের জন্যে নির্ধারিত আছে সে পরিপূর্ণরূপে তোমাদেরকে তার আয়ত্তে নিয়ে নিবে এবং তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। (সিজদা ঃ ১০-১১)

প্রথম এবং শেষ বাক্যের মাঝে একটি পরিপূর্ণ নীতিকাহিনী আছে যা শ্রোতার মনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাফেরদের যে প্রতিবাদ আপত্তি প্রথম বাক্যে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা এতোই অর্থহীন যে, তা খন্ডনের কোন প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। তা শুধু উদ্ধৃত করে দেয়াই তার অর্থহীনতা প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। এ জন্যে যে তাদের প্রতিবাদ যে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত তা দুটিই একেবারে অযৌক্তিক। "আমরা মাটিতে মিশে যাব"- তাদের এ কথাটির কি অর্থ হতে পারে? 'আমরা' যে বস্তুর নাম তা কখন মাটিতে মিশে যায়? মাটিতে ত শুধু সে দেহটা মিশে যায়, যার থেকে 'আমরা' বেরিয়ে যায়। ঐ দেহের নাম ত "আমরা" নয়। জীবিত অবস্থায় যখন সে দেহের অংগপ্রত্যঙ্গ কাটা হয়, তখন একটির পর একটি করে অংগ অংশ কাটা হতে থাকলেও "আমরা" বস্তুটি পরিপূর্ণরূপে আপন আপন স্থানে বিদ্যমান থাকে। দেহের কর্তিত কোন অংশের সাথে তার কোন অংশ যায় না এবং যখন এ "আমরা" বস্তুটি কোন দেহ থেকে বের হয়ে যায়, তখন সে সমগ্র দেহটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে দেহের সাথে "আমরা"

বস্তুটির সামান্যতম সম্পর্কও থাকে না। এ জন্যেই ত একজন নিবেদিত প্রাণ প্রেমিক তার প্রিয়তমের মৃতদেহ দাফন করে দেয়। কারণ তার প্রিয়তম সে দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। এ জন্যে প্রেমিক তার প্রিয়তমকে নয়, বরঞ্চ এ শুন্যদেহকে দাফন করে যার মধ্যে তার প্রিয়তম অবস্থান করতো। অতএব প্রতিবাদকারীর প্রথম মামলাটিই ভিত্তিহীন হয়ে গেল। এখন রইল তার দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ "আমাদেরকে কি নতুন করে পয়দা করা হবে?"

এ অস্বীকার এবং বিস্ময়সূচক প্রশ্নের উদয়ই হতো না। যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন করার পূর্বে এ 'আমরা' এবং তার সৃষ্টি করার অর্থের প্রতি মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা-ভাবনা করতো। এ "আমরা" বস্তুটির বর্তমান সৃষ্টি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, কোথাও থেকে কয়লা, কোথাও থেকে লোহা, কোথাও থেকে চুন এবং এ ধরনের অন্যান্য উপাদানগুলো একত্র করা হলো এবং এর মাটির দেহে এ "আমরা" বস্তুটি বিরাজমান হয়ে গেল। অতঃপর তার মৃত্যুর পর কি হয়? এ মাটির দেহ বা ঘর থেকে যখন "আমরা" বের হয়ে যায়, ত তার ঘর নির্মাণের জন্যে যে সকল উপাদান যমীনের বিভিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সবই সেই যমীনেই ফিরে যায়। প্রশ্ন এই যে, যিনি প্রথম এ "আমরা" কে এ ঘর বানিয়ে দিয়েছিল, তিনি কি দ্বিতীয়বার ঐসব উপাদান বা মালমশলা থেকে সেই ঘর বানিয়ে তাকে নতুনভাবে সেখানে পুনর্বাসিত করতে পারেন না? এ কাজ যখন প্রথম সম্ভব ছিল, সম্ভব কেন, একেবারে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছিল, তাহলে দ্বিতীয়বার তা সম্ভব হওয়ার এবং বাস্তবে পরিণত হওয়ার পথে কোন্ জিনিস প্রতিবন্ধক হতে পারে? এ বিষয়টি এমন যে, সামান্য বুদ্ধি খাটালেই একজন নিজেই বুঝতে পারে। কিন্তু সে তার জ্ঞানবুদ্ধিকে এদিকে ধাবিত হতে দেয় না কেন? কি কারণ থাকতে পারে যে, সে কোন চিন্তাভাবনা না করেই মৃত্যুর পরের জীবন এবং আখেরাত সম্পর্কে এ ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে? মাঝখানের সকল আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহতায়ালা দ্বিতীয় বাক্যে এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দিচ্ছেনঃ "প্রকৃতপক্ষে এরা তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করে।" অর্থাৎ আসল ব্যাপার এ নয় যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোন বিরাট ও অসম্ভব ব্যাপার যা তাদের বোধগম্য নয়, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে যে জিনিস এ কথা উপলব্ধি করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখে তা হলো তাদের এ অভিলাষ যে, দুনিয়ার সর্বত্র 'আমরা' লাগামহীন বিচরণ করব, প্রাণভরে পাপাচার করব এবং নির্বিঘ্নে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, তারপর কেউ যেন আমাদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করে এবং আমাদের কৃতকর্মের কোন হিসাবও যেন আমাদের দিতে না হয়।"

তারপর বলা হয়েছে যে, তোমাদের "আমরা" যে ঘরে বাস করতো, তাতো অবশ্যই মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু স্বয়ং এ "আমরা" মাটিতে মিশে যাবে না। বরং তাকে কাজের যে অবকাশ দেয়া হয়েছিল তা শেষ হতেই খোদার পক্ষ থেকে মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যাবে এবং তাকে দেহ থেকে বের করে তার সবটুকু নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবে। তার কোন সামান্যতম অংশও দেহের সাথে মাটিতে যেতে পারবে না। তার সবটুকুই তত্ত্বাবধানে (CUSTODY) নেয়া হবে এবং আপন খোদার সামনে পেশ করা হবে।

সংক্ষিপ্ত আয়াতটিতে বহু তথ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এর উপর ভাসা ভাসা (CURSORY) দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে চলবে না। নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ-

১। এতে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, মৃত্যু এমনিই আসে না যে, একটি ঘড়ি চলছিল, চাবি দেয়া হয়নি। যার ফলে চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বরঞ্চ

৩৮ —

প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে আল্লাহতায়ালা একজন বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি এসে রূহ ঠিক সেভাবেই যথারীতি হস্তগত করে নেন যেভাবে একজন সরকারী কর বা সম্পদ আদায়কারী (OFFICIAL RECEIVER) কোন কিছু নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। কুরআনের বিভিন্নস্থানে এ সম্পর্কে অতিরিক্ত যেসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর এ ফেরেশতার অধীনে একটি পূর্ণ কর্মচারী বাহিনী আছে, যারা মৃত্যু সংঘটিত করতে, দেহ থেকে রূহ বহিষ্কৃত করতে, অতঃপর সেগুলোকে নিজের আয়ত্তে রাখবে। সেসব কর্মচারীর আচরণ নেক রূহের সাথে এক ধরনের হবে এবং অপরাধী রূহের সাথে অন্য ধরনের হবে। বিশদ বিবরণের জন্যে সূরা নিসা-আয়াত-৯৭, আনয়াম আয়াত ৯৩, নহল ২৮, ওয়াকেয়া ৮৩, ৯৪ দ্রষ্টব্য।

২। এর থেকে এও জানতে পারা যায় যে, মৃত্যুর দ্বারা মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে যায় না। বরঞ্চ তার রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অস্তিত্ববান থাকে। "মওতের ফেরেশতা তোমাদেরকে পুরোপুরি তার আয়ত্তে নেবে"-কুরআনের এ শব্দগুলো এ সত্যকেই প্রমাণিত করে। কারণ কোন অস্তিত্বহীন বস্তুকে আয়ত্তে নেয়া যায় না। আয়ত্তে নেয়ার অর্থই ত এই যে, আয়ত্তে নেয়া হলে তা আয়ত্তে আনয়নকারীর কাছে বিদ্যমান থাকবে।

৩। আরও জানতে পারা যায় যে, মৃত্যুর সময় যা আয়ত্তে নেয়া হয় তা মানুষের জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত (BIOLOGICAL LIFE) নয়, বরঞ্চ তার সেই অহং বা আমিত্ব (EGO) যা 'আমি' 'আমরা' 'তুমি' 'তোমরা' শব্দগুলোর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ 'আমি' দুনিয়ায় কাজকর্মের মাধ্যমে যে ধরনের ব্যক্তিত্বই লাভ করুক তা পুরোপুরি এবং অবিকল বের করে নেয়া হয়, তার গুণাবলীর কোন কমবেশী না করেই এবং মৃত্যুর পর তাকে তার প্রভুর (আল্লাহ) কাছে উপস্থাপিত করা হয়। একেই আখেরাতে নবজীবন এবং নতুন দেহ দান করা হয়। এর বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হবে, তার কাছ থেকে কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং তাকেই শাস্তি অথবা পুরস্কার দেয়া হবে।(৮৩)

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ - (الصّٰفّٰت ١١)

-একটু তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ এদেরকে পয়দা করা কি বেশী কঠিন, না, না ঐসব বস্তু যা আমি পয়দা করে রেখেছি? এদেরকে আমরা আঠাল মাটি থেকে তৈরী করেছি।

(আসসাফফাত ঃ ১১)

এ ছিল মক্কার কাফেরদের সে সন্দেহের জবাব যা তারা আখেরাত সম্পর্কে পেশ করতো। তাদের ধারণা ছিল আখেরাত সম্ভব নয়। কারণ মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এর জবাবে আখেরাতের সম্ভাবনার যুক্তি করতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম তাদের সামনে এ প্রশ্ন রাখলেন ঃ তোমাদের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার পয়দা করা বড়ো কঠিন কাজ তোমাদের ধারণায় যার শক্তি আমাদের নেই। তাহলে বল, এ যমীন ও আসমান এবং আসমান যমীনের অসংখ্য বস্তুনিচয় পয়দা করা কি কোন সহজ কাজ? তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল যে, যে খোদার জন্যে এ বিরাট বিশ্ব প্রকৃতি সৃষ্টি কোন কঠিন কাজ ছিল না এবং যিনি তোমাদেরকে একবার পয়দা করেছেন তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে তিনি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার পয়দা করতে অক্ষম? তারপর তিনি বলেন, মানুষ ত এমন বিরাট কিছু নয়। তাকে মাটি থেকে

সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুনরায় তাকে সে মাটি থেকে সৃষ্টি করা যেতে পারে। তার অস্তিত্বের সকল উপাদান মাটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যে শুক্র থেকে তার সৃষ্টি তা আহার থেকে তৈরী হয়। গর্ভ সঞ্চারের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার গোটা সত্তা যেসব মিশ্রবস্তুর উপাদান (INGREDIENTS) থেকে তৈরী হয়, তা সবই আহার থেকে সংগৃহীত হয়। এ আহার প্রাণীজ হোক অথবা উদ্ভিদজাত, তার উৎস সেই মাটি থেকে যা পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে এমন শক্তি সঞ্চয় করে যে, মানুষের আহারের জন্যে শস্য, তরিতরকারি এবং ফলমূল উৎপন্ন করে এবং ঐসব পশু লালন-পালন করে যার দুগ্ধ ও মাংস মানুষ খায়। এ জবাবে যুক্তির ভিত্তি এই যে, এ মাটি যদি জীবন গ্রহণের যোগ্য না হতো তাহলে তোমরা আজ কিভাবে জীবিত বিদ্যমান আছ? আর যদি এর মধ্যে জীবন সৃষ্টি করা আজ সম্ভব হয় যেমন তোমাদের অস্তিত্বই স্বয়ং তার সম্ভাবনার সুস্পষ্ট প্রমাণ, তাহলে আগামীতে এ মাটি থেকে দ্বিতীয়বার তোমাদের সৃষ্টি করা কেন সম্ভব হবে না?(৮৪)

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ (المؤمن ٥٧)

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না । (মুমেন ঃ ৫৭)

এ হচ্ছে কাফেরদের সেই ধারণার জবাব যে মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে-এ এক অসম্ভব ব্যাপার। বলা হয়েছে যে, যারা এ ধরনের কথা বলে, তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ। একটু বুদ্ধি-বিবেকসহ চিন্তা করলে তাদের জন্যে এ কথা উপলব্ধি করা কঠিন হবে না যে, যে খোদা এ বিরাট বিশাল প্রকৃতিরাজ্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়। (৮৫)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا ـ (النّزعت :٢٧)

তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি বেশী কঠিন কাজ, না আসমান সৃষ্টি করা? আল্লাহ ত তা বানিয়েছেন। (নাযিয়াত ঃ ২৭)

সৃষ্টি করার অর্থ মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা এবং আসমান বলতে গোটা উর্ধলোককে বুঝায়। তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, অগণিত সৌরজগত ও ছায়াপথ। কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার জীবন লাভ অসম্ভব মনে করছ এবং বারবার বলছ ঃ এ কি করে সম্ভব যে যখন আমাদের অস্থিপিঞ্জর একেবার গলে পচে যাবে, তখন দেহের এ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলো আবার একত্র করে দেয়া হবে এবং তাতে জীবন দিয়ে দেয়া হবে? তোমরা কি এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেছ, এ বিরাট বিশাল প্রকৃত রাজ্য সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন কাজ, না তোমাদেরকে একবার সৃষ্টি করার পর দ্বিতীয়বার ঐ আকৃতিকে সৃষ্টি করা কঠিন? যে খোদার নিকটে এ কোন কঠিন কাজ ছিল না, তাঁর জন্যে এ কাজ কি করে এমন কঠিন হবে, তা তিনি করতে পারবেন না?(৮৬)

وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ـ اَوْ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ـ

قُلْ نَعَمْ و اَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ - فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ و قَالُوْا يوَيْلَنَا هذَا يَوْمُ الدِّيْنِ

(الصّفّت ١٥ تا ٢٠) -

এবং তারা বলে ঃ এত সুস্পষ্ট যাদু। আর এমনও কি কখনো হতে পারে যে, আমরা মরে যাব, মাটিতে মিশে যাব। এবং শুধু অস্থিপিঞ্জর রয়ে যাবে। তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে দাঁড় করানো হবে। আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাকেও কি উঠানো হবে? তাদেরকে বল ঃ হ্যাঁ আর তোমরা (খোদার মুকাবিলায়) একেবারে অসহায়। ব্যস একটি মাত্র ধাক্কা এবং তারা স্বচক্ষে সবকিছু দেখতে থাকবে (যার খবর দেয়া হচ্ছে)। সে সময় এরা বলবেঃ হায়! আমাদের কপাল, এতো সেই বিচার দিন। (সাফফাত ঃ ১৫-২০)

তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এতো যাদু জগতের কথা। এমন কোন যাদুর জগত আছে এ ব্যক্তি যার উল্লেখ করেছে। সেখানে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে বিচারালয় হবে, জান্নাত তৈরী হবে, দোজখের আজাব হবে। তাদের কথার অর্থ এটাও হতে পারে যে, এ ব্যক্তি এমন সব কথা বলছে যা এ কথার প্রমাণ যে, তাকে কেউ যাদু করেছে যার জন্যে একজন ভালো মানুষ এমন সব কথা বলছে। তার জবাবে বলা হলো, হ্যাঁ, তাই হবে। তোমরা খোদার সামনে অসহায়। তিনি তোমাদেরকে যা কিছুই বানাতে চান বানাতে পারেন। তিনি যখন চেয়েছিলেন তাঁর একটি ইংগিতে মাত্র তোমরা অস্তিত্ব লাভ করলে। যখন তিনি চাইবেন, তার একটি ইংগিতেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে তারপর তিনি যখন চাইবেন, তাঁর ইংগিতে তোমাদের উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে। এ কাজের সময় যখন আসবে, তখন দুনিয়া পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করা কোন বিরাট লম্বা-চওড়া কাজ হবে না। ব্যস একটি মাত্র ধাক্কা ও কম্পন নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করার জন্যে যথেষ্ট হবে। "ধাক্কা বা সজোরে ঝাঁকুনি" শব্দটি এখানে অর্থবহ। এর থেকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের এমন কিছু চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে যে মানবের সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব মৃত্যুবরণ করেছিল, তারা যেন নিদ্রিত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কেউ ভর্ৎসনার স্বরে বলছে-"উঠে পড়।" আর তক্ষুণি মুহূর্তের মধ্যেই সব উঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। (৮৭)

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الاْبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ - و اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ - و اِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ - و اِلَى الاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ - (الغاشيه ١٧ تا ٢٠)

(এসব লোক আখেরাত মানে না) তারা কি উট দেখে না যে কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ কি দেখে না কিভাবে তা উত্তোলিত হয়েছে? পাহাড় কি দেখে না কিভাবে তা জমাট করা হয়েছে? যমীন দেখে না কিভাবে তা বিছিয়ে রাখা হয়েছে?
(গাশিয়া ঃ ১৭-২০)

অর্থাৎ এসব লোকেরা যদি আখেরাতের এসব কথা শুনে বলে যে এ সবকিছু কিভাবে হতে পারে, তাহলে তারা কি কখনো তাদের চারপাশের দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে দেখেছে যে, কিভাবে উটের সৃষ্টি হলো, এ আকাশ কিভাবে এতো উর্ধে উত্থিত হলো,

পাহাড় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যমীন কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হলো। এসব কিছু যদি হতে পারে এবং হওয়ার পর বাস্তবে তাদের সামনে বিদ্যমান, তাহলে কিয়ামত কেন হতে পারবে না? আখেরাতে দ্বিতীয় একটি দুনিয়া কেন তৈরী হতে পারবে না? দোযখ এবং জান্নাতই বা কেন তৈরী হতে পারবে না? এত একজন নির্বোধ ও বেখেয়াল লোকের কাজ যে, দুনিয়ায় চোখ খোলার পর যেসব বস্তু সে চোখের সামনে দেখতে পেল সেসব সম্পর্কে সে মনে করলো যে, তাদের অস্তিত্ব লাভ ত সম্ভব, কিন্তু যে সব এখনও তার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় আসেনি, সে সব সম্পর্কে সে চোখ বুজে একথা বলবে যে, ওসব সম্ভব নয়। তার মাথায় যদি বুদ্ধি থেকে থাকে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, যা কিছু বিদ্যমান আছে তা কি করে অস্তিত্ব লাভ করলো? এ উট ঐ সব বৈশিষ্ট্যসহ কিভাবে তৈরী হলো, আরবের মরুবাসীদের জন্যে যেসব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পশুর প্রয়োজন ছিল? এ আকাশ কিভাবে তৈরী হলো যার বায়ুমন্ডলে শ্বাস গ্রহণের জন্যে বায়ু রয়েছে, যার মেঘমালা বৃষ্টি নিয়ে আসে, যার সূর্য দিনের আলো ও উত্তাপ সরবরাহ করে এবং যার চাঁদ ও তারা রাতে ঝকমক করে? এ যমীন কিভাবে বিছানো হলো যার উপর মানুষ বাস করে, যার উৎপন্ন ফসল থেকে তার সকল প্রয়োজন পূরণ হয়, যার ঝর্ণা ও কুপের উপরে তার জীবন নির্ভরশীল? এ পাহাড় কিভাবে যমীনের উপর উত্থিত হলো তা রং বেরঙয়ের মাটি ও পাথর এবং বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদসহ জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এসব কি কোন শক্তিমান সত্তা বিজ্ঞ নির্মাতার নির্মাণ কুশলতা ব্যতিরেকেই হয়ে গেল? কোন চিন্তাশীল ও সমঝদার ব্যক্তি এ প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিতে পারে না। সে যদি একগুঁয়ে ও হঠকারী না হয় তাহলে তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এর প্রতিটি বস্তুই অসম্ভব হতো যদি কোন বিরাট শক্তিমান ও বিজ্ঞ সত্তা সেগুলোকে সম্ভব বানিয়ে না দিতেন। আর যখন একজন শক্তিমানের শক্তিতে দুনিয়ার এসব কিছু হওয়া সম্ভব, তাহলে কোন কারণ নেই যেসবের ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভের সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা অসম্ভব মনে করা হবে। (৮৮)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِىٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ط اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

(القيمة ٤٠) -

-সে কি নিকৃষ্টতম পানির এক ফোঁটা শুক্র ছিল না। যা মাতৃগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়? পরে তা একটা মাংসপিন্ড হলো। তারপর আল্লাহ তার দেহ বানালেন, তার অংগপ্রত্যংগ সুসমঞ্জস করলেন। তার থেকে পুরুষ ও নারী দু'ধরনের মানুষ বানালেন। তিনি কি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে সক্ষম নন? (কিয়ামাহ ঃ ৪০)

এ হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সম্ভাবনার আর একটি যুক্তি যা কাফেরদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। যারা এ কথা স্বীকার করে যে, এক ফোঁটা শক্র থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি পর্যন্ত সমস্ত কাজ আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি কৌশলেরই নিদর্শন, তাদের জন্যে প্রকৃতপক্ষে এ যুক্তির কোন জবাবই ছিল না। কারণ তারা যতোই নির্লজ্জ হোক না কেন, তাদের বিবেক এ কথা স্বীকার না করে পারে না যে, যে খোদা এভাবে দুনিয়াতে মানুষ পয়দা করেন, তিনি পুনর্বারও এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম। কিন্তু যে

নাস্তিক ও বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজকে নিছক দুর্ঘটনার ফল গণ্য করে, সে মুখে যতোই হঠকারিতা প্রকাশ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না যে মানব সূচনা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিটি অংশে ও প্রত্যেক জাতির মধ্যে কিভাবে একই ধরনের সৃজনকর্মের ফলে পুত্র ও কন্যার জন্মগ্রহণ ক্রমাগতভাবে এমন অনুপাতে হয়ে আসছে যে কোথাও কোনকালে এমন হয়নি যে কোন জনপদে শুধুমাত্র ছেলে অথবা শুধুমাত্র মেয়ে জন্মগ্রহণ করতে থেকেছে যার ফলে ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়েছে। তারা যতোই নির্লজ্জ হোক না কেন, তাদের পক্ষে এ দাবী করা সম্ভব ছিল না যে, এ সবই ঘটনাক্রমে চলে আসছে। একবার যদি তাদের মন এ সাক্ষ্য দিত যে, এসব কিছু একজন বিজ্ঞ নির্মাতার নির্মাণকুশলতার নির্দশন, তাহলে তাদের এ কথা স্বীকার করা ব্যতীত উপায় ছিল না যে, সেই বিজ্ঞ নির্মাতা তাঁর নির্মিত বস্তু ভেঙ্গে ফেলে পুনর্বার নির্মাণ করতে পারে না।(৮৯)

فَلْيَنْظُرِ الانْسَانُ مِمَّا خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وِ التَّرَائِبِ - اِنَّه عَلى رَجْعِه لَقَادِرٌ - (الطّارق ٥ تا ٨)

-তারপর মানুষ এটুকুও লক্ষ্য করুক না কেন তাকে কোন বস্তু থেকে পয়দা করা হয়েছে, এক লম্ফমান পানি থেকে পয়দা করা হয়েছে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থির মধ্য থেকে বের হয়। নিশ্চয় সে (সৃষ্টিকর্তা) তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করতে সক্ষম। (তারেক ঃ ৫-৮)

অর্থাৎ মানুষ তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে দেখুক যে কিভাবে তাকে পয়দা করা হয়েছে। এই যে মা-বাপ বহুবার একত্রে যৌন সংমিলনে মিলিত হচ্ছে তাদের একটি মিলনকে কে গর্ভ সঞ্চারের উপায় বানিয়ে দিচ্ছেন এবং তাকে এক বিশেষ মানুষের জন্মলাভের কারণ বানিয়ে দিচ্ছেন।[১] তারপর এমন কোন্ সত্তা রয়েছেন যিনি গর্ভ

---

১) এ বিষয়টি সেকালের আরবদের জন্য যতোটা জটিল ছিল, তার চেয়ে কয়েকগুণ অধিক জটিল হয়ে পড়েছে বর্তমান যুগের লোকের কাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে। বর্তমানে যে সব আবিষ্কার হয়েছে তার দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের বৈবাহিক জীবনকালে অসংখ্য অগণিত শুক্রকীট (Sperm) পুরুষের দেহ থেকে নির্গত হয়ে নারী দেহে প্রবেশ করে। নারীর মধ্যেও বহুবছর যাবত এমন ডিম্বকোষ বা ভ্রূণ কোষ ক্রমাগত তৈরী হতে থাকে তার মধ্য থেকে প্রত্যেক ডিম্ব কোষে পুরুষের কোন একটি শুক্রকীট মিলিত হওয়ার ফলে গর্ভ সঞ্চারের শক্তি বিদ্যমান থাকে। আবার এসব একই রকমের হয় না। বরঞ্চ প্রতিটি শুক্র কীট ও ডিম্বকোষ পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তার প্রতিটি জোড়ার সংমিলনে এক বিশেষ ধরনের মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে যা অনিবার্যরূপে অন্যান্য জোড়ার সংমিলনে জন্মগ্রহণকারী মানুষ থেকে ভিন্নতর হবে। এখন প্রশ্ন এই যে, এখন এ সিদ্ধান্ত সে করবে যে, পুরুষের অসংখ্য শুক্র কীটের মধ্যে কোনটিকে নারীর অসংখ্য ডিম্বকোষের কোনটির সাথে মিলিত করে কোন সময় কোন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা যায়? পুরুষ ও নারী উভয়েই এ ব্যাপারে একেবারে এখতিয়ার বিহীন। কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ কথা বলাও ভুল যে কোন শুক্রকীটের কোন ডিম্ব কোষের সাথে মিলিত হওয়ার নিছক এক আকস্মিক ঘটনার ফল (ACCIDENTAL)। কারণ এ বিস্ময়কর সৃজন কর্মের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে ধরনের মানুষ জন্মগ্রহণ করে তা মানব ইতিহাসের চড়াই উৎরাইয়ে সিদ্ধান্তকর প্রভাব রাখে। আর এ প্রভাব এমন দক্ষতাপূর্ণ বিজ্ঞতাসহ প্রতিষ্ঠিত হয় যার বদৌলতে মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে ইতিহাসের কোন দর্শনও হতে পারে। মানুষ যদি কোন হিকমত ব্যতিরেকে এলোপাতাড়ি জন্মগ্রহণ করতো তাহলে তার ইতিহাসের কোন দর্শনের ধারণা কখনো করা যেতো না। অতএব এ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, এ লম্ফমান পানি থেকে মানব সৃষ্টি এক বিজ্ঞ খোদাই তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী করছেন-(গ্রন্থকার)

সঞ্চারের পর থেকে মাতৃগর্ভে স্তরে স্তরে ক্রমবিকাশ দান করে তাকে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেন যে, সে একটি জীবিত সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে? কোন্ সে শক্তি যে মাতৃগর্ভেই সে শিশুর দৈহিক গঠন এবং তার দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করে দেয়? এমন কোন্ সত্তা যিনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কালে তার ক্রমাগত তত্ত্বাবধান করেন? তাকে রোগ থেকে রক্ষা করেন, দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। বিভিন্ন রকমের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তার জন্যে জীবনের এতো উপায় উপাদান সরবরাহ করেন যা গণনা করা যায় না। তার জন্যে প্রতিটি পদক্ষেপে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার এমন সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দেন যে, তা নিজে সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়া ত দূরের কথা সে সবের বহু বিষয়ের তার কোন অনুভূতিই নেই। এসব কি কোন এক খোদার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ব্যতীতই হচ্ছে? যদি এ প্রশ্নের জবাব কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির নেতিবাচক না হয়, তাহলে এ কথা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভসঞ্চারের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এটাই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তিনি তাকে মৃত্যুর পর ফিরিয়ে এনে অস্তিত্ব দান করতে পারেন। যদি তিনি প্রথম বস্তুর উপর সক্ষম থেকে থাকেন এবং তাঁরই শক্তিতে মানুষ এ সময়ে দুনিয়ায় জীবিত বিদ্যমান, তা হলে এমন কোন্ সংগত যুক্তি এ ধারণা করার জন্যে পেশ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় বস্তুর উপর তিনি সক্ষম নন? এ সক্ষমতা অস্বীকার করার জন্যে মানুষকে এ কথাও একেবারে অস্বীকার করতে হবে যে, খোদা তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করতে পারে, তার জন্যে এটাও অসম্ভব নয় যে, একদিন তার মস্তিষ্কবিকৃতি তার মুখ থেকে এ দাবী উত্থাপন করাবে যে দুনিয়ার সকল গ্রন্থাবলী দুর্ঘটনার ফলে ছাপানো হয়েছে, দুনিয়ার সকল শহর-বন্দর দুর্ঘটনার ফলে নির্মিত হয়েছে এবং দুনিয়ায় এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে যার ফলে সকল কলকারখানাগুলো তৈরী হয়ে আপনা আপনি চলতে শুরু করেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের সৃষ্টি, তার দেহের গঠন এবং তার মধ্যে কাজের শক্তি ও যোগ্যতা পয়দা হওয়া ও একটি জীবন্ত সত্তা হিসাবে তার অস্তিত্ববান থাকা এমন এক কাজ যা ওসব কাজ থেকে বহুগুণে কঠিন যা মানুষের দ্বারা দুনিয়ায় হয়েছে এবং হচ্ছে। এতো বড়ো জটিল ও কঠিন কাজ এখন বিজ্ঞতা, অনুপাত ও ব্যবস্থাপনাসহ যদি দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি স্বরূপ লক্ষ লক্ষ বছর যাবত ধারাবাহিকভাবে চলতে পারে তাহলে এমন কোন্ বস্তু আছে যাকে একজন মস্তিষ্ক বিকৃত লোক দুর্ঘটনা বলতে পারবে না?(৯০)

بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ - ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ج ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ - قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ - (ق ٢ تا٤)

-বরং একজন সাবধানকারী স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই তাদের কাছে এসেছে এটাই এদের জন্যে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। ফলে অমান্যকারীগণ বলতে লাগলো-"এতো বড়ো আজব কথা। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তারপর পুনরায় উত্থিত হবো?) এ প্রত্যাবর্তন ত বিবেকের অগম্য।" অথচ মাটি তাদের দেহ থেকে যা কিছু ভক্ষণ

করে, তা সবই আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর আমাদের কাছে একখানি কিতাব আছে যার মধ্যে সব কিছুই সংরক্ষিত আছে। (কাফ ঃ ২-৪)

তাদের প্রথম বিস্ময় ত এ বিষয়ে ছিল যে, তাদের জাতির মধ্য থেকে তাদেরই মতো একজন এ দাবী করেছিল, "আমি খোদার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাবধান করে দিতে এসেছি।" তারপর তাদের কাছে অতিরিক্ত বিস্ময়কর ব্যাপার এই ছিল যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছিল তা এই যে, মৃত্যুর পর সকল মানুষকে পুনরায় নতুন করে জীবিত করা হবে। আর তাদের সকলকে একত্র করে আল্লাহতায়ালার আদালতে পেশ করা হবে। তারপর সেখানে তাদের কর্মকান্ডের হিসাব নেয়ার পর পুরস্কার এবং শাস্তি দেয়া হবে। তারপর বলা হলো যে, এ কথা যদি এসব লোকের বুদ্ধি-বিবেকে না ধরে ত এ তাদের বুদ্ধির সংকীর্ণতা বলতে হবে। এর জন্যে এটা অনিবার্য হয়ে পড়ে না যে, আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। এরা মনে করে যে, মানব জাতির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য অগণিত মানুষের দেহের অংশাবলী যে মাটি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও বিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। সেগুলো একত্র করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সে সবের প্রতিটি অংশ যে আকারে যেখানেই আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যক্ষভাবে তা জানেন। উপরন্তু তার পূর্ণ রেকর্ড আল্লাহতায়ালার দপ্তরে সংরক্ষিত করা হচ্ছে-যার থেকে কোন সামান্যতম অংশও ছুটে যায়নি। যখন আল্লাহর হুকুম হবে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ফেরেশতাগণ সে রেকর্ড থেকে এক একটি অংশ বের করে আনবেন এবং সকল মানুষের অবিকল সেই দেহ বানিয়ে দেবেন, যে দেহ ধারণ করে তারা দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে।

এ আয়াতটিও ঐসব আয়াতের মধ্যে একটি যেখানে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, আখেরাতের জীবন শুধুমাত্র সেরূপ দৈহিক জীবনই হবে না যেমন এ দুনিয়াতে রয়েছে, বরঞ্চ দেহও প্রত্যেকের তাই হবে যা এ দুনিয়াতে ছিল। প্রকৃত ব্যাপার যদি তা না হতো, তাহলে কাফেরদের কথার জবাবে এ কথা বলা অর্থহীন হতো যে, মাটি তোমাদের দেহের যা কিছু ভক্ষণ করছে তা আমাদের জানা আছে এবং তার অণু পরমাণুর রেকর্ড বিদ্যমান আছে। (৯১)

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الاَوَّلِ - بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ - (ق ١٥)

-তাহলে প্রথমবারের সৃষ্টিতে কি আমরা অক্ষম ছিলাম? কিন্তু নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে এরা সন্দিহান। (কাফ ঃ ১৫)

কয়েকটি শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে এ এমন পরিষ্কার ও সোজা কথা আখেরাত অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় বলা হয়েছিল যে, যা প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। কেউ যদি খোদা অস্বীকারকারী না হয় এবং নিবুর্দ্ধিতার এমন সীমায় পৌঁছে না থাকে যে, এ সুশৃংখল প্রকৃতি রাজ্য এবং তার ভেতরে মানুষের জন্মকে নিছক একটি দুর্ঘটনার ফলশ্রুতি মনে না করে, তার পক্ষে এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না যে, একমাত্র খোদাই আমাদেরকে এবং এ বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন। এ বাস্তবতা আমরা এ দুনিয়ায় বিদ্যমান দেখছি এবং যমীন ও আসমানের সকল কারখানা আমাদের চোখের সামনেই চলছে। এ সবই তো এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, খোদা

আমাদেরকে এ প্রকৃতি রাজ্য সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। এরপর যদি কেউ বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সেই খোদা এক দ্বিতীয় বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না। তাহলে বলতে হবে যে, সে বিবেকের পরিপন্থী কথা বলছে। খোদা অক্ষম হলে তো প্রথমবারই সৃষ্টি করতে পারতেন না। যখন তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করে ফেলেছেন এবং তাঁর সে সৃষ্টির বদৌলতে আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি, তাহলে এমন ধারণা করার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে যে, নিজের তৈরী জিনিস ভেঙ্গে ফেলে পুনরায় তা বানাতে তিনি অক্ষম?(৯২)

আখেরাতের অনিবার্যতার যুক্তি

কুরআন অনস্বীকার্য যুক্তিসহ আখেরাতের সম্ভাবনা প্রমাণ করাই যথেষ্ট মনে করেনি। বরঞ্চ একথাও প্রমাণ করেছে যে, তা সংঘটিত হওয়া আবশ্যকও বটে। বিবেকের দাবী, সুবিচারের দাবী এবং নৈতিকতার দাবী এই যে, আখেরাত হোক যেখানে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নেয়া হবে, যা তারা জ্ঞানলাভ করার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত করেছে এবং তারা তাদের পেছনে ফেলে গেছে তাদের কাজের এমন সব ভালো অথবা মন্দ প্রভাব যা দীর্ঘকাল যাবত ভবিষ্যৎ বংশধরগুলোকে প্রভাবিত করতে থাকে। এ হিসাব নেয়া যদি না হয় এবং ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি না হয়, তাহলে তার অর্থ এ হবে যে, খোদার এ দুনিয়ায় ইনসাফ বলতে কিছু নেই। এখানে মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দান করে, ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা দিয়ে এবং অসংখ্য বস্তু নিচয় ও অন্যান্য মানুষের উপর এখতিয়ার দান করে অযথা এবং অর্থহীনভাবে পয়দা করা হয়েছে। দুনিয়ার বর্তমান জীবনে না পুরোপুরি হিসাব নেয়া সম্ভব, না পুরোপুরি ইনসাফ আর না পূর্ণ পুরস্কার ও শাস্তি সম্ভব। এ জন্যে অনিবার্যরূপে একটি দ্বিতীয় জগত হওয়া উচিত যেখানে সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অস্তিত্বলাভকারী সকল মানুষকে যেন একই সময়ে একত্র করা যায়, সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কাজের এবং তার থেকে সৃষ্ট পরিণাম ফলের হিসাব নিয়ে এক এক ব্যক্তির দায়িত্ব নির্ণয় করা যায় এবং সেখানে জীবন সীমিত না হয়ে যেন চিরন্তন হয় যাতে করে যে ব্যক্তি যতোটুকু শাস্তির যোগ্য তা যেন পুরোপুরি ভোগ করতে পারে এবং যে যতোটুকু পুরস্কারের যোগ্য তা যেন তাকে পুরোপুরি দেয়া যায়। এ বিষয়টিকে কুরআনে বিশদভাবে বিভিন্ন উপায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে কাফেরদের নিকটে আখেরাত অস্বীকার করার কোন যুক্তি না থাকে। (৯৩)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى - (القيمة ٣٦)

মানুষ কি এ কথা মনে করে রেখেছে যে, তাকে অনর্থক ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়েছে? (কিয়ামত ঃ ৩৬)

আরবী ভাষায় ابل سُدى সে উটকে বলা হয়, যে এমনি মুক্তভাবে ছুটে বেড়ায়। যেদিক ও যেখানে খুশী চরে বেড়ায়। তা দেখাশুনা করার কেউ থাকে না। এ অর্থে আমরা লাগামহীন উট শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি। অতএব আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করে রেখেছে যে, তার স্রষ্টা তাকে পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? তার উপর কোন দায়িত্ব আরোপ করা হয়নি? কোন কিছু তার জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়নি? এমন সময় কি কখনো আসবে না যে তার কাজের জন্যে

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না? এ কথাই কুরআনের অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে জিজ্ঞেস করবেন-

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ -

-তোমরা কি এ কথা মনে করে রেখেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমাদেরকে কখনো আমাদের নিকটে ফিরে আসতে হবে না।

(মুমিনূন ঃ ১১৫)

এ দুটি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবন যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তি প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের অর্থ এই যে, তোমরা কি প্রকৃত পক্ষে নিজেদেরকে পশু মনে করে রেখেছ? তোমাদের ও পশুদের মধ্যে কি এ সুস্পষ্ট পার্থক্য নজরে পড়ে না যে, তাদেরকে ভালোমন্দ নির্ণয়ের কোন এখতিয়ার দেয়া হয়নি, তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে? তাদের কাজের মধ্যে নৈতিক ভালো মন্দের কোন প্রশ্নই ওঠে না, আর তোমাদের কাজ কর্মে অবশ্যই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে? তাহলে তোমরা নিজেদের সম্পর্কে এ কিভাবে মনে করে নিলে যে, পশু যেমন দায়িত্বহীন এবং তাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তোমরাও তদ্রূপ? পশুর দ্বিতীয়বার জীবিত করে না উঠাবার কারণ তো বুঝতে পারা যায় যে, সে শুধুমাত্র তার সহজাত প্রবৃত্তির বিশিষ্ট দাবী পূরণ করেছে, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন দর্শন রচনা করেনি। কোন মযহাব প্রবর্তন করেনি। কাউকে খোদা বানায়নি এবং স্বয়ং কারো খোদাও সাজেনি। এমন কোন কাজ করেনি যাকে ভালো বা বন্দ বলা যেতে পারে। কোন ভালো অথবা মন্দ সুন্নত জারি করেনি যার প্রভাব বংশানুক্রমে চলতে থেকেছে। অতএব সে যদি মরে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এ কথা তো প্রণিধানযোগ্য হতে পারে। কারণ তার কোন কাজের কোন দায়িত্বই তার উপর আরোপিত হয় না যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে তাকে পুনর্জীবিত করার কোন প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন থেকে তোমরা কি করে অব্যাহতি পেতে পার? কারণ আপন মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তোমরা এমন সব নৈতিক আচরণ করতে থাক যার ভালো অথবা মন্দ হওয়ার এবং শাস্তি ও পুরস্কারের যোগ্য হওয়ার নির্দেশ তোমাদের বিবেক দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়লো, তোমাদের দৃষ্টিতে কি তার নির্বিঘ্নে নিষ্কৃতি পাওয়া উচিত এবং এ জুলুমের কোন বিনিময় নিহত ব্যক্তির পাওয়া উচিত নয়? যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে বিশৃংখলা ও অনাচারের এমন বীজ বপন করে গেল যার পরিণাম তারপর কয়েক শতক পর্যন্ত মানুষ ভোগ করতে থাকলো। তার সম্পর্কে তোমাদের বিবেক কি দ্বিধাহীনচিত্তে এ কথা বলে যে, পোকামাকড়ের মতো তারও মরে লয়প্রাপ্ত হওয়া উচিত, পুনর্জীবিত হয়ে তার ওসব অপকর্মের জবাবদিহি করা উচিত নয় যার কারণে অসংখ্য মানুষের জীবন বিনষ্ট হয়েছে? যে ব্যক্তি সারা জীবন সত্য, সুবিচার ও মানবকল্যাণের জন্যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিল এবং সারাজীবন বিপদ মসিবত ভুগতে থাকে, সেও কি তোমাদের দৃষ্টিতে কীট পতংগের মতো কোন সৃষ্টি?(৯৪)

لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (القيمة ١-٢) -

-না, আমি কসম করছি কিয়ামতের দিনের এবং না, আমি কসম করছি ভর্ৎসনাকারী নফসের। অর্থাৎ তোমাদের ধারণা ভুল যে, কিয়ামত হবে না। আমি কসম করছি কিয়ামতের এবং ভর্ৎসনাকারী নফসের যে অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনের এবং ভর্ৎসনাকারী নফসের কসম যে বিষয়ের জন্যে করছেন তা তিনি বলেননি। কারণ পরের বাক্য তা বলে দিচ্ছে। কসম এ জন্যে করছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় তাকে পয়দা করবেন এবং এমন করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ যৌক্তিকতার খাতিরে এ বিষয় দুটি বস্তুর কসম করা হলো? চিন্তাশীল লোকদের জন্যে এ যৌক্তিকতা সে সময়ে যতোটা সুস্পষ্ট ছিল তার চেয়ে আজ অনেক বেশী সুস্পষ্ট।

কিয়ামতের কথাই ধরা যাক। তার কসম খাওয়ার কারণ এই যে, তার আগমন অবশ্যম্ভাবী। গোটা বিশ্ব প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা এ কথার সাক্ষ্য দান করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা না অনাদি, না অনন্ত। তার ধরনটাই স্বয়ং এ কথা বলে যে, না সে চিরদিন ছিল আর না চিরদিন থাকবে। পূর্বেও মানুষের বিবেকের কাছে এ অমূলক ধারণার জন্যে কোন শক্তিশালী যুক্তি ছিল না যে, এ নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়া কখনো অনাদি ও অনন্ত হতে পারে। কিন্তু যতোই এ দুনিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বর্ধিত হচ্ছে, ততো বেশী এ বিষয়টি মানুষের নিকটে সুনিশ্চিত হতে যাচ্ছে যে, এ বিশ্বলোকের একটু সূচনা আছে যার পূর্বে এ ছিল না এবং অনিবার্যরূপে তার এক শেষও আছে যার পর এ থাকবে না। এর ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জন্যে স্বয়ং কিয়ামতেরই কসম খেয়েছেন। আর এমন এক কসম যা আমরা আপন অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান এমন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলি, তোমার জানের কসম তুমি বিদ্যমান। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং তোমার বিদ্যমান হওয়ার সাক্ষ্যদান করছে।

কিন্তু কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ কথার প্রমাণ যে, একদিন এ বিশ্বব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। এখন রইলো এ বিষয় যে, তারপর মানুষকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে তার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তার ভালোমন্দের পুরস্কার ও শাস্তি পেতে হবে। তো এর জন্যে দ্বিতীয় কসম নফ্সে লাওয়ামার খাওয়া হয়েছে। এমন কোন লোক দুনিয়াতে নেই, যার মধ্যে বিবেক বলে কোন কিছু নেই। এ বিবেকের মধ্যে অবশ্যই ভালো ও মন্দের এক অনুভূতি পাওয়া যায়। মানুষ যতোই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হোক না কেন, তার বিবেক তাকে কোন মন্দ কাজ করতে এবং কোন ভালো কাজ না করার জন্যে অবশ্যই বাধা দেয়। সে ভালো এবং মন্দের যে মানদন্ড নির্ণয় করে রেখেছে তা সঠিক হোক বা না হোক, এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষ নিছক পশু নয় বরঞ্চ একটি নৈতিক জীব। তার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে ভালো ও মন্দ নির্ণয়ের শক্তি আছে। সে স্বয়ং তার ভালো ও মন্দ কাজের জন্য দায়িত্বশীল মনে করে। ফলে যে অসদাচরণ সে অন্যের সাথে করেছে তার জন্যে সে তার বিবেকের ভর্ৎসনা দমিত করে যদি আত্মতৃপ্তিও লাভ করে এবং পক্ষান্তরে যখন সে অসদাচরণ অন্য কেউ তার সাথে করে, তখন তার মন ভেতর থেকে এ দাবী করে যে, তার সাথে এ বাড়াবাড়ি যে করেছে তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। যদি মানুষের মধ্যে এ ধরনের ভর্ৎসনাকারী মন (নফ্সে লাওয়ামা) এর অস্তিত্ব এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা হয়। তাহলে এ বাস্তবতাও অনস্বীকার্য যে, এ নফ্সে লাওয়ামাহ মৃত্যুর পরের জীবনের এমন এক সাক্ষ্য যা স্বয়ং মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান। কারণ মানব প্রকৃতির এ দাবী যে, যে ভালো ও মন্দ কাজের জন্যে মানুষ দায়ী তার পুরস্কার অথবা শাস্তি

অবশ্যই দরকার তা মৃত্যুর পরের জীবন ব্যতীত পূরণ হতে পারে না। কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, মৃত্যুর পর মানুষ যদি বিলীন হয়ে যায়, তাহলে সে তার বহু ভালো কাজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং তার বহু অন্যায় কাজে সুবিচার পূর্ণ শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এ জন্যে যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বাজে কথা মেনে না নিয়েছে যে, বিবেক সম্পন্ন মানুষ একটি অবান্তর বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং নৈতিক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ এমন এক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে যা বুনিয়াদী দিক দিয়ে তার গোটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে নৈতিকতার কোন অস্তিত্বই ধারণ করে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পরের জীবন অস্বীকার করতে পারে না। এমনিভাবে পুনর্জন্মবাদ দর্শনও প্রকৃতির এ দাবীর জবাব নয়। কারণ মানুষ যদি নৈতিক কর্মকান্ডের শাস্তি অথবা পুরস্কার লাভের জন্যে পুনরায় এ দুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করতে থাকে, তাহলে প্রত্যেক জন্মেই সে পুনরায় কিছু অতিরিক্ত নৈতিক কর্মকান্ড করতে থাকবে যা নতুন করে শাস্তি অথবা পুরস্কারের দাবী করবে এবং এ অন্তহীন ধারাবাহিকতায় তার হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার পরিবর্তে উল্টো তার হিসাব বাড়তেই থাকবে। এ জন্যে প্রকৃতির দাবী শুধু এ অবস্থায় পূরণ হতে পারে যে, এ দুনিয়ায় মানুষের মাত্র একটি জীবনই হতে হবে। অতঃপর সমগ্র মানব জাতির ধ্বংস হওয়ার পর এক দ্বিতীয় জীবন হতে হবে যেখানে মানুষের কর্মকান্ডের যথাযথ হিসাব করার পর পরিপূর্ণ শাস্তি অথবা পুরস্কার দিতে হবে। (৯৫)

وما خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالاَرْضَ وما بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ط ذلك ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ط اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ امَنُوْا و عَمِلُوْا الصلحت كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (ص ٢٧-٢٨)

-আমরা এ আসমান ও যমীনকে এবং এর মধ্যবর্তী এ দুনিয়াকে অযথা পয়দা করিনি। এ ত তাদের ধারণা যারা কাফের এবং এমন কাফেরদের জন্যে ধ্বংস রয়েছে জাহান্নামের আগুনের দ্বারা। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে তাদেরকে এবং যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদেরকে সমান করে দেব? খোদাভীরুদেরকে কি আমরা পাপাচারীর মতো করে দেব? (সোয়াদ ঃ ২৭-২৮)

অর্থাৎ এ বিশ্ব প্রকৃতিকে আমরা নিছক খেলার বস্তু হিসাবে সৃষ্টি করিনি যে এর মধ্যে বিজ্ঞতা নেই। কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন সুবিচার হবে, কোন ভালো অথবা মন্দ কাজের কোন পরিণাম ফল প্রকাশিত হবে না। এখানে মানুষকে লাগামহীন উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং এ দুনিয়াটা মগের মুল্লুকও নয় যে এখানে যে যা খুশী তাই করবে আর তার কোন বিচার হবে না। যে ব্যক্তি পুরস্কার ও শাস্তি মানতে রাজী নয় এবং এ কথা মনে করে বসে আছে যে, ভালো মন্দ সব মানুষ শেষ পর্যন্ত মরে মাটিতে মিশে যাবে, কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, আর না কেউ ভালো মন্দ কাজের কোন পরিণাম ভোগ করবে, সে প্রকৃত পক্ষে দুনিয়াকে একটা খেলা এবং তার নির্মাতাকে একজন খেলাকারী মনে করছে। তার ধারণা এই যে, জগত স্রষ্টা এ দুনিয়া এবং তার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে এক

বাজে কাজ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমাদের নিকটে কি এ কথা কি সংগত যে, সৎ এবং অসৎ উভয়ই সমান হয়ে যাক? এ ধারণা কি তোমাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য যে, কোন ব্যক্তিকে তার কোন সৎ কাজের কোন প্রতিদান এবং অসৎকাজের কোন শাস্তি দেয়া না হোক? এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি আখেরাত না হয়, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না হয় আর মানুষের কর্মকান্ডের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না হয়, তাহলে আল্লাহতায়ালার হিকমত ও ইনসাফ বলে কিছু থাকে না। ফলে বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র ব্যবস্থাপনা বিশৃংখল হতে বাধ্য। এ ধারণার ভিত্তিতে তো দুনিয়ায় কল্যাণের জন্যে কোন প্রেরণা এবং অনাচার থেকে বিরত রাখার কোন বাধা-নিষেধ থাকে না। খোদার খোদায়ী যদি মায়াযাল্লাহ এ ধরনের কান্ডজ্ঞানহীন হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অতি নির্বোধ যে এ পৃথিবীতে বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করে স্বয়ং সৎজীবন যাপন করে এবং মানব জাতির সংস্কার সংশোধনের জন্যে কাজ করে। আর ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান যে সুবিধাজনক পরিবেশ পরিস্থিতি লাভ করে বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নিবে এবং সকল প্রকার অনাচার পাপাচারে জীবন উপভোগ করবে। (৯৬)

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - (التّغابن ٧)

অস্বীকারকারীগণ বড়ো গলায় বল্লো যে মৃত্যুর পর কিছুতেই তাদেরকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে না। তাদেরকে বলঃ না, আমার রবের কসম, অবশ্যই তোমাদেরকে উঠানো হবে। তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে বলা হবে যে, দুনিয়াতে তোমরা কত কিছু করেছ। আর এমনটি করা আল্লাহর জন্যে বড়োই সহজ। (তাগাবুনঃ ৭)

যদিও কোন আখেরাত অস্বীকারকারীর নিকটে পূর্বেও জানার এমন কোন উপায় ছিল না এবং আজও নেই যে মৃত্যুর পর কোন দ্বিতীয় জীবন নেই। কিন্তু এ নির্বোধেরা চিরদিন বড়ো গলায় এ দাবী করেছে। অথচ নিশ্চয়তার সাথে অস্বীকার করার না কোন যুক্তিসংগত আর না কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি আছে।

তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেন, তুমি আমার কসম খেয়ে বল তোমাদেরকে অবশ্যই উঠানো হবে এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এ কথা বলে দেয়া হবে যে, তোমরা দুনিয়ার বুকে কি করে এসেছ। কুরআনে এ তৃতীয় স্থান যেখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, তোমার রবের কসম খেয়ে লোকদেরকে বল যে, অবশ্যই এরূপ হবে। প্রথমে সূরায়ে ইউনুসে বলা হয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করে। প্রকৃতঃই কি একথা সত্য? বলঃ আমার রবের কসম, এ অবশ্যই সত্য এবং তোমাদের এমন শক্তি নেই যে এটা হতে তোমরা বাধা দেবে। (আয়াত ঃ ৫৩)

অতঃপর সূরা সাবাতে বলা হয়, অস্বীকারকারীগণ বলে, কি হলো যে কিয়ামত আমাদের উপর এসে পড়ছে না? বলঃ কসম আমার রবের, এ তোমাদের উপর অবশ্যই এসে পড়বে।

এখন প্রশ্ন এই যে, আপনি একজন আখেরাত অস্বীকারকারীকে আখেরাতের সংবাদ কসম খেয়েই দিন আর কসম না খেয়েই দিন, তাতে কি পার্থক্য সূচিত হয়? সে যখন

এটা স্বীকারই করে না ত নিছক এজন্যে কেন স্বীকার করবে যে আপনি কসম খেয়ে তাকে বলছেন? এর জবাব এই যে, প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ (সা) সেসব লোককে সম্বোধন করে কথা বলেন যারা নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা জানতো যে, তাঁর মুখ থেকে জীবনে কোন মিথ্যা কথা বেরয়নি। সে জন্যে মুখে তারা যতোই তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাক না কেন, তারা মনের মধ্যে এ ধারণা কিছুতেই করতে পারতো না যে, এমন সত্যবাদী লোক কখনো খোদার কসম করে এমন কথা বলতে পারে যার সত্য হওয়ার উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস নেই? দ্বিতীয়তঃ তিনি নিছক আখেরাতের আকীদাই বর্ণনা করছিলেন না, বরঞ্চ তার জন্যে অত্যন্ত যুক্তিসংগত দলিল প্রমাণ পেশ করছিলেন। কিন্তু যে বস্তুটি নবী ও অ-নবীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তা এই যে, একজন অ-নবী আখেরাতের সপক্ষে যে শক্তিশালী যুক্তি পেশ করতে পারে তা লাভ বড়োজোর এটা হতে পারে যে, আখেরাত না হওয়ার তুলনায় হওয়াকেই অধিক সম্ভাবনাময় মনে করা যেতে পারে। এর বিপরীত, নবীর স্থান একজন দার্শনিকের স্থান থেকে বহু উচ্চে। তাঁর প্রকৃত মর্যাদা এটা নয় যে, বিবেক সম্মত যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আখেরাত হওয়া উচিত। বরঞ্চ তাঁর প্রকৃত মর্যাদা এই যে, তিনি এ বিষয়ের জ্ঞান রাখেন যে আখেরাত হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বলেন যে, তা অবশ্যই হবে। এজন্যে একজন নবীই কসম করে এ কথা বলতে পারেন। একজন দার্শনিক তাঁর কোন কথার উপরেই কসম খেতে পারেন না। আর আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস একজন নবীর বর্ণনার পরেই হতে পারে। দার্শনিকের যুক্তি নিজের মধ্যে এ শক্তি রাখে না যে, অন্য লোক তো দূরের কথা, স্বয়ং দার্শনিকও নিজের যুক্তির ভিত্তিতে তাকে নিজের ঈমানী আকীদা বানাতে পারে। দার্শনিক যদি সঠিক চিন্তার অধিকারী হন তাহলে, হওয়া উচিত। এ কথার বেশী বলতে পারেন না এবং 'অবশ্যই হবে' এ কথা একজন নবীই বলতে পারেন।

তারপর কসম খেয়ে শুধু এতোটুকুই বলা হয়নি যে মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে। বরঞ্চ এ কথাও বলা হয়েছে যে, সে সময়ে অবশ্যই তোমাদেরকে বলা হবে যে তোমরা দুনিয়ায় কি কি কাজ করে এসেছো। এটাই হচ্ছে সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য যার জন্যে মানবজাতিকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার উঠানো হবে। আর এর মধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে যে, এ রূপ করার প্রয়োজনটা কি। এ সত্য সঠিক বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সৃষ্টিকে কুফর ও ঈমানের মধ্য থেকে যে কোন একটি পথ অবলম্বনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যাকে এ দুনিয়াতে বহু কিছু ব্যবহারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং যে কুফর অথবা ঈমানের পথ অবলম্বন করে সারাজীবন তার এ স্বাধীনতা সঠিকপন্থায় অথবা ভুল পন্থায় ব্যবহার করে বহু কল্যাণকর কাজের অথবা বহু অনিষ্টকর কাজের দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে তার সম্পর্কে এমন ধারণা করা একেবারে অযৌক্তিক হবে যে, এসব কিছু যখন সে করেই ফেলেছে ত ভালো মন্দের ফলাফলের দরকার নেই এবং কিছুতেই এমন কোন সময় যেন না আসে যাতে তার কাজকর্মের যাঁচাই পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ ধরনের অবান্তর কথা যে বলে সে অবশ্যই দুটি নির্বুদ্ধিতার একটি অবশ্যই করে। হয়ত সে মনে করে যে, এ বিশ্বপ্রকৃতি ত এক বিজ্ঞতাপূর্ণ বাস্তবতা, তবে এখানে মানুষের মতো এখতিয়ার সম্পন্ন জীবকে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অথবা সে মনে করে এ এক এলোমেলো সৃষ্টিরাজ্য যার পেছনে কোন বিজ্ঞতা কার্যকর ছিল না। প্রথম ধারণা ত স্ববিরোধী, কারণ বিজ্ঞতাপূর্ণ এক বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক এখতিয়ার সম্পন্ন জীবের দায়িত্বহীন হওয়া বিজ্ঞতা ও ইনসাফের পরিপন্থী। আর দ্বিতীয় ধারণা সম্পর্কে সে ত কোন

যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ পেশ করতে পারে না যে একটি এলোমেলো বিজ্ঞতাহীন সৃষ্টিরাজ্যে মানুষের মতো বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হলো? আর তার মনে ইনসাফের ধারণা কোথা থেকে এলো? বিবেকহীনতা থেকে বিবেকের উন্মেষ এবং বেইনসাফী থেকে সুবিচারের ধারণা সৃষ্টি হওয়া এমন একটি বিষয় যার প্রবক্তা হয়তো একজন হঠকারী হতে পারে অথবা সে ব্যক্তি যে অধিক দর্শনচর্চা করতে করতে মস্তিষ্কবিকৃতির রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, এমনটি করা আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ। এ আখেরাতের দ্বিতীয় যুক্তি। প্রথম যুক্তি আখেরাতের আবশ্যকতার জন্যে ছিল এবং এ যুক্তি তার সম্ভবপর হওয়ার, যে খোদার জন্যে বিশ্বপ্রকৃতির এ বিরাট ব্যবস্থাপনা বানিয়ে দেয়া কোন কঠিন কাজ নয়, তাঁর জন্যে এ কাজ কি করে কঠিন হবে যে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে নিজের সামনে হাজির করবেন এবং তার হিসাব নেবেন? (৯৭)

اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُوْلُوْنَ اِنْ هِىَ اِلاَّ مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ـ فَاْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ لا وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ـ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ـ وَمَا خَلَقْنٰهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ (الدُّخان ٣٤ تا ٤٠)

-এসব লোকেরা বলেঃ "আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছু নেই। তারপর দ্বিতীয়বার আমাদেরকে উঠানো হবে না। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের (মৃত) বাপদাদাকে উঠিয়ে আন দেখি।"

এরা ভালো, না তুব্বা জাতি, না তাদের পূর্ববর্তী লোক? আমরা তাদেরকে এ জন্যে ধ্বংস করেছিলাম যে তারা ছিল পাপাচারী। এ আসমান-যমীন এবং তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ আমরা খেল তামাশার জন্যে সৃষ্টি করিনি। এগুলো আমরা সত্যতাসহ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। এসব উঠাবার নির্দিষ্ট সময় হবে সিদ্ধান্তের দিন। (দুখান ঃ ৩৪-৪০)

কাফেরদের বক্তব্য ছিল এই যে, প্রথমবার যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে তখন ব্যস লয় হয়ে যাবে। তারপর আর কোন জীবন নেই। "প্রথম মৃত্যু" শব্দগুলো দ্বারা এ কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে না যে, তারপর কোন দ্বিতীয় মৃত্যু হবে।

আমরা যখন বলি, অমুক ব্যক্তির প্রথম সন্তান হয়েছে, তখন এ কথা সত্য হওয়ার জন্যে জরুরী নয় যে, তারপর অবশ্যই দ্বিতীয় সন্তান হবে। বরঞ্চ এটাই যথেষ্ট হয় যে, তার পূর্বে কোন সন্তান হয়নি। এ জন্যে কাফেরগণ প্রথম মৃত্যু শব্দগুলো এ অর্থে ব্যবহার করতো না যে তারপর কোন জীবন এবং কোন দ্বিতীয় মৃত্যু হবে। তারা প্রথম মৃত্যুকেই

একই এবং শেষ মৃত্যু মনে করতো। তাদের যুক্তি এ ছিল যে, "যেহেতু আমরা মৃত্যুর পর কাউকে দ্বিতীয়বার উঠতে দেখিনি, সেজন্যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোন জীবন হবে না। তোমরা যদি দাবী কর যে, দ্বিতীয় জীবন হবে, তাহলে আমাদের বাপদাদাকে কবর থেকে উঠিয়ে আন যাতে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। এ যদি তোমরা করতে না পার, তাহলে বুঝবো যে তোমাদের দাবী ভিত্তিহীন।"

এ যেন তাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুর পরের জীবন খন্ডন করার পাকাপোক্ত দলিল ছিল। অথচ তা একেবারে অর্থহীন। তাদেরকে এ কথা কে বলেছিল যে, মৃত্যুবরণকারী দ্বিতীয়বার জীবন লাভ করে এ দুনিয়াতেই ফিরে আসবে? নবী (সা) অথবা কোন মুসলমান এ দাবী কখন করেছেন যে, তাঁরা মৃতকে জীবিত করতে পারেন?

তাদের আপত্তির প্রথম জবাব এ দেয়া হলো যে এসব লোক তোববা জাতি[১] এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অপেক্ষা ভালো নয়। তাদেরকে ত আমরা তাদের পাপের জন্যে ধ্বংস করেছি। অন্য কথায় এ জবাবের মর্ম এ ছিল যে, আখেরাতকে অস্বীকার করা এমন এক জিনিস যা কোন ব্যক্তি, দল অথবা জাতিকে পাপাচারী না বানিয়ে পারে না। নৈতিক অধঃপতন তার অনিবার্য পরিণতি এবং মানব ইতিহাস সাক্ষী যে, জীবনের এ দৃষ্টিভঙ্গী যে জাতিই অবলম্বন করেছে, সে অবশেষে ধ্বংস হয়েছে। মক্কায় কাফেরগণ সে প্রভাব প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভ করতে পারেনি যা তুব্বা জাতি এবং তাদের পূর্বে সাবা, ফেরাউন জাতি ও অন্যান্য জাতিসমূহ লাভ করেছিল। কিন্তু এ বস্তুগত উন্নতি এবং পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি নৈতিক অধঃপতনের পরিণাম থেকে তাদেরকে কখন রক্ষা করতে পেরেছিল যে, এরা সামান্য পুঁজি এবং উপায়-উপাদানের সাহায্যে তার থেকে রক্ষা পাবে?

তাদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাব এ দেয়া হয়েছিল যে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অস্বীকার করে সে প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বব্যবস্থাকে একটা খেলনা এবং তার স্রষ্টাকে অবোধ শিশু মনে করে। এর ভিত্তিতেই সে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, মানুষ দুনিয়াতে সকল প্রকার বিশৃংখলা সৃষ্টি করার পর একদিন ব্যস এমনিই মাটিতে মিশে যাবে এবং তার কোন ভালো ও মন্দ কাজের কোন পরিণাম ফল বেরুবে না। বস্তুতঃ এ সৃষ্টিজগত কোন ক্রীড়ামোদীর নয় বরঞ্চ এক বিজ্ঞ স্রষ্টার দ্বারা নির্মিত এবং কোন বিজ্ঞের নিকটে এ আশা করা যায় না যে, তিনি বেহুদা কাজ করবেন। আখেরাত অস্বীকারের জবাবে এ যুক্তি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে।

এখন রইলো তাদের এ দাবী, "উঠিয়ে আন আমাদের বাপদাদাকে যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" এর জবাব এ দেয়া হয়েছে যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ত কোন তামাশা নয় যে, কেউ তা অস্বীকার করলেই একজন মৃতকে কবর থেকে উঠিয়ে তার সামনে এনে খাড়া করা হবে। এর জন্য ত রাব্বুল আলামীন একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যখন তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে তাঁর আদালতে একত্রে হাজির করবেন এবং তাদের মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করে দেবেন। তোমরা মান আর না মানো, একাজ নির্দিষ্ট সময়েই হবে। মানলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে। কারণ এভাবে সময় থাকতে সাবধান হয়ে সে আদালতে কৃতকার্য হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে। না

---

১. হিমইয়ার গোত্রের বাদশাহের উপাধি ছিল তোব্বা। খৃঃ পূর্ব ১১৫ সালে তারা ইয়ামেনে শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং ৩০০ খৃঃ পর্যন্ত শাসন করে। -গ্রন্থকার।

তোমাদের জন্যে অবশ্যই সেসব কিছু আছে যা তোমরা পছন্দ কর? অথবা তোমাদের জন্যে আমাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্য পালনীয় এমন ওয়াদা প্রতিশ্রুতি আছে যে তোমরা যা বলছ তা সব কিছুই তোমাদেরকে দেয়া হবে? এদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যে কে এর জন্যে দায়িত্বশীল। অথবা এদের নির্ধারিত কোন শরীক আছে নাকি (যারা এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে)? তাই যদি হয়, তাহলে তাদের সে শরীকদের ডেকে আনুন যদি তারা সত্যবাদী হয়। (কলম ঃ ৩৫-৪১)

মক্কায় সর্দারগণ মুসলমানদের বলতো, দুনিয়ায় আমরা যে নিয়ামত লাভ করছি, এ আমাদের খোদার প্রিয় হওয়ার আলামত। আর যে শোচনীয় অবস্থায় আছ তা একথারই প্রমাণ যে তোমরা খোদার নিগৃহীত। অতএব কোন আখেরাত যদি হয়ই, যেমন তোমরা বলছ, তাহলে সেখানেও আমরা আনন্দে থাকব এবং আযাব তোমাদের হবে, আমাদের না। "এর জবাবে বলা হলো, এ কথা বিবেকের পরিপন্থী যে, খোদা অনুগত এবং অপরাধীর মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না। একথা তোমরা কিভাবে বুঝলে যে এ বিশ্বপ্রকৃতির স্রস্টা একজন অন্ধ রাজা যিনি এটা দেখবেন না যে কারা দুনিয়ায় তাঁর হুকুম মেনে চলেছে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থেকেছে আর কারা তাঁর থেকে নির্ভয় হয়ে সকল প্রকার পাপ ও জুলুম নির্যাতন করেছে? তোমরা ত ঈমানদারদের শোচনীয় অবস্থা এবং নিজেদের সুখ শান্তি ত দেখলে। কিন্তু নিজেদের এবং তাদের চরিত্রের ও কর্মকান্ডের পার্থক্য ত দেখলে না এবং দ্বিধাহীনচিত্তে বলে ফেল্লে যে, খোদার দরবারে অনুগতদের সাথে ত অপরাধীদের মতোই আচরণ করা হবে এবং তোমাদের মত অপরাধীদেরকে বেহেশত দান করা হবে। কিসের ভিত্তিতে তোমরা একথা বল্লে? তোমাদের নিকটে কি খোদার কোন কিতাব আছে যার মধ্যে একথা লিখা আছে? অথবা খোদার সাথে কি তোমাদের কোন চুক্তি হয়েছে। যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের মধ্যে সামনে এসে কে এ দাবী করতে পারে যে, আল্লাহ্ এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? আর তোমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে যদি কেউ এ কথা বলে থাকে, তাহলে তাকে ডেকে আন এবং জিজ্ঞেস কর যে তাদের মধ্যে কে খোদার নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছে। আসল কথা তোমরা নিজের সপক্ষে যেসব মন্তব্য করছ তার কোনই ভিত্তি নেই। এ বিবেকেরও পরিপন্থী। খোদার কোন কিতাবেও একথা লিখিত আছে দেখাতে পারবে না। তোমাদেরও কেউ এ দাবী করতে পারবে না যে, সে খোদার নিকট থেকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে। তোমরা যাদেরকে খোদা বানিয়ে রেখেছ তাদের কাউকেও এ সাক্ষ্য দেয়াতে পারবে না যে, খোদার ওখানে তোমাদেরকে জান্নাত নিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিবে। এ ভুল ধারণা তোমাদের কোথা থেকে হলো?(১০১)

و اذا الموؤدة سئلت - باى ذنب قتلت -

(التكوير :٨-٩)

"এবং যখন জীবিত অবস্থায় প্রোথিত শিশু সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (তাকবীর ঃ ৮-৯)

এ আয়াতের প্রকাশ ভংগীতে এমন প্রচন্ড ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে যার অধিক ধারণা করা যায় না। কিয়ামতের দিনে শিশুকন্যাকে জীবিত প্রোথিতকারী মাতাপিতা আল্লাহতায়ালার দৃষ্টিতে এমন ঘৃণ্য হবে যে তাদেরকে সম্বোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না তোমরা এ নিষ্পাপ শিশুকে কেন হত্যা করেছিলে? বরঞ্চ তাদের থেকে দৃষ্টি

ফিরিয়ে নিয়ে নিষ্পাপ শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে হতভাগিনী তুমি কোন অপরাধে নিহত হয়েছিলে? সে তার কাহিনী বিবৃত করে বলবে যে জালেম মা-বাপ তার উপর কী জুলুমই না করেছিল এবং কিভাবে তাকে মাটির তলায় পুঁতে মেরে ছিল। তাছাড়া এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে দুটি বিরাট বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে-যা শব্দে প্রকাশ করার পরিবর্তে বর্ণনা ভংগীতেই আপনা আপনি প্রকাশ লাভ করছিল। একটি এই যে, এর দ্বারা আরববাসীদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে যে, জাহেলিয়াত তাদেরকে নৈতিক অধঃপতনের কোন অতল তলে নিমজ্জিত করে রেখেছিল যে তারা আপন সন্তানকে স্বহস্তে জীবিত কবরস্থ করতো। তারপরও তাদের এ একগুঁয়েমি যে তারা এ জাহেলিয়াতের উপরই অবিচল থাকবে ও সে সংস্কার সংশোধন মেনে নেবে না যা নবী মুহাম্মদ (সা) তাদের বিকৃত ও অধঃপতিত সমাজে করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয় এই যে, আখেরাত যে অত্যাবশ্যক তার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ এতে পেশ করা হয়েছে। যে শিশুকে জীবিত দাফন করা হয়েছে, তার ত কোথাও না কোথাও প্রতিকার লাভের ক্ষেত্র থাকতে হবে। আর যেসব জালেম এ জুলুম করেছে, তাদের জন্যেও এমন একসময় আসা দরকার যখন তাঁদেরকে এ নির্মম জুলুমের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। দাফনকৃত শিশু কন্যাটির ফরিয়াদ শুনার জন্য দুনিয়ায় ত কেউ ছিল না। জাহেলিয়াতের সমাজে এ অমানবিক কাজটিকে না একবার অবৈধ কাজ বলে গণ্য করা হতো। না মা-বাপ এ কাজের জন্য লজ্জাবোধ করতো, আর না পরিবারের মধ্যে কেউ কেউ তাদের ভর্ৎসনা করার ছিল। সমাজেও এমন কেউ ছিল না যে তাদেরকে পাকড়াও করতে পারতো। তাহলে কি খোদার খোদায়ীর মধ্যেও এ বিরাট জুলুম প্রতিকারহীন হয়েই থাকবে?(১০২)

আখেরাত অস্বীকারের নৈতিক ফল

কুরআন পাকে আখেরাতের সম্ভাবনা ও তার অপরিহার্যতা সম্পর্কে এতো শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করার সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র আখেরাতের বিশ্বাসই সেই বস্তু যা মানুষের চরিত্র ও আচার-আচরণ সঠিক ও সুদৃঢ় নৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। এ নাহলে তাকে সে অন্যায় অত্যাচার, অনাচার-পাপাচার, চুক্তিভঙ্গ, আত্মসাৎ, কুকর্ম প্রভৃতি থেকে নিবৃত্ত করার কোন কিছুই থাকবেনা। এই কারণে যে, আখেরাত অস্বীকারকারী মুখে যতোই যুক্তির বহর দেখাক না কেন তাদের বাস্তব কার্যকলাপে জানা যায় যে, তারা প্রকৃতপক্ষে নৈতিক লাগামহীনতার স্বাধীনতা চায় এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আখেরাত অস্বীকার করে। এই সাথে কুরআনে ওসব নৈতিক অনাচার চিহ্নিত করা হয়েছে যা আরব সমাজে সাধারণত বিস্তার লাভ করেছিল। তারপর লোকের সামনে এ প্রশ্ন রাখা হয় যে, এসব অনাচার কি সে অবস্থাতেও অনুষ্ঠিত হতো যদি মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হতো যে, একদিন খোদার সামনে হাযির হয়ে নিজের এক একটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে।(১০৩)

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ - بَلْ يُرِيْدُ الاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ -(القيامه ۳ تا ۵)

মানলে নিজেদেরই ক্ষতি করবে। কারণ সারাজীবন এ ভুল ধারণায় কাটিয়ে দেবে যে, ভালোমন্দ যা কিছু তা এ দুনিয়ার মধ্যেই সীমিত। মৃত্যুর পর কোন বিচার হবে না যে আমাদের ভালোমন্দ কাজের কোন স্থায়ী পরিণাম প্রকাশিত হবে।(৯৮)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ امَنُوْا و عَمِلُوا الصّلِحتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ و مَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ - و خَلَقَ اللّهُ السَّموتِ و الاَرْضَ بِالْحَق و لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ و هُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ - (الجاثيه :٢١-٢٢)

যারা অন্যায় অনাচার করেছে তারা কি এ কথা মনে করে বসে আছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান আনয়নকারী ও নেক আমলকারীদেরকে একইরূপ করে দেব যে তাদের জীবন ও মৃত্যু একইরূপ হয়ে যাবে? তারা যে সিদ্ধান্ত করেছে তা খুবই খারাপ। আল্লাহ ত আসমান ও যমীনকে সত্যতাসহ সৃষ্টি করেছেন। আর এ জন্যে করেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেন তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়, লোকের উপর জুলুম করা না হয়। (জাসিয়া ঃ ২১-২২)

এ আখেরাত সত্য হওয়ার নৈতিক যুক্তি। নৈতিকতার ভালো ও মন্দ এবং কাজের মধ্যে পাপ ও পুণ্যের পার্থক্যের অনিবার্য দাবী এই যে সৎ ও অসৎ লোকের পরিণাম যেন এক না হয়। বরঞ্চ সৎ লোক যেন সৎ কাজের এবং অসৎ লোক অসৎ কাজের প্রতিদান যেন লাভ করে। তা যদি না হয়, এবং পাপ ও পুণ্যের প্রতিদান যদি একই রকম হয় তাহলে নৈতিকতায় ভালো ও মন্দের পার্থক্য একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়বে। এতে খোদার উপর বেইনসাফীর অভিযোগও আরোপ করা হয়। যারা দুনিয়ায় অসৎ কর্মের পথে চলে, তারা ত অবশ্যই চায় যে, কোন শাস্তি অথবা পুরস্কার না হোক। কারণ এ ধারণাই তাদের ভোগের জীবন বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভুর বিজ্ঞতা ও ইনসাফের এ পরিপন্থী যে অসৎ ও সৎ লোকের সাথে তিনি একই আচরণ করবেন এবং তিনি কিছুই দেখবেন না যে নেক মুমিন ব্যক্তি কিভাবে জীবন-যাপন করেছে এবং কাফের ও পাপাচারী এখানে কি বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। একব্যক্তি সারা জীবন নিজের উপরে নৈতিক বাধা নিষেধ আরোপ করে রাখলো, হকদারের হক আদায় করতে থাকলো, অন্যায় সুযোগ সুবিধা ও ভোগ বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখলো, সততা ও সত্যনিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি স্বীকার করলো। অন্যান্য লোক নিজেদের প্রবৃত্তির লালসা প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে পূরণ করলো, না খোদার হক চিনতে পারলো আর না মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকলো, যেভাবেই নিজের সুযোগ সুবিধা লাভ ও ভোগ বিলাস করতে পারতো তা করেছে। এখন খোদার কাছে এ আশা করা যায় যে, এ দু ধরনের মানুষের জীবনের এ পার্থক্য তিনি উপেক্ষা করবেন? মৃত্যু পর্যন্ত যাদের জীবন একরকম ছিল না, মৃত্যুর পর যদি তাদের পরিণাম একই রকম হয়, তাহলে খোদার খোদায়ীতে এর চেয়ে অধিক বেইনসাফী আর কি হতে পারে?

তারপর বলা হয় যে, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি কোন খেলা নয়। বরঞ্চ এক উদ্দেশ্যপূর্ণ ও বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনায় এ কথা ধারণার অতীত যে আল্লাহর প্রদত্ত এখতিয়ার ও উপায়-উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতঃ যারা ভালো কাজ করেছে এবং ভুল পন্থায় ব্যবহার করে অন্যান্যরা যে জুলুম ও ফাসাদ করেছে, এ উভয় প্রকার মানুষ শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে মাটিতে মিশে যাবে এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোন জীবন হবে না। যেখানে ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের ভালো ও মন্দ কাজের কোন ভালো ও মন্দ পরিণাম হবে না। যদি তাই হয়, তাহলে এ বিশ্বপ্রকৃতি একজন খেলোয়াড়ের খেলনা হবে, কোন এক বিজ্ঞ সত্তার তৈরী কোন উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা হবে না।(৯৯)

সূরা জাসিয়ার আয়াত ২১-২৩ এ সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে যে, আখেরাত অস্বীকার ঐসব লোক করে যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে চায় এবং আখেরাতের বিশ্বাসকে তাদের এ স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করে। তারপর যখন তারা আখেরাত অস্বীকার করে তখন তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব আরও বেড়ে চলে এবং তারা তাদের গোমরাহীতে দিন দিন অধিক মাত্রায় লিপ্ত হতে থাকে। এমন কোন অনাচার থাকে না যার থেকে তারা বিরত হয়। কারো অধিকার হরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা কোন জুলুম ও বাড়াবাড়ির সুযোগ পেলে তাদের কাছ থেকে এ আশা করা যায় না যে, তারা তার থেকে এ জন্যে বিরত থাকবে যে তাদের অন্তরে সত্য ও ইনসাফের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ আছে। যেসব ঘটনা দেখার পর মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তা তারা তাদের চোখের সামনে দেখতে পায়। কিন্তু তারা তার থেকে উলটো এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা যা করছে ঠিকই করছে এবং তাই তাদের করা উচিত। কোন ভালো কথা তাদের গ্রহণযোগ্য হয় না। যে যুক্তি কোন লোককে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে উপযোগী হতে পারে, তা তাদের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। বরঞ্চ তারা যতোসব যুক্তি তালাশ করে বের করে তাদের বল্গাহীন স্বাধীনতার সপক্ষে। তাদের মন-মস্তিষ্ক কোন ভালো চিন্তার পরিবর্তে প্রবৃত্তির লালসা যে কোন উপায়ে চরিতার্থ করার চিন্তায় থাকে। এ একথারই প্রমাণ যে আখেরাত অস্বীকার করাই মানবীয় চরিত্র ধ্বংসের কারণ। মানুষকে মনুষ্যত্বের সীমার মধ্যে কোন কিছু রাখতে পারলে তা শুধু এ অনুভূতি যে আমরা দায়িত্বহীন নই বরঞ্চ খোদার কাছে আমাদের প্রত্যেক কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। এ অনুভূতি না থাকলে, কেউ বিরাট আলেম হওয়া সত্ত্বেও জঘন্যতম আচরণ না করে পারে না।(১০০)

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ - اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ - اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ - اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لا اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ - سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ - اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ج فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ - (القلم :٣٥ تا ٤١)

আমরা কি অনুগত লোকদের অবস্থা অপরাধীদের মত করব? তোমাদের কি হয়েছে? কি রকম মন্তব্য করছ? তোমাদের কি এমন কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা পড় যে,

إِنَّ هَـؤُلَاءِ يُـحِـبُّـوْنَ الْـعَـاجِـلَـةَ وَ يَـذَرُوْنَ وَرَاءَهُـمْ يَـوْمًـا ثَـقِـيْـلاً ـ (الـدّهـر ٢٧)

এরা ত সত্বর লাভ করা যায় এমন বস্তু (দুনিয়া) ভালোবাসে এবং সামনে যে কঠিন দিন আসবে তা উপেক্ষা করে। (দাহর ঃ ২৭)

অর্থাৎ এ কুরাইশ কাফেরগণ যে কারণে নৈতিক ও আকীদাগত গোমরাহীর মধ্যে জিদের বশবর্তী হয়ে নিমগ্ন থাকতে চায় এবং যার ভিত্তিতে আল্লাহর রসূলের দাওয়াতের জন্যে তাদের কর্ণ বধির হয়ে গেছে, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাদের দুনিয়া-পুরস্তি এবং আখেরাতের ঔদাসীন্য। এজন্যে একজন সত্যপন্থী মানুষের পথ এদের পথ থেকে এতো পৃথক যে তাদের মধ্যে আপোসের কোন প্রশ্নই ওঠে না।(১০৬)

أَلْـهٰـكُـمُ الـتَّـكَـاثُـرُ ـ حَـتّٰـى زُرْتُـمُ الْـمَـقَـابِـرَ ـ كَـلاَّ سَوْفَ تَـعْلَـمُـوْنَ ـ ثُـمَّ كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْـلَـمُـوْنَ ـ كَـلاَّ لَـوْ تَـعْلَمُوْنَ عِـلْـمَ الْـيَـقِـيْـنِ ـ لَـتَـرَوُنَّ الْـجَـحِـيْـمَ ـ ثُـمَّ لَـتَـرَوُنَّـهَا عَـيْـنَ الْـيَـقِـيْـنِ ـ ثُـمَّ لَـتُـسْـئَـلُـنَّ يَـوْمَـئِـذٍ عَـنِ الـنَّـعِـيْـمِ ـ (الـتـكـاثـر ١ تـا ٨)

অপরের তুলনায় অধিকমাত্রায় দুনিয়ার সুখশান্তি লাভের চিন্তা তোমাদেরকে গাফলতির মধ্যে বা ঔদাসীন্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত (এ চিন্তায়) তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। কখনো না শিগগির তোমরা জানতে পারবে। তারপর (শুনে রাখ) কখনো না, তোমরা শিগগির জানতে পারবে। যদি তোমরা নিশ্চিতভাবে (এ আচরণের পরিণাম) জানতে পারতে (তাহলে তোমাদের কাজের ধরন এমন হতো না)। অতঃপর অবশ্যই তোমাদেরকে এসব নিয়ামতের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (তাকাসুর ঃ ১-৮)।

الـهٰـكـم। শব্দটি لـهـو থেকে উৎপন্ন। তার আসল অর্থ ঔদাসীন্য। কিন্তু আরবী ভাষায় এ শব্দটি এমন কাজের জন্যে বলা হয় যার দ্বারা মানুষের অনুরাগ এতো বেড়ে যায় যে, এতে নিমগ্ন হয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি সে উদাসীন হয়ে পড়ে। এ মূল থেকে যখন الـهٰـكـم। শব্দ বলা হয়, তখন তার অর্থ এই হয় যে, কোন ঔদাসীন্য তোমাকে এমন নিমগ্ন করে রেখেছে যে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন হুশজ্ঞানই থাকে না। তারই চিন্তা-ভাবনা তোমাকে পেয়ে বসে। আর এ নিমগ্নতা তোমাকে একেবারে গাফেল বানিয়ে দেয়।

تـكـاثـر উৎপন্ন كـثـرت থেকে। তার তিনটি অর্থঃ এক, মানুষ আধিক্য লাভের জন্যে চেষ্টা করে। দুই, আধিক্য লাভের জন্যে মানুষ একে অপর থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করে। তিন, লোক একে অপরের তুলনায় এ বিষয়ে গর্ব করে যে, অপর থেকে সে অনেক আধিক্য লাভ করেছে।

অতএব الـهٰـكـم الـتـكـاثـر। এর অর্থ হলোঃ আধিক্য অর্থাৎ অত্যধিক লাভ করার লালসা তোমাদেরকে নিজেদের মধ্যে এমন মগ্ন করে রেখেছে যে, তার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে। এখানে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়নি যে, তাকাসুর দ্বারা কোন্ জিনিসের আধিক্য এবং আল্হাকুম দ্বারা- কোন্

জিনিস থেকে গাফেল করা বুঝানো হয়েছে। এখানে الهكم বলে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাও ব্যাখ্যা করা হয়নি। এ ব্যাখ্যা না থাকার কারণে, এ শব্দগুলো দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝানো হয়েছে। 'তাকাসুর' এর অর্থ সীমিত নয়, বরঞ্চ দুনিয়ার সকল সুযোগ-সুবিধা, মুনাফা, ভোগ বিলাসের উপকরণ, শাসন ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ্যের উপকরণ যতো বেশী সম্ভব লাভ করার চেষ্টা চরিত্র করা, এসব লাভ করতে গিয়ে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অন্যান্য থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা এবং একে অপরের মুকাবিলায় তার আধিক্যের জন্য গর্ব করা, এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে আ-لهكم। বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে তাদের সংখ্যাও সীমিত থাকে না। বরঞ্চ প্রত্যেক যুগের লোক ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে এ সম্বোধনের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ যতো বেশী সম্ভব দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করা এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে সামনে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা ব্যক্তিবর্গেরও এবং জাতিসমূহেরও।

ঠিক তেমনি কোন্ জিনিস থেকে গাফেল করে রেখেছে এর ব্যাখ্যা যেহেতু الهكم التكاثر। এর মধ্যে নেই সে জন্যে এও ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে খোদা থেকে বিমুখ হয়েছে, আখেরাতের পরিণাম থেকে বিমুখ হয়েছে। নৈতিক সীমারেখা ও নৈতিক দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়েছে। তাদের মধ্যে শুধু জীবনের মান বৃদ্ধির চিন্তাই রয়েছে। এ বিষয়ে কোন চিন্তা নেই যে, মনুষ্যত্বের মান কতখানি নীচে নেমে যাচ্ছে। তাদের অধিক মাত্রায় ধনসম্পদ চাই। এ বিষয়ের কোন পরোয়া নেই যে তা কিভাবে লাভ করা হচ্ছে। ভোগ বিলাস ও দৈহিক আনন্দ সম্ভোগ তাদের সর্বাপেক্ষা কামনার বস্তু। এ সুখ সম্ভোগে নিমগ্ন থেকে সে এ বিষয়ে একেবারে গাফেল হয়ে গেছে যে এ আচরণের কি পরিণাম হতে পারে। তার ত যতো বেশী শক্তি, যতো বেশী সৈন্য সামন্ত, যতো বেশী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেরই চিন্তা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে। তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখে না যে, এসব কিছু খোদার যমীনকে জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ করার এবং মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার সরঞ্জাম। মোট কথা 'তাকাসুর' এর বহু ধরন আছে যা ব্যক্তি ও জাতিকে তার মধ্যে এমন মগ্ন করে রেখেছে যে, দুনিয়া ও তার সুখ সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর চিন্তাই তাদের নেই এবং এ চিন্তা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে মগ্ন করে রাখে।

এ ভ্রান্তি থেকে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা এ ভুল ধারণায় রয়েছ যে, দুনিয়ার এ আধিক্য এবং তার জন্যে প্রতিযোগিতা করে সামনে অগ্রসর হওয়াই উন্নতি ও সাফল্য। অথচ এ কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য হতে পারে না। অতিসত্বর এর অশুভ পরিণাম তোমরা জানতে পারবে এবং তোমরা জানতে পারবে যে, এ কত বড়ো ভ্রান্তি ছিল যার মধ্যে সারা জীবন মগ্ন ছিলে। অতিসত্বর বলতে আখেরাতও হতে পারে। কারণ যে সত্তার দৃষ্টি অনাদি কাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর জন্যে কয়েক হাজার অথবা কয়েক লক্ষ বছরও কালের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এর অর্থ মৃত্যুও হতে পারে। কারণ তা ত কোন মানুষ থেকেই দূরে নয়। আর মৃত্যুর সাথে সাথেই এ কথা মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, যে কাজ কর্মে সে তার গোটা জীবন কাটিয়ে এসেছে, তা তার সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্যের কারণ।(১০৭)

অতঃপর কুরআন স্বয়ং আরব সমাজ থেকেই কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছে যে আখেরাত বিমুখতা মানুষের মধ্যে কি কি অনাচার সৃষ্টি করেছে।

-মানুষ কি মনে করছে যে আমরা তাদের অস্থিগুলো একত্র করতে পারব না? আমরা ত তাদের আঙুলের গিঁটগুলো পর্যন্ত ঠিকমত বানিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু মানুষ চাচ্ছে যে সামনেও সে অপকর্ম করতে থাকবে। (কিয়ামাহ ঃ ৩-৫)

প্রথম দু আয়াতে অস্বীকারকারীদের ওসব কথার জবাব দেয়া হয়, যেমন তারা বলছিল যে, এ কি করে হতে পারে যে, যাদের মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতীত হয়েছে, যাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে গেছে, যাদের অস্থিগুলো জরাজীর্ণ হয়ে না জানি কোথায় কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যাদের মধ্যে কেউ আগুনে জ্বলে মরেছে, কেউ হিংস্র পশুর উদরস্থ হয়েছে, কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের আহারে পরিণত হয়েছে, তাদের দেহের অংশগুলো পুনরায় একত্র হবে এবং প্রত্যেক মানুষ ঠিক অবিকল সে মানুষটি হয়েই উঠবে যেমনটি দশবিশ হাজার বছর পূর্বে ছিল? এর অত্যন্ত যুক্তিসংগত ও অত্যন্ত শক্তিশালী জবাব আল্লাহতায়ালা এ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আকারে দিয়েছেন। তা এই "মানুষ কি মনে করছে যে, আমরা তার অস্থিগুলোকে একত্র করতে পারব না? অর্থাৎ তোমাদেরকে যদি একথা বলা হয়ে থাকতো যে, দেহের এ বিক্ষিপ্ত অংশগুলো কোন এক সময়ে আপনাআপনি একত্র হবে এবং তোমরা নিজে নিজেই এ দেহসহ জীবিত হয়ে উঠবে, তাহলে অবশ্য তোমাদের এটা অসম্ভব মনে করা সংগত হতো। কিন্তু তোমাদেরকে ত একথা বলা হয়েছিল যে এ কাজ স্বয়ং হবে না, বরঞ্চ আল্লাহতায়ালা এমনটি করবেন। এখন তাহলে কি তোমরা সত্যিই এ কথা মনে করছ যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, যাকে তোমরা স্বয়ং স্রষ্টা বলে মান, একাজ করতে অক্ষম?" এ এমন এক প্রশ্ন যার জবাবে খোদাকে স্রষ্টা বলে মানে এমন কোন ব্যক্তি না সে সময়ে একথা বলতে পারতো আর না আজ বলতে পারে যে খোদাও যদি এ কাজ করতে চান ত পারবেন না। কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলে, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, "তুমি যে দেহসহ এখন বিদ্যমান তার অসংখ্য অংশ বায়ু, পানি, মাটি এবং নাজানি কত স্থান থেকে একত্র করে ঐ খোদা কিভাবে এ দেহ তৈরী করলেন যাঁর সম্পর্কে তুমি বলছ যে, তিনি এসব অংশ একত্র করতে পারবেন না? তারপর বলা হলো, বড়ো বড়ো অস্থিগুলো একত্র করে তোমার দেহ কাঠামো পুনরায় বানিয়ে দেয়া কেন আমরা ত একাজ করতেও সক্ষম যে তোমাদের দেহের সূক্ষ্মতম অংশ এমনকি তোমাদের আঙুলের গিটগুলো পর্যন্ত অবিকল তেমন বানিয়ে দিতে পারি যেমনটি তা আগে ছিল।

শেষবাক্যে আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে। যে জিনিস আখেরাত অস্বীকার করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তা প্রকৃতপক্ষে এ নয় যে, তারা আখেরাতকে অসম্ভব মনে করে। বরঞ্চ তাদের এ অস্বীকারের প্রকৃত কারণ এই যে, আখেরাত মেনে নিলে অনিবার্যরূপে তাদের উপর কিছু নৈতিক বাধা নিষেধ আরোপিত হয় এবং এ তাদের জন্যে অসহনীয়। তারা চায় যে, যেভাবে তারা আজ পর্যন্ত নাকলবিহীন (নাকদড়ি বিহীন) বলদের ন্যায় যত্রতত্র চরে বেড়াচ্ছে, এভাবে ভবিষ্যতেও চরে বেড়াবে। যে জুলুম অত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার অনাচার তারা এখন পর্যন্ত করে চলেছে, তা করার পুরা লাইসেন্স যেন ভবিষ্যতেও পেয়ে যায়। এ ধারণা যেন তাদের এ অন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে যে, একদিন তাদেরকে তাদের খোদার সামনে হাজির হয়ে নিজেদের কর্মকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে। এজন্যে প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত রাখছে না, বরঞ্চ তাদের প্রবৃত্তির লালসা-বাসনাই এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক।(১০৪)

নিম্নের আয়াতে সে কথাটিই বলা হয়েছেঃ

وَمَا يُكَذِّبُ بِه الاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ - (الْمُطَفِّفِيْنَ : ١٢)

এবং সীমালংঘনকারী দুর্বৃত্ত ব্যতীত তা কেউ মিথ্যা মনে করে না।
(মুতাফ্ফেফীন ঃ ১২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّه لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ - (ص ٢٦)

-যারা আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে। এ জন্যে যে তারা হিসাবের দিন ভুলে গেছে। (সোয়াদ ঃ ২৬)

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ و تَذَرُوْنَ الاخِرَةَ -
(القيمة ٢٠-٢١)

কখনো না। আসল কথা এই যে, তোমরা সত্বর লভ্য জিনিস (দুনিয়া) ভালোবাস এবং আখেরাত পরিত্যাগ কর। (কিয়ামাহ ঃ ২০-২১)

এ আখেরাত অস্বীকারকারীদের অস্বীকারের দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণ ত উপরে বলা হলো যে তারা পাপাচারের পূর্ণ স্বাধীনতা চায় এবং ওসব নৈতিক বাধা নিষেধ থেকে বাঁচতে চায় যা আখেরাত মেনে নেয়ার পর তাদের উপর অনিবার্যরূপে আরোপিত হয়। এজন্যে প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তির লালসাই তাদেরকে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারপর তারা তাদের এ অস্বীকার প্রমাণ করার জন্যে যুক্তিতর্কের আশ্রয় নেয়।

এখন দ্বিতীয় কারণ এ বলা হয়েছে যে, আখেরাত অস্বীকারকারীগণ যেহেতু সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও অদূরদর্শী সে জন্যে তাদের দৃষ্টিতে সকল গুরুত্ব এ দুনিয়ার সুফলের প্রতি যা এখানে প্রকাশিত হয় এবং সে পরিণাম ফলের প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না যা আখেরাতে প্রকাশিত হবে। তারা মনে করে যে সুযোগ সুবিধা, অথবা ভোগ বিলাস অথবা আনন্দ সুখ এখানে লাভ করা আর তার জন্যেই সকল পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র নিয়োজিত করা উচিত, কারণ তা লাভ করতে পারলে যেন সব কিছু লাভ করা হলো -আখেরাতে তার পরিণাম যতোই মন্দ হোক না কেন। এভাবে তাদের ধারণা এই যে, এখানে যে ক্ষতি ও দুঃখকষ্ট হতে পারে তার থেকে বেঁচে থাকাই আসল কাজ এদিকে দৃষ্টিপাত না করে যে, এসব সহ্য করার ফলে যতো বড়ো প্রতিদানই আখেরাতে পাওয়া যাক না কেন, তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মতো সুদূর ভবিষ্যতের জন্যে তারা না এখনকার কোন মুনাফা ছাড়তে রাজী আর না কোন ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী। এ চিন্তাধারার সাথে যখন আখেরাতের বিষয়ের উপর কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা করতো, তখন তার মধ্যে কোন বিজ্ঞতা পাওয়া যেতো না বরঞ্চ তার পেছনে এ চিন্তাধারা কাজ করতো যে কারণে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতো যে, আখেরাত মেনে নেয়া যাবে না যদিও ভেতর থেকে তাদের বিবেক একথাই বলতো যে, আখেরাতের সম্ভাবনা ও অপরিহার্যতার যেসব যুক্তি কুরআনে দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং তার বিরুদ্ধে তারা যেসব যুক্তি পেশ করছে তা একেবারে অবান্তর।(১০৫)

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً - (الملك ٢)

-যিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট আমল কে করতে পারে। (মুলক ঃ ২)

অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষের জীবন মৃত্যুর ধারাবাহিকতা আল্লাহতায়ালা এ জন্যে শুরু করেছেন যাতে তাদের পরীক্ষা নিতে পারেন এবং দেখেন যে কার কাজকর্ম অধিক উৎকৃষ্ট। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে বহু সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

প্রথম কথা এই যে, মৃত্যু ও জীবন তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। জীবন ও মৃত্যুদানকারী দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ একটি সৃষ্টি হিসাবে তাকে ভালো ও মন্দ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। না তার জীবন উদ্দেশ্যহীন আর না তার মৃত্যু। স্রষ্টা তাকে এখানে পরীক্ষার জন্যে পয়দা করেছেন। জীবন তার জন্যে পরীক্ষার অবকাশ। মৃত্যুর অর্থ এই যে, তার পরীক্ষার সময় শেষ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্রষ্টা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন যাতে সে দুনিয়ায় কাজের মাধ্যমে ভালো ও মন্দ প্রকাশ করতে পারে এবং বাস্তবে দেখিয়ে দেয় যে, সে কেমন লোক।

চতুর্থতঃ স্রষ্টাই এ বিষয়ের সিদ্ধান্তকারী যে কার কাজ ভালো এবং কার মন্দ। অবশ্যি ভালো ও মন্দের মান নির্ণয় করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়। বরঞ্চ পরীক্ষকই মান নির্ণয়কারী। অতএব যেই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করতে চায় তার জানতে হবে যে, পরীক্ষকের নিকটে ভালো কাজ কি।

পঞ্চমতঃ পরীক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির যেমন কার্য হবে, তেমন তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। কারণ পুরস্কার না থাকলে পরীক্ষার কোন অর্থই হয় না।(১১১)

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا - اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا - (الدّهر ٢-٣)

আমরা মানুষকে যুগ্ম শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছি যেন তার পরীক্ষা নিতে পারি এবং এ উদ্দেশ্যেই তাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বানিয়েছি। আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি। তারপর সে শোকরকারীও হতে পারে। কুফরকারীও হতে পারে। (দাহর ঃ ২-৩)

এ হচ্ছে দুনিয়ার মানুষের এবং মানুষের জন্যে দুনিয়ার প্রকৃত মর্যাদা। সে বৃক্ষলতা ও পশুপাখীর মতো নয় যে, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির আইন অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপন অংশের কাজ সমাধা করে এখানেই মৃত্যুবরণ করে লয়প্রাপ্ত হবে। উপরন্তু এ দুনিয়া মানুষের জন্যে না শাস্তির স্থান, যেমন সন্ন্যাসীগণ মনে করে, আর না পুরস্কারের স্থান, যেমন পুনর্জন্মবাদীগণ মনে করে। আর এ চারণভূমিও নয় এবং চিত্তবিনোদনের স্থানও নয়, যেমন জড়বাদীরা মনে করে। এ সংগ্রাম

ক্ষেত্রও নয় যেমন ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীগণ মনে করে থাকে। বরঞ্চ এ মানুষের জন্যে এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। যাকে সে আয়ু মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে পরীক্ষার সময় যা তাকে এখানে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তু ব্যবহারের সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব দায়িত্বসহ সে এখানে কাজ করছে, তার মধ্যে এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান এসব প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষায় অগণিত প্রশ্নপত্র এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলতে থাকে। দুনিয়ায় তার ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা নয়, বরঞ্চ আখেরাতে এসব প্রশ্নপত্র যাঁচাই করার পর সিদ্ধান্ত করা হবে যে, সে কৃতকার্য হয়েছে, না অকৃতকার্য। তার সাফল্য এবং অসাফল্য এ বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে সে নিজেকে কি মনে করে এখানে কাজ করেছে এবং তাকে যে প্রশ্নপত্র দেয়া হয়েছে কিভাবে তার জবাব দিয়েছে। যদি সে নিজেকে কোন খোদারই বান্দাহ মনে করে না থাকে। অথবা বহু খোদার বান্দাহ মনে করেছে এবং সমস্ত প্রশ্নপত্রের জবাব এ মনে করে দিয়েছে যে, আখেরাতে তাকে তার স্রষ্টার কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তাহলে তার জীবনের সকল কর্মকান্ড ভুল হয়েছে। কিন্তু যদি সে নিজেকে এক খোদার বান্দাহ মনে করে সে পন্থায় কাজ করেছে যা খোদার ইচ্ছানুযায়ী হয়েছে এবং আখেরাতের জবাবদিহিকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে তাহলে সে পরীক্ষায় পাস করেছে।

তারপর বলা হয়েছে, আমরা তাকে শ্রবণকারী ও দর্শনকারী বানিয়েছি। যদিও আরবী ভাষার এ দুটি শব্দের سميع ও بصير অর্থ তাই অর্থাৎ 'শ্রবণকারী' ও 'দর্শনকারী, কিন্তু প্রত্যেক আরবী ভাষাভাষী জানে যে পশুর বেলায় سميع ও بصير শব্দদ্বয় কখনো ব্যবহৃত হয় না। যদিও পশু শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হয়ে থাকে। অতএব শ্রবণ করা এবং দেখার অর্থ এখানে শ্রবণ ও দর্শনের সে শক্তি নয় যা পশুকেও দেয়া হয়েছে। বরঞ্চ এর অর্থ ঐসব উপায় যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান লাভ করে এবং তারপর তার থেকে সুফল লাভ করে। তাছাড়া শ্রবণ এবং দর্শন মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়সমূহের মধ্যে যেহেতু অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যে সংক্ষেপে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা আসল উদ্দেশ্য মানুষকে সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞান দান করা যার মাধ্যমে সে জ্ঞান লাভ করে থাকে। অতঃপর মানুষকে যে ইন্দ্রিয় জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা আপন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ঐসব ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক যা পশুকে দান করা হয়েছে। কারণ তার প্রত্যেক অনুভূতির পেছনে একটি চিন্তাশীল মস্তিষ্ক আছে যা অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাবলী একত্র করে এবং সেগুলো সুবিন্যস্ত করে তার থেকে ফলাফল বের করে, অভিমত স্থির করে এবং তারপর কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যার উপর তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ তৈরী হয়। অতএব মানুষকে পয়দা করে আমরা তার পরীক্ষা নিতে চাই-এ কথা বলার পর বলা হলো, এ উদ্দেশ্যে আমরা তাকে 'সামী' ও 'বাসীর' বানিয়েছি। এর প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহতায়ালা তাকে জ্ঞান-বিবেকের শক্তি দান করেছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য হতে পারে। এ কথা ঠিক যে, যদি কালামে ইলাহীর উদ্দেশ্য এ না হয় এবং 'সামী' ও 'বাসীর' বানাবার উদ্দেশ্য নিছক শ্রবন ও দর্শনের শক্তি বানানো হয়, তাহলে একজন অন্ধ ও বধির ব্যক্তি ত পরীক্ষা থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। অথচ যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি জ্ঞান ও বিবেক থেকে বঞ্চিত না হয়েছে, ততোক্ষণ তার পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি লাভের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ط اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ - لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ - يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (الْمُطَفِّفِين : ١ تا ٦)

-ধ্বংস! মাপে প্রতারণাকারীদের জন্যে। তাদের অবস্থা এই যে, যখন তারা লোকের নিকট থেকে গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদেরকে যখন ওজন করে দেয় তখন (কম দিয়ে) তাদের ক্ষতি করে। এরা কি বোঝে না যে, একটা মহাদিনে তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? তা এমন এক দিন, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়াবে। (মুতাফ্‌ফেফীন ঃ ১-৬)

مطففين শব্দটি طفيف থেকে উৎপন্ন। আরবী ভাষায় তার অর্থ ছোট ও নগন্য বস্তু। আর تطفيف শব্দ পরিভাষা হিসাবে ওজনে চুরি করে কম দেয়াকে বুঝায়। কারণ এ কাজ যে করে সে ওজন করে দিতে বা নিতে বেশী পরিমাণে মেরে দেয় না। বরঞ্চ হাতছাপাই করে প্রত্যেক খদ্দের থেকে সামান্য পরিমাণ করে ঠকিয়ে নেয় এবং খদ্দের বেচারা বুঝতেই পারে না যে ব্যবসায়ী তার কতটা লোকসান করলেন। এ কথা ঠিক যে, এই যে অনাচারটি সমাজে প্রচলিত ছিল, তা কখনো প্রসার লাভ করতে পারতো না, যদি মানুষ আখেরাতের কথা মনে করতো।(১০৮)

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ - وَلاَ تَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا - وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا - (الفجر ١٧ تا ٢٠)

কখনো না। (দুনিয়ার উন্নতি অথবা দুর্গতি সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড নয়)। কিন্তু তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর না। আর মিসকিনকে অন্ন দানের ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ কর না। উত্তরাধিকারের সমস্ত মাল একত্র করে খেয়ে ফেল এবং ধনসম্পদের ভালোবাসায় বা লালসায় তোমরা অধীর। (ফজর ঃ ১৭-২০)

অর্থাৎ এই যে তোমরা দুনিয়ার উন্নতি ও দুর্গতিকে সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড মনে করে আছ তা তোমাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। নতুবা প্রকৃত মানদন্ড ত হচ্ছে চারিত্রিক মাধুর্য ও কুস্বভাব। তোমাদের অবস্থা এই যে যতো দিন এতিমের বাপ জীবিত থাকে ততোদিন তার সাথে তোমাদের আচরণ একরকম হয়ে থাকে এবং যখন তার বাপ মৃত্যুবরণ করে তখন প্রতিবেশী ও দূর সম্পর্কের আত্মীয় ত দূরের কথা, চাচা, মামু এমনকি বড়ো ভাই পর্যন্ত তাকে দেখতে পারে না। তোমাদের সমাজে দরিদ্র লোকদেরকে অন্ন দানের কোন প্রচলন নেই। না কেউ স্বয়ং কোন ক্ষুধার্তকে আহার দানে প্রস্তুত হয়, আর না লোকের মধ্যে এ অনুপ্রেরণা দেখতে পাওয়া যায় যে, ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা মেটাবার কোন চিন্তা-ভাবনা করে এবং একে অপরকে তার ব্যবস্থাপনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। উত্তরাধিকারে তোমরা নারী ও শিশুকে ত বঞ্চিত করে রেখেছ। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়, সে দ্বিধাহীন চিত্তে সকল উত্তরাধিকার আত্মসাৎ

করে ফেলে। যারা তাদের অংশ লাভ করার শক্তি সামর্থ্য রাখে না, তাদের অংশ মারা যায়। তোমাদের দৃষ্টিতে অধিকার ও দায়িত্বের কোন পার্থক্য নেই যে, ঈমানদারির সাথে আপন দায়িত্ব মনে করে হকদারকে তার হক দিয়ে দেবে-সে তা আদায় করার শক্তি রাখুক বা না রাখুক। সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে জায়েয না জায়েয এবং হালাল হারামের কোন চিন্তা তোমাদের নেই। যেমন করেই হোক সম্পদ লাভ করতে তোমাদের কোন দ্বিধা নেই। আর যতোই সম্পদ তোমরা লাভ কর না কেন তোমাদের লোভ-লালসার অগ্নি কখনো নির্বাপিত হয় না।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

(الماعون ١ تا ٣)

তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি মিথ্যা মনে করে? এত সেই, যে এতিমকে ধাক্কা (দিয়ে বের করে) দেয় এবং মিসকিনকে খানা দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে না। (মাউন ঃ ১-৩)

এখানে আল্লাহ তায়ালা দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রকৃত পক্ষে এ কথা বলেছেন যে, আখেরাতের অস্বীকার মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নৈতিক কুফল বয়ে আনে। এ দুটি অনাচার ধরে দেয়াটাই আসল উদ্দেশ্য নয় যে, আখেরাত না মানলে শুধু এ দুটি কুফলই দেখা যায় যে, মানুষ এতিমদেরকে তিরস্কার করে এবং মিসকিনকে আহার দানে উদ্বুদ্ধ করে না। বরঞ্চ এ গোমরাহির ফলে যে অসংখ্য অনাচার দেখা দেয়, তার মধ্যে দুটি এমন জিনিস দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে যাকে প্রত্যেক সুস্থ প্রকৃতির লোক মেনে নেবে যে, তা অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের কাজ। এর থেকে এ কথাই হৃদয়ে বদ্ধমূল করা উদ্দেশ্য যে, যদি এই ব্যক্তি খোদার সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহির কথা মেনে নিত, তাহলে তার দ্বারা এমন জঘন্য আচরণ হতো না যে সে এতিমের হক মারবে, তার উপর জুলুম করবে, তাকে তিরস্কার করবে এবং মিসকিনকে না স্বয়ং খানা খাওয়াবে, আর না কাউকে খাওয়াতে বলবে। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর গুণাবলী ত সূরা বালাদ এবং সূরা আসরে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা একে অপরের প্রতি খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের নসিহত করে এবং একে অপরকে সত্যনিষ্ঠা ও অধিকার পূরণ করে দেয়ার নসিহত করে।(১১০)

দুনিয়া মানুষের পরীক্ষা ক্ষেত্র

একদিকে কুরআন আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষের প্রতিটি সন্দেহ-সংশয় অত্যন্ত যুক্তিসংগত উপায়ে দূর করেছে এবং অপরদিকে সে মানুষকে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, সে তার গাফলতির কারণে দুনিয়াকে নিছক চারণভূমি অথবা চিত্তবিনোদনের স্থান মনে করে বসে আছে। অথচ এ হচ্ছে একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র যেখানে সর্বদা আপন জীবনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সামগ্রিক ব্যাপারে সে আসলে পরীক্ষা দিচ্ছে। আর এ পরীক্ষা তার অজ্ঞাতে নেয়া হচ্ছে না, বরঞ্চ আল্লাহতায়ালা তাকে একথা বলে দেয়ার পুরোপুরি ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন যে-এখানে তার সাফল্য এবং অসাফল্য কিসের উপর নির্ভরশীল।

কাজের পার্থক্য এবং তাদের উপস্থাপিত চারিত্রিক মূলনীতি ও আইনানুগ নির্দেশাবলী সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যায়নি। তাদের একথা জানা থাক বা না থাক যে এ জ্ঞান তারা আম্বিয়া এবং আল্লাহর কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকে লাভ করেছে। আজ যারা আম্বিয়া ও প্রেরিত কিতাবসমূহ অস্বীকার করে, অথবা সে সবের কোন খবর রাখে না, তারাও বহু কিছু মেনে চলে যা প্রকৃতপক্ষে নবী ও কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই কোন না কোনভাবে তাদের নিকটে পৌঁছেছে এবং তারা জানে না যে, এ সবের আসল উৎস কি।(১১২)

সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি দিন নির্ধারিত আছে

তারপর কুরআনের স্থানে স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার ফলাফল এ দুনিয়ায় প্রকাশিত হবে না। বরঞ্চ একটা সময় তার জন্যে নির্ধারিত আছে যখন দুনিয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বংশধরদের দ্বিতীয়বার জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদের সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে। প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি দেয়া হবে।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ - (الدُّخَان : ٤٠)

সকলের জন্যে সিদ্ধান্তের একটা নির্ধারিত সময় আছে। (দুখান ঃ ৪০)

قُلْ اِنَّ الاَوَّلِيْنَ وَالاخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ - (الواقعه ٤٩ - ٥٠)

-তাদেরকে বল, নিশ্চিতরূপে আগের এবং পরের সকলকেই একদিন অবশ্যই একত্রে জমা করা হবে যার সময় নির্ধারিত আছে। (ওয়াকেয়া ঃ ৪৯-৫০)

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموتِ و مَنْ فِى الاَرْضِ الاَّ مَنْ شَاءَ اللّهُ - ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ - (الزُّمَر ٦٨)

-এবং সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সেসব মরে পড়ে যাবে যা আসমান ও যমীনে আছে তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চান (যেমন ফেরেশতাগণ)। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁকানো হবে এবং তখন হঠাৎ সকলে উঠে দেখতে থাকবে। (যুমার ঃ ৬৮)

و قِيْلَ لِلظّلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ - (الزُّمَر ٢٤)

-এবং জালেমদের বলা হবেঃ তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর। (যুমার ঃ ২৪)

উপরে كسب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় তার অর্থ পুরস্কার ও শাস্তির সে অধিকার যা মানুষ তার কর্মের দ্বারা লাভ করে। নেক আমলকারীর প্রকৃত উপার্জন এই যে, সে আল্লাহর প্রতিদানের অধিকারী হয়। যারা কুপথ অবলম্বন করবে তাদের উপার্জন হলো সে শাস্তি যা তারা আখেরাতে লাভ করবে। (১১৩)

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ - (المؤمن ١٧)

-(সে সময়ে বলা হবে) আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সে উপার্জনের প্রতিদান দেয়া হবে যা সে দুনিয়ায় করেছে। আর কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। (মুমেন ঃ ১৭)

অর্থাৎ কোন প্রকার জুলুমই করা হবে না। উল্লেখ্য যে, প্রতিদানের ব্যাপারে জুলুমের কয়েক ধরন হতে পারে। একঃ এই যে, মানুষ কোন প্রতিদানের অধিকারী হলো এবং তা তাকে দেয়া হলো না। দ্বিতীয়ঃ সে যতোখানি প্রতিদানের অধিকারী তা পুরোপুরি দেয়া হলো না। তৃতীয়ঃ শাস্তির অধিকারী নয়, কিন্তু শাস্তি দেয়া হলো। চতুর্থঃ সে শাস্তির অধিকারী কিন্তু শাস্তি দেয়া হলো না। পঞ্চমঃ কেউ অল্প শাস্তির যোগ্য কিন্তু তাকে বেশী শাস্তি দেয়া হলো। ষষ্ঠঃ মজলুম চেয়ে রইলো এবং তার সামনে জালেম অব্যাহতি পেয়ে বেরিয়ে গেল। সপ্তমঃ একজনের অপরাধে অন্যজনকে ধরা হলো। আল্লাহতায়ালা চান জুলুম যতো প্রকারের হতে পারে তার কোন একটিও যেন তাঁর আদালত থেকে না হয়।(১১৪)

মানুষ যা কিছুই দুনিয়ায় করে আল্লাহ্ তায়ালা সে সম্পর্কে সরাসরি অবগত

কুরআন পাকে একথাও বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে মানুষ যা কিছুই করছে, আল্লাহ্ তায়ালা সে সম্পর্কে সরাসরি অবগত। মানুষের কোন কাজ, এমনকি তার মনের কোন ধারণা-বাসনাও আল্লাহর কাছে গোপন থাকতে পারে না। এ জন্যে বিচার দিবসে মানুষ সেই খোদার সামনে হাজির হবে যিনি তার জীবনের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।

وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ - (الملك ١٣)

তোমরা চুপে চুপে কথা বল অথবা উচ্চঃস্বরে (তাঁর কাছে সমান) তিনি ত মনের অবস্থাও জানেন। (মুলক ঃ ১৩)

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ - بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ - (الزخرف ٨٠)

তারা কি মনে করছে আমরা তাদের গোপন কথা এবং কানাঘুষা শুনছি না? আমরা সবই শুনছি। (উপরন্তু) আমাদের ফেরেশতাগণ তাদের নিকটে থেকে সব লিখে নিচ্ছে। (যুখরুফ ঃ ৮০)

وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ - (ق ١٦)

তার মনের মধ্যে উদ্ভূত কুচিন্তাগুলো (অসঅসা) পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (কাফ ঃ ১৬)

তারপর বলা হয়েছে, আমরা তাকে শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিবেকের শক্তি দান করেই ছাড়িনি, বরঞ্চ সেই সাথে তাকে পথ প্রদর্শনও করেছি যাতে সে জানতে পারে শোকর করার পথ কোনটা এবং কুফর করার পথ কোনটা। তারপর যে পথই সে অবলম্বন করুক, তার দায়-দায়িত্ব তারই হবে। সূরায়ে বালাদে এ বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে–

وَ هَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ

আমরা তাকে উভয় পথই (ভালো ও মন্দ) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছি।

আবার সূরায়ে শামসে এ কথাই এভাবে বলা হয়েছে-

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰهَا ۔

-এবং কসম (মানুষের) মনের এবং সে সত্তার যিনি তাকে (সকল প্রকাশ্য ও গোপন শক্তিসহ) সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তার উপর ইলহাম করে দিয়েছেন তার পাপ প্রবণতা ও খোদাভীতি।

এসব কিছু সামনে রেখে যদি দেখা যায় এবং সেই সাথে কুরআন মজিদের ঐসব বিশদ বিবরণের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের জন্যে কি কি ব্যবস্থাপনা করেছেন, তাহলে জানা যায় যে, এ আয়াতে 'পথ দেখানো' এর অর্থ পথ দেখানোর কোন একই পন্থা নয় বরঞ্চ অগণিত পন্থা রয়েছে। যেমনঃ

১। প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান বিবেকের যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে এক নৈতিক অনুভূতিও দেয়া হয়েছে যার বদৌলতে সে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, কিছু কাজ ও গুণাবলী সে মন্দ মনে করে যদিও তার মধ্যে সে লিপ্ত হয় এবং কিছু কাজ ও গুণাবলী সে ভালো মনে করে যদিও সেসব থেকে সে দূরে থাকে। এমনকি যারা তাদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির লালসার খাতিরে এমন সব দর্শন আবিষ্কার করেছে যার ভিত্তিতে বহু পাপাচার অনাচার তাদের জন্যে হালাল করে নিয়েছে, তাদের অবস্থাও এই যে, এসব অনাচারই যদি অন্য কেউ তাদের সাথে করে, তাহলে তখন আর্তনাদ করে ওঠে এবং তখন জানতে পারা যায় যে, তাদের নিজেদের ভ্রান্ত দর্শন সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা মন্দ মনে করে। ঠিক তেমনি সৎ কাজ ও গুণাবলীকে কেউ যতোই অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং সেকেলে গণ্য করুক না কেন, কোন লোকের সৎ আচরণের দ্বারা নিজে উপকৃত হলে তার প্রকৃতি তাকে মর্যাদার যোগ্য মনে করতে বাধ্য হয়।

২। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহতায়ালা বিবেক (তিরস্কারকারী মন নফসে লাওয়ামা) বলে একটি বস্তু রেখে দিয়েছেন যে তাকে কোন মন্দ কাজ করার সময় বাধা দেয়। এ বিবেককে মানুষ যতোই আদর করে ঘুমিয়ে দিক অথবা যতোই অনুভূতিহীন বানাবার চেষ্টা করুক, তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হবে না। সে নির্লজ্জ সেজে নিজেকে একেবারে বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, বানোয়াট দলিল প্রমাণ দ্বারা সে দুনিয়াকে প্রতারিত করার সকল চেষ্টা করতে পারে, সে নিজের মনকেও ধোঁকা দেয়ার জন্যে স্বীয় কাজকর্মের অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহতায়ালা তার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে যে দোষদর্শক (CRITIC) বসিয়ে রেখেছেন সে এতো জীবন্ত যে কোন অসৎ লোকের নিকটেও এ কথা গোপন থাকবে না যে, সে প্রকৃতপক্ষে কি। এ কথাটিই সূরায়ে কিয়ামাতে এভাবে বলা হয়েছে-

-বরঞ্চ মানুষ নিজেই নিজেকে খুব ভালোভাবে জানে, সে যতোই ওজর-আপত্তি পেশ করুক না কেন।

৩। মানুষের আপন অস্তিত্বের মধ্যে, তার চারপাশের যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির চতুর্দিকে এমন অগণিত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে যারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, এসব খোদা ব্যতীত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর না বহু খোদা এ বিশ্ব কারখানার নির্মাণ ও পরিচালনাকারী হতে পারে। এভাবে উর্ধজগত ও অন্তর্জগতের এসব নিদর্শন কিয়ামত এবং আখেরাতের যুক্তি প্রমাণ পেশ করে। মানুষ যদি এসব থেকে চক্ষু বন্ধ করে নেয় অথবা বিবেক দ্বারা চালিত হয়ে এ সবের উপর চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা এসব যে সত্যাবলীকে চিহ্নিত করে তা মেনে নিতে যদি সে ইতস্ততঃ করে, তাহলে এটা হবে তার নিজের দোষ। আল্লাহতায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে সত্যের সংবাদ দানকারী নিদর্শনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরতে কোন কিছু বাকী রাখেননি।

৪। মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক দুনিয়ায় এবং অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতার অসংখ্য অগণিত এমন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা একথা প্রমাণ করে যে, একটি উচ্চতর সরকার তার এবং সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির শাসন চালাচ্ছে যার সামনে মানুষ একেবারে অসহায়, যার ইচ্ছা প্রতিটি বিষয়ের উপর বিজয়ী এবং মানুষ যার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শুধু বহির্জগতেই এ সত্যের সংবাদ দান করে না, বরঞ্চ মানব প্রকৃতির মধ্যেও সেই উচ্চতর শাসন কর্তৃত্বের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান যার ভিত্তিতে বড়ো বড়ো নাস্তিকও চরম বিপদের সময় খোদার সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে।

৫। মানুষের বিবেক ও তার প্রভাব প্রকৃতি পরিপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, অপরাধের শাস্তি এবং ভালো কাজের পুরস্কার লাভের প্রয়োজন আছে। এর ভিত্তিতেই তো প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন আকারে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং যে কাজ প্রশংসনীয় মনে করা হয় তার জন্যে পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করা হয়। এ একথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান প্রতিশোধ আইনের (LAW OF RETRIBUTION) মধ্যে এমন এক অপরিহার্য সম্পর্ক রয়েছে যে, তা অস্বীকার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন যদি এ কথা সর্বস্বীকৃত হয় যে, দুনিয়ায় এমন অসংখ্য অপরাধ আছে তার পূর্ণ শাস্তি ত দূরের কথা, কোন শাস্তিই দেয়া যায় না এবং অসংখ্য ভালো কাজ এমন আছে যার যথাযথ পুরস্কার তো দূরের কথা কোন পুরস্কারই সৎকর্মশীল ব্যক্তি লাভ করে না। তাহলে আখেরাতকে স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। অবশ্যি এমন কোন নির্বোধ যদি এটা মনে করে অথবা কোন হঠকারী এ সিদ্ধান্ত করতে চায় যে, সুবিচারের ধারণা পোষণকারী লোক এমন এক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে যে নিজেই কোন সুবিচারের ধারণা রাখে না। তাহলে অন্য কথা। তারপর এ প্রশ্নের জবাব তার দায়িত্বে থেকে যায় যে, এমন দুনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মানুষের মনে সুবিচারের ধারণা এলো কোথা থেকে?

৬। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্যে দুনিয়ায় নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন যাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, শোকরের পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি এবং তারপর এই দুই পথে চলার পরিণাম কি। নবীগণ এবং আল্লাহর কিতাবসমূহের আনীত এসব শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে যে, কোন মনুষ্য জনপদ খোদার ধারণা, আখেরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - (الحديد ٤)

-তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সাথেই রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাক। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখছেন। (হাদীদ ঃ ৪)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ و مَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ - و اللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ - (المؤمن ١٩-٢٠)

আল্লাহ (তোমাদের) চোরা চাহনী পর্যন্ত জানেন এবং সে সব রহস্যও জানেন যা বুকে লুকায়িত আছে। আল্লাহ হক ফয়সালা করবেন। (মুমেন ঃ ১৯-২০)।(১১৫)

আখেরাতে অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা তার কাজের প্রমাণ পেশ করা হবে

কুরআন মজিদে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন না। বরঞ্চ তিনি প্রত্যেকের কাজ কর্মের পরিপূর্ণ, বিস্তারিত এবং সঠিক রেকর্ড তৈরী করাচ্ছেন। তারপর আদালতে আখেরাতে মানুষের কর্মকান্ডের এমন সব সাক্ষ্য পেশ করা হবে যা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ و عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

(ق ١٧-١٨)

দুজন লেখক তার ডানে ও বামে বসে সব কিছু লিখে রাখছে। তার মুখ থেকে এমন কোন কথা বেরুচ্ছে না যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদ্য উপস্থিত সংরক্ষক সেখানে থাকে না। (কাফ ঃ ১৭-১৮)

এসব কথার মর্ম এই যে, একদিকে ত আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সরাসরি মানুষের চলাফেরা, চালচলন ও অংগভংগী এবং মনের হাবভাব জানেন, অপরদিকে প্রত্যেক মানুষের জন্যে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যাঁরা তার এক একটি কথা লিপিবদ্ধ করছেন। তার কোন কথা ও কাজ তাঁদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। তার অর্থ এই যে, যে সময়ে আল্লাহ তায়ালার আদালতে মানুষকে পেশ করা হবে, তখন স্বয়ং 'আল্লাহ অবগত থাকবেন যে কে কি করে এসেছে। সাক্ষাৎ দেয়ার জন্যে দুজন ফেরেশতাও থাকবেন যাঁরা তার কাজকর্মের দলিল দস্তাবিজ প্রমাণস্বরূপ সামনে রাখবেন। এসব দলিল প্রমাণাদি কি ধরনের হবে তা সঠিক অনুমান করা আমাদের জন্যে বড়ো কঠিন। কিন্তু যেসব তথ্য আমাদের সামনে উদঘাটিত হচ্ছে তা দেখার পর একথা নিশ্চিতরূপে জানতে পারা যায় যে, যে পরিবেশে মানুষ বাস করে এবং কাজকর্ম করে, সেখানে চারদিকে তার ধ্বনি, ছবি, নড়ন চড়ন, ভাবভংগীর ছাপ প্রতিটি অনু-পরমাণুর উপরে অংকিত হচ্ছে তার মধ্য থেকে একটিকে অবিকল সেই আকৃতিতে ও ধ্বনিতে দ্বিতীয়বার এমনভাবে পেশ করা যেতে পারে যে আসল ও নকলের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকবে না। আজ মানুষ একেবারে

সীমিত আকারে যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করছে। কিন্তু খোদার ফেরেশতাগণ না এসব যন্ত্রের মুখাপেক্ষী, আর না এসব বিধিবন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের আপন দেহ এবং তার চারিধারের প্রতিটি বস্তু তাঁদের টেপ এবং তাঁদের ফিল্ম যার ওপর তাঁরা প্রত্যেক ধ্বনি ও ছবিকে তার অতি সুক্ষ্ণ ও পুংখানুপুংখ অবস্থাসহ অবিকল অংকিত করতে পারেন এবং কিয়ামতের দিন মানুষকে তার আপন কানে ও তার আপন ধ্বনিতে তার সে সব কিছু শুনাতে পারেন যা সে দুনিয়ায় করছিল। তার আপন চোখে তার সকল কর্মকান্ডের চলমান ছবি দেখাতে পারেন যার সত্যতা অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এখানে একথাও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের আদালতে কোন ব্যক্তিকে তাঁর স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন না। বরঞ্চ সুবিচারের সকল শর্ত পূরণ করে শাস্তি দেবেন। এ জন্যে দুনিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির কথা ও কাজের পরিপূর্ণ রেকর্ড তৈরী করানো হচ্ছে যাতে তার কর্মকান্ডের পরিপূর্ণ প্রমাণ অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা সরবরাহ করা হয়।(১১৬)

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ - كِرَامًا كَاتِبِيْنَ
يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ - (اَلانفطار ١٠ تا ١٢)

(তোমাদের তদারককারী নিযুক্ত আছে। তারা এমন সম্মানিত লেখক যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে অবহিত। (ইনফিতার ঃ ১০-১২)

অর্থাৎ তোমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার কর অথবা তা মিথ্যা মনে কর অথবা তার প্রতি বিদ্রূপ কর, তাতে সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। প্রকৃত সত্য এই যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে দুনিয়ায় লাগামহীন উট বানিয়ে ছেড়ে দেননি। বরঞ্চ তিনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ তদারককারী নিযুক্ত করে রেখেছেন যারা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সকল ভালোমন্দ কাজ রেকর্ড করছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের কাছে গোপন নেই, তা তোমরা অন্ধকারে, কোন নিভৃত স্থানে জনমানবশূন্য বন জংগলে, অথবা এমন কোন অবস্থায় তা কর না কেন যেখানে তোমরা নিশ্চিত যে তোমরা যা কিছু করেছ তা লোকের দৃষ্টিগোচর থেকে লুকিয়ে আছে।

এসব তদারককারী ফেরেশতাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা كِرَامًا كَاتِبِيْنَ শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা এমন লেখক যাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত। কারো সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নেই যে, কারো প্রতি অন্যায়ভাবে করুণা প্রদর্শন করবেন এবং কারো অন্যায় বিরোধিতা করে ঘটনার বিপরীত রেকর্ড তৈরী করবেন। তাঁরা খিয়ানতকারীও নন যে, কাজে হাজির না হয়েও নিজে নিজেই বানোয়াট রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করলেন। তাঁরা ঘুষখোরও নন যে, কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করলেন। তাঁদের স্থান এ সকল নৈতিক দুর্বলতার উর্ধে। এ জন্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকারের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, প্রত্যেকের সৎকাজ কোন কমিকমা না করে রেকর্ড করা হবে এবং কারো উপর এমন কোন পাপ কাজ আরোপ করা হবে না যা সে করেনি।

অতঃপর সেসব ফেরেশতার দ্বিতীয় গুণ এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যা কিছু তোমরা করছ তা তারা জানে।" অর্থাৎ তাঁদের অবস্থা দুনিয়ার সিআইডি ডিআইবি বিভাগের লোকদের মত নয় যে, সকল চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও বহু কিছু তাদের অজানা থেকে যায়।

তাঁরা প্রত্যেকের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকেন। প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক অবস্থায় প্রতিটি মানুষের সাথে তাঁরা এমনভাবে লেগে থাকেন যে সেও জানতে পারে না যে কেউ তার তদারকি করছে। তাঁরা এটাও জানতে পারেন কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে কোন কাজ করেছে। এ জন্যে তাঁদের তৈরী রেকর্ড একটি পরিপূর্ণ রেকর্ড যাতে কোন কিছু লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে ছুটে যায় না। এ সম্পর্কে সূরায়ে কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পাপীগণ দেখে বিস্মিত হবে যে, তাদের যে নামায়ে আমল (কৃতকর্মের রেকর্ড) পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে ছোটো বড়ো কোন কিছুই সন্নিবেশিত হওয়া থেকে বাদ পড়েনি। যা কিছু তারা করেছে তা অবিকল তাদের সামনে তারা দেখতে পাচ্ছে।(১১৭)

و اَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقَالَهَا - و قَالَ الانْسَانُ مَالَهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا - (الزِّلزل ٢ تا ٥)

এবং যমীন তার ভেতরের সকল বোঝা বের করে বাইরে ফেলে দেবে। এবং মানুষ বলবে ঃ এ তার কি হচ্ছে? সেদিন সে (যমীন) তার উপর সংঘটিত সকল অবস্থা বর্ণনা করবে। কারণ তোমার রব তাকে এরূপ করার হুকুম দিয়ে থাকবেন। (যিলযাল ঃ ২-৫)

এ হচ্ছে সেই বিষয় যা সুরা ইনশিকাক ৪ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-

و اَلْقَتْ مَا فِيْهَا و تَخَلَّتْ -

এবং যা কিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।

এর কয়েকটি অর্থ। একঃ মৃত মানুষ যমীনের মধ্যে যেখানে যেখানে যে আকৃতিতে যে অবস্থায় পড়ে থাকবে সেসব বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্য এ কথা বুঝায় যে, সে সময়ে তাদের দেহের যাবতীয় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলো একত্রে জমা হয়ে নতুন করে সেই আকার আকৃতিতে জীবিত হবে যেমন তারা প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। কারণ এমন যদি না হয়, এবং তারা যদি একেবারে নতুন লোক হয় তাহলে তারা কি করে বলবে যমীনের এ কি হলো? নতুন লোক যমীনের প্রথম অবস্থা দেখলোই বা কখন যে তারা এমন কথা বলবে?

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শুধু মৃত ব্যক্তিদেরকেই বাইরে নিক্ষেপ করেই সে ক্ষান্ত হবে না। বরঞ্চ তাদের প্রথম জীবনের কাজ কর্ম অংগভংগী, চলাফেরা ও আচার-আচরণের সাক্ষ্যসমূহের যে স্তূপ তার মধ্যে দাবানো ছিল, সে সবকেও সে বের করে বাইরে ফেলে দেবে।

তারপর পরবর্তী বাক্যদ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে, যমীন তার উপর সংঘটিত অবস্থা বর্ণনা করবে।

তৃতীয় অর্থ, কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন যে, সোনা, রৌপ্য, রত্ন এবং বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ যা মাটির তলায় হয়ে থাকে, তারও স্তূপ বের করে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং মানুষ দেখবে যে এই হলো সেসব বস্তু যার জন্যে সে পৃথিবীতে জীবনপাত করতো, যার জন্যে সে কত খুন করেছে, হকদারদের হক মেরেছে, চুরি ডাকাতি করেছে,

জলে স্থলে লুটতরাজ করেছে, যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং কত জাতিকে ধ্বংস করেছে। আজ সেসব কিছু সম্মুখে বিদ্যমান যা তার কোন কল্যাণ করবে না, বরঞ্চ শাস্তিরই কারণ হবে।

দ্বিতীয় বাক্যে মানুষ বলতে প্রত্যেক মানুষও হতে পারে। কারণ জীবিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া এ হবে যে এসব কি হচ্ছে।

পরে তাদের কাছে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, এ রোজে হাশর। আবার মানুষ বলতে আখেরাত অস্বীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে জিনিস তারা অসম্ভব মনে করতো তা তাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে। এর ফলে তারা হয়রান পেরেশান হয়ে পড়বে। অবশ্যি যারা ঈমানদার তাদের হয়রানির কোন কারণ থাকবে না। এ জন্যে যে এসব কিছু তাদের আকীদাহ ও বিশ্বাস অনুযায়ীই হচ্ছে।

তৃতীয় আয়াত বা বাক্যে বলা হয়েছে, যমীন তার অবস্থা বর্ণনা করবে। কারণ তার প্রভু তাকে এমনটি করার হুকুম দিয়ে থাকবেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান তার এ অবস্থা কি ছিল? সাহাবীগণ বল্লেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। নবী (সা) বল্লেন, সে অবস্থা এই যে, যমীন প্রত্যেক নর ও নারীর সেসব কাজকর্মের সাক্ষ্য দেবে যা তারা তার পৃষ্ঠদেশে করেছে। সে বলবে, সে অমুক দিনে অমুক কাজ করছে। এ হচ্ছে সে অবস্থা যা যমীন বর্ণনা করবে-(মসনদে আহমদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে জারীর আবদ বিন হামীদ, আবুল মুনযের, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী)।

হযরত রাবিআতুল জুরাশী বলেন যে, নবী (সা) বলেছেন, যমীন থেকে গা বাঁচিয়ে চলবে। কারণ এ তোমাদের মূল বুনিয়াদ। এর উপর কার্য সম্পাদনকারী এমন কেউ নেই যার কাজের খবর এ দেবে না, তা ভালো হোক বা মন্দ হোক- (মু'জামুত্তাবারানী)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, নবী (সা) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যমীন সেই প্রতিটি আমল নিয়ে আসবে যা তার পিঠের উপর করা হয়েছে। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-(মারদুইয়া, বায়হাকী)।

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন তিনি বায়তুল মালের সমদুয় বিতরণ করে কোষাগার খালি করতেন তখন দু'রাকায়াত নামায পড়তেন এবং বলতেন, তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, আমি তোমাকে হকের সাথে পরিপূর্ণ করেছিলাম এবং হকের সাথে খালি করলাম। যমীন সম্পর্কে একথা বলা হলো যে, তার উপরে সংঘটিত সকল অবস্থা সে বয়ান করবে। প্রাচীনকালের লোকের কাছে ত এ বড়ো বিস্ময়কর মনে হবে যে, যমীন কিভাবে কথা বলবে। কিন্তু আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানের (Physical Scince) আবিষ্কার, সিনেমা, লাউডস্পীকার, রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ড, ইলেকট্রোনিক্স প্রভৃতির যুগে এ বুঝতে পারা কোন কঠিন ব্যাপার নয় যে, যমীন তার অবস্থা কিভাবে বয়ান করবে। মানুষ তার মুখ দিয়ে যা কিছু বলে তার ছাপ বাতাসে, আলোকে তরংগে, ঘরে দেয়ালে, মেঝেতে, ছাদের কণিকায় কণিকায় এবং মাঠে ময়দানে, ক্ষেত খামারে অংকিত হয়ে যায়। আল্লাহ যখনই ইচ্ছা করবেন এ সকল ধ্বনিকে অবিকল সেভাবেই আবৃত্তি করাতে পারেন যেভাবে তা মানুষের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। মানুষ আপন কানে সে সময়ে শুনতে পাবে যে এ তার নিজেরই ধ্বনি এবং তারি পরিচিত। সকলেই চিনে ফেলবে যে যা কিছু তারা শুনছে তা সেই ব্যক্তিরই ধ্বনি ও তারই স্বর। তারপর মানুষ যমীনের উপর যেখানে যে

অবস্থায় কোন কাজ করেছে তার এক একটি গতির ছাপ তার চার ধারের প্রতিটি বস্তুর উপর পড়েছে এবং তার ছবিও তার উপর চিত্রিত হয়ে গেছে। ঘনো অন্ধকারেও কোন কাজ সে করে থাকলে খোদার কুদরতে এমন আলোক রশ্মি বিদ্যমান রয়েছে যে, আলো ও আঁধারের প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সকল অবস্থাতেই তার চিত্র গ্রহণ করতে পারেন। এ সমুদয় চিত্র কিয়ামতের দিন এক চলমান ফিল্মের ন্যায় মানুষের সামনে প্রতিভাত হয়ে দেখিয়ে দেবে যে, সে জীবনভর কখন কোথায় কোথায় কি কাজ করেছে।

সত্যকথা এই যে, যদিও আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষের কার্যকলাপ সরাসরি স্বয়ং জানেন, কিন্তু আখেরাতে যখন তিনি আদালত কায়েম করবেন, তখন যাকেই শাস্তি দিবেন, সুবিচারের সকল দাবী পুরণ করেই দিবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেক অপরাধীর বিরুদ্ধে যে মামলা পেশ করা হবে, তা এমন প্রকাশ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে তার অপরাধী হওয়া সম্পর্কে কথা বলার কোন অবকাশই থাকবে না।

সর্বপ্রথম ত মানুষের সেই নামায়ে আমল যার মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে তার সাথে লেগে থাকা 'কেরামান-কাতেবীন' প্রতিটি কথা ও কাজ সন্নিবেশিত করে যাচ্ছেন। এ নামায়ে আমল তার হাতে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, 'পড় তোমার জীবনের কর্মকান্ড। নিজের হিসাব নেয়ার জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (বনী ইসরাইল ঃ ১৪) মানুষ তা পড়ে হতভম্ব হয়ে পড়বে যে কোন ছোটো এবং বড়ো এমন কোন জিনিস নেই যা এর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়নি। তারপর মানুষের দেহ যার সাহায্যে সে দুনিয়ায় কাজ করেছে। আল্লাহর আদালতে তার নিজের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে যে, তার দ্বারা সে কত কিছু বলেছে। তার নিজের হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, তাদের দ্বারা সে কোন্ কোন্ কাজ করিয়ে নিয়েছে। (নূহ ঃ ২৪) তার চোখ সাক্ষ্য দেবে যে, তার দ্বারা সে কতকিছু দেখেছে। তার কান সাক্ষ্য দেবে যে, তার দ্বারা কত কিছু শুনেছে। তার দেহের গোটা চামড়া তার কর্মকান্ডের সাক্ষ্য দেবে। সে দিশেহারা হয়ে তার অংগ-প্রত্যংগকে বলবে তোমরাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তার অংগ-প্রত্যংগ জবাবে বলবে আজ আল্লাহর হুকুমে প্রতিটি বস্তু কথা বলছে। তাঁর হুকুমে আমরাও কথা বলছি। (হা-মীম-সাজদাহ ঃ ২০-২২) তারপর অতিরিক্ত সাক্ষ্যদান করা হবে যমীন ও তার পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ থেকে, যখন মানুষ নিজের স্বরধ্বনি নিজের কানে শুনবে এবং তার কর্মকান্ডের হুবহু ছবি স্বচক্ষে দেখবে।

এতোসবের পরও মানুষের অন্তরে যে সকল ধারণা-বাসনা, ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য লুকায়িত ছিল এবং যে নিয়তে সে কাজকর্ম করেছে, তা বের করে সামনে রেখে দেয়া হবে। যেমন সূরায়ে আদিয়াতে বলা হয়েছে, এটাই কারণ যে, এতোসব অকাট্য, সুস্পষ্ট এবং অনস্বীকার্য প্রমাণাদি উপস্থাপিত হওয়ার পর মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়বে এবং তার পক্ষে কৈফিয়ৎ পেশ করার কোন সুযোগই থাকবে না। (সূরা মুরসিলাত আয়াত ঃ ৩৫-৩৬ দ্রঃ)(১১৮)

و وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لاَكَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ (الكهف ٤٩)

এবং নামায়ে আমল সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময়ে তুমি দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা তাদের জীবন গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিষয়সমূহ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হবে এবং বলতে থাকবে, "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কোন ধরনের কিতাব যে আমাদের ছোট বড়ো ক্রিয়াকর্ম এমন নেই যা এর মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়নি।" যা কিছু তারা করেছে তা সবই নিজের সামনে দেখতে পাবে এবং তোমার রব কারো উপরে জুলুম করবেন না। (কাহাফ ঃ ৪৯)

অর্থাৎ এমন কখনো হবে না যে, কেউ কোন অপরাধ করেনি, অথচ অযথা তা তার নামায়ে আমলে লিখে দেয়া হবে। আর এমন কিছুও হবে না যে, কাউকে তার অপরাধ থেকে অধিকতর শাস্তি দেয়া হবে অথবা নিরপরাধকে শাস্তি দেয়া হবে।(১১৯)

و كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ - و كُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ - (القمر ٥٢-٥٣)

যা কিছু তারা করেছে তা খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক ছোট ও বড়ো বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। (কামার ঃ ৫২-৫৩)

অর্থাৎ এসব লোক যেন এ ভুল ধারণায় লিপ্ত না থাকে যে, তাদের কৃতকর্ম কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। না, প্রতিটি ব্যক্তি, দল ও জাতির পূর্ণ রেকর্ড সংরক্ষিত আছে। সময়মত সামনে আসবে।(১২০)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصٰهُ اللّٰهُ و نَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ - (المجادله -٦)

(এ অবমাননাকর শাস্তি হবে) সেইদিন যখন আল্লাহতায়ালা তাদের সকলকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তাদেরকে বলে দিবেন তারা যা কিছু করেছে। তারা ভুলে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম গুণে গুণে সংরক্ষিত করে রেখেছেন এবং আল্লাহ এক একটি বিষয়ের সাক্ষী। (মুজাদিলা ঃ ৬)

অর্থাৎ তারা ভুলে গেলেও মামলা দফারফা হয়ে যায়নি। তাদের জন্যে খোদার নাফরমানি এবং তাঁর হুকুম-আহকাম লংঘন করা এমন সাধারণ জিনিস হতে পারে যে তা করার পর মনেও রাখে না। বরঞ্চ তাকে কোন আপত্তিকর জিনিসই মনে করে না যে, তার জন্য কোন পরোয়া করবে। কিন্তু খোদার নিকটে এ যেমন তেমন জিনিস নয়। তাঁর খাতায় তার প্রতিটি কাজকর্ম লিখিত হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি, কখন কোন উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়াকর্ম করেছে তারপর তার নিজের কি প্রতিক্রিয়া ছিল এবং তার পরিণাম কোথায় কোথায় কি আকারে দেখা দিয়েছে- এ সব কিছু তাঁর খাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।(১২১)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ و تُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ و تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - (يس :٦٥)

আজ আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, তার পাগুলো সাক্ষ্য দেবে তারা দুনিয়ায় কি কামাই করছিল। (ইয়াসিন ঃ ৬৫)

এ আদেশ দেয়া হবে ঐসব তুখোড় অপরাধীদের বেলায় যারা তাদের দোষ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, সাক্ষ্যগুলো মিথ্যা মনে করবে এবং নামায়ে আমলের সত্যতাও স্বীকার করবে না। তখন আল্লাহ্ হুকুম দিবেন আচ্ছা, তোমাদের বাচালতা বন্ধ কর এবং দেখ তোমাদের দেহের অংগপ্রত্যংগ তোমাদের কর্মকান্ডের কি কার্যবিবরণী পেশ করে।(১২২)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ - (النُّور ٢٤)

(তারা সেদিনকে যেন ভুলে যায়) যেদিন তাদের মুখ, তাদের হাত-পা তার কাজ-কর্মের সাক্ষ্য দেবে। (নূর ঃ ২৪)

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সূরায়ে ইয়াসিনের উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, আমরা তাদের মুখ বন্ধ করে দেব। অপরদিকে সূরায়ে নূরে বলেন, তাদের মুখ সাক্ষ্য দেবে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিভাবে?

এর জবাব এই যে, মুখ বন্ধ করার অর্থ তাদের কথা বলার এখতিয়ার কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ তারপর তারা আর আপন মর্জিমত কথা বলতে পারবে না। মুখের দ্বারা সাক্ষ্যদানের অর্থ এই যে, তাদের মুখ স্বয়ং এ কাহিনী বর্ণনা করা শুরু করবে যে, এ জালেমেরা কি কাজ তাদের দ্বারা নিয়েছিল, কেমন কেমন কুফরী করেছিল। কি কি মিথ্যা বলেছিল। কি কি ফেৎনা সৃষ্টি করেছিল এবং কোন কোন সময়ে মুখের সাহায্যে কি কথা বলেছিল।(১২৩)

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ اَبْصَارُهُمْ وَ جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّ هُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ - (حم السجده ٢٠-٢١)

তারপর যখন তারা সকলে সেখানে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের কান চোখ এবং দেহের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে তারা দুনিয়ায় কত কিছু করছিল। তারা নিজের দেহের চামড়াকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে? তারা জবাব দেবে, আমাদেরকে সে খোদাই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (হামীম সাজদা ঃ ২০-২১)

হাদীসগুলোতে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, যখন কোন তুখোড় হঠকারী অপরাধী তার অপরাধ অস্বীকার করতে থাকবে এবং সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে থাকবে, তখন আল্লাহতায়ালার হুকুমে তার দেহের অংগপ্রত্যংগ এক এক করে সাক্ষ্য দেবে যে,সে তাদের দ্বারা কোন কোন কাজ নিয়েছিল। এ বিষয়টি হযরত আনাস (রাঃ), হযরত

আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, বাযযার প্রমুখ মুহাদ্দেসগণ এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ আয়াতটি ঐসব আয়াতের মধ্যে একটি যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাত শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক জগত নয়, বরঞ্চ মানুষকে সেখানে পুনর্বার সেভাবেই দেহ ও আত্মাসহ জীবিত করা হবে যেভাবে এখন দুনিয়ায় রয়েছে। বরঞ্চ তাদেরকে দেহ তাই দেয়া হবে যে দেহে এখন তারা বিরাজ করছে। যেসব অংগপ্রত্যংগ ও অনুপরমাণু দ্বারা এ দুনিয়ায় তাদের দেহ তৈরী, সেসব কিয়ামতের দিন একত্র করে দেয়া হবে এবং তাদেরকে তাদের পূর্ববর্তী দেহসহ উঠানো হবে, যে দেহসহ তারা দুনিয়ায় কাজকর্ম করেছে। এ কথা ঠিক যে, মানুষের অংগপ্রত্যংগ সেখানে এমন অবস্থাতেই ত সাক্ষ্য দিতে পারে যদি তারা সেসব অংগপ্রত্যংগই হয় যার দ্বারা সে তার দুনিয়ার জীবনে অপরাধ সংঘটিত করেছে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি পেশ করেঃ বনী ইসরাইল ঃ ৪৯-৫১, ৯৮; মুমেনুন ঃ ৩৫-৩৮, ৮২-৮৩; নূর ঃ ২৪, সিজদাহ ঃ ১০; ইয়াসীন ঃ ৬৫, ৭৮-৭৯; আসসাফফাত ঃ ১৬-১৮; ওয়াকেয়া ঃ ৪৭-৫০; নাযেয়াত ঃ ১০-১৪। (১২৪)

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ

-(يس ١٢)

আমরা নিশ্চিতরূপে একদিন মৃতকে জীবিত করব। যেসব কাজ তারা করেছে তা সব আমরা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। আর যেসব নিদর্শন তারা পেছনে রেখে গেছে, সেগুলোও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি বিষয় আমরা একটি প্রকাশ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে রেখেছি। (ইয়াসিন ঃ ১২)

এর থেকে জানা গেল যে, মানুষের নামায়ে আমল তিন প্রকার পন্থায় সন্নিবেশিত করা হবে। এক হচ্ছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছুই ভালো ও মন্দ করে, তা আল্লাহতায়লার খাতায় লিখে নেয়া হয়। দ্বিতীয়ঃ নিজের চতুষ্পার্শস্থ বস্তুসমূহ এবং আপন দেহের অংগপ্রত্যংগের উপর মানুষ যেসব চাপ অংকিত করে, তার সবটুকুই সুরক্ষিত হয়ে যায়। তারপর এ সমুদয় চিত্র এক সময়ে এমনভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে যে তার নিজস্ব ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। তার নিজস্ব ধারণা, ইচ্ছা ও অভিলাষের পূর্ণ বিবরণ হৃদয়পটে অংকিত দেখতে পাবে। তৃতীয়তঃ মৃত্যুর পরে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপরে, আপন সমাজের উপরে এবং গোটা মানবতার উপরে ভালো ও মন্দ কাজের যে প্রভাব সে ফেলে গেছে তা যে সময় পর্যন্ত এবং যেখানে যেখানে পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে সে সব তার হিসাবের খাতায় লেখা হতে থাকবে। সে তার সন্তানাদিকে যে যে ভালো বা মন্দ শিক্ষা দিয়ে গেছে, আপন সমাজে যে কল্যাণ বা অনাচার সে ছড়িয়েছে এবং মানবতার সপক্ষে যে ফুল অথবা কন্টক সে বপণ করে গেছে, সে সবের পূর্ণ রেকর্ড সে সময় পর্যন্ত তৈরী করা হতে থাকবে যতোদিন পর্যন্ত তার লাগানো এ ফসল দুনিয়ায় তার ভালো অথবা মন্দ ফল দান করতে থাকবে।(১২৫)

و تَـرٰى كُـلَّ اُمَّـةٍ جَـاثِـيَـةً قف كُـلُّ اُمَّـةٍ تُـدْعٰى الٰى كِتٰبِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ (الجاثيه ٢٨-٢٩)

-সেদিন তুমি সকল দলকে হাঁটু গেড়ে থাকতে দেখবে। প্রত্যেক দলকে ডেকে বলা হবে, এসো এবং নিজের নামায়ে আমল দেখ। তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমাদেরকে সেসব কাজের প্রতিদান দেখানো হবে যা তোমরা করছিলে। এ হচ্ছে আমাদের তৈরী করা নামায়ে আমল যা তোমাদের ব্যাপারে নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে। যা কিছুই তোমরা করছিলে তা আমরা লেখাতেছিলাম। (জাসিয়া ঃ ২৮-২৯)

লেখাবার শুধু এ একটিমাত্র উপায়ই নয় যে, তা কাগজের উপর লেখানো যায়। মানুষের কথা ও কাজ চিত্রিত করার এবং পুনর্বার তা অবিকল সেই আকার-আকৃতিতে পেশ করার আরও বিভিন্ন পন্থা এ দুনিয়াতেই স্বয়ং মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে এবং আমরা ধারণাও করতে পারি না যে, ভবিষ্যতে তার আরও কি কি সম্ভাবনা লুকায়িত আছে যা মানুষই আয়ত্ত করতে পারবে। এখন এ কথা কে জানতে পারে যে, আল্লাহতায়ালা কোন কোন পন্থায় মানুষের এক একটি কথা, চাল-চলন ও অংগভংগীর এক একটি এবং তার ধারণা-বাসনা, ইচ্ছা ও অভিলাষের প্রতিটি অতি গোপন বিষয় অংকিত করিয়ে রাখছেন। (১২৬)

و اِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ـ (المرسلت ١١)

-এবং যখন রসূলগণের হাযিরি দেয়ার সময় এসে যাবে। (মুরসিলাত ঃ ১১)

কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানব জাতির মোকদ্দমা পেশ করা হবে তখন প্রত্যেক জাতির রসূলকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে পেশ করা হবে যেন তাঁরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে তাঁরা আল্লাহতায়ালার পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। এ হবে গোমরাহ এবং গোনাহগারদের বিরুদ্ধে আল্লাহতায়লার সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে খারাপ দলিলপ্রমাণ যার থেকে এ কথা প্রমাণ করা হবে যে, তারা তাদের ভ্রান্ত আচরণের জন্যে নিজেরাই দায়ী। আল্লাহতায়লার পক্ষ থেকে তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে কোন কিছু বাকী রাখা হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্যঃ-সূরা আরাফ ঃ ১৭২-৭৩; যুমার ঃ ৬৯; মূলক ঃ ৮।(১২৭)

و وُضِعَ الْكِتٰبُ و جَاىْءَ بِالنَّبِيّنَ و الشُّهَدَاءِ و قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ و هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ـ (الزمر ٦٩)

-এবং নামায়ে আমল এনে রেখে দেয়া হবে। আম্বিয়া এবং সকল সাক্ষী হাযির করা হবে। মানুষের মধ্যে ঠিক ঠিক হকের সাথে ফয়সালা করে দেয়া হবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম হবে না। (যুমার ঃ ৬৯)

নবীগণ ত এ কথার সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা খোদার পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন। তাঁরা ব্যতীত অন্যান্য সাক্ষীর অর্থ ঐসব লোক যাঁরা এ কথার সাক্ষ্য দেবেন যে, নবীগণের পর

৪৩—

তাঁরা লোকের কাছে খোদার পয়গাম পৌছিয়ে দিয়েছেন। ওসব সাক্ষীও হতে পারে যারা মানুষের কাজ-কর্মের সাক্ষ্য দেবে। এটা জরুরী নয় যে, এসব সাক্ষী শুধু মানুষই হবে। ফেরেশতা, জ্বিন, পশুপাখী এবং মানুষের অংগপ্রত্যংগ, ঘরদোর, বৃক্ষলতা, মাটি পাথর সবই সে সবের সাক্ষীর অন্তর্ভুক্ত। (১২৮)

اَفَلاَ يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ - وَ حُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ - (العديت ٩-١٠)

সেকি সে সময়টি জানে না যখন কবরগুলোতে যা সমাহিত আছে তা বের করে আনা হবে? এবং বুকে যা কিছু লুক্কায়িত আছে তা বের করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে? (আদিয়াত ঃ ৯-১০)

অর্থাৎ মরার পর মৃত মানুষ যেখানে যে অবস্থায় পড়ে থাকবে সেখান থেকে তাকে বের করে জীবিত মানুষের আকারে উঠিয়ে আনা হবে। মনের মধ্যে যেসব ইচ্ছা বাসনা, নিয়ত, উদ্দেশ্য, ধারণা, চিন্তা এবং প্রকাশ্য কাজকর্মের পেছনে যেসব উদ্দেশ্য (MOTIVE) লুক্কায়িত ছিল তা উদ্ঘাটিত করে রেখে দেয়া হবে। তারপর সেসব যাঁচাই বাছাই করে ভালো ও মন্দ পৃথক করা হবে। অন্য কথায় সিদ্ধান্ত শুধু বাইরের দিকটা দেখেই করা হবে না যে মানুষ বাস্তবে কি করেছে, বরঞ্চ মনের মধ্যে লুকায়িত রহস্যাবলীও বের করে এটা দেখানো হবে যে, যে কাজ মানুষ করেছে তা কোন্ অভিপ্রায়ে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে করেছে। এ বিষয়ের উপর চিন্তা করলে মানুষ এ কথা স্বীকার না করে পারে না যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ইনসাফ খোদার আদালত ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যেতে পারে না।

দুনিয়ার ধর্মহীন আইনও নীতিগত দিক দিয়ে এটা জরুরী মনে করে যে, কোন ব্যক্তির শুধু বাহ্যিক কাজের ভিত্তিতে তাকে যেন শাস্তি দেয়া না হয়। বরঞ্চ এও দেখতে হবে যে, সে কোন্ নিয়তে সে কাজ করেছে। কিন্তু দুনিয়ায় কোন আদালতের নিকটেও সেসব উপায়-উপাদান নেই যার দ্বারা সে নিয়তের যথাযথ তথ্য অবগত হতে পারে। এ শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাই করতে পারেন যে, মানুষের প্রতিটি বাহ্যিক কাজের পেছনে যে গোপণ প্রেরণা কার্যকর থাকে তাও তিনি যাঁচাই করতে পারেন এবং তারপর এ সিদ্ধান্ত করবেন যে সে কোন্ শাস্তি বা পুরস্কারের যোগ্য।

অতঃপর আয়াতটির শব্দাবলী একথা প্রকাশ করে যে, এ সিদ্ধান্ত নিছক আল্লাহতায়ালার সে জ্ঞানের ভিত্তিতে হবে না, যে জ্ঞান তিনি মনের ইচ্ছা ও নিয়ত সম্পর্কে রাখতেন। বরঞ্চ কিয়ামতের দিন এসব রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রকাশ্যে সামনে রেখে দেয়া হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ দেখা হবে যে তার মধ্যে কল্যাণ কতোটুকু ছিল আর অকল্যাণ কতোটুকু। এ কারণেই تحصيل শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে। حصل ما فى الصدور শব্দের অর্থ কোন কিছুকে বের করে বাইরে আনাও হয়। যেমন ছোবড়া বা খোসা ছড়িয়ে মগজ বের করা। তারপর বিভিন্ন জিনিস ছেঁটে একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করাও হয়। অতএব মনের রহস্যাবলী অবগত হওয়ার জন্যে এ উভয় অর্থ ব্যবহৃত হয়। তা খুলে প্রকাশ করাও এবং বাছাই করে ভালো ও মন্দকে আলাদাও করা।(১২৯)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَالَه مِنْ قُوَّةٍ وَّ لاَ نَاصِرٍ -

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ - وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ - (الطارق ٩-١٤)

যেদিন গোপন রহস্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবেন সেদিন না মানুষের নিজস্ব কোন শক্তি থাকবে আর না তার কোন সাহায্যকারী। কসম বৃষ্টিবর্ষণকারী আকাশের এবং (শস্য উৎপাদনের সময়) বিদীর্ণ হওয়া যমীনের, এ এক মাপাজোঁকা কথা, হাসিঠাট্টা নয়। (তারেক ঃ ৯-১৪)

গোপন রহস্য অর্থ প্রত্যেক মানুষের ওসব কাজ কর্ম যা দুনিয়ায় এক গোপন রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে এবং ওসব কার্যকলাপও যা বাহ্যিক আকার আকৃতিতে ত দুনিয়ার সামনে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তার পেছনে তার যেসব নিয়ত, উদ্দেশ্য ও অভিলাষ কার্যকর ছিল, তার যে আভ্যন্তরীণ আবেগও প্রেরণাসৃষ্টিকারী ছিল তা মানুষের কাছে লুকায়িত ছিল। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিছক এ বিষয়েরই হবে না যে, কোন্ মানুষ কি কাজ করেছে। বরঞ্চ কি জন্যে করেছে, কিসের স্বার্থে, কোন্ নিয়তে এবং কোন উদ্দেশ্যে করেছে। এভাবে এ কথাও সমগ্র দুনিয়ার এমনকি কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির নিকটেও গোপন রয়ে গেছে যে, যে কাজ সে করেছে তার কি প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় হয়েছে, কোথায় কোথায় তা পৌঁছেছে এবং কতকাল তা অব্যাহত থেকেছে এ রহস্যও কিয়ামতের দিন উদ্ঘাটিত হবে এবং এ বিষয়ে পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে যে, যে বীজ কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় বপণ করে গিয়েছিল, কোন্ কোন্ খামারে এবং কতকাল পর্যন্ত তার ফসল উৎপন্ন হচ্ছিল এবং কে কে তা ঘরে আনছিল।

শেষ বাক্যটির অর্থ এই যে, আকাশ থেকে বর্ষণ এবং মাটি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্য থেকে উদ্ভিদ অংকুরিত হওয়া যেমন কোন হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়, বরঞ্চ এক বাস্তব সত্য, তেমনি কুরআন যে বিষয়ের কথা বলছে যে, মানুষকে পুনরায় তার খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এ কোন হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়, বরঞ্চ একটি অতি সুনিশ্চিত কথা, একটি অকাট্য বাস্তবতা এবং শাশ্বত সত্য যা অনিবার্যরূপে কার্যকর হবে।(১৩০)

يُنَبَّؤُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ - بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرَهُ -

(القيامه ١٣ تا ١٥)

-সেদিন মানুষকে তার আগে পিছের সকল কর্মকান্ড বলে দেয়া হবে। বরঞ্চ মানুষ স্বয়ং নিজেকে ভালোভাবে জানে, যতোই সে ওজর-আপত্তি পেশ করুক না কেন। (কিয়ামাহ ঃ ১৩-১৫)

প্রকৃত শব্দাবলী হচ্ছে بِمَا قَدَّمَ وَ اَخَّرَ এ এক ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য যার কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সম্ভবতঃ সকল অর্থেই তা বলা হয়েছে। একটি অর্থ তার এই যে, মানুষকে সেদিন এ কথাও বলে দেয়া হবে যে, নিজের দুনিয়ার জীবনে মৃত্যুর আগে কি কি সৎ অথবা অসৎ কাজ করে তা আখেরাতের জন্যে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং এ হিসাবও তার সামনে রেখে দেয়া হবে যে তার ভালো অথবা মন্দ কাজের কি প্রভাব সে তার পেছনে ছেড়ে এসেছিল যা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে বলবৎ ছিল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাকে সেসব কিছুই বলে দেয়া হবে যা তার করা উচিত ছিল কিন্তু করেনি এবং যা কিছু না করার ছিল তা করেছে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, যা কিছু সে প্রথমে করেছে এবং যা কিছু পরে করেছে তার পুংখানুপুংখ হিসাবসহ তারিখ সন সামনে রেখে দেয়া হবে।

চতুর্থ অর্থ এই যে, যে সৎ কাজ অথবা অসৎ কাজ সে করেছে তাও তাকে বলে দেয়া হবে এবং যে সৎ কাজ অথবা অসৎ কাজ করা থেকে সে বিরত ছিল সে সম্পর্কেও তাকে অবহিত করা হবে।

কিন্তু মানুষের নামায়ে আমল তার সামনে রাখার উদ্দেশ্য আসলে এ হবে না যে, অপরাধীকে তার অপরাধ বলে দেয়া হবে। বরঞ্চ এমন করা এ জন্যে জরুরী হবে যে, ইনসাফের দাবী আদালত সমক্ষে অপরাধ প্রমাণিত করা ব্যতীত পূরণ হয় না। নতুবা প্রত্যেকেই ভালোভাবে জানে যে সে স্বয়ং কি। নিজেকে জানবার জন্যে সে এ বিষয়ের মুখাপেক্ষী নয় যে, অন্য কেউ বলুক যে সে কি। একজন মিথ্যাবাদী সমগ্র দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু তার নিজের জানা আছে যে, সে মিথ্যা বলছে। একজন চোর তার চুরি গোপন করার জন্যে অগনিত কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তার নিজের মনের কাছে ত একথা গোপন থাকে না যে সে চোর। একজন পথভ্রষ্ট লোক হাজার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে মানুষকে এ নিশ্চয়তা দান করতে পারে যে, যে কুফর, নাস্তিক্য অথবা শির্কে সে বিশ্বাসী, তা প্রকৃতপক্ষে তার আন্তরিক অভিমত। কিন্তু তার আপন বিবেক ত এ বিষয়ে অজ্ঞাত নয় যে, এসব বিশ্বাসের উপর সে কেন অনুরক্ত এবং এ সবের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তু তাকে বিরত রাখছে। একজন জালেম, একজন অবিশ্বস্ত লোক, একজন লম্পট এবং একজন হারামখোর তার অপকর্মের জন্যে বিভিন্ন ধরনের ওজর-আপত্তি পেশ করে আপন বিবেকের মুখও বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। যাতে সে তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং এ কথা মেনে নেয় যে, সত্যি সত্যিই কোন বাধ্যবাধকতা, কিছু উপযোগিতা এবং কিছু প্রয়োজন এমন আছে যে কারণে সে এসব কিছু করছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ত অবশ্যই জানে যে, সে কার উপর কি জুলুম করেছে, কার হক মেরেছে, কার শ্লীলতা হানি করেছে, কাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং কোন অবৈধ পন্থায় কত কিছু করেছে। এ জন্যে আখেরাতের আদালতে পেশ হওয়ার সময় প্রত্যেক কাফের, প্রত্যেক মুনাফিক, প্রত্যেক পাপী ও অপরাধী স্বয়ং জানতে পারবে যে সে কি হিসাবে খোদার সামনে দন্ডায়মান।(১৩১)

فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى - (النازعات ٣٤-٣٥)

-অতঃপর যখন সে বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ তার সকল কর্মকান্ড স্মরণ করবে। (নাযিয়াত ঃ ৩৪-৩৫)

অর্থাৎ মানুষ যখন দেখবে যে সেই পরীক্ষার দিন এসে গেছে যার খবর দুনিয়ায় দেয়া হচ্ছিল। তখন তার নামায়ে আমল হাতে দেয়ার আগেই একএক করে তার সে সব কিছুই মনে পড়তে থাকবে যা সে দুনিয়ায় করে এসেছে। কতিপয় লোকের দুনিয়াতেই এ অভিজ্ঞতা হয় যে, যখন হঠাৎ সে এমন কোন আশংকাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয় যে মৃত্যু অতি সন্নিকট মনে হয়, তখন তার গোটা জীবনের চিত্র হৃদয়পটে হঠাৎ প্রতিফলিত হয়।(১৩২)

وَ جِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لا يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الاِنْسَانُ وَ اَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى - يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ - (الفجر ٢٣-٢٤)

-এবং জাহান্নাম সেদিন সম্মুখে আনা হবে। ঐ দিন মানুষ সবই বুঝতে পারবে। কিন্তু বুঝতে পেরে লাভ কি হবে? সে বলবে হায়রে যদি আমি এ জীবনের জন্যে কিছু অগ্রিম পাঠিয়ে দিতাম। (ফজরঃ ২৩-২৪)

-প্রথম আয়াত বা বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে। এক এই যে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যে, সে দুনিয়ায় কতকিছু করে এসেছে এবং তার জন্যে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সেদিন মানুষ তার সম্বিৎ ফিরে পাবে, সে উপলব্ধি করবে যে, যা কিছু নবীগণ বলেছিলেন তা সঠিক ছিল এবং তাঁদের কথা না মেনে সে নির্বুদ্ধিতা করেছে। কিন্তু সেদিন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে এবং ভুল বুঝতে পেরে কোনই লাভ হবে না।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ - (انفطار ٥)

-সে সময়ে প্রতিটি মানুষ তার আগে পিছের সকল কৃতকর্ম জানতে পারবে। (ইনফিতার ঃ ৫)

مَا قَدَّمَتْ وَ اَخَّرَتْ - -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। সব অর্থেই তা এখানে ব্যবহৃত। যেমনঃ

১। যা ভালো অথবা মন্দ কাজ মানুষ করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে তা مَا قَدَّمَتْ এবং যা করা থেকে সে বিরত থেকেছে তা ما اخرت এ দিক দিয়ে এ শব্দগুলো ইংরেজী শব্দ COMMISSION ও OMMISSION এর সমর্থবোধক।

২। যা কিছু প্রথমে করেছে তা হলো ما قدمت এবং যা কিছু পরে করেছে তা ما اخرت অর্থাৎ মানুষের গোটা কর্মকান্ডের ফিরিস্তি ক্রমানুসারে এবং সন তারিখসহ প্রকাশিত হবে।

৩। যা ভলো ও মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে, তা ماقدمت এবং ওসব কাজের যেসব প্রভাব সে মানব সমাজে তার পেছনে ছেড়ে গেছে তা(১৩৪) مَا اَخَّرَتْ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَاه - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه - (زلزل ٦ تا ٨)

-সেদিন মানুষ বিভিন্ন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যাতে তাদের কাজকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়। তারপর যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণ নেকি করেছে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণ পাপ কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে। (যিলযাল ঃ ৬-৮)

প্রথম বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক এই যে, প্রত্যেকে একাকী একজন ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হবে। পরিবার, দল, জোট, জাতি সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ কথা কুরআনের অন্যান্য স্থানেও বলা হয়েছে। যেমন সূরায়ে আনয়ামে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সেদিন লোকদেরকে বলবেন, "নাও, তোমরা ঠিক তেমনি একাকী আমাদের সামনে হাযির হয়েছ যেমন প্রথমবার আমরা তোমাদেরকে পয়দা করেছিলাম।" (আয়াত-৯৪) সূরায়ে মরিয়মে বলা হয়েছে-"এরা একাকী আমাদের নিকটে আসবে"-আয়াত-৮০। "তাদের প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একাকী হাযির হবে।" (আয়াত ঃ ৯৫)

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, হাজার হাজার বছর যাবত যারা বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছিল, তারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে দলে দলে আসতে থাকবে। যেমন সূরায়ে নাবাতে বলা হয়েছে-যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন তোমরা দলে দলে আসবে। (আয়াত ঃ ১৮)

তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তিকে তার নামায়ে আমল দিয়ে দেয়া হবে যাতে সে দেখতে পায় যে, সে দুনিয়ায় কি করে এসেছে। কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, কাফের ও মুমেন, নেককার ও পাপী, অনুগত ও নাফরমান সকলকেই তাদের নামায়ে আমল দিয়ে দেয়া হবে। (আল হাক্কা-আয়াত ১৯, ২৫ এবং ইনশিকাক আয়াত ৭-১০ দ্রষ্টব্য)

প্রকাশ থাকে যে, কাউকে তার কৃতকর্ম দেখানো এবং নামায়ে আমল দিয়ে দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উপরন্তু যমীন যখন তার উপর সংঘটিত অবস্থাসমূহ পেশ করবে, তখন হক ও বাতিলের যে সংঘর্ষ আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার পূর্ণ চিত্র সকলের সামনে উদ্ভাসিত হবে। তাতে সকলেই দেখবে যে, হকের জন্যে সংগ্রামকারীগণ কি করেছে এবং বাতিলের সমর্থকগণ তাদের মুকাবিলায় কি কি তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। এটাও অসম্ভব নয় যে, হেদায়েতের দিকে আহ্বানকারীগণের এবং পথভ্রষ্টতা বিস্তারকারীগণের সকল বক্তব্য ও কথাবার্তা লোক তাদের নিজ কানে শুনতে পাবে। উভয়পক্ষের প্রচারপত্র ও সাহিত্যের পূর্ণ রেকর্ড অবিকল সকলের সামনে রেখে দেয়া হবে। হকপন্থীদের উপর বাতিলপন্থীদের অত্যাচার-নির্যাতন, উভয়ের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের সকল চিত্র হাশরের ময়দানের জনতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

তারপর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিত সৎ কাজ করেছে সেও তা দেখতে পাবে এবং যে যৎকিঞ্চিত অসৎকাজ করেছে সেও তা দেখতে পাবে। এর এক সাদাসিদে অর্থ এই যে, এবং তা একেবারে সঠিক, তা হলো এই যে, মানুষের সামান্যতম সৎ অথবা অসৎ কাজও এমন হবে না যা তার নামায়ে আমলে সন্নিবেশিত হওয়া থেকে বাদ পড়বে। তাকে সে অবশ্যই দেখতে পাবে। কিন্তু যদি দেখার অর্থ তার পুরস্কার অথবা শাস্তি দেখা গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ অর্থ একেবারে ভুল হবে যে আখেরাতে একটি তুচ্ছ নেকির পুরস্কার এবং একটি তুচ্ছ পাপের শাস্তি প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া হবে। সেখানে কোন ব্যক্তিই তার সৎ কাজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না এবং পাপের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কারণ প্রথমতঃ তার অর্থ এই হবে যে, এক একটি মন্দ কাজের শাস্তি এবং এক একটি ভালো কাজের পুরস্কার পৃথকভাবে দেয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ তার অর্থও এটাও হবে যে, কোন বড়ো নেককার মুমেনও তার কোন ছোটোখাটো ত্রুটির শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না এবং কোন নিকৃষ্টতম কাফের, জালেম ও দুর্বৃত্তও তার কোন ক্ষুদ্রতম

ভালো কাজের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না। এ উভয় অর্থ কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও পরিপন্থী এবং বিবেকও তা স্বীকার করে না যে, তা ইনসাফের দাবী। বিবেক-বুদ্ধিসহ বিবেচনা করে দেখুন যে এ কথা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, আপনার কোন খাদেম বা কর্মচারী অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিবেদিতপ্রাণ, কিন্তু তার কোন অতি তুচ্ছ ত্রুটি আপনি ক্ষমা করেন না এবং এক একটি খেদমতের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দেয়ার সাথে সাথে তার এক একটি ত্রুটি গুণে গুণে তার প্রত্যেকটির শাস্তিও তাকে দেবেন। এমনি এটাও বিবেকের কাছে প্রণিধানযোগ্য নয় যে, আপনার কোন লালিত-পালিত গৃহভৃত্য যার প্রতি আপনার বহু দয়াদাক্ষিণ্য রয়েছে, আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং আপনার দয়া অনুগ্রহের প্রতিদান নিমকহারামির দ্বারা দেয়, কিন্তু আপনি তার সামগ্রিক আচরণ উপেক্ষা করে এক এক বিশ্বাসঘাতকতার পৃথক শাস্তি এবং এক এক খেদমতের (তা যে কোন সময় একটু পানি এনে দিয়ে থাক অথবা পাখা টানার খেদমত করে থাকুক) পৃথক পুরস্কার দেবেন। এখন রইলো কুরআন-হাদীসের কথা। এ কুরআন ও হাদীস বিশদভাবে মুমেন, মুনাফেক, কাফের, নেককার মুমেন, গোনাহগার মুমেন, জালেম ও ফাসেক মুমেন, নিছক কাফের, ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাফের, জালেম প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের লোকের পুরস্কার ও শাস্তির এক বিস্তারিত আইন বর্ণনা করে এবং এ পুরস্কার ও শাস্তি দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত মানুষের গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ সম্পর্কে কুরআন নীতিগতভাবে কিছু কথা বিশদভাবে বর্ণনা করে। প্রথম কথা এই যে, কাফের, মুশরিক ও মুনাফেকের কাজকর্ম (যেগুলোকে নেকি মনে করা হয়) বিনষ্ট করে দেয়া হবে। আখেরাতে তারা তার কোনই প্রতিদান পাবে না। তাদের কোন প্রতিদান প্রাপ্য থাকলে তা তারা এ দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন সুরায়ে আ'রাফ ঃ ১২৭; তওবা ঃ ১৭, ৬৭-৬৯; হুদ ঃ ১৫-১৬; ইব্রাহিম ঃ ১৮; কাহাফ ঃ ১০৪-১০৫; নূর ঃ ৩৯; ফুরকা ঃ ২৩; আহযাব ঃ ১৯, যুমার ঃ ৬৫; আহকাফ ঃ ২০।

দ্বিতীয়তঃ পাপের শাস্তি ততোটুকুই দেয়া হবে যতোটুকু পাপ করা হয়েছে। কিন্তু নেকির পুরস্কার আসল কাজ থেকে অধিক দেয়া হবে। বরঞ্চ কোথাও এ ব্যাখ্যা রয়েছে যে প্রত্যেক নেকির প্রতিদান তার থেকে দশগুণ দেয়া হবে। কোথাও একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যতোটা চান নেকীর প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। (দেখুন-বাকারাহ ঃ ২৬১; আনয়াম ঃ ১৬; ইউনুস ঃ ৬৬-৬৭; নূর ঃ ৩৮; কাসাস ঃ ৮৪; সাবা ঃ ৩৭, মুমেন ঃ ৪০)।

তৃতীয়তঃ মুমেন যদি গোনাহে কবিরা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার ছোটো ছোটো গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (দেখুন-নিসাঃ ৩১, শুরা ঃ ৩৭, নজম ঃ৩২)।

চতুর্থতঃ নেককার মুমেনের সহজ হিসাব নেয়া হবে। তার মন্দ কাজ উপেক্ষা করা হবে এবং তার সর্বোৎকৃষ্ট কাজ হিসেবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। (দেখুন আনকাবুত ঃ ৭, যুমার ঃ ৩৫, আহকাফ ঃ ১৬; ইনশিকাক ঃ ৮)।

হাদীসগুলো বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করে দেয়। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী (সা) এর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় এ আয়াত নাযিল হয়। (যিলযালের শেষ আয়াত)। হযরত আবু বকর (রাঃ) আহার থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা), আমি কি সেই অতি তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিফল দেখতে পাব যা আমার দ্বারা হয়েছে? হুযুর (সা) বল্লেন, হে আবু বকর (রাঃ), তুমি যদি এমন কিছু বিষয়ের সম্মূখীন হও যা তোমার কাছে অসহনীয়, তাহলে তা

ঐসব তুচ্ছ ক্রটি বিচ্যুতির বদলা যা তোমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে আর যেসব সামান্য পরিমাণ নেকীও তোমার রয়েছে তা আল্লাহ্ আখেরাতে তোমার জন্যে সংরক্ষিত করে রেখেছেন-(ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী ফিল্আওসাৎ, বায়হাকী ফিশ্শুয়াব, ইবনুল মুনযির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া, আবদ বিন হামীদ)।

এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ নেকী করবে, তার পুরস্কার আখেরাতে রয়েছে। আর যে কোন প্রকারের পাপ করবে সে এ দুনিয়াতেই তার শাস্তি বিপদাপদ ও রোগের আকারে ভোগ করবে-(ইবনে মারদুইয়া)। কাতাদাহ হযরত আনাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে রসূলুল্লাহ (সা) এর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা মুমেনের উপর কোন জুলুম করেন না। দুনিয়ায় তার নেক কাজের বিনিময়ে জীবিকা দান করেন এবং আখেরাতে তার পুরস্কার দেবেন। এখন রইলো কাফের, এ দুনিয়াতে তাদের ভালো কাজের বিনিময় চুকিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। তারপর যখন কিয়ামত হবে, তখন তার হিসাবে কোন পুণ্য কাজ থাকবে না। (ইবনে জারীর)।

মস্রুক হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করেন, আব্দুল্লাহ বিন জুদআন জাহেলিয়াতের যুগে আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতো, মিসকিনদেরকে খানা খাওয়াতো, মেহমানদারি করতো, কয়েদীদেরকে মুক্ত করে দিত। এসব কি তার জন্যে আখেরাতে লাভজনক হবে?

নবী (সা) বলেন, না। সে মরণের আগে কখনো একথা বলেনি

رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

- হে খোদা! বিচারদিনে তুমি আমার গোনাহ মাফ করে দিও। (ইবনে জারীর)

এ ধরনের জবাব নবী (সা) কতিপয় অন্যান্য লোকের সম্পর্কেও বলেন, যারা জাহেলিয়াতের যুগে সৎ কাজ করতো। কিন্তু তারা মৃত্যুবরণ করেছে কুফর ও শির্কের অবস্থায়। কিন্তু নবী (সা) এর কিছু বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কাফেরের সৎ কাজ তাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে তো বাঁচাতে পারবে না, কিন্তু তাকে তেমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে না যা জালেম, পাপাচারী ও অসৎকর্মশীল কাফেরদেরকে দেয়া হবে। যেমন হাদীসে আছে, হাতেম তাইকে তার দানশীলতার জন্যে লঘু শাস্তি দেয়া হবে । (রুহুল মায়ানী)

তথাপি এ আয়াত মানুষকে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি সজাগ সচেতন করে দেয়। তা এই যে, প্রত্যেক তুচ্ছ তুচ্ছ নেকী তার নিজস্ব একটা গুরুত্ব ও মর্যাদা রাখে। এ অবস্থা পাপ কাজেরও যে, সামান্য পাপ কাজও হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। এমনিতেই উপেক্ষা করার বস্তু নয়। এজন্যে কোন ক্ষুদ্র নেকীকে ক্ষুদ্র মনে করে তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এমন ধরনের বহু নেকী একত্রে মিলিত হয়ে আল্লাহতায়ালার হিসাবের খাতায় একটি অনেক বড়ো নেকী বলে গণ্য হতে পারে। তেমনি ছোটো খাটো পাপ করাও উচিত নয়। কারণ এ ধরনের ছোটো ছোটো পাপ একত্র হয়ে পাপের এক স্তূপে পরিণত হতে পারে। এ কথাটিই নবী (সা) বিভিন্ন হাদীসে এরশাদ করেছেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আদী বিন হাতেমের (রাঃ) এ বর্ণনায় উদ্ধৃত আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, দোজখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর তা খেজুরের এক টুকরা দান করে হোক অথবা একটি ভালো কথা বলার দ্বারাই হোক। আদী বিন হাতেম (রাঃ) থেকে নবী (সা) এর

আর একটি বক্তব্য সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, নবী (সা) বলেন, কোন নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করো না তা পানি চায় এমন কোন ব্যক্তির পাত্রে কিছু পানি ঢেলে দেয়া হোক অথবা এই নেকী যে তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে মিলিত হও।

বোখারীতে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) এর একটি বর্ণনা আছে এবং তা এই যে হুযুর (সা) মহিলাদের সম্বোধন করে বলেন– হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশীনী যেন তার প্রতিবেশীনির কাছে কোন কিছু পাঠাতে ছোটো কাজ মনে না করে তা সে ছাগলের একটা খুরই হোক না কেন।

মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজায় হযরত আয়েশার (রাঃ) একটি বর্ণনা আছে যে,নবী (সা) বলতেন, হে আয়েশা (রাঃ) সে সব গোনাহ থেকেও দূরে থাকবে যেগুলো ছোটো মনে করা হয়, কারণ আল্লাহর নিকটে সেসব সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা আছে যে, হুযুর (সা) বলেছেন- খবরদার, ছোটো গোনাহগুলো থেকে দূরে থাকবে। কারণ সেসব মানুষের জন্যে একত্র করা হবে। এমনকি মানুষকে ধ্বংস করে দেবে। (১৩৫)

আখেরাতে কেউ কারো কাজে আসবেনা

শেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা যা কুরআনে আখেরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা এই যে, সেখানে কেউ কারো কাজে লাগবে না। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকবে। পিতা, পুত্র, ভাই, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, মুরীদ অথবা পীরকে বাঁচাবার কারো কোন চিন্তা থাকবে না। প্রত্যেকে তার নিজের কর্মকান্ডের বোঝা বহন করবে। কেউ অন্যের তিল পরিমাণ বোঝাও বহন করবে না। খোদার ইনসাফপূর্ণ নীতি একের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেবে না। সে সময় ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে যিনি বিচার দিনের মালিক। সেদিন কথা বলার শক্তি কারো হবে না। অবশ্যি আল্লাহ কাউকে অনুমতি দিলে সে ঠিক কথাই বলবে।

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ط و انْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ الى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْئٌ و لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

(الفاطر ١٨)

-কোন বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। বোঝা চাপানো হয়েছে এমন কোন ব্যক্তি তার বোঝা উঠাবার জন্যে যদি কাউকে ডাকে, তাহলে তার সামান্য পরিমাণ বোঝা উঠাবার জন্যে কেউ আসবেনা, তা সে অতি নিকটাত্মীয় হোক না কেন। (ফাতির ঃ ১৮)

'বোঝার' অর্থ কর্মকান্ডের দায়িত্বের বোঝা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের জন্যে স্বয়ং দায়ী। প্রত্যেকের উপরে তার আপন কাজের দায়িত্বই আরোপিত হয়। এ বিষয়ের কোন সম্ভাবনা নেই যে, এক ব্যক্তির দায়িত্বের বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কারো ওপরে চাপানো হবে। আর না এটাও সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারো দায়িত্বের বোঝা আপন স্কন্ধে নেবে এবং তাকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে তার অপরাধে ধরা দেবে। একথা এখানে এজন্যে বলা হয়েছিল যে, মক্কায় যারা ইসলাম গ্রহণ করছিল, তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক বলতো, "তোমরা আমাদের কথায় এ নতুন ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং বাপ-দাদার ধর্মে অটল থাক। তার শাস্তি ও পুরস্কার আমাদের ঘাড়ে।"

প্রথম বাক্যে আল্লাহ তায়ালার সুবিচার আইনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তা একের পাপের জন্যে অপরকে পাকড়াও করবে না। বরঞ্চ প্রত্যেককে তার নিজের পাপের জন্যে দায়ী গণ্য করা হবে। পরের বাক্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, যারা আজ এ কথা বলছে, "তোমরা আমাদের দায়িত্বে কুফরি ও গোনাহের কাজ করতে থাক, কিয়ামতের দিন তোমাদের পাপের বোঝা আমরা বহন করবো"– তারা আসলে এক মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং মানুষ দেখবে যে তারা নিজেদের কর্মকান্ডের জন্যে কোন পরিণামের সম্মুখীন, তখন প্রত্যেকে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। ভাই ভাই থেকে এবং পিতা পুত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেউ কারো তিল পরিমাণ বোঝা আপন কাঁধে নেয়ার জন্যে তৈরী হবে না।(১৩৬)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ و اُمِّهِ و اَبِيْهِ و صاحِبَتِهِ و بَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ -
(عبس ٣٤-٣٧)

-ঐদিন মানুষ আপন ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী এবং সন্তান থেকে পলায়ন করবে। তাদের মধ্যে সকলেই ঐদিন এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে যে নিজের ছাড়া অন্য কারো জন্যে (চিন্তাভাবনা করার) কোন হুশজ্ঞান থাকবে না। (আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

পলায়ন করার অর্থ এই যে, মানুষ সেদিন তাদের প্রিয়তম বন্ধুদেরকে বিপন্ন দেখে তাদের কোন সাহায্য করার পরিবর্তে পলায়ন করবে যেন তারা সাহায্যের জন্যে ডাকতে না পারে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুনিয়াতে তারা খোদা থেকে নির্ভয় হয়ে এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীন থেকে একে অপরের খাতিরে পাপ কাজ করতো এবং একে অপরকে পথভ্রষ্ট করতো। এখন তার পরিণাম সামনে দেখতে পেয়ে তাদের প্রত্যেকেই একে অপর থেকে পলায়ন করবে যেন তারা তাদের পাপাচার ও গোমরাহীর দায়িত্ব তাদের উপর চাপাতে না পারে। ভাই ভাইয়ের থেকে, সন্তান মা-বাপ থেকে, স্বামী স্ত্রী থেকে এবং মা-বাপ সন্তান থেকে এ আশংকা করবে যে, এসব হতভাগ্যের দল তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় সাক্ষী হবে।(১৩৭)

وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا - يُبَصَّرُوْنَهُمْ ط يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ - وصاحِبَتِهِ و اَخِيْهِ - و فَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ - و مَنْ فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ -
(المعارج ١٠ تا ١٤)

-কোন অন্তরংগ বন্ধু কোন অন্তরংগ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না। অথচ একে অপরকে দেখানো হবে। অপরাধী চাইবে যে ঐদিনের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে নিজের সন্তানকে আপন স্ত্রীকে, আপন ভাইকে এবং আশ্রয়দাতা অতি নিকট পরিবার পরিজনকে এবং

পৃথিবীর সকল মানুষকে মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দিবে এবং এ কৌশল তাকে মুক্তি দান করবে। (মায়ারিজ ঃ ১০-১৪)

অর্থাৎ এমন হবে না যে, তারা একে অপরকে দেখতে পাবে না। এজন্যে জিজ্ঞাসা করবেনা। বরঞ্চ স্বচক্ষে দেখতে পাবে যে তারা কোন্ বিপদে পতিত। তারপর আর জিজ্ঞাসা করবে না কারণ নিজের ঘাড়েই তো বিপদ। পক্ষান্তরে তারা চাইবে সকলকে মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে নিজে মুক্ত হবে।(১৩৮)

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّ لاَ شَفِيْعٍ يُّطَاعُ -

(المؤمن ١٨)

-জালেমদের জন্যে না কোন বন্ধু হবে আর না কোন সুপারিশকারী যার সুপারিশ শুনা হবে। (মুমেন ঃ ১৮৭)

জালেম বলতে সে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বুঝায় যে হকের উপর জুলুম করে অসত্যের পন্থা অবলম্বন করেছে।

উক্ত আয়াতের حميم শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তির এমন বন্ধু যে তাকে আক্রান্ত দেখে উত্তেজিত হয়ে তাকে রক্ষা করার জন্যে দ্রুত অগ্রসর হয়। শেষ কথাটি বলা হয়েছে, কাফেরদের শাফায়াতের ধারণা বিশ্বাস খন্ডন করে। আসল কথা এই যে, ওখানেতো জালেমদের কোন শাফায়াতকারী মোটেই থাকবে না। কারণ কেউ শাফায়াতের কোন অনুমতি লাভ করলে তো আল্লাহর নেক বান্দাহগণই করতে পারেন। আর আল্লাহর নেক বান্দাহগণ কখনো কাফের মুশরিক ও পাপাচারীদের বন্ধু হতে পারেন না যে তাঁরা তাদেরকে রক্ষা করার জন্যে সুপারিশ করার কোন খেয়াল করবেন। কিন্তু যেহেতু কাফের, মুশরিক এবং গোমরাহ লোকদের সাধারণতঃ এ ধারণা ছিল এবং এখনো রয়েছে যে, তারা যেসব বুযর্গের আঁচল ধরে আছে তারা কখনো তাদেরকে দোযখে যেতে দেবে না বরঞ্চ আড়াল করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে ছাড়বে এবং তাদের সুপারিশ অবশ্যই মানতে হবে।(১৩৯)

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ط لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ

اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا - (النبا ٣٨)

-সেদিন যখন রূহ(জিব্রিল) এবং ফেরেশতাগণ সারি বেঁধে দাঁড়াবেন তখন কেউ কথা বলবে না তারা ব্যতীত যাদেরকে আল্লাহ্ রহমানুর রহীম অনুমতি দেবেন এবং তারা ঠিক কথা বলবে। (নাবা ঃ ৩৮)

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে দরবারে ইলাহীর ভয়ানক প্রভাব প্রতিপত্তি এমন হবে যে, দুনিয়াবাসী অথবা আসমানবাসী কারো এমন দুঃসাহস হবে না যে স্বেচ্ছায় আল্লাহর সামনে মুখ খুলবে, অথবা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করবে। কথা বলার অর্থ সুপারিশ করা এবং বলা হয়েছে যে, তা দুটি শর্তের অধীনে সম্ভব হবে। এক এই যে, যে ব্যক্তিকে যে গোনাহগারের সপক্ষে সুপারিশের অনুমতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হবে, সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সপক্ষেই সুপারিশ করতে পারবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, সুপারিশকারী স্বয়ং সঠিক কথা বলবে, অন্যায় কোন সুপারিশ করবে না। এর মধ্যে অতিরিক্ত এ শর্তও পাওয়া

যায় যে, যার সপক্ষে সুপারিশ করা হবে সে দুনিয়াতে অন্ততঃ কালেমা পাঠকারী হবে, অর্থাৎ নিছক গোনাহগার, কাফের নয়। (১৪০)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ط وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ - (الانفطار - ١٩)

-এ হচ্ছে সেই দিন যখন কোন মানুষের জন্যে কিছু করা কারও সাধ্য হবে না এবং ফয়সালা সেদিন পুরোপুরি আল্লাহর এখতিয়ারে হবে। (ইনফিতার ঃ ১৯)

আলোচনার সারাংশ

এ ছিল দাওয়াতে ইসলামীর চতুর্থ দফা যা এমন জোর দিয়ে যৌক্তিকতা সহকারে এমন বিশদভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, তার সামনে কাফেরদের ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ দাবী "উঠিয়ে আন আমাদের বাপ-দাদাকে" কিছুতেই টিকতে পারে না। যারা তাদের আপন স্বার্থের খাতিরে লড়াই করছিল এবং যাদেরকে অবশ্য লড়তেই হতো, তাদেরকে ছাড়া প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা না করে পারতো না যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়া না অসম্ভব আর না বিবেকের পরিপন্থী। আর না এটা সম্ভব যে, খোদার কাছে জবাবদিহির অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়ায় মানুষের কর্মপদ্ধতি সত্য ও সুবিচারের স্থায়ী মূলনীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, আর না মানুষ সত্যিকার এবং পরিপূর্ণ ইনসাফ এছাড়া অন্য কোন উপায়ে পেতে পারে যে, বর্তমান দুনিয়ার ব্যবস্থা শেষ হওয়ার পর কিয়ামত সংঘটিত হবে, সকল আগে ও পরের মানব বংশধরদেরকে একত্র করে বিশ্বপ্রকৃতির মালিকের সামনে হাযির করা হবে এবং একেবারে নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেকের দায়িত্ব চিহ্নিত করে শাস্তি এবং পুরস্কারের যোগ্য যে হবে তাকে তা দেয়া হবে।(১৪১)

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নৈতিক শিক্ষা

ইসলামী দাওয়াত এসব আকীদাহ বিশ্বাস এমন সব যুক্তি প্রমাণসহ হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে পেশ করার সাথে সাথে নৈতিকতারও এক অতি স্পষ্ট ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, যার দরুন কুরআনের শ্রোতা ও পাঠক প্রত্যেকেই পরিষ্কার জানতে পেরেছে যে, ইসলাম কোন্ ধরনের চরিত্র পছন্দ করে এবং কোন ধরনের অপছন্দ করে। মানবতার কোন্ সে নমুনা বা আদর্শ তার কাছে মন্দ যা সে পরিবর্তন ও বিলোপ করতে চায়। আর মানবতার এমন কোন্ সে আদর্শ যা ভালো এবং তা সে তৈরী করতে, লালন ও বিকশিত করতে চায়। মন্দ ও অনিষ্ট তার দৃষ্টিতে কি, কি কারণে তা জন্মলাভ করে এবং মানবজীবনে তা কি কি রূপ ধারণ করে। আর কোন জিনিস তাকে বিকশিত করে। ঠিক তার বিপরীত কল্যাণ তার দৃষ্টিতে কি এবং তার উৎসইবা কি? তার প্রকাশ লাভের পথ কিভাবে উন্মুক্ত হয় এবং কি রূপ ও আকৃতিতে তা প্রকাশ লাভ করে?

দাওয়াতে ইসলামী এ কথা বলে যে, ইসলামের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অনিষ্ট অকল্যাণের যত কারণ তা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলা এবং কল্যাণের পথ সুগম করে দেয়া। বেশী বেশী প্রশস্ত করে দেয়া এবং ব্যক্তি থেকে সমাজ পর্যন্ত জীবনের সকল বিভাগে অকল্যাণের স্থলে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করা। এ বর্ণনা ইসলামী দাওয়াতের মধ্যে এতো বিস্তারিত, এতো সুস্পষ্ট, এতো হৃদয়গ্রাহী এবং সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির কাছে এতোটা বোধগম্য ভাষায় করা হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের সমাজে শত শত বছর ধরে যারা নৈতিক অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত ছিল, তাদের জন্যেও একথা উপলব্ধি করা কঠিন ছিল না যে, সত্যি সত্যিই মানবতার সেই নমুনাই সর্বনিকৃষ্ট যাকে ইসলাম মন্দ বলে এবং সেই নমুনাই সর্বোৎকৃষ্ট যার ছাঁচে সে মানুষ ও সমাজকে ঢেলে সাজাতে চায়।(১৪২)

নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু মৌলিক বাস্তবতা

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম কিছু বাস্তবতা লোকের সামনে পেশ করা হয়েছে যাতে নৈতিক সমস্যা মৌলিক দিক দিয়ে তাদের বোধগম্য হয়।

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ـ

(الشمس ٧ تا ١٠)

-আর মানুষের নফ্সের কসম এবং কসম সেই সত্তার যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে তার পাপ ও পুণ্য উভয়ের প্রবণতা তার মধ্যে ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ লাভ করলো সে যে নফ্সের পবিত্রতা বিধান করলো এবং ব্যর্থ হলো সে যে তাকে দমিত করে রাখলো। (শামস ঃ ৭-১০)

মানুষের নফ্‌সকে সুবিন্যস্ত করার অর্থ স্রষ্টা তাকে এমন দেহদান করেছেন যা সঠিক আকার-আকৃতি। আপন হাত-পা এবং মনমস্তিষ্কের দিক দিয়ে মানুষের মতো জীবন যাপন করার সম্পূর্ণ উপযোগী। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার এবং ঘ্রাণ গ্রহণ করার এমন সব ইন্দ্রিয় দান করেছেন, যা স্বীয় অনুপাত ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জনের উৎকৃষ্টতম উপায় হতে পারতো। তাকে জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি, যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ধারণা শক্তি, স্মরণশক্তি, ভালোমন্দ নির্ণয়ের শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি দান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সে দুনিয়ার সে কাজ করার যোগ্য হয় যা মানুষের করণীয়। তাকে স্বভাবজাত দুর্বৃত্ত এবং জন্মগত পাপী হিসাবে নয় বরঞ্চ সঠিক ও সরল প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। তার গঠন আকৃতিতে কোন প্রকার বক্রতা ও বিকৃতি রেখে দেয়া হয়নি যে, সে সঠিক পথ অবলম্বন করতে চাইলেও তা পারবে না।

আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বান্দাহর মন মস্তিষ্কের উপর তার অজ্ঞাতে কোন চিন্তা ধারণা প্রবিষ্ট করা অর্থে ইলহাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানুষের মনের উপর তার পাপ কাজ, সৎকাজ ও পরহেজগারীর প্রবণতা ইলহাম করে দেয়ার দুটি অর্থ হতে পারে। এক এই যে, স্রষ্টা তার মধ্যে সৎ কাজ ও পাপ কাজ উভয়ের প্রবণতা ও ইচ্ছা-অভিলাষ রেখে দিয়েছেন। আর এ এমন এক বস্তু যা প্রত্যেক মানুষ তার মধ্যে অনুভব করে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের অবচেতন অবস্থায় আল্লাহতায়ালা এ ধারণা দান করেছেন যে, চরিত্র ও আচার-আচরণে কোন জিনিস ভালো এবং কোন জিনিস মন্দ রয়েছে। আর ভালো চরিত্র ও কাজকর্ম এবং মন্দ চরিত্র ও কাজকর্ম একই রকম নয়। পাপাচার একটি জঘন্য বস্তু এবং তাকওয়া (মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা) একটি মহৎ বস্তু। এ ধারণা মানুষের কাছে অপরিচিত নয়, বরঞ্চ তার স্বভাব প্রকৃতি এসব সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। স্রষ্টা ভালো এবং মন্দ নির্ণয়ের শক্তি জন্মগতভাবে তাকে দান করেছেন।

'তাযকিয়া' পাক করা, বর্ধিত করা ও বিকশিত করা অর্থে বলা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তাযকিয়া দমিত করা, গোপন করা, প্রলুব্ধ করা ও পথভ্রষ্ট করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতটিতে এ কথা সিদ্ধান্তকর পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে, মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা এ প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল যে, আল্লাহ যেসব শক্তি তাকে দান করেছেন, তা ব্যবহার করে আপন মনের ভালো ও মন্দ প্রবণতার মধ্যে কোনটি বর্ধিত করে এবং কোনটি দমিত করে রাখে। সাফল্য শুধু সে ব্যক্তির জন্যে যে তার মনকে পাপ থেকে পবিত্র করে রাখে এবং তাকে বর্ধিত করে তাকওয়ার উচ্চ শিখরে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে কল্যাণ বিকশিত করে। বিফল মনোরথ সে ব্যক্তি যে তার মধ্যে বিদ্যমান সৎ প্রবণতাকে দমিত করে এবং আপন মনকে প্রলুব্ধ করে। মন্দ প্রবণতার দিকে নিয়ে যায়। তারপর পাপাচারকে এতোটা শক্তিশালী করে দেয় যে, তাকওয়া তার তলায় এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যেমন একটি মৃতুদেহ কবরে মাটি দেয়ার পর দৃষ্টির অগোচর হয়।(১৪৩)

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ـ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ـ (الدّهر ٢-٣)

-আমরা মানুষকে (মা ও বাপের) যুক্ত শূক্র থেকে পয়দা করেছি যাতে তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আর এ উদ্দেশ্যে আমরা তাকে শ্রোতা ও দর্শক বানিয়েছি। আমরা তাকে পথ দেখিয়েছি তা সে কৃতজ্ঞ হোক অথবা অকৃতজ্ঞ। (দাহর ঃ ২-৩)

মাতাপিতার যুক্ত শূক্র থেকে এ মানুষের মতো পশুও জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশু এ দুনিয়াতে পরীক্ষার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে পরীক্ষার জন্যে পয়দা করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহতায়ালা পশুর বিপরীত তাকে শ্রোতা ও দর্শক বানিয়েছেন। অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধির শক্তি দান করেছেন যাতে সে পরীক্ষার যোগ্য হতে পারে। তারপর এ শক্তি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরঞ্চ, তাকে পথও দেখানো হয়েছে। যাতে সে একথা উপলব্ধি করে যে, খোদার বান্দাহ হিসাবে তার মধ্যে শুকরিয়া আদায়ের পথ কোনটি এবং অকৃতজ্ঞতা বা নিমকহারামীর পথ কোনটি। এখন তার পরীক্ষা এ বিষয়ে যে, উভয় পথের পার্থক্য জানার পর নিজের এসব শক্তি ব্যবহার করে শোকর আদায়ের পথ অবলম্বন করছে, না কুফরের।(১৪৪)

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّه عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وهَدَيْنه النَّجْدَيْنِ ـ(البلد ٨ تا ١٠)

আমরা কি তাকে দুটি চক্ষু, একটি জিহ্বা ও দুটি ওষ্ঠ দান করিনি? এবং উভয় সুস্পষ্ট পথ কি তাকে দেখাইনি? (বালাদ ঃ ৮-১০)

দুটি চোখের অর্থ গরু-মহিষের চোখ নয়, বরঞ্চ মানবীয় চোখ যা মেলে দেখলে সে চারদিকে সেসব নিদর্শন দেখতে পাবে যা বাস্তবতা সুস্পষ্ট করে দেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। জিহ্বা ও ওষ্ঠের অর্থ শুধু কথা বলার যন্ত্রই নয়, বরঞ্চ একটি বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মন (Reasoning mind) যে এ যন্ত্রদ্বয়ের সাহায্যে চিন্তা-ভাবনা করার কাজ করে এবং মনের কথা প্রকাশ করার কাজ করে। তারপর আল্লাহ বলেন, আমরা তাকে জ্ঞান বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে এমনি ছেড়ে দিইনি যে, সে তার পথ নিজেই বেছে নেবে। বরঞ্চ তার পথ নির্দেশনার জন্যে তার সামনে ভালো ও মন্দ, পুণ্য ও পাপ দুটি পথও পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি যাতে সে খুব চিন্তাভাবনা করে এ দুটির যে কোনটি আপন দায়িত্বে গ্রহণ করতে পারে।(১৪৫)

لَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَان فِى اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنهُ اَسْفَلَ سفلِيْنَ الاَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا و عَمِلُوا الصّلِحتِ ـ (التّين ٤ تا ٦)

-আমরা মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোসহ পয়দা করেছি। পরে তাকে উলটো দিকে ফিরিয়ে সর্বনিম্ন করে দিয়েছি। ব্যতিক্রম শুধু ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। (আত্তীন ঃ ৪-৬)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেহ দান করেছেন যা অন্য কোন প্রাণীকে দান করেননি। আর তাকে চিন্তাভাবনা ও জ্ঞান বুদ্ধির সর্বোত্তম যোগ্যতা দান করেছেন যা অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে দান করেননি। কিন্তু যখন সে ঈমান ও নেক

আমলের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আপন দেহ ও মনের শক্তিকে মন্দ পথে ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ তাকে মন্দ কাজেরই তওফীক দেন এবং তাকে এমন চরম অধঃপতনে পৌঁছিয়ে দেন যে, কোন নিকৃষ্টতম সৃষ্টিও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

এ এমন এক বাস্তবতা যা মানব সমাজে বহু দেখতে পাওয়া যায়। লোভ লালসা, স্বার্থপরতা, আত্মপ্রচারণা, মাদকাসক্তি, নীচতা, ক্রোধোন্মত্ততা এবং এ ধরনের অন্যান্য স্বভাব প্রকৃতির যার মধ্যেই মানুষ নিমজ্জিত হয়, নৈতিক দিক দিয়ে সে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু একটিকেই যদি সামনে রাখা যায় তাহলে দেখা যায় যে, একটি জাতি যখন অন্য একটি জাতির প্রতি শত্রুতায় অন্ধ হয়ে পড়ে তখন কিভাবে হিংস্রতায় সকল হিংস্র প্রাণীকে হার মানায়, হিংস্র পশু ত শুধু আপন আহারের জন্যে অন্য কোন পশু শিকার করে, সকল পশু একত্রে হত্যা করে না। কিন্তু মানুষ স্বয়ং সমজাতীয় মানুষেরই গণহত্যা করে। হিংস্র পশু তার নখর ও দন্তদ্বারা শিকার করে। কিন্তু সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করা মানুষ তার বুদ্ধি ও আবিষ্কার শক্তি দ্বারা একটির পর একটি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তৈরী করতে থাকে যেন গোটা জনপদ ধ্বংস করতে পারে। হিংস্র পশু শুধু আহত অথবা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ, তার নিজের মতো মানুষকে নির্যাতিত করার জন্যে এমন সব মর্মান্তিক পন্থা অবলম্বন করে যার ধারণা কোন হিংস্র পশুর মনে আসতে পারে না। অতঃপর সে তার শত্রুতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার লালসা চরিতার্থ করার জন্যে নীচতার এমন নিম্নতম স্তরে পৌঁছে যায় যে, শত্রুর নারীদের উলংগ মিছিল বের করে, এক এক নারীকে দশ বিশজন পুরুষ তাদের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য ধর্ষণ করে। বাপ, ভাই ও স্বামীর চোখের সামনে তাদের কন্যা, ভগ্নি ও স্ত্রীর সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে। মা বাপের সামনে তাদের শিশুদেরকে হত্যা করে। মাকে তার সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করে। জীবিত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয় এবং জীবিত অবস্থায় দাফন করা হয়। দুনিয়ায় এমন কোন হিংস্রতম পশু নেই যে মানুষের এ পশুত্বের কোন পর্যায়ে মুকাবিলা করতে পারে। এ অবস্থা আন্যান্য মন্দ গুণাবলীরও যে সে সবের মধ্যে যার দিকেই মানুষ ধাবিত হয়, সে নিজেকে এক অতি নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করে। এমনকি মানুষের জন্যে ধর্ম যে, এক পবিত্রতম বস্তু তারও সে এমন অবনতি ঘটায় যে, গাছপালা, জীবজন্তু এবং গ্রন্থরাজির পূজা করতে করতে অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছার পর নারী ও পুরুষের লিংগ পূজায় লিপ্ত হয়। দেব-দেবীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে মন্দিরে দেবদাসী রাখারও প্রচলন করে এবং পুণ্য কাজ মনে করে তাদের সাথে ব্যভিচার করা হয়। তাদের পুরান বা ধর্মগ্রন্থে এমন সব অশ্লীল কল্পকাহিনী আরোপ করা হয় যা নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যেও লজ্জাকর।(১৪৬)

এসব বাস্তবতা বর্ণনা করার সাথে সাথে কুরআন মানব মনের তিনটি পৃথক পৃথক রূপ বর্ণনা করেছে। একটি হলো নফ্সে আম্মারা যা মানুষকে মন্দ কাজে উত্তেজিত করে। (ইউসুফ ঃ ৫৩)

দ্বিতীয় নফসে লাওয়ামাহ। তার কাজ হলো মানুষের ইচ্ছা বাসনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত একটি স্তরে সে মানুষকে সতর্ক করে দেয়। তারপর মন্দ কাজ করে ফেলার পর তাকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। (কিয়ামাহ ঃ২) তৃতীয় হচ্ছে নফসে মুতমায়েন্নাহ। সে পূর্ণ নিশ্চিন্ততার সাথে মন্দ পথ পরিহার করে সৎ পথ অবলম্বন করে এবং তার এতে কোন দুঃখ নেই যে, সে অসৎ কাজের স্বাদ ও সুযোগ সুবিধা কেন পরিহার করলো এবং কল্যাণের জন্যে কেন বঞ্চনা, ত্যাগ ও কুরবানী, দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মসিবত কেন বরদাশত

করলো। এতে দুঃখ করাত দূরের কথা, তার মন এতে সন্তুষ্ট হয় যে, সে মন্দ কাজের আবিলতা ও পংকিলতা থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং কল্যাণের পবিত্রতা সে লাভ করেছে। এ তৃতীয় প্রকারের নফসকে কুরআন খোদার পছন্দনীয় নফস বলে অভিহিত করেছে। তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে। (ফজর ঃ ২৭-৩০)

গোমরাহীর কারণ

তারপর কুরআন মজিদ একটি একটি করে ঐ সব কারণ বর্ণনা করেছে যার বদৌলতে, মানুষ সাধারণত গোমরাহীতে লিপ্ত হয়। আরবের কাফেরগণও এসব কারণে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছিল। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১. পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণ

এ সবের মধ্যে প্রথম বস্তুটি হচ্ছে, পূর্ব পুরুষের ধর্মের অন্ধ অনুসরণ। শুধুমাত্র এ কারণেই এসব করা হতো যে, বাপ-দাদার সময় থেকে এ রকম হয়ে আসছে। তারা কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে এ কথা চিন্তা করার চেষ্টা করেনি যে, বাপ-দাদা যা কিছু করতো তা যুক্তিসংগত ছিল কি না। এ অন্ধ অনুসরণের কোন যুক্তি প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, এ হচ্ছে বাপ-দাদার প্রথা। এ প্রসঙ্গে কুরআন ইতিহাস থেকে বহু দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।

হযরত হুদ (আঃ) যখন আদ জাতিকে তাদের বিপথগামী হওয়ার সমালোচনা করে সঠিক পথে আসার পরামর্শ দেন, তখন তারা শুধু এ কথা বলে তাঁর সকল দলিলপ্রমাণ ও নসিহত প্রত্যাখ্যান করে যে, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যে এসেছ যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত করবো এবং ঐসব খোদাকে পরিহার করব, যাদের এবাদত আমাদের বাপ-দাদা করে এসেছেন? (আ'রাফ ঃ ১৭০)

হযরত সালেহ (আঃ) যখন সামূদ জাতিকে বুঝাবার চেষ্টা করেন তখন তাদের জবাব এই ছিল- হে সালেহ! এর পূর্বে তুমি ত এমন ব্যক্তি ছিলে যার থেকে আমরা অনেক আশা পোষণ করতাম। এখন তুমি কি আমাদেরকে সেসব খোদার পূজা অর্চনা থেকে বিরত রাখতে চাও যাদের পূজা অর্চনা আমাদের বাপ-দাদা করতেন? যে পথের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ সে সম্পর্কে বড়ো সন্দেহ-সংশয় রয়েছে যা আমাদের ভয়ানক উদ্বেগ-আশংকার কারণ হয়েছে। (হুদ ঃ ৬২)

হযরত শুয়াইব (আঃ) যখন মাদয়ানবাসীকে তাদের সুস্পষ্ট গোমরাহীর জন্যে সতর্ক করে দেন, তখন তাদের জবাব এই ছিল-

-হে শুয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ শিক্ষা দেয় যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের খোদাকে ছেড়ে দেব? (হুদ ঃ ৮৭)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর পিতা ও জাতিকে বল্লেন, এসব কেমন মূর্তি যার প্রতি তোমরা অনুরক্ত হয়ে পড়ছ? তখন তাদের এ ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে তাদের পূজা করতে দেখেছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তারপর পরিষ্কার বল্লেন, তোমরাও পথভ্রষ্ট এবং তোমাদের বাপ-দাদাও সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিল। (আম্বিয়া ঃ ৫২-৫৪)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তোমাদের দোয়ার কোন জবাব দেয়? তোমাদের কোন উপকার ও ক্ষতি করে কি?

তাদের জবাব ছিল- এতে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। আমরা ত এসব শুধু এ জন্যে করি যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এমনই করতে পেয়েছি।
(আশ্‌শুয়ারা ঃ ৭২-৭৪)

হযরত মূসা (আঃ) যখন সুস্পষ্ট মুজেযাসহ ফেরাউন ও তার সভাজনদের কাছে হকের দাওয়াত দিলেন তখন তারাও এ কথাই বলেছিল- তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দেবে- যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে দেখেছি? (ইউনুস ঃ ৭৮)

এসব দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে কুরআন মজিদ বলে যে, সকল জাহেল জাতি তাদের নবীগণের দাওয়াত এই যুক্তিহীন যুক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রথম জাতিগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন বলে যে, এরা সকলে তাদের নবীগণের সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ, নসিহত ও সতর্কবাণীর কোন জবাব দিয়ে থাকলে এই দিয়েছে-আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া তুমি আর কিছু নও। তুমি আমাদেরকে ঐসব খোদার বন্দেগী থেকে দূরে রাখতে চাও যাদের বন্দেগী আমাদের বাপ-দাদা করতে থাকেন। (ইব্রাহীম ঃ ১০)

অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে এভাবে, হে নবী! তোমার পূর্বে যে জনপদে আমরা কোন সতর্কবাণী পাঠিয়েছি তার সচ্ছল ব্যক্তিগণ এ কথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক পদ্ধতিতে চলতে দেখেছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি। প্রত্যেক নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি সে পথেই চলতে থাকবে যদিও আমি তোমাদেরকে অধিকতর সরল সঠিক পথ বাতিয়ে দেই? সেই পথ থেকে যে পথে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছ? তারা সকল নবীকে এ জবাবই দিয়েছে- যে জিনিসের দিকে ডাকার জন্যে তোমাদেরকে পঠানো হয়েছে, আমরা তার অস্বীকারকারী।
(যুখরুখ ঃ ২৩-২৪)

এ শুধু অতীত কালের জাতিসমূহের অবস্থাই ছিল না, বরঞ্চ প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকদের নিয়মপন্থা এই ছিল এবং আছে যে, তারা কোন জ্ঞান এবং আলো ও পথ প্রদর্শনকারী কেতাব ব্যতীত আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই শিক্ষার দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে, না, আমরা সেই পথই অবলম্বন করবো যে পথে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।

তা শয়তান তাদের বাপ-দাদকে জাহান্নামের দিকেই ডাকুক না কেন।
(লুকমান ঃ ২০-২১)

এসব দৃষ্টান্ত পেশ করার পর কুরআন সরাসরি কুরাইশ ও আরববাসীকে সাবধান করে দেয় যে, তোমরাও তাদের মতোই। তোমরা না তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে এ চিন্তা কর যে, যে ধর্মের তোমরা অনুসরণ কর তা সঠিক কি না। আর না যুক্তি প্রমাণসহ তোমাদের ধর্ম ও রেসম-রেওয়াজের ভ্রান্তি তোমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করছ। ব্যস শুধু এ কারণেই এক ভ্রান্ত জিনিসের উপর জিদ ধরে বসে আছ যে, এ বাপ-দাদা থেকে চলে আসছে।

সূরায়ে সাফফাতে বলা হয়েছে, এসব লোক তাদের বাপ-দাদাকে পথভ্রষ্ট পেয়েছে। অতএব, তাদের পেছনেই দ্রুত চলেছে, অথচ তাদের পূর্বে যারা কালযাপন করেছে তাদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট হয়েছে। (আয়াত ঃ ৬৯-৭১)

সূরা হুদে রসূলে করীম (সা)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমি ওসব মাবুদ বা

দেবদেবীর পক্ষ থেকে কোনরূপ সন্দেহে নিপতিত হয়ো না যাদের এসব লোক পূজা করছে। এ ঠিক সেভাবেই পূজা করা হচ্ছে যেমন তাদের বাপ-দাদা করতো। (আয়াত-১০৯)

উলংগতা ও নগ্নতার মতো চরম লজ্জাকর জিনিস থেকে যখন কুরাইশ ও আরববাসীদের বিরত থাকতে বলা হলো এবং বলা হলো যে, তারা পবিত্র কাবাগৃহের চারধারে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করতেও কোন দ্বিধাবোধ করে না, যার চেয়ে ঘৃণ্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। অতএব এ ব্যাপারে তাদের লজ্জাবোধ করা উচিত তখন তারা এটাকেও বাপ-দাদাকে অনুসরণ করার ভিত্তিতে বৈধ গন্য করার চেষ্টা করে। বস্তুতঃ সূরায়ে আ'রাফে বলা হয়েছে, যখন এরা কোন লজ্জাজনক কাজ করে তখন তারা বলে- আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এমনটি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এ কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।

হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ্ নির্লজ্জতার আদেশ কখনো দিয়ে থাকেন না। তোমরা কি আল্লাহ্র নাম নিয়ে সে কথা বল যা তোমরা জান না যে, আল্লাহ এর হুকুম দিয়েছেন? (আয়াত ঃ ২৮)

আরবের কাফেরগণ বিভিন্ন ধরনের অযৌক্তিক জাহেলী রেসম-রেওয়াজের প্রতি অবিচল ছিল এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই এ কথা বুঝে বসেছিল যে এসব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ সম্পর্কে সূরায়ে মায়েদায় বলা হয়েছে- এবং যখন তাদেরকে বলা হয় এসো সেই শিক্ষার দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে ত তাই যথেষ্ট যার উপরে আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। এরা কি বাপ-দাদারই অন্ধ অনুসরণ করতে থাকবে, তা তারা কোন জ্ঞানের অধিকারী না হোক এবং সঠিক পথের উপর না হোক? (আয়াত ঃ ১০৪)

এভাবে আরবের কাফেরগণ হালাল হারামের বহু বাধানিষেধ নিজেদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। এসব তাদের নিজেদের তৈরী এবং এর ভিত্তিতে বাধ্যতামূলক করেছে যে, তা পূর্ব হতে চলে আসছে। এ সবের মধ্যে অনেক হালালকে হারাম এবং অনেক হারাম, লজ্জাকর ও জঘন্য জিনিস হালাল করা হয়। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বলা হয়- যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ঐ হেদায়েত মেনে চল যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, না, আমরা ত সেই পথ অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি এবং তারা কি ওদেরই অনুসরণ করতে আসবে যদিও তাদের বাপ-দাদার কোন বোধশক্তি না থাকে এবং তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয়? (আয়াত ঃ ১৭০)

সূরায়ে আনয়ামে এ অন্ধ অনুসরণকে এমন শক্তিশালী যুক্তি প্রমাণসহ অসংগত ও যুক্তি বিরুদ্ধ প্রমাণ করা হয়েছে যে, আরবের চরম হঠকারী লোকও হয়তো একবার তার মন থেকে এ কথা মেনে নিয়েছে যে, সত্যি সত্যিই আমরা একটা উদ্ভট জিনিসের অনুসরণ করছি।

উক্ত সূরায় বলা হয়েছে- এ লোকেরা আল্লাহর জন্যে তাঁর নিজেরই সৃষ্ট ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশুর মধ্য থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে এবং বলে, এ আল্লাহর জন্যে (এ তাদের স্বীয় ধারণামাত্র) আর এ আমাদের বানানো শরীকদের জন্যে। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্যে তা আল্লাহর নিকট পৌছায় না। অথচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের কাছে পৌছে যায়।[১]

এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহুসংখ্যক মুশরিকদের জন্যে তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজ খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্ধিগ্ধ বানিয়ে দেয়।[২]

তারা বলে, এসব গবাদি পশু ও ফসল সংরক্ষিত। আমরা যাদেরকে খাওয়াই তারা ব্যতীত আর কেউ এ খেতে পারে না। এসব তাদের নিজেদের কল্পিত। আর কিছু পশু এমন আছে যার উপর সওয়ার হওয়া ও তাদের দ্বারা মাল বহন করা হারাম করা হয়েছে। আর কিছু পশু এমন আছে যাদের উপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না, আল্লাহর প্রতি এ মিথ্যা আরোপ করে যে আল্লাহ তাদের উপর নাম নিতে নিষেধ করেছেন।....এবং তারা আরও বলে, এসব পশুর পেটে যেসব বাচ্চা আছে তা আমাদের পুরুষের জন্যে নির্দিষ্ট ও নারীদের জন্যে হারাম। কিন্তু যদি তা মৃত হয় তাহলে নারী পুরুষ সকলেই তাতে অংশীদার।.... দেখ এই আট নর ও মাদী। দুই ভেড়া শ্রেণীর আর দুই ছাগল শ্রেণীর। হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস কর আল্লাহ কি তাদের নর জাতীয়কে হারাম করেছেন, না মাদী বা স্ত্রী জাতীয়কে। অথবা ওসব বাচ্চা যা ভেড়া এবং ছাগলের পেটে আছে? যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং এমনিভাবে উটের দুই প্রকার আছে এবং গাভীর দুই প্রকার। এদেরকে জিজ্ঞেস কর, এদের নর আল্লাহ হারাম করেছেন না মাদী? অথবা সে বাচ্চা যা উটনী ও গাভীর পেটে আছে? তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এসব হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদের দেন? তারপর সে ব্যক্তি অপেক্ষা জালেম আর কে হবে যে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে মিথ্যা কথা বলে, যাতে জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে ভ্রান্ত পথে চালানো যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন জালেমদের সুপথ দেখান না। (আয়াত ঃ ১৩৬-৪৪)

২. বড়োলোক ও নেতাদের ভ্রান্ত অনুসরণ

পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণের কাছাকাছি গোমরাহীর আর একটি কারণ কুরআন চিহ্নিত করেছে যা মানুষকে উচ্ছৃংখল ও সমাজকে বিনষ্ট করতে তার চেয়ে কোনদিক দিয়ে কম

---

১. অর্থাৎ যে ফসল অথবা ফল প্রভৃতি আল্লাহর নামে বের করা হতো তার মধ্য থেকে যদি কিছু পড়ে যেতো তাহলে তা শরীকদের অংশে শামিল করে দেয়া হতো। আর যদি শরীকদের অংশ থেকে পড়ে যেতো অথবা খোদার অংশে পাওয়া যেতো তাহলে তা তাদেরই অংশে ফেরৎ দেয়া হতো। ক্ষেতের যে অংশ শরীকদের নযর-নিয়াযের জন্যে নির্দিষ্ট করা হতো, তার থেকে যদি কখনো পানি প্রবাহিত হয়ে সে অংশের দিকে যেতো যা খোদার নযরের জন্যে নির্দিষ্ট করা হতো, তাহলে তা সমুদয় ফসল শরীকদের অংশে শামিল করা হতো। কিন্তু এর বিপরীত হলে খোদার অংশে অতিরিক্ত কিছু দেয়া হতো না। যদি কখনো অনাবৃষ্টির কারণে নযর-নিয়াযের অংশ নিজেদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো, তাহলে খোদার অংশ তারা খেয়ে ফেলতো। কিন্তু শরীকদের অংশে হাত লাগাতে তারা ভয় করতো- যে কি জানি কোন বিপদ এসে পড়ে নাকি। যদি কোন কারণে শরীকদের অংশে কিছু কম হতো, তাহলে খোদার অংশ থেকে তা পূরণ করা হতো। কিন্তু খোদার অংশে কম হলে শরীকদের অংশ থেকে একটি দানাও খোদার অংশে দেয়া হতো না। -গ্রন্থকার।

২. অর্থাৎ তাদেরকে এ বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা যে এটাও ঐ দ্বীনের কোন অংশ যা তারা পেয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) থেকে। এ স্থানে এটা পরিষ্কার যে, শরীক অর্থ দেবদেবী বা অন্য উপাস্য নয় বরঞ্চ ওসব ধর্মীয় নেতা যারা পরবর্তী যুগে মিথ্যা আকীদাহ ও ধর্মীয় প্রথার প্রচলন করে। আর মানুষ তা এমনভাবে মেনে চলে যেমন খোদার আইন মেনে চলা উচিত- গ্রন্থকার।

নয়। তা হচ্ছে আপন জাতির অথবা দুনিয়ার বড়োলোক, নেতা, ধর্মীয় গুরু এবং ধনী সমাজপতিদের অনুসরণ। তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ চিন্তা না করে শুধু এ কারণে তাদের অনুসরণ করা হয় যে, তারা বড়ো লোক, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোক। কুরআন মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ ধরনের অনুসারীগণ অনুতপ্ত হয়ে বলবে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের সরদার ও বড়োলোকদের অনুসরণ করেছি এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রভু! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর কঠিন অভিসম্পাত কর। (আল আহ্যাব ঃ ৬৭-৬৮)

-হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদেরকে ঐসব জিন ও মানুষকে দেখিয়ে দাও যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদেরকে আমরা পদদলিত করব যাতে তারা খুব হেয় ও লাঞ্ছিত হয়। (হামীম আসসাজদাহ ঃ ২৯)

-(যখন আল্লাহতায়ালা শাস্তি দেবেন) তখন এমন অবস্থা দেখা দেবে যে, দুনিয়ায় যেসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হতো, তারাই তাদের অনুসারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে। কিন্তু তারা শাস্তি দেখতে পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপকরণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করতো তারা বলবে, হায়! আবার যদি আমাদেরকে সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আমরা ঐভাবে তাদের কাছ থেকে সরে পড়তাম যেভাবে আজ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সরে পড়ছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজকর্ম যা তারা এ দুনিয়াতে করছে-- তাদের সামনে এমনভাবে নিয়ে আসবেন যে তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে বেরুবার কোন পথ খুঁজে পাবে না (বাকারাহ ঃ ১৬৬-৬৭)

-হায়, যদি তোমরা এসব জালেমের অবস্থা সে সময় দেখতে যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং একে অপরের মুখোমুখী ঝগড়া করবে। যাদেরকে দুনিয়াতে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা বড়ো লোকদের বলবে, তোমরা নাহলে আমরা মুসলমান হতাম। ওসব বড়ো লোকেরা দাবিয়ে রাখা লোকদের বলবে, আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত কবুল করতে বাধা দিয়েছিলাম যখন তা তোমাদের কাছে এসেছিল? তোমরা তো স্বয়ং অপরাধী ছিলে। দাবিয়ে রাখা লোকেরা বড়োলোকদের বলবে-না, বরঞ্চ তা ছিল রাতদিনের প্রতারণা, যখন তোমরা আমাদেরকে বলতে,-আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করবো এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাবো। শেষ পর্যন্ত এসব লোক যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন মনে মনে অনুতাপ করবে। (সাবা ঃ ৩১-৩৩)

এ বাস্তবতাকে কুরআন একটি বিশ্বজনীন আইন হিসাবে বর্ণনা করেছে যে, কোন সমাজকে যে জিনিস অবশেষে ধ্বংস করে তাহলো তার সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও উচ্চশ্রেণীর লোকের নৈতিক অধঃপতন। কোন জাতির যখন দুর্ভাগ্য আসার সময় হয়, তখন তার ধনী ও প্রভাব প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিগণ পাপাচারে লিপ্ত হয়, অত্যাচার-উৎপীড়ণ, ব্যভিচার প্রভৃতি দুষ্কর্ম করতে শুরু করে, অবশেষে এ অনাচার দুষ্কৃতি গোটা জাতিকে ধ্বংস করে। কুরআন বলেঃ

وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ـ

(ايت -١٦)

-আমরা যখন জনপদ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন তার সচ্ছল লোকদের হুকুম দিই এবং তখন তারা সেখানে সব ধরনের পাপাচার করতে শুরু করে। তখন শাস্তির ফয়সালা সে জনপদের উপর কার্যকর হয়। আর আমরা তাকে ধ্বংস করে দিই। (বনী ইসরাইল ঃ ১৬)

৩. গর্ব অহংকার

পথভ্রষ্টতার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা কুরআন চিহ্নিত করে তাহলো এই যে, মানুষ সত্য কথা মানতে এজন্যে অস্বীকার করে যে, তার দৃষ্টিভঙ্গী যে ভুল এ কথা স্বীকার করতে নিজকে হেয় মনে করে। অথবা সে এ কথা মনে করে যে, এ সত্য যদি সে মেনে নেয় তাহলে পথভ্রষ্ট সমাজে তার যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে তা সে হারাবে। অথবা সে মনে করে যে, নিজের কথাকে ছেড়ে দিয়ে অপরের কথা মেনে নেয়া তার উচ্চ মর্যাদার জন্যে হানিকর। তার কথা যতোই ভ্রান্ত হোক এবং অন্যের উপস্থাপিত কথা যতোই সত্য হোক না কেন।

পথভ্রষ্টতার এ কারণ কুরআন মজিদ বারবার মানুষের সামনে তুলে ধরেছে যাতে তার গর্ব অহংকার চূর্ণ হয়, যা সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়েছিল এবং ওসব গোমরাহীর পতাকাবাহীদের গোমরাহীর কারণও সে জানতে পারে যারা তার আপন যুগে অথবা অতীত যুগে হক পথের প্রতিবন্ধক ছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ সূরায়ে নূহে হযরত নূহ (আঃ) এর এ উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, হে আমার রব! আমি আমার জাতির লোকদেরকে দিবারাত্রি হকের দিকে আসার জন্যে ডেকেছি। আমার এ আহবানের ফল এ হয়েছে যে তারা আরও দূরে সরে গেছে এবং যখনই আমি তাদেরকে হকের দিকে দাওয়াত দিয়েছি যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তা তারা তাদের কাছে অঙ্গুলি ঠেসে দিয়েছে, নিজেদের কাপড়ে মুখ ঢেকেছে, নিজেদের আচার-আচরণে অবিচল রয়েছে এবং গর্ব অহংকার করেছে। (নূহ ঃ ৬-৭)(১)

সূরায়ে মু'মেনে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন ফেরাউন হযরত মূসাকে (আঃ) হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, তখন তার দরবারের এক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি সহানুভূতি ও শুভাকাংখাসহ যুক্তিসংগত ভাষায় বুঝাবার এবং ভ্রান্ত আচরণ পরিহার করে সঠিক পথ অবলম্বনের উপদেশ দেয়। কিন্তু সে কথায় কোন কান না দিয়ে আপন হঠকারিতায় অবিচল থাকে। এর পর্যালোচনা করে আল্লাহ্ বলেন-

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ -

(ايت ٣٥)

-এভাবে আল্লাহ্তায়ালা মোহর মেরে দেন প্রত্যেক অহংকারী ও অত্যাচারীর দিলের উপর। -(মুমেন ঃ ৩৫)

---

(১) অহংকারের অর্থ এই যে, তারা সত্যের কাছে মাথা নত করতে এবং খোদার রসূলের নসিহত মেনে নেয়াকে তাদের মানসম্মানের জন্যে হানিকর মনে করেছে। যেমন ধরুন, কোন ভালো মানুষ কোন নীতিভ্রষ্ট লোককে নসিহত করছে এবং সে তার জবাবে মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, মাটিতে ধপ্ধপ্ করে পা ফেলে চলে যাচ্ছে। এ হচ্ছে অহংকারের সাথে নসিহত প্রত্যাখ্যান করা -(গ্রন্থকার)

অর্থাৎ অহংকার ও অত্যাচার উৎপীড়নের হাওয়ায় যে দিল পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তার দুয়ার প্রতিটি উপদেশ বাণী ও সত্য কথার জন্যে বন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ অতঃপর তার উপর তাঁর অভিসম্পাতের মোহর এভাবে মেরে দেন যে, কেউ তাকে সঠিক পথে আনার যতোই চেষ্টা করুক না কেন, সে কোনভাবেই দুরস্ত হয় না।

সূরায়ে আ'রাফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা যখন হযরত মূসাকে (আঃ) কাষ্ঠফলকের উপর হেদায়েতনামা লিখে দিলেন, তখন সেই সাথে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন,- আমি আমার নিদর্শনগুলো থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেব, যারা কোন অধিকার ছাড়াই যমীনের উপর গর্ব অহংকার করে বেড়ায়। এসব লোক কোন নির্দশন দেখলেও কখনো তার উপর ঈমান আনবে না। তাদের সামনে সঠিক পথ এলেও তারা তা অবলম্বন করবে না। যদি বক্র পথ তাদের নজরে পড়ে তাহলে তা অবলম্বন করবে।
(আ'রাফ ঃ ১৪৬)

সূরায়ে বাকারায় বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের খুব ভালো লাগে। সে তার নেক নিয়তের উপর বার বার আল্লাহর কসম করে। কিন্তু সে সত্যের বড়ো দুশমন। এসব বথা বলার পর যখন সে ফিরে যায় তখন তার সকল চেষ্টা চরিত্র এ কাজে নিয়োজিত হয় যে, কি করে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, ফসল ও মানব বংশ ধ্বংস করবে। অথচ আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টি পছন্দ করেন না এবং যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর, তার আত্মসম্মানবোধ তাকে পাপ কাজে সুদৃঢ় রাখে।
(বাকারাহ ঃ ২০৪-২০৬)

সূরায়ে মুদ্দাসসেরে স্বয়ং মক্কার একজন সর্দারের আচরণ পেশ করা হয়েছে। যে কুরাইশ সর্দারদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, তোমরা মুহাম্মদের (সা) উপর যে অভিযোগ আরোপ করছ তা সবই মিথ্যা। কুরআন এক অতি মিষ্টমধুর বাণী। তার মূল অতি গভীরে এবং তার শাখা প্রশাখা ফলবান। কিন্তু যখন সে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলো, "এ রসূল আর এ বাণীকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আমি আমার সর্দারি হারাব না। এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আমার সর্দারি বজায় রাখবো তখন সে দ্বিতীয়টিকে অগ্রাধিকার দিল এবং নিজের মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অবশেষে এক অভিযোগ তৈরী করে ফেল্লো। কিন্তু তার মন জানতো যে, নিছক তার শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখার জন্যে এক সুস্পষ্ট মিথ্যা সে আরোপ করছে। কুরআন তার এ চিত্র পেশ করে তার গোমর ফাঁক করে দিচ্ছেঃ

-সে চিন্তা করলো এবং কিছু কথা বানাবার চেষ্টা করলো। হ্যাঁ খোদার মার তার উপর, সে কেমন কথা বানাবার চেষ্টা করলো। পরে লোকদের প্রতি তাকালো। তারপর কপাল সংকুচিত করলো ও মুখ বাঁকা করলো। পরে ফিরে গেল এবং অহংকারের ফাঁদে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বল্লো, এ কিছু নয়, শুধু যাদু মাত্র। আর এ পূর্ব থেকেই চলে আসছে। এতো এক মানবীয় কালাম। (মুদ্দাস্‌সের ঃ ১৮-২৫)

৪. দুনিয়ার সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতাকে ভালো ও মন্দের মানদন্ড মনে করা

অতঃপর কুরআন বলে যে, গোমরাহীর আর একটি বড়ো কারণ এ ধারণা যে, দুনিয়ায় যে ফল প্রকাশ হয় তাই ভালো ও মন্দের মানদন্ড। এখানে যদি কেউ সচ্ছল হয়, এবং তার সচ্ছলতা কোন অপকর্মের কারণে হলেও সে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত। আর এখানে যে দুস্থ এবং তারপর দুস্থতা কোন সৎ কর্মসহ হলেও সে অকৃতকার্য। অর্থাৎ মংগল তাই যার

পরিণাম এখানে প্রকাশ্যতঃ ভালো দেখা যাচ্ছে এবং অমংগল তাই যার পরিণাম এখানে প্রকাশ্যতঃ মন্দ দেখা যাচ্ছে। এটা দেখা হচ্ছে না যে, এ প্রকাশ্য মংগলের পশ্চাতে কতটা অবৈধ জীবিকা এবং দুষ্কর্ম রয়েছে। আর ঐ প্রকাশ্য অমংগলের পশ্চাতে কতটা সৎকর্ম ও চারিত্রিক উন্নত মানের সম্পদ রয়েছে। কুরআন এ ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণের দৃষ্টান্ত অতীত ইতিহাস থেকেও পেশ করেছে এবং স্বয়ং মক্কা ও আরববাসীর কথাবার্তা ও আচরণেও তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে।

হযরত নূহের (আঃ) কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, তাঁর জাতির সমাজপতিগণ এ কথা বলে তাঁর শিক্ষা ও হেদায়েত কবুল করতে অস্বীকার করে যে, তার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারা ছিল গরীব এবং সমাজে তাদের কোন উচ্চ মর্যাদা ছিল না।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الاَرْذَلُوْنَ ـ

-তারা বল্লো, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, যেহেতু তোমার আনুগত্য অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মেনে নিয়েছে? (আশ শূয়ারা ঃ ১১১)

হযরত সালেহ (আঃ) এর কাহিনীতেও এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তাঁর জাতির ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর গরীব অনুসারীদেরকে জিজ্ঞেস করে -

اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّه ـ

তোমরা কি সত্যি সত্যি জান যে, সালেহ তাঁর প্রভুর পয়গম্বর?

তারা জবাব দেয়- اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِه مُؤْمِنُوْنَ ـ

-আমরা তো সেই জিনিসের উপর ঈমান এনেছি যা সহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

জবাবে বড়ো লোকেরা বলে-

اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِه كٰفِرُوْنَ ـ

-আমরা সে জিনিস মানি না যার উপর তোমরা ঈমান এনেছ। (আ'রাফ ঃ ৭৫-৭৬)

অর্থাৎ তোমাদের মতো নিম্নশ্রেণীর লোক যে জিনিস মেনে নিয়েছ তা আমরা মানি না।

সকল নবীর সম্পর্কে কুরআন এ কথা বলে যে, তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাঁদের জাতির সচ্ছল লোকেরা এবং তাদের দৃষ্টিকোণ এই ছিল যে, দুনিয়ায় খুব ধন সম্পদ ও সন্তানাদি লাভের সৌভাগ্য যার হয়েছে সেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

و مَا اَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِه كٰفِرُوْنَ و قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّ اَوْلاَدًا وَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ (سبا ٣٤-٣٥)

-এবং কখনো এমন হয়নি যে আমরা কোন জনপদে কোন সাবধানকারী পাঠিয়েছি এবং সে জনপদের সচ্ছল লোকেরা এ কথা বলেনি যে, যে পয়গামসহ তোমাকে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না এবং তারা বলে, আমরা তো তোমাদের অপেক্ষা অধিক ধনসম্পদ ও সন্তানের মালিক এবং আমরা কখনো শাস্তিভোগকারী নই। (সাবা ঃ ৩৪-৩৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যমানায় মক্কা ও আরবের কাফেরদের এই ছিল চিন্তাপদ্ধতি। তা যে ভ্রান্ত ছিল এ কথা কুরআন বারবার উল্লেখ করেছে।

সূরায়ে মরিয়মে বলা হয়েছে, এদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত শুনানো হয় তখন কাফেরগণ ঈমানদারদেরকে বলে, বল দেখি আমাদের দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি ভালো অবস্থায় আছে এবং কার বৈঠকাদি জাঁকজমকপূর্ণ?

অথচ এদের পূর্বে এরূপ কত জাতি আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে অধিক সম্পদশালী ছিল এবং প্রকাশ্য জাঁকজমকে এদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল।
(মরিয়মঃ ৭৩-৭৪)

সূরায়ে মুমেনূনে বলা হয়েছে, এরা কি মনে করে যে, তাদেরকে আমরা ধনদৌলত ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তাকি আমরা তাদের কল্যাণ বিধানের জন্যেই করছি? না, তা নয়, প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এদের কোন চেতনাই নেই। প্রকৃতপক্ষে যারা নিজেদের খোদার ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, যারা তাদের খোদার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা নিজের খোদার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যাদের অবস্থা এই যে, তারা যখন দেয়- যা কিছুই দেয়- এ চিন্তায় তাদের অন্তর কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের খোদার নিকট ফিরে যেতে হবে, তারাই কল্যাণের দিকে দ্রুত অগ্রসর এবং অগ্রসর হয়ে তা লাভ করবে। (আয়াত ঃ ৫৫-৬১)

এ কথা বুঝবার জন্যে সূরা ফজরে প্রথমে আদ, সামূদ ও ফেরাউনের মতো অতি উন্নত জাতিসমূহের ও সাম্রাজ্যগুলোর সীমালংঘন ও খোদাদ্রোহিতার বর্ণনা করেছে এবং তারপর বলেছে যে, মানুষ এখনও এ ভ্রান্ত ধারণায় মগ্ন রয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামত ও দৌলতই প্রকৃত সম্মান এবং এখানকার দারিদ্র্য ও আর্থিক অনটনই প্রকৃত অসম্মান। অথচ ধনদৌলত হোক অথবা দারিদ্র্য উভয়ই মানুষের পরীক্ষার জন্যে। তার মধ্যে কোনটাই সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড নয়। (ফজর ঃ ১৫-১৬)

৫. প্রবৃত্তির লালসা ও আন্দাজ-অনুমান অনুযায়ী চলা

গোমরাহীর কারণসমূহ বলতে গিয়ে কুরআন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ চিহ্নিত করছে এবং তা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিছক অনুমান আন্দাজ করে কোন বস্তুকে হক এবং কোনটাকে বাতিল মনে করে বসে। অথবা নিজের প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়ে তার এমন বন্দেগী করে যে, সে দিকেই সে ইচ্ছাকে সে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। কিন্তু খোদাপ্রদত্ত বিবেক ও জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো সে দেখে না যে, নিজের আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে যে পথকে অবলম্বন করেছে অথবা নিজের প্রবৃত্তি অনুসরণে যে পথে সে চলেছে তা সঠিক ও যুক্তিসংগত কি না, এ ভুলের জন্যে কুরআন বার বার মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে যাতে সে আন্দাজ-অনুমান ও প্রবৃত্তির উপত্যকায় পথ হারিয়ে ঘুরাফেরা করার পরিবর্তে বিবেক ও জ্ঞানের সরল পথে আসে।

সূরা আ'রাফে এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, যে জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে দুনিয়ার কুকুরে পরিণত হয়ে থাকে। অতঃপর তার মতো লোকদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়, আমরা বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যেই পয়দা করেছি। তাদের মন আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না। তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না। কান আছে, কিন্তু শুনে না। তারা পশুর ন্যায়। বরঞ্চ তার চেয়েও অধম। এরা ঐসব লোক যারা অবহেলা অসাবধানতার নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে আছে।
(আয়াত ঃ ১৭৩-৭৯)

সূরা আনফালে ওসব লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যারা সব কিছু শুনার পরও যেন কিছুই শুনতো না। তারপর বলা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকটে তাঁর সমগ্র প্রাণবন্তু সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি সেসব বোবা ও বধির লোক যারা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগায় না। (আয়াতঃ ২২) বোবা ও বধিরের অর্থ দৈহিক দিক দিয়ে বোবা ও বধির নয়। বরঞ্চ ওসব লোক, যারা না হক কথা শ্রবন করে আর না হক কথা বলে।

যেসব দেবদেবীদেরকে মুশরিকগণ খোদায়ীতে বিশ্ব প্রভুর শরীক বানিয়ে রেখেছে তাদের মধ্যে কেউই খোদায়ী গুণাবলী ও এখতিয়ার রাখে না, সূরা ইউনুসে ৩১ থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত একটি একটি করে তার যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদেরকে খোদা বানানো হয়নি। বরঞ্চ নিছক আন্দাজ-অনুমান করে মানুষ এটা মনে করে রেখেছে যে, তারাও খোদায়ীতে কিছু অংশ রাখে। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক আন্দাজ-অনুমান ব্যতীত কোন কিছু অনুমান করে না। বস্তুতঃ আন্দাজ-অনুমান হকের কোন-প্রয়োজনই পূরণ করে না। (আয়াত ঃ ৪৬)

সূরা হজ্বে অতীতের ভ্রান্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এসব লোক কি যমীনে চলাফেরা করে দেখেনি যে, (তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখে) তাদের দিল বুঝতে পারতো এবং কান শুনতে পারতো? প্রকৃত পক্ষে চোখ অন্ধ হয় না, বরঞ্চ সে দিল অন্ধ হয় যা বক্ষে থাকে। (আয়াতঃ ৪৬)

এভাবে সূরা ফুরকানে নূহের জাতি, আদ, সামূদ, আসহাবে রাস্, ফেরাউন জাতি ও লুত জাতির পরিণামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর রসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তুমি কি ঐ ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে তার খোদা বানিয়ে নিয়েছে? এমন লোককে সৎ পথে আনার দায়িত্ব কি তুমি নিতে পার? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শুনতে পায় এবং বিবেক কাজে লাগায়? এরা ত পশুর মতো বরঞ্চ তার চেয়েও নিকৃষ্ট। (আয়াত ঃ ৪৩-৪৪)

এ কথা সূরা জাসিয়াতেও বলা হয়েছে, হে নবী তুমি কি কখনো ঐ ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ যে, নিজের প্রবৃত্তিকেই তার খোদা বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন? তার দিল ও কানে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে এবং তার চোখের উপর আবরণ দেয়া হয়েছে। এখন আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে তাকে হেদায়েত দিবে? (আয়াত ঃ ২৩)

৬. মন্দকে সৌন্দর্য মনে করা এবং অসত্যের মধ্যে মগ্ন থাকা

আর একটি বিষয় যাকে কুরআন সমাজের গোমরাহীর বড়ো কারণ গণ্য করে তা এই যে, মানুষ মন্দ কাজকে ভালো মনে করতে থাকে। সত্যের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে কোনরূপ মানসিক অস্বস্তি অনুভব করেনি। বরঞ্চ উল্টো তাতে মগ্ন হয়, এতে গৌরব বোধ করে এবং সত্যকে জানার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। বস্তুতঃ সূরা ফাতেরে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির মন্দ কাজগুলোকে সুন্দর ও চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা সে ভালো মনে করে, তার গোমরাহীর কোন শেষ আছে কি? (আয়াত ঃ ৮)

আর সূরা মুমেনে বলা হয়েছে, জাহান্নামে যখন মানুষকে শাস্তি দেয়া হতে থাকবে তখন তাদেরকে বলা হবে, এ পরিণাম তোমাদের এ জন্যে হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ায় অসত্যে মগ্ন ছিলে এবং তার জন্যে গৌরববোধ করতে। (আয়াত ঃ ৭৫)

৭. এরূপ ধারণা যে সৎ কাজ ও সত্য নিষ্ঠার ফলে মানুষের দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায়

কুরআন মজিদ এ ধারণাকেও গোমরাহীর বড়ো কারণ বলে উল্লেখ করেছে। সূরা আ'রাফে আছে, যখন হযরত শুয়াইব (আঃ) তাঁর জাতিকে ওজন কম দেয়া, কাফেলা লুট করা এবং রাহাজানি করা থেকে বিরত থাকতে বল্লেন তখন জাতির সমাজপতিগণ লোকদেরকে বল্লো-

لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ -

-তোমরা যদি শুয়াইবের কথা মেনে চল, তাহলে নিশ্চিতরূপে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। (আয়াত ঃ ৯০) যেন তাদের এ কথা বলার অর্থ এই ছিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ঈমানদারি করতে গেলে ব্যবসা চলে? আর আমরা যে বাণিজ্যিক কাফেলার পথে বাস করি, ত রাহাজানি যদি না করি এবং পথ বিপদসংকুল করে কাফেলাগুলোর নিকট থেকে মোটা টোল আদায় না করি তাহলে আমাদের এ আর্থিক সমৃদ্ধি কিভাবে বহাল থাকতো? একথাই কুরাইশ সর্দারগণ নবী (সা) কে বলতো।

اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا -

-যদি আমরা তোমার সাথে এ হেদায়েত মেনে চলি, তাহলে যমীন থেকে আমাদেরকে ছোঁ মেরে উৎপাটিত করা হবে। (কাসাস ঃ ৭৫) অর্থাৎ আমাদের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি আরববাসীর উপর আছে তা এ কারণে যে, এখানে আমরা আরবের মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা হয়ে রয়েছি। এ কারণেই আমাদের ব্যবসা এতো সমৃদ্ধ। এ কারণেই আমাদের কাফেলাগুলোর দেশের সকল পথ প্রান্তরে নিরাপত্তা রয়েছে। আর এ কারণেই আরবের সকল উপজাতি আমাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আমরা যদি তোমার কথা মেনে নিয়ে সে পথ অবলম্বন করি, যা তুমি পেশ করছ, তাহলে ত সমগ্র আরব আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে। যে মর্যাদা দেশে আমাদের রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং মক্কাতেও নিরাপদে থাকা সম্ভব হবে না।

৮. শাফায়াতের মুশরেকী ধারণা

প্রাচীনতম কাল থেকে সকল যুগে এ গোমরাহীর একটি বড়ো কারণ ছিল এবং আরবে যখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হলো, তখন তাকে এ গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হলো। মানুষ মনে করতো যে, আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দাহ এমন আছেন, যাদের কথা কিছুতেই টলানো যাবে না। তাঁদের আঁচল যদি মানুষ শক্ত করে ধরে, নযর-নিয়ায ও পূজাপাট দিয়ে তাদেরকে তুষ্ট করে, তাহলে তারপর দুনিয়ায় যা খুশী তাই করা যায়। তাঁদের সুপারিশ মানুষকে সকল অপরাধ ও গুনাহ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহর মেহেরবাণী হাসিল করার এবং মনের বাসনা পূরণ করার এমন সহজ পন্থা, বিদ্যমান থাকতে কার কি গরজ পড়েছে যে, তাকওয়া পরহেজগারীর বেড়ি পায়ে লাগিয়ে প্রতিটি গোনাহের স্বাদ ও প্রত্যেক জুলুম ও বাড়াবাড়ির সুযোগ-সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে? আরবের কাফেরগণ বলতো ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى -

-আমরা ত তাদের এবাদত এ জন্যে করি যে, তাঁরা আল্লাহ পর্যন্ত আমাদেরকে পৌছিয়ে দেবেন। (যুমার ঃ ৩) অর্থাৎ আল্লাহর দরবার এতো উঁচুতে যে সরাসরি সে পর্যন্ত

পৌঁছার শক্তি আমাদের কোথায়? এ জন্যে এসব বুযর্গ ব্যক্তিকে ঐ পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছাবার জন্যে মাধ্যম বানিয়েছি।

هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ -

এঁরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। (ইউনুসঃ ১৮)

এ ভ্রান্ত আকীদাহ বিদ্যমান থাকতে নেক কাজের ও কল্যাণের কোন দাওয়াত সফল হতে পারে না। এ জন্যে কুরআনে বারবার এর উপর আঘাত করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিহীন হওয়া এমন যুক্তিসহ প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে যে, কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ শাফায়াত সমর্থন করা আর সম্ভব রইলো না।

সূরা মুমেনে বলা হয়েছে- হে নবী! এসব লোককে সে দিনের ভয় দেখাও যা নিকটবর্তী। যখন কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে, আর লোকেরা চুপচাপ দুঃখ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ জালেমদের দরদী বন্ধু হবে না। আর না এমন কোন শাফায়াতকারী যার কথা মেনে নেয়া হবে। আল্লাহ চাহনীর চুরিও জানেন, আর সে গোপন কথাও যা বুকের তলায় লুকানো রয়েছে। আল্লাহ নিরপেক্ষ ও সঠিক ফয়সালা করবেন। আর এ মুশরিকরা খোদাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, তারা ত কোন কিছুরই ফয়সালা করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (আয়াত ঃ ১৮-২০)

এ আয়াতগুলোতে শাফায়াতের এ মুশরেকী ধারণা বিশ্বাসকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। প্রথমে ত এ কথা বিবেক ও সুবিচারের পরিপন্থী যে, জালেমের সুপারিশ করা হবে, তারপর এ খোদার খোদায়ী শানেরও পরিপন্থী যে, তাঁর বান্দাহদের মধ্যে কেউ এমন সুপারিশকারী হবে যার কথা মানতে হবে। অর্থাৎ খোদা তার সুপারিশ মানতে বাধ্য হবেন। এর চেয়ে বড়ো কথা এই যা ধারণাও করা যেতে পারে না, যে খোদার নিকটে এমন সব লোকের সুপারিশ চলবে যারা দুনিয়ায় জুলুম করে আসা অপরাধীদের সমর্থনে দাঁড়াবে এবং এটা চাইবে যে খোদা তাদের খাতিরে জালেম অপরাধীকে মাফ করে দিবেন। এর চেয়েও বড়ো কথা এই যে, একজন বিচারক যিনি কোন ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং যাঁকে ইনসাফের সাথে তার মামলার ফয়সালা করতে হবে, তিনি এমন লোককে তার (অপরাধীর) সুপারিশের অধিকার দিবেন যে জানেই না যে, সে ব্যক্তি (অপরাধী) কি করে এসেছে।

অন্যত্র এ শাফায়াতের ধারণা শক্তিশালী যুক্তিসহ খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসব লোক যাদেরকে ডাকছে তারা সুপারিশের কোন অধিকারই রাখে না। তবে কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিলে সে ভিন্ন কথা। (যুখরুফ ঃ ৮৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন দেব-দেবীর অথবা বুযর্গ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, তাদের অবশ্যই শাফায়াতের অধিকার আছে এবং তাদের এমন শাফায়াতের এখতিয়ার আছে যা খন্ডন করা যায় না, তাহলে তার সামনে আসা উচিত এবং এলমের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সত্য সাক্ষ্য দেয়া উচিত। শুধু কিংবদন্তী অথবা আন্দাজ-অনুমানের উপর নির্ভর করে এমন এক আকীদাহ মেনে নেয়া একেবারে অর্থহীন যার সত্য হওয়ার সাক্ষ্য ইলমের ভিত্তিতে দেয়া যায় না। অন্য কথায়, যারা কতিপয় সত্তার জন্যে এ ধরনের এখতিয়ার আছে বলে দাবী করেন তারা কখনো এ কথা বলতে পারে না-"আমরা জানি যে তাদের এ এখতিয়ার আছে এবং আমরা সঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

কিন্তু কুরআন শাফায়াত অস্বীকারও করেনি। বরঞ্চ বারবার এ কথা বলেছে যে, শাফায়াত শুধু সে করতে পারে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং শুধু তার সপক্ষেই শাফায়াত করতে পারে যার জন্যে শাফায়াত শুনতে আল্লাহ রাজী হন। এর অতিরিক্ত শর্ত এই যে, সে ব্যক্তি হক অনুযায়ী শাফায়াত করবে এবং হক ও ইনসাফের বিপরীত কোন কথা বলবে না। তারপরও শাফায়াত কবুল করা না করা আল্লাহর এখতিয়ারে রয়েছে। কারো শাফায়াত মানতে তিনি কখনো বাধ্য নন। এ বিষয়ে কুরআনের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ-

مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه اِلاَّ بِاِذْنِه - (البقره ٢٥٥)

-কে আছে এমন যে তাঁর সামনে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে শাফায়াত করতে পারবে? (বাকারাহ ঃ ২৫৫)

وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ - (سبا :٢٣)

-এবং তার সামনে শাফায়াত কোন কাজে লাগবে না ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার জন্যে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। (সাবা ঃ ২৩)

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفًّا لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ و قَالَ صَوَابًا - (النبا ٣٨)

-যে দিন রূহ (হযরত জিব্রাইল আঃ) এবং ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে। কেউ কথা বলবে না শুধু সে ব্যতীত যাকে রহমান অনুমতি দিয়ে থাকবেন এবং সে ঠিক কথা বলবে। (নাবা ঃ ৩৮)

قُلْ لِّلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَه مُلْكُ السَّموتِ وَالاَرْضِ - (الزمر ٤٤)

-হে নবী! বল যে শাফায়াত সবটাই আল্লাহর এখতিয়ারে। আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। (যুমার ঃ ৪৪)

অর্থাৎ শাফায়াত শুনা অথবা না শুনা তা কবুল করা অথবা প্রত্যাখ্যান করা বিলকুল আল্লাহর এখতিয়ারে। তিনি বিশ্বজগতের বাদশাহীর মালিক। কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করে এবং কারো এ মর্যাদা নেই যে, তার শাফায়াত আল্লাহকে অবশ্যই শুনতে ও মানতে হবে।

মানব ইতিহাস থেকে ভালো ও মন্দ আচরণের দৃষ্টান্ত

গোমরাহীর যে কারণের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন পেশ করেছে কুরাইশ ও আরব সমাজে তা সবই বিদ্যমান ছিল। তাদের এক একজন যখন এসব কথা শুনতো, তখন তারা উপলব্ধি করতো যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে গোমরাহীর এ সমুদয় কারণই বিদ্যমান ছিল। তারপর কুরআন মজিদে মানবীয় ইতিহাস থেকে এক একটি করে এমন চরিত্র ও আচরণের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় যা ছিল উন্নতমানের এবং এমন আচরণের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়, যা ছিল নিকৃষ্টমানের যাতে লোক ভালোভাবে বুঝতে পারে যে,

ইসলাম কোন ধরনের মানুষ তৈরী করতে চায়। আর কোন ধরনের মানুষ তার অপছন্দীয় যার সংশোধন হওয়া উচিত অথবা তাদের অস্তিত্ব থেকে সমাজকে পবিত্র করে ফেলা উচিত। অথবা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং যাদেরকে তার গজবের পাত্র বানিয়ে এ দুনিয়াতে ধ্বংস করে দিয়েছেন। কুরআনের এ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে আলোচনা করে দেখা যাক।

আদম (আঃ) এর দুই পুত্রের ঘটনা

সর্বপ্রথম যে শিক্ষণীয় ঘটনা মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় তা হযরত আদম (আঃ) এর দুইপুত্রের ঘটনা। যার মধ্যে দু'ধরনের আচরণ একে অপরের মুকাবিলায় দেখতে পাওয়া যায়। দু'ভাই কুরবানী করছেন। একজনের কুরবানী কবুল করা হয় অপর জনের কবুল করা হয় না। দ্বিতীয় জন হিংসায় ক্রুদ্ধ হয়ে আপন ভাইকে বলে আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। তার ভাই বলে, আল্লাহ ত খোদাভীরুদের কুরবানী কবুল করে থাকেন। (অর্থাৎ তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার জন্যে আমি দোষী নই। তুমি তোমার চরিত্র ও কাজ কর্মের ক্রুটি দূর করার চেষ্টা কর যে কারণে তোমার কুরবানী কবুল হয়নি) কিন্তু তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাক, আমি তোমাকে হত্যা করব না। কারণ আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। তোমার সাথে মারামারি করে তোমার সাথে অন্যায় খুনের গোনাহে শরীক হওয়ার পরিবর্তে আমি এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেব যে আমার এবং তোমার নিজের গোনাহ তুমি স্বয়ং একত্র করে নেবে।

অবশেষে সে জালেম ভাই তার আপন নেক ভাইকে হত্যা করলো। তারপর খুব অনুতাপ করলো।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর এমন এক পরিবেশে যেখানে মানুষের জীবনের কোন মূল্য ছিল না এবং খুন খারাবী যেখানকার দৈনন্দিন ঘটনা ছিল, কুরআন কত মহান কথা মানুষকে শুনায়। কুরআন বলে, যে ব্যক্তি কাউকে খুনের বদলায় খুন করা ছাড়া অথবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে খুন করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে খুন করলো। আর যে ব্যক্তি কোন একটি রক্ষা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন দান করলো। (মায়েদাঃ ২৭-৩২ দ্রঃ)

হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর জাতি

ইতিহাসে প্রথম যে জাতি দুনিয়ায় খোদাদ্রোহিতার ঝড় প্রবাহিত করেছিল সে ছিল হযরত নূহের (আঃ) জাতি। কুরআনের কয়েক স্থানে সে জাতির কাহিনী বর্ণনা করে একদিকে সে জাতি ও তার সর্দারদের আচরণ বর্ণনা করেছে যার দরুণ শেষে তারা সকলে শাস্তিভোগ করেছে, অপরদিকে স্বয়ং হযরত নূহের (আঃ) আচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে যে, চরম বিরোধিতার মুকাবিলায় সাড়ে ৯শ' বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতাসহ সে জাতির সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকেন -(আয়াত ঃ১৪)। তিনি যথাসম্ভব উপায়ে অত্যন্ত দরদসহ মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনে কোন ক্রুটি করেননি। কিন্তু জাতির সর্দারেরা তাঁর কোন চেষ্টাই সফল হতে দেয়নি। (সমগ্র সূরা নূহ) তাঁকে পাগল বলা হয়েছে এবং তিরস্কার ভর্ৎসনা করা হয়েছে। (কামার ৯) তাঁকে ও তার গরীব অনুসারীদেরকে হেয় অপদস্থ করা হয়েছে। -(হুদ ঃ ২৭) তাঁকে এই বলে ভয় দেখানো হয় যে, যদি তুমি বিরত না হও, তাহলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে

নিহত করা হবে। (শুয়ারা ১১৬) কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বল্লেন, আমার অস্তিত্ব ও নসিহত যদি তোমাদের অসহনীয় হয় তাহলে আমার বিরুদ্ধে যা কিছু করতে চাও কর, আমাকে অবকাশ দিও না। আমার ভরসা আল্লাহর উপরে রয়েছে । (ইউনুস ঃ ৭১) তারপর দ্বন্দ্ব যখন চরম আকার ধারণ করলো তখন তার জাতি বল্লো, তুমি যে তুফানের ভয় আমাদের দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। বস্তুত, হযরত নূহ (আঃ) তাদের চোখের সামনে সে নৌকা বানাতে শুরু করলেন-যাতে আরোহন করে তিনি এবং তার সাথে ঈমানদারগণ আগামী তুফান থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি তাঁর নৌকা নির্মাণ করা দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো। তারা বলতো, বড়ো মিয়ার পাগলামি শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গায় জাহাজ চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তাদের জানা ছিল না যে অতি শীঘ্রই এ ডাঙ্গা এমন এক সমুদ্রে পরিণত হবে যে তার এক একটি তরংগ পাহাড়ের মতো হবে। তার মধ্যে নূহের (আঃ) পুত্রসহ গোটা জাতির লোক নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারাবে। আর যমীনের উপর রাখা নৌকা জুদি পাহাড়ে গিয়ে লাগবে। (হুদ ঃ ৩২-৪৪)

এ কাহিনীর শেষ পর্যায় এভাবে পেশ করা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ) যখন কাফেরদের সাথে তাঁর পুত্রকেও ডুবতে দেখলেন, তখন মানবীয় স্নেহ বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেন, জাহেল হয়ো না। এ তোমার পুত্র বটে; কিন্তু তোমার পরিবারভুক্ত নয়। বরং এমন আমল যা নেক নয়। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর দোয়ার জবাব শুনার সাথে সাথে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং বলেন, হে আমার পরোয়ারদেগার! আমি এর থেকে তোমার আশ্রয় চাই যে, যার জ্ঞান আমার নেই তাই তোমার কাছে চাই। তুমি যদি আমাকে মাফ না কর, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। (হুদ ঃ ৪৪-৪৭)

আদ জাতি ও হযরত হুদ (আঃ)

আরবের বিখ্যাত জাতি আদ, যার সম্পর্কে আরবের শিশুরা পর্যন্ত ওয়াকেফহাল ছিল। তাদের সম্পর্কে মানুষ এটাও জানতো যে, তারা খোদার আজাবে ধ্বংস হয়েছিল। এদের প্রসঙ্গে কুরআন বলে শির্ক ও মুর্তি পূজার সাথে তাদের মধ্যে চারিত্রিক দোষ কি ছিল। সূরা হামীম আসসাজদায় আছে, তারা যমীনের উপরে কোন অধিকার ব্যতীতই অহংকারে মেতেছিল এবং বলতো, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? (আয়াত ঃ ১৫)। সূরা ফজরে আছে, তারা দুনিয়ায় খোদাদ্রোহিতা করেছে এবং বহু ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। (আয়াতঃ ৬-১২ দ্রঃ) সূরা শুয়ারায় আছে, হযরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেন, তোমাদের এ কি আচরণ যে প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তোমরা এক স্মারক অট্টালিকা নির্মাণ কর এবং বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরী কর যেন তোমরা চিরদিন থাকবে। আর যখন কাউকে পাকড়াও কর ত অত্যাচারী হয়ে কর। (আয়াত ১২৮-৩০) তারা প্রত্যেক অত্যাচারী হকের দুশমনের হুকুম মেনে চলেছে। (হুদ ঃ ৫৯) হযরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বুঝাবার যতো চেষ্টাই করেন, এ সবের জবাব তারা সীমালংঘন, বিদ্বেষ ও বিরোধিতাপূর্ণ কূটকৌশলসহ দিয়েছে। অবশেষে হযরত নূহের (আঃ) মতো তাঁকেও তাঁর জাতিকে এ কথা বলতে হয়, তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা কিছু করার তা কর এবং আমাকে এতোটুকু অবকাশ দিও না। আমার ভরসা ত আল্লাহর উপর যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। কোন প্রাণী এমন নেই যার মাথা তার মুষ্টির মধ্যে নেই। (হুদ ঃ ৫৫-৫৬) অবশেষে খোদার পয়গম্বরকে বল্লো, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে ঠিক আছে যে শাস্তির ভয় তুমি

আমাদের দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। তারপর যখন সে আজাব সম্মুখ দিক থেকে আসতে দেখা গেল, তখন এ নির্বোধেরা মনে করলো যে, এ বাদল যা তাদের উপত্যকা সিক্ত করবে। কিন্তু তা ছিল একটি ধ্বংসকারী ঝড়-ঝঞ্ঝা যা প্রতিটি বস্তু ধ্বংস করে দিল। (আহকাফ ঃ ২২-২৫)

সামূদ ও হযরত সালেহ (আঃ)

আদের পর আরবের প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সামুদ ছিল অতি বিখ্যাত জাতি। যাদের পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ গোটা উত্তর হেজাযে ছড়িয়ে আছে এবং এখনও তা দেখতে পাওয়া যায়। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা সে সব অতিক্রম করে শামের (সিরিয়া) দিকে যেতো। এটাও সকলের জানা ছিল যে, এক ভয়ানক ভূমিকম্প ঐ জাতিকে ধ্বংস করে দেয় যার ফলে সে অঞ্চলে পাহাড় আজ পর্যন্ত ধসে পড়ছে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এ জাতি খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শুধু শির্ক ও মূর্তি পূজার অপরাধই করেনি। বরঞ্চ খোদার যমীনের উপর বিদ্রোহ ও ফাসাদের তুফান সৃষ্টি করেছে। (ফজর ঃ৬-১২, আরাফ ঃ ৭৪)। সে জাতির সর্দার বা সমাজপতিরা সীমালংঘনকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছিল যাদের দ্বারা কোন সংস্কার সংশোধনের কাজ হতো না। (শুয়ারা ঃ ১৫১-১৫২) তারা ভোগবিলাস করার জন্যে এবং নিজেদের মর্যাদা প্রদর্শনের জন্যে উন্মুক্ত স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করতো এবং পাহাড় খোদাই করে অট্টালিকা তৈরী করতো। (আরাফ ঃ ৭৪, শুয়ারা ঃ ১৪৯) এ একটি অধঃপতিত সমাজের বৈশিষ্ট যে একদিকে দরিদ্র লোক মাথা গুঁজবার স্থান পায় না অপরদিকে ধনিক শ্রেণী জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ তৈরী করে। এসব ধনশালীদের কাছে হযরত সালেহ (আঃ) এমন যোগ্য ছিলেন না যে তাঁর উপর ঈমান আনা যেতে পারতো, কারণ তাঁর উপরে গরীব মানুষ ঈমান এনেছিল। (আরাফ ঃ ৭৫-৭৬) হযরত সালেহ (আঃ) যখন তাদেরকে খোদাপুরস্তির দাওয়াত দিলেন এবং জুলুম, ফাসাদ ও ভোগ বিলাস থেকে বিরত থাকতে বল্লেন, তখন নয়টি বড়ো বড়ো ফাসাদকারী উপজাতীয় জোট আপোসে পরামর্শ করে বল্লো, খোদার কসম করে ফয়সালা কর যে, রাতে সালেহ এবং তাঁর পরিবারের উপর হঠাৎ হামলা করব। তার পর সালেহের অলী অর্থাৎ তাঁর গোত্রের সর্দারকে বলে দেব যে, তাঁর পরিবারের নিহত হওয়ার ঘটনার সময় আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা বিলকুল সত্য কথা বলছি। (নমল ঃ ৪৮-৪৯) আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। তারা হযরত সালেহ (আঃ) এর কাছে মোজেযার দাবী করে। তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালা একটি উটনী তাদের সামনে এনে দেন। তার অস্তিত্বই ছিল স্বয়ং একটি মোজেযা। তারপর হযরত সালেহ (আঃ) এর মাধ্যমে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হলো যে, এ উটনী তোমাদের মাঠ ময়দানে ক্ষেত খামারে যেখানে খুশী সেখানে চরে বেড়াবে। আর একদিন সে একা পানি পান করবে এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সকলে এবং তোমাদের পশু পানি পান করবে। এর উপর যদি তোমরা খারাপ নিয়তে হাত লাগাও তাহলে তোমাদের উপর আযাব এসে পড়বে। (আরাফ ঃ৭৩, হুদঃ ৬৪, শুয়ারা ঃ ১৫৫ দ্রঃ)

কিছু কাল পর্যন্ত তারা সে উটনীকে ভয় করে চলতে থাকে। অবশেষে এ উটনী যে একটি মোজেযা তা জানা সত্ত্বেও তারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী সর্দারকে ডেকে বলে এ বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। সে এ কাজের দায়িত্ব বহন করে তাকে মেরে ফেলে। এ ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের পর তারা হযরত সালেহকে (আঃ) চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে, সে আযাব নিয়ে এসো যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাতে-(আরাফ ঃ৭৭)। হযরত সালেহ

(আঃ) বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তিন দিন তোমরা তোমাদের ঘরে আনন্দ উল্লাস করে নাও। তার পর বজ্র ধ্বনিসহ এক ভয়াবহ ভূমিকম্প এলো যা হযরত সালেহ (আঃ) এবং ঈমানদারগণ ব্যতীত গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিল এবং তাদের ঘরদোর এমনভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো যেন সেখানে কোন দিন বসবাস করতো না।
-(আরাফ ঃ৭৮, হুদ ঃ৬৫, কামার ঃ৩১ দ্রঃ)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

সবচেয়ে দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র এ আচার-আচরণ কুরআনে পেশ করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের। তাঁকে আরববাসী নিজেদের দ্বীনের নেতা বলে মানতো। তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণেই কুরাইশদের সকল গৌরব অহংকার মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির ভিত্তি রচিত হয়েছিল। কুরআন তাদেরকে বলে যে, তাঁর মধ্যে এমন কি সৌন্দর্য বেশিষ্ট্য ছিল যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সে বান্দাহকে আপন খলিল (বন্ধু) গণ্য করেন। (নিসা ঃ ১২৫) আল্লাহ বলেন, আমি তোমাকে সমগ্র জাতির নেতা বানাচ্ছি। (বাকারাহ ঃ ১২৪) তাঁর নিকটে যখন এ সত্য প্রকট হয়ে পড়লো যে আল্লাহ ব্যতীত কোন রব ও ইলাহ নেই, এবং তাঁর পিতা ও জাতি সকলেই পথভ্রষ্ট, তখন তিনি বাপ দাদার অন্ধ অনুসরণ পরিত্যাগ করেন। স্বীয় জাতীয় ধর্ম পরিত্যাগ করতে, এবং একেবারে একমুখী হয়ে শুধু দুনিয়া ও আসমানের স্রষ্টার আনুগত্য অবলম্বন করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। শুধু আপন স্থানেই খালেস খোদাপুরস্ত হয়ে রয়ে গেলেন না, বরঞ্চ, প্রকাশ্যে আপন বাপ দাদা ও আপন জাতির লোকদেরকে বলে দিলেন, আমি তোমাদের এ শির্ক পূর্ণ ধর্মের প্রতি ত্যক্ত বিরক্ত এবং আমার মতে তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত। (আনয়াম ঃ ৭৪-৮১) তিনি তাঁর পিতাকে পরিষ্কার বলে দিলেন, তুমি অন্ধ বধির এখতিয়ার বিহীন দেব-দেবীদের বন্দেগী করে প্রকৃতপক্ষে শয়তানের বন্দেগী করছে। পিতা তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে দেন। (মরিয়ম ঃ ৪৩-৪৬) তিনি তাদেরকে যুক্তিসহ বুঝবার চেষ্টা করার পরও যখন তারা মানলো না, তখন তিনি সুযোগ বুঝে তাদের প্রতিমাগৃহে প্রবেশ করেন এবং তাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে কার্যত তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন যে, যাদের বন্দেগী তারা করছে তারা বন্দেগীকারী ত দূরের কথা আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম নয়। (আম্বিয়া ঃ ৫৩-৬৭, সাফফাত ঃ ৮৫-৯৬) হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) দেশের বাদশার নিকটে হাযির করা হলো যে রব হওয়ার দাবীদার ছিল। তিনি নির্ভয়ে বল্লেন, আমি আর কাউকে রব বলে মানি না সেই সত্তা ব্যতীত যার হাতে আমার জীবন ও মৃত্যু রয়েছে। সে বল্লো, জীবন ও মৃত্যু আমারও হাতে রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বল্লেন, আল্লাহ ত সূর্য পূর্ব দিকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখিয়ে দাও। এ কথা বলে তিনি গর্বিত বাদশাহকে বোকা বানিয়ে দেন। (বাকারা ঃ ২৫৮)

তাঁর জন্যে বিরাট অগ্নিকুন্ড তৈরী করা হলো। সিদ্ধান্ত করা হলো যে, এর মধ্যে হযরত ইব্রাহীমকে নিক্ষেপ করে জীবিত অবস্থায় জ্বালিয়ে মারা হোক। তথাপি তিনি বাতিলের সামনে মস্তক অবনত না করতে এবং হকের জন্যে দগ্ধিভূত হয়ে মরতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এ ছিল আল্লাহতায়ালার ফযল ও করম যে তিনি আগুনকে শীতল করে দিলেন এবং তাঁর জন্যে তা অনিষ্টহীন বানিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজের পক্ষ থেকে এ কথা প্রমাণ করতে ত্রুটি করলেন না যে, তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে মেনে নিতে পারেন

কিন্তু হক পরিত্যাগ করে বাতিলের বন্দেগী কবুল করতে পারেন না।
(আম্বিয়া ঃ ৬৮-৭০, সাফফাত ঃ ৯৭-৯৮)

অবশেষে তাঁর কাছে যখন এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, দ্বীন ছাড়বেন, না দেশ ছাড়বেন, তখন তিনি দ্বীন পরিত্যাগ করলেন না, বরঞ্চ ঘরবাড়ী, পরিবার, জাতি ও দেশ সবই চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করে খোদার উপর ভরসা করতঃ বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জানতেন যে দেশ পরিত্যাগ করে বিদেশী হওয়া কত ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ করে সেকালে আপন জাতির আশ্রয় থেকে বের হয়ে অপরিচিত অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হওয়া যে কত বিপজ্জনক হতে পারে তা তাঁর জানা ছিল। কিন্তু তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বল্লেন, انى ذاهب الى ربى سيهدين আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।(সাফফাতঃ ৯৯)

বৃদ্ধ বয়সে যখন অনেক দোয়া ও কাকুতি মিনতির পর তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেলা, তখন তাঁর রব তাঁকে আর এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। তাঁর প্রতি ইংগিত করলেন, "এ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে তার মা সহ মক্কার সেই জনশূন্য ও প্রান্তরের সেস্থানে রেখে এসো যেখানে আমি আমার ঘর বানাতে চাই।" তিনি এ হুকুম পালনের জন্যেও তৈরী হলেন এবং তাঁর আবাসস্থল ফিলিস্তিন থেকে শত শত মাইল দূরে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে গিয়ে একেবারে খোদার উপর ভরসা করে ছেড়ে আসেন-(হজ্ব ঃ ২৬, ইব্রাহীম ঃ৩৭)। তারপর তার চেয়েও এক কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। যখন সেই পুত্র বড়ো হয়ে এমন বয়সে পৌঁছেন যে পিতার সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে পারেন, তখন ইংগিত হলো যে, খোদার জন্যে তাকে যবেহ করতে হবে। এ আদেশ পালনের জন্যেও তিনি প্রস্তুত হলেন। তারপর পুত্রের গলায় ছুরি চালাবেন এমন সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুরবানী কবুল করে এক 'যবহে আযীম'কে তার ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিলেন। (সাফফাত ঃ ১০০-১০৭)

খোদা ও তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে কারো সাথে কোন পক্ষপাতিত্ব করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জন্মভূমি পরিত্যাগ করার সময় তিনি তাঁর জাতিকে পরিষ্কার বলেছেন, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্যে শত্রুতা হয়ে গেছে এবং ব্যবধান শুরু হয়েছে যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ -(মুমতাহিনা ঃ৪)। পিতার মাগফেরাতের জন্যে দোয়ার ওয়াদা তিনি করেন এবং দোয়া করেনও। কিন্তু যখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন ছিলেন, তখন তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্পর্কও ছিন্ন করেন (তওবাঃ ১১৪)। এ ছিল সেই চরিত্র ও সেই আচরণ যাকে ইসলামী দাওয়াত নমুনা হিসাবে লোকের সামনে পেশ করে।

হযরত লূত (আঃ) ও লূত জাতি

হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ভাইপো ছিলেন এবং তাঁর সাথেই হিজরত করে ফিলিস্তিনের দিকে যান। এখানে যে স্থানটিকে তিনি তাঁর বাসস্থান বানিয়েছিলেন তার নিকটেই এক অতি দুষ্ট জাতি বাস করতো দুষ্টামি-নষ্টামির দিক দিয়ে দুনিয়ায় তার কোন তুলনা ছিল না। আল্লাহতায়ালা তাদের সংশোধনের এ কঠিন দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন এবং তাঁকে নবী বানিয়ে তাদের এলাকায় পাঠিয়ে দেন। সে জাতির অবস্থা এই ছিল যে, পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার ছিল এক সাধারণ ব্যাপার। তা তারা গোপনে করতো না, বরঞ্চ প্রকাশ্যে একে অপরের সামনে এবং লোকের সমাবেশে।

উপরন্তু তারা রাহাজানি করতো। কোন ব্যক্তি অথবা কাফেলার সে অঞ্চল নিরাপদে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। (নমল ঃ ৫৪, আনকাবুত ঃ ২৯)

হযরত লূত (আঃ) বহু বছর যাবত তাদেরকে খোদার ভয় দেখান এবং ওসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেন। তাদের জবাব ছিল, "হে লুত! তুমি যদি এসব কথা বলা বন্ধ না কর, তাহলে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব"-(শুয়ারা ঃ১৬৭)। হযরত লূত এসব হুমকির কোন পরোয়া না করে নিজের তবলিগ চালু রাখেন। তখন তারা পারস্পরিক আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত করে যে, লূত পরিবারকে তাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করা হোক, তারা নিজেদের বড়ো পবিত্র ও নিষ্পাপ বলে জাহির করছে (আ'রাফ ঃ৮২) আনকাবুত ঃ৫৬)। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাদের শাস্তি দেয়ার ফয়সালা করেন এবং কার্যকর করার জন্যে এক আজব পন্থা অবলম্বন করেন। কতিপয় ফেরেশতাকে সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূতের বাড়ী মেহমানরূপে পাঠিয়ে দেন। তাদের আগমনের সাথে সাথে সমস্ত শহরে এক আনন্দ উল্লাসের স্রোত প্রবাহিত হলো। লোক দলে দলে হযরত লূতের (আঃ) বাড়ীর দিকে দৌড় দিল ঐসব বালকের সাথে কুকর্ম করার অভিপ্রায়ে। হযরত লুত (আঃ) বহু অনুরোধ করেন এবং বলেন,- মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করো না। তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলোনা বরঞ্চ উল্টা তাঁকে ভর্ৎসনা করে বল্লো, আমরা তোমাকে কি বারবার নিষেধ করিনি যে, সারা দুনিয়ার ধিক হয়ে যেয়ো না? (হাজ্বর ঃ ৭০)

তখন ফেরেশতাগণ হযরত লূতকে (আঃ) বল্লেন, আমরা খোদার প্রেরিত ফেরেশতা এবং এদের উপর আজাব নাযিল করার জন্যে পাঠানো হয়েছে। ভোর হওয়ার আগে আগে আপনি বাড়ীর লোকদেরকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। যেসব লোক হযরত লূতের বাড়ীর দিকে চড়াও হয়ে এসেছিল তাদেরকে অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। (কামার ঃ ৩৭) অতি সকালে অবশিষ্ট জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল। তাদের জনপদ ওলট পালট করে দেয়া হয়েছিল, তাদের উপর এমনভাবে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকটি চিহ্নিত ছিল কোন্ প্রস্তর কোন্ ব্যক্তিকে শেষ করে দেবে। (হুদ ঃ ৮২-৮৩) এ এমন এক হতভাগ্য জাতি ছিল যে, ঐ সমগ্র অঞ্চলে এক লূতের (আঃ) বাড়ী ছাড়া কোন ঈমানদার ব্যক্তির বাড়ী পাওয়া যেতো না। (যারিয়াত ঃ ৩৬) এবং সে একটি বাড়ীতেও স্বয়ং লূত (আঃ)-এর স্ত্রী বেঈমান ছিল যার সম্পর্কে তাঁকে আদেশ করা হয় যে, তিনি যেন তাকে সাথে নিয়ে না যান। কারণ তারও শাস্তি ভোগ করার কথা ছিল। (হুদ ঃ ৮১) কুরআনে এ কাহিনী স্থানে স্থানে বর্ণনা করে লোকদেরকে এ কথা বলা হয়েছিল যে, একটি চরিত্রহীন জাতি কেমন হয়ে থাকে এবং তার পরিণাম কি হয়। আর আল্লাহর নবীগণ কোন অবস্থায় কাজ করেছেন।

ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী

তারপর ঐতিহাসিক দিক দিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাহিনীর পালা আসে যার উপরে কুরআনের একটি পরিপূর্ণ সূরা নাযিল করে ভালো ও মন্দ চরিত্র একে অপরের বিপক্ষে পেশ করা হয়েছে। এতে একদিকে ইউসুফের (আঃ) ভাইদের চরিত্র দেখানো হয়েছে যা শুধু এ কারণে যে যেহেতু সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্র ইউসুফকে (আঃ) অধিক ভালোবাসতেন, সেজন্যে তারা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করে যে, তাকে হত্যা করা হোক অথবা কোথাও নিক্ষেপ করে এসে সৎলোক

হওয়া যাক। তারপর তারা পিতাকে ধোঁকা দিয়ে ভাইকে ভ্রমণ ও আমোদ প্রমোদ করার উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করলো। অতঃপর তার জামায় মিছিমিছি রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এলো এবং পিতাকে বল্লো নেকড়ে বাঘ তাকে ধরে খেয়ে ফেলেছে।

ঐ ব্যবসায়ী কাফেলার লোকদের আচরণ এই যে, তারা হযরত ইউসুফকে (আঃ) শুষ্ক কূপে পেয়ে সে মজলুম বালককে নিজেদের পণ্যদ্রব্য বানিয়ে মিসরে গিয়ে বিক্রি করে দিল।

আযীযে মেসেরের স্ত্রীর চরিত্র দেখুন যার স্বামী হযরত ইউসুফকে(আঃ) ক্রয় করেছিল এবং যার ঘরে পালিত হয়ে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। তার নির্লজ্জতার অবস্থা এই ছিল যে, হযরত ইউসুফকে (আঃ) পাপ কাজের দিকে ডাকে। তিনি অস্বীকার করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার পিছু লাগে। এমন সময় তার স্বামী এসে পড়ে। তখন সে তাঁর প্রতি এ উল্টা অভিযোগ আরোপ করে যে, তিনি তার শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মিথ্যা যখন প্রমাণিত হলো এবং উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের তার প্রেম সম্পর্কে চর্চা শুরু হলো তখন সে তাদেরকে আমন্ত্রণ করে ডেকে এনে হযরত ইউসুফকে (আঃ) তাদের সামনে এ কথা বলার জন্যে পেশ করলো, এমন সুশ্রী যুবকের প্রেমেই যদি না পড়লাম ত আর কি করলাম। তারপর সে সমবেত সকলের সামনে বল্লো- সে যদি আমার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত না হয়, তাহলে আমি তাকে কয়েদ খানায় পাঠাবো।

মিসরের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের আচরণ এই যে, তারা ঐ সমাবেশে হযরত ইউসুফের (আঃ) সৌন্দর্য দেখে তাদের হাত কেটে ফেলে। তারাও তাঁর প্রেমে পড়ে এবং তাঁকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে।

মিশরের বিচারকদের আচরণ দেখুন যারা নিজেদের মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের শাস্তি হযরত ইউসুফকে(আঃ) দিল এবং বিনা অপরাধে কয়েক বছরের জন্যে জেলে প্রেরণ করে।

অপরদিকে হযরত ইউসুফের (আঃ) আচরণে চারিত্রিক পবিত্রতার নমুনা একটি একটি করে সামনে আসে। তিনি কারাদন্ড বরদাশত করেন কিন্তু নিজেকে পাপে কলংকিত করা বরদাশত করেননি। এতেও তার মধ্যে তাকওয়ার কোন গর্ব সৃষ্টি হয়নি। তিনি অত্যন্ত বিনয় নম্রতার সাথে আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করেন, হে আমার পরোয়ারদেগার! কারাদন্ড আমার নিকটে ঐ জিনিস থেকে অধিক প্রিয় যার দিকে এসব লোক আমাকে ডাকছে। তুমি যদি এসব নারীদের পাতানো ফাঁদ থেকে আমাকে রক্ষা না কর তাহলে আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়বো এবং জাহেলদের শামিল হয়ে যাব।

তিনি জেলখানায়ও খোদার বান্দাহদেরকে ওয়াজ-নসিহত করে সৎপথ দেখাবার চেষ্টা করেন এবং তবলিগে হকের কোন সুযোগ হাতছাড়া হতে দেননি। এরমাত্র একটি ঘটনা সূরা ইউসুফে ৩৬ থেকে ৪০ আয়াত পর্যন্ত বয়ান করা হয়েছে যার থেকে জানা যায় যে, তাঁর দীর্ঘ কারাজীবনে তিনি কিভাবে দাওয়াত-ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

অতঃপর তিনি যখন মিশর রাজের একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করেন তখন বাদশাহ প্রভাবিত হয়ে তাঁকে মুক্তি দান ও সাক্ষাৎ দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি মুক্তি লাভে অসম্মতি ব্যক্ত করেন যতোক্ষণ না আযীয মেসেরের স্ত্রী এবং তার সাথের অন্যান্য

মহিলাগণ তাঁর পূত চরিত্রবান হওয়ার এবং তাদের নিজেদের দোষী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে।

তারপর এমন এক সময় এলো যখন তিনি মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলেন। সে সময়ে তাঁর সেসব ভাই যারা তাঁকে শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তাঁর কাছে বারবার খাদ্য শস্য চাইতে আসতে থাকে। তিনি তাদেরকে শস্য দিতেও থাকেন। কিন্তু তাঁর মনে কখনো এ চিন্তা আসেনি যে তিনি তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যা তারা তাঁর উপর করেছে। প্রথম প্রথম এরা জানতেই পারেনি যে, মিসরের যে শাসকের নিকটে তারা শস্য লাভ করছে তিনি কে। শুধু হযরত ইউসুফই (আঃ) তাদের চিনতে পারেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন তারা এলেন এবং ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে বল্লেন, আমি তোমাদের সেই ভাই যার প্রতি তোমরা এমন জুলুম করেছ যা তোমরা জান। তখন তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে। তখন ইউসুফের জবাব ছিল ঃ

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ -

-আজ (তোমাদের অপরাধের জন্যে) পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ তোমাদের মাফ করুন–তিনি সবচেয়ে বড় দয়াশীল। তারপর তিনি শুধু তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) কেই মিসরে ডেকে পাঠালেন না, বরঞ্চ তাঁর ভাইদেরকেও তাদের পরিবার পরিজনসহ ডেকে এনে সসম্মানে পুনর্বাসিত করেন।

সূরা ইউসুফে এ মহান ব্যক্তির চরিত্রের শেষ মহত্ব এ দেখানো হয়েছে যে, তাঁর এ উন্নত মর্যাদার জন্যে তিনি কোন প্রকার গর্ব অহংকার প্রকাশ করেননি। বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালার কাছে বন্দেগীর শির নত করে আবেদন করছেনঃ

-হে খোদা! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছ এবং আমাকে সব বিষয়ের সুক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করার জ্ঞান দিয়েছ। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। মুসলমান হিসাবে আমার মৃত্যু দাও এবং নেকলোকদের সাথে আমাকে মিলিত কর। (ইউসুফ ঃ ১০১)

হযরত শুয়াইব (আঃ), মাদয়ানবাসী ও আইকাহবাসী

কুরআন মজিদে মাদয়ানবাসী ও আসহাবুল আইকাহ্ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের বসবাস ছিল উত্তর হেজাজ অঞ্চলে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, খোদার সাথে অন্যান্যদের এবাদত করার সাথে যেসব নৈতিক ত্রুটি তাদের মধ্যে ছিল তাহলো এই যে, তারা মাপে কম দিত, রাহাজানি করতো এবং বিবাদ-ফাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত শুয়াইবকে (আঃ) মাদায়েনে নবী বানিয়ে পাঠিয়ে দেন। আইকাহবাসীদের সংশোধনের দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি বহুদিন যাবত তাদেরকে খোদার ভয় দেখিয়ে ঐসব দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার নসিহত করেন । কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক তার উপর ঈমান আনে এবং অবশিষ্ট লোক নিজেদের আচরণে অটল থাকে। মাদয়ানের সর্দারগণ হযরত শুয়াইবকে বলে, তোমার নামায কি তোমাকে এ আদেশ করে যে, আমরা আমাদের বাপ দাদার দেবদেবীদেরকে পরিত্যাগ করি? অথবা আমাদের ধনসম্পদের ব্যাপারে যা কিছু করতে চাই তা না করি। (হুদ ঃ ৮৭) অন্য কথায় তাদের এ জিদ ছিল

যে, খোদা ছাড়া অন্যদের বন্দেগী এজন্যে করতে হবে যে, বাপ-দাদা তাদের বন্দেগী করে এসেছে। তাদের জিদ এ কথার উপরেও ছিল যে, তাদের আপন মর্জি মতো ধনসম্পদ লাভের স্বাধীনতা থাকতে হবে, তা লুণ্ঠন করে হোক, ব্যবসা বাণিজ্যে বেঈমানী করে হোক অথবা দুর্বলের উপর জুলুম করে হোক। তারা তাদের লোকদের বলে, তোমরা যদি শুয়ায়েবের কথা মেনে চল তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (আ'রাফ ঃ ৯) তাদের দৃষ্টিতে জাতির উন্নতি অগ্রগতি এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে, তারা সব ধরনের অবৈধ পন্থায় ধনসম্পদ অর্জন করবে। বৈধ পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা হযরত শুয়ায়েবকে (আঃ) ধমক দিয়ে বলে, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে ঈমান আনয়নকারীদেরকে বহিষ্কার করে দেব। (আ'রাফ ঃ ৮৮) তারা আরও বলে তোমাকে তো আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল লোক মনে করি। তোমার গোত্র না থাকলে ত তোমাকে আমরা প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলতাম। তোমার আপন শক্তি সামর্থ এতোটা নেই যে, তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী হতে পার। (হুদঃ ৯১) তার জবাবে হযরত শুয়ায়েব (আঃ) এ কথা বলে তাদেরকে লজ্জা দিলেন। তোমাদের মুকাবিলায় আমার গোত্র কি আল্লাহ্ থেকে অধিক শক্তিশালী? তোমরা ত তাঁকে (আল্লাহকে) পেছনে ফেলে রেখেছো। (হুদ ঃ ৯২)

এ ধরনের আচরণ আসহাবে আইকাও হযরত শুয়ায়েবের সাথে করে। তাঁর কোন নসিহতই তারা কবুল করে না এবং এই বলে জবাব দেয়, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশ থেকে কোন এক খন্ড আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। (শুয়ারা ঃ ৮৭)

অবশেষে উভয় জাতিই খোদার আযাবের সম্মুখীন হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কুরাইশের লোকেরা ব্যবসার সফরে শাম যাবার সময় ঐসব অঞ্চল অতিক্রম করতো যেখানে এ জাতিদ্বয় আযাবে লিপ্ত হয়। এজন্যে কুরআনে এ বর্ণনায় তারা প্রভাবিত না হয়ে পারতো না।

ফেরাউন ও মূসা (আঃ) এর কাহিনী

সমগ্র বিশ্বে এ ভয়াবহ ঐতিহাসিক ঘটনা সকলের জানা ছিল যে, ফেরাউন ও তাঁর লোক লস্কর খোদার আযাবের শিকার হয়ে সমুদ্রের অতলতলে নিমজ্জিত হয়। আরবে বহুসংখ্যক ইহুদী ও নাসারা বসবাস করতো যাদের মাধ্যমে সকল আরববাসীই জানতো যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নবী হিসাবে তাদের নিকটে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি বিস্ময়কর মুজেযা প্রদর্শন করে তাদেরকে হকের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা কোন মুজেযা দেখার পরও ঈমান আনেনি। স্বয়ং কুরাইশের লোকেরাও হযরত মূসার (আঃ) এসব মুজেযা সম্পর্কে অবহিত ছিল। বস্তুতঃ নবী (সা) এর বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগ এটাও ছিল-

لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى -

-এ নবীকে সে মুজেযা কেন দেয়া হয়নি যা মূসাকে (আঃ) দেয়া হয়েছিল? (ক্বাসাস ঃ ৪৮)

এর ভিত্তিতেই কুরআনে স্থানে স্থানে হযরত মূসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ভালো ও মন্দ আচরণ তাদের বৈশিষ্ট্যসহ সুস্পষ্টরূপে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

ফেরাউনের অপরাধসমূহ একটি একটি করে তার মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে যমীনে ভয়ানক ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, দেশবাসীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, তাদের মধ্যে একটি দলকে সে অত্যন্ত হেয় অপদস্থ করতো, তাদের পুত্র সন্তান হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তান বেঁচে থাকতে দিত। প্রকৃতপক্ষে সে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (কাসাস ঃ ৪) অর্থাৎ তার সরকারের নিয়ম এ ছিল না যে, দেশের সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সকলকে সমান অধিকার দেয়া হবে। কিন্তু সে রাজনীতির এ পন্থা অবলম্বন করেছিল যাতে দেশের অধিবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যায়। কাউকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শাসকদল গন্য করা হতো এবং কাউকে শাসিত গণ্য করে দমিত নিষ্পেষিত করা হতো। এ দ্বিতীয় দলের মধ্যে বিশেষ করে বনী ইসরাইলের উপর চরম নির্যাতন-নিপীড়ন করা হতো। তাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানকে বেঁচে থাকার জন্যে ছেড়ে দিত যাতে ক্রমশঃ তাদের বংশ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যাতে নারী জাতি মিসরীয়দের আয়ত্তে আসার পর এক মিসরীয় বংশ জন্মদানের মাধ্যম হয়। এ কারণে হযরত মূসা (আঃ) যখন একটি ইসরাইলী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর মায়ের প্রতি ইংগিত করলেন যে, যখন তাঁর সন্তানের হত্যার আশংকা হবে তখন যেন তাকে একটি ঝুড়ির মধ্যে রেখে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। (কাসাস ঃ ৭)

স্বয়ং তার আপন মিসরীয় জাতির সাথে ফেরাউনের যে আচরণ ছিল তার পূর্ণ চিত্র সূরা যুখরুফের মাত্র একটি বাক্যে সংকলিত করা হয়েছে।

-সে তার আপন জাতিকে তুচ্ছ নগণ্য মনে করতো এবং তারা তাকে মেনে চলতো। তারা ছিল প্রকৃত পক্ষে ফাসেক লোক। (যুখরুফ ঃ ৫৪)

এতে ফেরাউনের রাজনীতি এবং তার জাতির নৈতিক অধঃপতনের অবস্থা উভয়ের চিত্র পরিস্ফুট হয়।

যখন কোন ব্যক্তি কোন দেশে তার স্বৈরাচারী শাসন চালাবার চেষ্টা করে এবং তার জন্য সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন করে, সকল প্রকার ধোঁকা প্রতারণা করে, খোলা বাজারে বিবেকের কেনাবেচা করে, আর যারা বিক্রি হয় না তাদেরকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করা হয়, তখন সে একথা মুখে বলুক বা না বলুক, নিজের কর্মকান্ড দ্বারা প্রকাশ করে যে প্রকৃত পক্ষে সে এদেশের অধিবাসীকে বিবেক, চরিত্র ও বীরত্বের দিক দিয়ে নগণ্য মনে করে। সে তাদের সম্পর্কে এ অভিমত পোষণ করে ফেলে যে সে এসব নির্বোধ, ভীরু ও বিবেকহীনদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ডেকে নিয়ে যেতে পারে। তারপর যখন তার এ কৌশলসমূহ সাফল্যের সাথে দেশে চালু হয়ে যায় এবং দেশবাসী কৃতাঞ্জলীপুটে গোলাম হয়ে থাকে, তখন সে নিজের কার্যকলাপ দ্বারা এ কথা প্রমাণ করে যে সে তাদেরকে যেমন মনে করেছিল তারা ঠিক তেমনই। তাদের এ অসম্মানজনক অবস্থায় পতিত হওয়ার প্রকৃত কারণ এই হয় যে, মৌলিক দিক দিয়ে তারা ফাসেক। তাদের এতে কোন মাথাব্যথা নেই যে, হক কি জিনিস এবং বাতিল কোন জিনিস। ইনসাফ কি এবং জুলুম কি। সত্যতা বিশ্বস্ততা এবং ভদ্রতা কি সম্মানের যোগ্য, না মিথ্যা বেঈমানী ও নীচতা । এ সবের পরিবর্তে তাদের নিকটে প্রকৃত গুরুত্ব শুধু আপন ব্যক্তিস্বার্থ যার জন্যে সে প্রত্যেক জালেমের সহযোগিতা করতে, প্রত্যেক শক্তিধরের কাছে মাথা নত করতে, প্রতিটি মিথ্যা কবুল করতে এবং প্রতিটি সত্যের আওয়াজ দাবিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যায়।

হযরত মূসা (আঃ) যখন তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ) এর সাথে ফেরাউনের দরবারে আল্লাহর পয়গম্বর হিসাবে পৌঁছলেন এবং যখন তিনি একটির পর একটি এমন সুস্পষ্ট মুযেযা পেশ করলেন, যে সম্পর্কে অতি নির্বোধ ব্যক্তিও এ ধারণা করতে পারতো না যে কোন এ যাদুর খেলা। সে তাকে শুধু তার গর্ব-অহংকারের কারণেই যাদু বলতে থাকে। তার সভাসদগণ তার হ্যাঁ-তে হ্যাঁ বলতে থাকে। লাঠির অজগর হওয়াকে ত তার আমন্ত্রিত দক্ষ যাদুকরগণ মেনে নিয়ে বল্লো যে এ তাদের নৈপুণ্যের কোন বস্তু নয় বরঞ্চ খোদার মুজেযা।

এখন রইলো অন্যান্য মুজেযাগুলো, যেমন হযরত মূসার (আঃ) আগাম ঘোষণা মোতাবেক সমগ্র মিসরে দুর্ভিক্ষ হওয়া, তাঁর দোয়ার বদৌলতে তা আবার দূর হওয়া, তাঁর ঘোষণার পর সারাদেশে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়া, আবার তাঁর দোয়ায় তা বন্ধ হওয়া, তাঁর ঘোষণার পর পংগপালের ভয়ানক আক্রমণ এবং তাঁর দোয়ায় সব দূর হওয়া। এভাবে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী উকুন, ক্ষুদ্র কীট, ব্যাঙ এবং রক্তের শাস্তি পালাক্রমে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়া এবং শুধু তাঁর দোয়ায় সব দূর হয়ে যাওয়া সন্দেহের কোন অবকাশ রাখতো না যে, এ কোন যাদুকরের যাদু। কারণ এমন কাজ না কখনো কোন যাদুকর করতে পেরেছে না করতে পারতো। এ মুজেযাগুলো থেকে এ কথাই প্রকাশ হচ্ছিল যে, এসব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতেরই বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই প্রত্যেকটি শাস্তি আসার পর ফেরাউন ও তার সভাসদগণ হযরত মূসাকে (আঃ) বলতো, "আপনার রবের নিকটে "আপনার যে পদমর্যাদা রয়েছে তার ভিত্তিতে দোয়া করুন যেন এ শাস্তি আমাদের দূর হয়ে যায়। তাহলে আমরা আপনার কথা মেনে নিব।" কিন্তু বিপদ চলে যাওয়ার পর তারা তাদের ওয়াদা ভংগ করতো। (আ'রাফ ঃ ১৩৪-১৩৫), যুখরুফ ঃ ৪৯-৫০)

কুরআনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তারা মনে মনে এ বিশ্বাস করতো যে হযরত মূসা (আঃ) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর তারা জুলুম ও ঔদ্ধত্যের কারণে অস্বীকার করে চলেছিল। (নমল ঃ ১৪) এ সত্য তখনই একেবারে প্রকট হয়ে পড়লো, যখন ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ নিমজ্জিত হতে থাকলো এবং সে চিৎকার করে বল্লো, 'আমি এ কথা মিনে নিলাম যে, কোন খোদা নেই তিনি ব্যতীত যাঁর উপর বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (ইউনুস ঃ ৯০)

এভাবে সত্য জানার পরও সে ও তার সভাসদগণ মিথ্যার পূজারী হয়ে সীমাতিরিক্ত জুলুম ও গর্ব অহংকার করলো। তার সভাসদগণ তাকে বল্লো, হুজুর! এ মূসা ও তার জাতিকে এভাবে কি দেশে ফাসাদ সৃষ্টি এবং আপনার ও আপনার দেব-দেবীর বন্দেগী ত্যাগ করার জন্যে প্রশ্রয় দিয়ে রাখবেন?

সে বল্লো, না, আমি এখনই হুকুম জারি করছি যে তাদের পুত্র সন্তান হত্যা করা হোক এবং কন্যা সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেয়া হোক। (আ'রাফ ঃ ১২৭)

বস্তুতঃ হযরত মূসার (আঃ) জন্মের পূর্বে যে আদেশ জারি হয়েছিল তা নতুন করে জারি করা হলো। তারপর নতুন আদেশ এ জারি করা হলো যে যারা মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানও হত্যা করা হোক এবং কন্যা সন্তানকে বেঁচে থাকতে দেয়া হোক। (মুমেন ঃ ২৫)

সে হযরত মূসাকে (আঃ) বল্লো, তুমি যদি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে খোদা

মেনে নাও তাহলে তোমাকে বন্দী করবো। (শুয়ারাঃ ২৯)। সে তার জনাকীর্ণ দরবারে বল্লো, সর্দারগণ। আমি ত জানি না যে আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে-(কাসাসঃ৩৮)। সে নির্ভীকচিত্তে বল্লো, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড়ো খোদা-(নাযিয়াতঃ২৪)। অত্যন্ত নির্লজ্জের মতো সে তার মন্ত্রী হামানকে বল্লো, এক উঁচু দালান তৈরী কর। তার উপর চড়ে দেখবো যে, মূসার খোদা কোথায় আছে- (কাসাসঃ ৩৮, মুমেন ঃ ৩৬-৩৭০)। এমন কি একবার সে মূসাকে (আঃ) হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে এবং সভাসদগণকে বলে, আমাকে ছেড়ে দাও, এ মূসাকে আমি হত্যা করব। তারপর সে তার খোদাকে ডেকে দেখুক। (মুমেন ঃ ২৬)

এক ধরনের আচরণ ত এই যা এ কাহিনীগুলোতে ফেরাউন, তার সভাসদবৃন্দ ও তার জাতির দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় এক শিক্ষণীয় আচরণ মিসরের যাদুকরদের যারা নিজেদের দ্বীনের সমর্থনে হযরত মূসার (আঃ) মুকাবেলা করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হয়েছিল। তারা ফেরাউনকে বলে, আমরা যদি জয়লাভ করি তাহলে কিছু পুরস্কার পাব ত?

ফেরাউন বলে, শুধু পুরস্কার নয়, বরঞ্চ তোমরা আমার সান্নিধ্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

কিন্তু ঐ যাদুকরগণই যখন হযরত মূসার (আঃ) মুজেযার দ্বারা তাদের যাদুকে পরাভূত হতে দেখলো, তখন তারা বুঝে ফেল্লো যে, এখানে যাদু নয় বরঞ্চ খোদায়ী শক্তি কার্যকর। তখন তারা সিজদারত হয়ে যায় এবং চিৎকার করে বলে, আমরা মেনে নিলাম রাব্বুল আলামীনকে, মূসা (আঃ) ও হারুনের (আঃ) রবকে।

তাদের মধ্যে হঠাৎ এমন এক বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয় যে, ফেরাউন তাদের হাত-পা কেটে দেয়ার এবং ফাঁসিতে লটকাবার ভয় দেখার পরও এ সবের কোন পরোয়া তারা করে না। তাকে পরিষ্কার বলে দেয়, তোমার যা কিছু করার আছে কর। আমরা তোমার খাতিরে যে সুস্পষ্ট সত্য দেখতে পেয়েছি তার থেকে এবং আমাদের স্রষ্টা থেকে মুখ ফেরাব না। (আ'রাফঃ ১১৩-১২৬; তা-হাঃ ৭০-৭৩, শুয়ারাঃ ৪১-৫১ দ্রঃ)।

আর এক আচরণ হলোঃ ফেরাউনের সভাসদগণের মধ্য থেকে একজনের। তিনি অন্তর থেকে ঈমান এনেছিলেন এবং তা গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু যখন ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)কে হত্যা করতে মনস্থ করলো, তখন তিনি পূর্ণ দরবারে উঠে দাঁড়ালেন এবং বল্লেন, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে সে বলে, আমার রব আল্লাহ?

তারপর তিনি এক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ভাষণ দেন যা সূরা মুমেনেঃ ২৮ থেকে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর ভাষণে তিনি প্রকাশ্যে ফেরাউন, তার রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দ এবং জাতিকে খোদার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। তাদের সকলকে সঠিক পথ অবলম্বনের উপদেশ দেন। তিনি এ বিষয়ে কোন পরোয়া করেননি যে, তার এ সত্য কথা বলার কি পরিণাম তাঁকে ভোগ করতে হবে।

এ কাহিনীর মাধ্যমে সবচেয়ে চমৎকার আচরণ হযরত মূসা (আঃ) এর দেখা যায়। তিনি এমন এক জাতির লোক ছিলেন যারা চরম লজ্জাকর জীবন-যাপন করতো। তাদের এতোটুকু সৎ সাহসও ছিল না যে, তাদের সন্তান হত্যার জন্যে একটু বিলাপ করে। স্বয়ং হযরত মূসার (আঃ) বিরুদ্ধে একজন মিসরীকে হত্যা করার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী ওয়ারেন্টও ছিল। তিনি দেশ ত্যাগ করে কয়েক বছর যাবত মাদয়ানে আশ্রয়

গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় আল্লাহতায়ালা নবী বানিয়ে মুজেযা স্বরূপ একটি লাঠি ও ইয়াদে বায়জাসহ ফেরাউনের মতো একজন অত্যাচারী শাসকের মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন সামিরক শক্তি ছাড়াই ফেরাউনের দরবারে গিয়ে পৌছেন। তার ভীতি প্রদর্শনে তিনি ভীত হননি। তার জুলুম-অত্যাচারে মাথা নত করেননি। ক্রমাগত বছরের পর বছর যাবত অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করতে থাকেন। ফেরাউন যখন তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করার ঘোষণা করে, তখন এ কথা বলে তার মুখ বন্ধ করে দেন-

اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

-আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার এবং তোমাদের রবের, প্রত্যেক ক্ষমতামদমত্ত অহংকারী থেকে যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না। (মুমেন ঃ ২৭)

অন্যান্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

এভাবে কুরআনে অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে এটা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম কোন্ ধরনের আচরণ ও চরিত্রের মানুষ পছন্দ করে এবং কোন ধরনের মানুষ তার অপছন্দনীয়। একদিকে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ) ছিলেন যাঁরা বাদশাহীর সিংহাসনে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও খোদাভীতি ও খোদার বন্দেগী থেকে সরে যাননি। গর্ব-অহংকারের পরিবর্তে শোকর ও আনুগত্যের পন্থার উপর কায়েম ছিলেন। যেখানেই তাঁরা অনুভব করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সে মুহূর্তেই তাঁরা বিনয়-নম্রতাসহ আল্লাহর সামনে নতশির হয়েছেন। (সোয়াদঃ ১৭-১৪, ৩৪-৩৫, নমলঃ১৯-৪০ দ্রঃ)

সাবার রাণী একটি মুশরিক জাতির শাসক হওয়া সত্ত্বেও যখন সত্য সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন দ্বিধাহীনচিত্তে তা মেনে নিলেন এবং এ বিষয়ের কোন পরোয়া করলেন না যে, তাঁর মুশরিক জাতি তাঁর সহযোগিতা করবে কি না। (নমল ঃ ৪৪)

সূরা ইয়াসিনে একজন মর্দে হকের উল্লেখ পাওয়া যায়-যাঁর জাতি তিন তিনজন নবীর চরম বিরোধিতা করে এবং তাঁদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে আসছেন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করছেন, পয়গম্বরগণকে মেনে নেয়ার জন্যে তাদের গোমরাহী যুক্তিসহ প্রমাণ করছেন, নিজের ঈমানের সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন এবং পরিণামে নিজের জীবনের আশা পরিত্যাগ করছেন। অর্থাৎ তারা তাঁকে নিহত করে। তথাপি জালেমদের জন্যে তাঁর মুখ থেকে কোন বদদোয়া বেরুচ্ছে না। বরঞ্চ তিনি আশা করছেন, আহা, যদি তাঁর জাতি এখনো জানতে পারতো কোন জিনিসের বদৌলতে তাঁর রবের পক্ষ থেকে তিনি সম্মান ও মাগফেরাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করছেন। (ইয়াসিন ঃ ১৩-২৭)

তারপর আসহাবে কাহাফের উল্লেখ আছে যারা একটি মুশরিক জাতির জুলুম থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্যে শুধু খোদার উপর ভরসা করে একটি পর্বত গুহায় আত্মগোপন্ করছেন এবং এ কথা চিন্তা করছেন না যে, এ আশ্রয়স্থলে কতদিন অসহায় অবস্থায় কাটাবেন। তাঁদের শুধু চিন্তা এই যে তাঁরা যেন ঈমানের পথ থেকে সরে না পড়েন। (কাহাফ ঃ ১৩-২০)

অন্যদিকে কারুনেরও উল্লেখ কুরআনে আছে। সে ছিল হযরত মূসার (আঃ) জাতির এক ব্যক্তি। কিন্তু সে দুনিয়া পুরস্তির জন্যে ফেরাউনের ঘনিষ্ট সভাসদগণের মধ্যে শামিল হয়েছিল। সে অবৈধ উপায়ে অঢেল সম্পদের মালিক হয় এবং এর জন্যে গর্ব প্রকাশ করতে থাকে। সৎ লোকেরা তাকে সৎ জীবন-যাপনের নসিহত করলে সে এই বলে তাদের প্রচেষ্টা নাকচ করে দিত আমি যা কিছু অর্জন করেছি তা আমার যোগ্যতার ফল। দুনিয়ার মোহাবিষ্ট লোকেরা তার জাঁকজমক দেখে তাকে বড়ো ভাগ্যবান মনে করতো এবং এ অভিলাষ পোষণ করতো যে তারাও যদি এমন ভাগ্যবান হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহতায়লা যখন তাকে তার ধন-দৌলত ও প্রাসাদসহ মাটির নীচে প্রোথিত করে দিলেন, তখন তা তাদের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে পড়লো যারা তার মতো ভাগ্য লাভের অভিলাষ পোষণ করতো। (কাসাস ঃ ৭৬-৮২)

সাবা জাতি যে দেশে বাস করতো আল্লাহ তাকে দুনিয়ার বেহেশত বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর নাফরমানীর পথ অবলম্বন করলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে এক ভয়ংকর বন্যার দ্বারা ধ্বংস করে দিলেন। তাদের বাগ-বাগিচা কন্টকযুক্ত গুল্মগুচ্ছে পরিণত হলো এবং তারা এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যে, এটা আরবে তারা এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। (সাবা ঃ ১৫-১৯)

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ইহুদীদের পেশ করা হয়েছে। তারা খোদার নাফরমানী করে ইতিহাসে দুইবার বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি করে, যার শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হয়। একবার বেবিলনীয় ও আশুরিয়দের কঠোর শাসকগণ তাদেরকে উৎখাত করে দেয়। দ্বিতীয়বার রোমীয়গণ তাদের ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে সারা দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেয়। এই শেষবারের মতো তাদের বিছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তারা আরবে পৌঁছে। তাদের এক একটি নৈতিক দোষক্রটি আরবদের জানা ছিল। এসব চিহ্নিত করে কুরআন লোকদেরকে বলে যে, আল্লাহতায়ালা এ ধরনের দোষক্রটিপূর্ণ লোকদেরকে অত্যন্ত অপছন্দ করে। তারা জেনে বুঝে তাদের পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ধর্মের শিক্ষার পরিপন্থী ও ভরসায় গোনাহে লিপ্ত হতো যে, তাদেরকে ত মাফ করেই দেয়া হবে। (আ'রাফ ঃ ১৬৯)

তারা বলতো, অইহুদীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতে এবং তাদের সাথে অসদাচরণে আমাদের কোন গোনাহ হয় না। (আলে ইমরান ঃ ১৭৫) তাদের আলেম-পীর-দরবেশ অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করতো। (তওবা ঃ ৩৪) সুদখুরী তাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল। অথচ তাদের ধর্মে এসব নিষিদ্ধ ছিল। (নিসা ঃ ১৬১)

তারা যাদু-টোনা ও ভূত-প্রেতের সাহায্য নিয়ে যেসব শয়তানী কাজ-কর্মের ব্যবসা জমজমাট করে রেখেছিল তা হযরত সুলায়মান (আঃ) উপর অন্যায়ভাবে আরোপ করতো। (বাকারা ঃ ১০২)

তাদের মধ্যে সকল প্রকার অনাচার-পাপাচারের প্রসার ঘটেছিল এবং তারা একে অপরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার পথ পরিহার করেছিল। এ কারণে তারা নৈতিক অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত হচ্ছিল। (মায়েদাহ ঃ ৭৯) এসব এমন দোষ-ক্রটি যাকে কুরআন সকল জাতির ধ্বংসের সাধারণ কারণ বলে বর্ণনা করেছে। বস্তুতঃ সূরা হুদে অতীত জাতিগুলোর বার বার আযাবে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা বয়ান করার পর বলা হয়েছিল, তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতীত হয়েছে তাদের মধ্যে এমন লোক কেন ছিলনা যারা

মানুষকে দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতো? এমন লোক থাকলেও তারা ছিল নগণ্য-যাদেরকে আমরা সেসব জাতির মধ্যে থেকে রক্ষা করেছি। নতুবা জালেম লোকেরা ঐসব ভোগ-বিলাসে লিপ্ত ছিল যার সরঞ্জাম আমরা অধিক পরিমাণে তাদেরকে দিয়েছিলাম এবং তারা অপরাধী হয়ে রয়েছিল। তোমার রব এমন নন যে অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করে দেবেন যার অধিবাসী সংশোধন প্রয়াসী ছিল। (আয়াত ঃ ১১৬-১১৭)

কুরআন যেসব অনাচারের নিন্দা করেছে

এ এক প্রকাশভংগী ছিল যার দ্বারা কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে তার নৈতিক শিক্ষা বর্ণনা করেছে। তারপর দ্বিতীয় বর্ণনাভঙ্গী এই যে, সে প্রত্যক্ষভাবে মন্দ আচরণ, কর্ম ও চরিত্রের নিন্দা করেছে যা কুরাইশ, আরব এবং সাধারণ মানব সমাজে পাওয়া যেত। এ এমন সব মন্দ কাজ যাকে ভালো বলার সাহস কারো ছিলনা। এদের মুকাবিলায় কুরআন বলে সৎ গুণাবলী, চরিত্র ও কাজ কি কি যার দ্বারা ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজকে ভূষিত দেখতে চায়। এ এমন সদগুণাবলী যা নৈতিক মহত্ব বলে অস্বীকার করা কারো মধ্যে ছিল না।

এখন আমরা যেসব দোষত্রুটি বয়ান করব যার নিন্দা কুরআন করেছে এবং মানুষকে বলেছে যে, ইসলাম এসব থেকে মানব জীবনকে পাকপবিত্র করতে চায়।

-নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেকের জন্যে যে সামনা-সামনি লোকদের গালমন্দ করে এবং পেছনে দোষ প্রচারে অভ্যস্ত। যে ধনসম্পদ সঞ্চিত করেছে এবং তা গুণে গুণে রেখেছে। সে মনে করে তার ধন চিরদিন তার সাথে থাকবে। (হুমাযাহ ঃ ১-৩)

-তুমি কি দেখেছ তাকে যে আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অবিশ্বাস করে? এতো সেই যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং মিসকীনকে আহার দিতে উদ্বুদ্ধ করে না। (অর্থাৎ না সে স্বয়ং তার নিজেকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, আর না অন্যকে এ জন্যে উদ্বুদ্ধ করে যে গরীব ও অভাবগ্রস্তের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কিছু করে)। তারপর ধ্বংস সে নামাযীর জন্যে যে তার নিজের নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা-অবহেলা দেখায়, যে রিয়াকারী রিয়া করে এবং মামুলী প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষকে দেয়া থেকে বিরত থাকে। (মাউন)

মানুষের অবস্থা এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং পরীক্ষার খাতিরে তাকে ইজ্জত ও নিয়ামত দান করে, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর তিনি যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং এর ভিত্তিতে তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন। কখনোই না (অর্থাৎ এ সম্মান ও অসম্মানের মানদন্ড নয়) বরঞ্চ তোমরা এতিমদের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর না। মিসকীনকে খানা খাওয়াবার জন্যে একে অপরকে উৎসাহিত কর না, মীরাসের সমুদয় মাল একত্র করে খেয়ে ফেলো। তারপর মালের মোহে পুরোপুরি লিপ্ত হয়ে যাও।
(ফজর ঃ ১৫-২০)

-যারা জুলুম সহকারে এতিমের মাল ভক্ষণ করে-তারা তাদের পেট আগুনে পরিপূর্ণ করে। (নিসা ঃ ১০)

-অধিক থেকে অধিকতর এবং একে অপর থেকে বেশী বেশী দুনিয়া হাসিল করার চিন্তা তোমাদেরকে গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছে। অবশেষে তোমরা ঐ চিন্তায় কবরে গিয়ে পৌঁছে যাও। কখনো না (অর্থাৎ এ কোন কল্যাণ নয়)-অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (তাকাসুর ঃ ১-৩)

-তুমি কখনো এমন ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যে খুব বেশী কসম করে এবং যে গুরুত্বহীন ব্যক্তি। যে গালমন্দ করে, অভিশাপ দেয় ও চোগলখুরি করে বেড়ায়। ভালো কাজের প্রতিবন্ধক, জুলুম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত। বড়ো অসৎ কর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন আর সেই সাথে অসৎ বংশজাতও। (তার চাপে নতিস্বীকার করো না শুধু এ কারণে যে) সে বহু ধনসম্পদ ও সন্তানের মালিক। (কলম ঃ ১০-১৪)

-ধ্বংস হীন প্রতারকদের জন্যে, যাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরা মাত্রায় নেয় এবং তাদেরকে যখন ওজন করে দেয় তখন তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরা কি বুঝে না যে এক মহাদিনে এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? তা সেই দিন যেদিন সকল মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে। (মুতাফফেফীন ঃ ১-৬)

-ইনসাফের সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর এবং পাল্লার দাঁড়ি (গ্রাহককে প্রতারণা করার জন্যে) উপর-নীচ করো না। (রাহমান ঃ ৯)

-(কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসী) অপরাধী জাহান্নামবাসীদের জিজ্ঞেস করবে, কোন জিনিস আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলছে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। এতিমদেরকে খানা খাওয়াতামনা, সত্যের পরিপন্থী কথা রচনাকারীদের মধ্যেও শামিল হয়ে যেতাম এবং প্রতিফল দানের দিনকেও অস্বীকার করতাম। (মুদ্দাসসির ঃ ৪০-৪৬)

-(কিয়ামতের দিন জাহান্নামীকে শৃংখল পরিয়ে নিয়ে যাবার সময় বলা হবে) না এ ব্যক্তি মহান খোদার উপর ঈমান রাখতো, আর না মিসকীনকে খানা খাওয়াবার জন্যে উৎসাহিত করতো। অতএব আজ এখানে না তার কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু আছে আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া কোন খাদ্য যা অপরাধী লোক ছাড়া আর কেউ খায় না। (হাক্কাহ ঃ ৩৩-৩৭)

-সে বলে, আমি অঢেল সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি? (বালাদ ঃ ৬-৭)

-অঢেল সম্পদ উড়িয়ে দেয়ার অর্থ এই যে, তার ধনশীলতার প্রদর্শনী এবং নিজের গর্ব-অহংকার প্রকাশের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা। শেষ বাক্যের অর্থ এই যে, এ গর্ব অহংকার প্রদর্শনকারী কি মনে করে যে, কেউ তা দেখার নেই যে কিভাবে সে ধন অর্জন করেছে এবং কোন কাজে কোন নিয়তে তা উড়িয়ে দিয়েছে?)

-যারা তাদের ধন আল্লাহর পথে খরচ করে এবং খরচের পর কারো কাছে কোন প্রতিদান চেয়ে বেড়ায় না, আর না অনুগৃহীত ব্যক্তিকে কোন মনঃকষ্ট দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন দুঃখ ও ভয়ের কারণ নেই।

একটি মিষ্টি কথা এবং কোন অসহনীয় ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন সেই খয়রাত থেকে উৎকৃষ্টতর যার পেছনে মনঃকষ্ট দেয়া হয়। (বাকারাহ ঃ ১৬২-১৬৩)

-প্রতিদান চেয়ে এবং কষ্ট দিয়ে নিজের দান খয়রাতকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় বিনষ্ট করো না, যে লোক দেখানোর জন্যে নিজের ধন খরচ করে। (বাকারাহ ঃ ২৬৪)

-যে ব্যক্তি সেই মাল খরচ করতে কৃপণতা করে যা আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন, সে যেন এ কথা মনে না করে যে, এ তার জন্যে মংগলকর, বরঞ্চ এ তার জন্যে অত্যন্ত অমংগলকর। যা কিছু সে কৃপণতা করে সঞ্চিত করে তা কিয়ামতের দিন তাদের গলায় শিকল বানিয়ে দেয়া হবে। (আলে ইমরান ঃ১৮০)

কৃপণতা শুধু এটাই নয় যে, লোক তার ধনসম্পদ না তার নিজের জন্যে ব্যয় করে আর না তার সন্তানাদির জন্যে। বরঞ্চ কৃপণতা এটাকে বলে যে, সে তার সবকিছু তার ভোগবিলাস, আমোদপ্রমোদ ও আপন ধনদৌলতের প্রদর্শনীর জন্যে উড়িয়ে দিতে থাকে। কিন্তু কোন সৎকাজে ব্যয় করার জন্য তার মন চায় না।

-আল্লাহতায়লা এমন লোককে কখনো পছন্দ করেন না, যে আত্মগর্বে গর্বিত এবং আপন শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব করে। যে কৃপণতা করে অপরকেও কৃপণতা করতে বলে এবং আল্লাহ অনুগ্রহ করে, যা কিছু তাকে দিয়েছেন তা গোপন করে। (নিসা ঃ ৩৬-৩৭)

-যারা মনের সংকীর্ণতা থেকে বেঁচে আছে তারাই সাফল্য লাভ করবে।
(তাগাবুন ঃ ১৬)

-লোকের মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না এবং যমীনে গর্ব ভরে চলো না। আল্লাহ কোন আত্মঅহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। চালচলনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর কিছুটা মৃদু রাখ। সব আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে কর্কশ।
(লোকমান ঃ ১৮-১৯)

-যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে অন্যের তুলনায় বেশী দিয়েছেন তার অভিলাষ পাষণ করো না। (নিসা ঃ ৩২)

কাউকে নিজের তুলনায় কোন দিক দিয়ে উন্নত দেখে অস্থির হয়ে যাওয়াই হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল কারণ, যার জন্যে মানুষ অন্তর্দাহ ভোগ করতে থাকে। নিজের মঙ্গলের জন্যে তার অমংগল কামনা করে। আর যে উন্নতি সে বৈধ পন্থায় লাভ করতে পারে না, তার জন্যে সে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে।

-হে নবী! লোকদেরকে বলে দাও, আমার রব ত হারাম করে দিয়েছেন অশ্লীল কাজ-প্রকাশ্য অথবা গোপন, গোনাহের কাজ, হকের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করার কাজ। আর হারাম করেছেন এ কাজ যে আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকে শরীক মনে করবে যার সপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলবে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার কোন জ্ঞান তোমাদের নেই। (আ'রাফ ঃ ৩৩)

-আল্লাহর নাম এমন কসম খাওয়ার কাজে ব্যবহার করো না যার উদ্দেশ্য নেক কাজ, তাকওয়া এবং লোকের মধ্যে সংস্কার-সংশোধনের কাজ থেকে বিরত থাকা ।
(বাকারাহ ঃ ২২৪)

-এবং আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ কর, যখন তোমরা তাঁর সাথে কোন চুক্তি করেছ। আর নিজেদের কসম পাকাপোক্ত করার পর তা ভংগ করো না যখন তোমরা আল্লাহকে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তোমাদের অবস্থা সেই নারীর মতো যেন না হয়, যে নিজে মেহনত করে সূতা কেটেছে এবং নিজেই তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা তোমাদের কসমকে নিজেদের ব্যাপারে ধোঁকা প্রতারণার হাতিয়ার বানাও যেন একটি দল অপরটি থেকে অধিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ ত তোমাদেরকে এ কসমও চুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। (নাহল ঃ ৯১-৯২)

-এবং যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি দৃঢ়ভাবে করার পর ভংগ করে, ও সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা স্থাপন করার হুকুম আল্লাহ দিয়েছেন এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের জন্যে অভিসম্পাৎ এবং আখেরাতে তাদের জন্য অত্যন্ত মন্দ বাসস্থান হবে। (রাদ ঃ ২৫)

-বাদশাহ যখন কোন দেশে প্রবেশ করে তখন সে তা লন্ডভন্ড করে দেয় এবং তার সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করে। তারা এমনটিই করে থাকে। (নমল ঃ ৩৪)

-সূরায়ে হুজুরাতে যেসব নৈতিক দোষত্রুটির নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে- একে অপরের প্রতি বিদ্রূপ করা, গালমন্দ করা, খারাপ নামে ডাকা, অন্যায়ভাবে খারাপ ধারণা পোষণ করা, অপরের অবস্থা সম্বন্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা এবং পশ্চাতে এসে অপরের অপপ্রচার করা। (আয়াতঃ ১১-১২ দ্রঃ)

-নিশ্চিতরূপে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তারা যারা অজ্ঞতার কারণে তাদের সন্তান হত্যা করেছে। (আনয়াম ঃ ১৪০)

-তাদের মধ্যে কাউকে যখন কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখমন্ডল কালিমায় ছেয়ে যায় এবং সে ব্যস, রক্তের মতো এক ঢোক পান করে রয়ে যায়। সে মানুষ থেকে নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যে এ দুঃসংবাদের পর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে কি করে। চিন্তা করে যে, লাঞ্ছনাসহ কন্যাকে নিয়ে থাকবে; না মাটির মধ্যে দাবিয়ে দেবে। (নাহল ঃ ৫৮-৫৯)

-(কিয়ামতের দিন যখন খোদার সামনে লোক হাযির হবে তখন) জীবিত কবরস্থ কন্যা সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন্ অপরাধে তোমাকে মেরে ফেলা হয়েছে?
(তাকবীর ঃ ৮-৯)

-যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন অপরাধ বা গোনাহ করলো এবং তার অভিযোগ কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করলো সে বড়ো বোহতান ও গোনাহের বোঝা কাঁধে নিল।
(নিসা ঃ ১১২)

-তুমি কোন খেয়ানতকারীর সমর্থক হয়ো না। আল্লাহ কোন খেয়ানতকারী ও অপরাধে অভ্যস্থ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। (নিসা ঃ ১০৫-১০৭)

-খেয়ানতকারী তার খেয়ানতসহ কিয়ামতের দিন হাযির হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কামাইয়ের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং লোকদের উপর জুলুম হবে না। (আলে ইমরান ঃ ১৬১)

-জেনেশুনে অন্যের আমনত খেয়ানত করো না। (আনফাল ঃ ২৭)

-যে সুদ তোমরা দাও যাতে লোকের মাল বর্ধিত হয়, তা আল্লাহর নিকটে বর্ধিত হয় না। আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দাও, প্রকৃতপক্ষে এ যাকাতদাতাগণ তাদের মাল বর্ধিত করে। (রোম ঃ ৩৯)

-পরস্পর একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। তবে লেনদেন পরস্পরের সম্মতিতে হলে ভিন্ন কথা। একে অপরকে হত্যা করো না।.... তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুলুম ও বাড়াবাড়িসহ এমন করবে, তাকে আমরা অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।
(নিসা ঃ ২৯-৩০)

-পরস্পর একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। আর না তা বিচারকের কাছে এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যাতে লোকের মালের কোন অংশ জেনে বুঝে ভক্ষণ কর।
(বাকারাহ ঃ ১৮৮)

এর অর্থ এটাও যে বিচারককে ঘুষ দিয়ে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা করো না। মাল প্রকৃতপক্ষে অন্য ব্যক্তির এ কথা জানা সত্ত্বেও নিছক এ উদ্দেশ্যে মামলা

আদালতে নিও না যে সে ব্যক্তি তার মালিকানার প্রমাণ দিতে পারবে না অথবা তুমি কোন হেরফের করে মামলায় জয়লাভ করবে।

-সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা উচিত যখন তাদেরকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তলব করা হবে এবং সাক্ষ্য গোপন করো না। যে তা গোপন করবে তার দিল গোনাহের কালিমায় লিপ্ত হবে। (বাকারাহ ঃ ২৮২-৮৩)

-মিথ্যা বলা থেকে দূরে থাক। (হজ্ব ঃ ৩০)

এর মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যও এসে যায়, যে সম্পর্কে নবী (সা) বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সাথে শির্কের সমান।

-যে ভালো কাজের জন্যে সুপারিশ করবে সে তার অংশ পাবে এবং যে মন্দ কাজের সুপারিশ করবে সে তার অংশ পাবে। (নিসা ঃ ৮৫)। অর্থাৎ ভালো অথবা মন্দ কাজের সেও অংশীদার হবে।

-সূরায়ে নূরে ৪ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে সতীসাধ্বী নারীদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের, তা শুনে প্রচার করার এবং সমাজের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচারের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু আয়াতসমূহের বরাত দেয়াই যথেষ্ট মনে করি। আর এ ব্যাপার শুধু নারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়, পুরুষদের উপর বোহতান বা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করাও গোনাহের কাজ।

-স্ত্রীদের সাথে উত্তম পন্থায় জীবন যাপন কর। (নিসা ঃ ১৯)

-যদি নারীদের তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দৎ পূরণ হয়ে আসছে এমন সময় তাদেরকে উত্তম পন্থায় রেখে দাও অথবা উত্তম পন্থায় বিদায় করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আটকে রেখো না যাতে তাদের উপর বাড়াবাড়ি করতে পার। যারা এমন করবে তারা নিজেদের উপর জুলুম করবে। (বাকারাহ ঃ ২৩১)

-নারীদেরকে তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং তাদের মোহর সুবিদিত পন্থায় পরিশোধ কর যেন বিবাহ বন্ধনে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। স্বাধীনভাবে যৌন আচরণ করে বেড়ায়ো না অথবা গোপনে গোপনে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করো না। (নিসা ঃ ২৫)

-হে নবী! নারীদের নিকট থেকে এ কথার প্রতিশ্রুতি নাও যে তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, আপন সন্তান হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা অপরাধ রচনা করে আনবে না এবং সর্বজনবিদিত কোন ন্যায্য ব্যাপারে তোমার নাফরমানী করবে না। (মুমতাহেনা ঃ ১২)

-মিথ্যা অপবাদ রচনা করে আনার অর্থ সম্বন্ধে দুটি কথা। এক. এই যে, কোন নারী অন্যান্য নারীদের উপর পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ আরোপ করবে এবং তার চর্চা করবে। দ্বিতীয়. এই যে, সন্তান ত অন্য কারো ঔরসে পয়দা হলো এবং স্বামীকে এভাবে প্রতারিত করা হলো যে, এ সন্তান তারই।

-হে বনী আদম! আমরা তোমাদের উপর পোশাক নাযিল করেছি তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখার জন্যে। আর এ সৌন্দর্য বর্ধনের উপায়ও বটে।... হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফেৎনার মধ্যে নিক্ষেপ না করে যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে (হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিল-

এবং তাদের পোশাক তাদের থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে তাদের লজ্জাস্থান একে অপর থেকে উন্মুক্ত হয়ে যায়। (আ'রাফ ঃ ২৬-২৭)

-হে নবী (সা)! তাদেরকে বল কে হারাম করেছে আল্লাহর সে সৌন্দর্য যা তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্যে বের করেছেন এবং কে হারাম করেছে পানাহারের পাক জিনিসগুলো। (আ'রাফ ঃ ৩২)

-রাহবানিয়াতের বেদআত (ঈসায়ীগণ) স্বয়ং আবিষ্কার করেছে। আমরা তা তাদের উপরে ফরয করিনি। (হাদীদ ঃ ২৭)

-খেজুর ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মাদকদ্রব্যও বানাও এবং ভালো রিযিকও অর্জন কর। (নহল ঃ ৬৭) অর্থাৎ আল্লাহ্ যে ভালো রিযিক দিয়েছিলেন তাকে তোমরা এক মন্দ কাজ তথা মাদকতা সৃষ্টিকারী একবস্তু বানাতে ব্যবহার কর।

এসব মন্দ চরিত্র, গুণ ও কাজের নিন্দা কুরআনে করা হয়েছে। এ সবের অনিষ্টকারিতা অস্বীকার করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কুরাইশ ও আরববাসীর মধ্যে কোন ব্যক্তিরই এ দাবী করার সাহস ছিল না যে, তার সমাজ এসব অনাচার থেকে পবিত্র ছিল। আর না কেউ এ কথা বলতে পারতো যে সব অনাচার-অনিষ্ট থেকে কুরআন বিরত রাখছে তার কোন একটি রসূলুল্লাহ (সা) অথবা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। একগুঁয়ে এ হঠকারী লোক ব্যতীত যারাই পরিচ্ছন্ন ও কুসংস্কারহীন মানসিকতা পোষণ করতো তাদের পক্ষে এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে, এসব অনিষ্ট থেকে প্রকৃতপক্ষে লোক ও সমাজের দূরে থাকা উচিত এবং ঐ ব্যক্তি কোন অপরাধ করছেন না যিনি মানব জীবনকে এসব থেকে পাক পবিত্র করতে চান।

ব্যাপক নৈতিক হেদায়েত

এসব মন্দ কাজ চিহ্নিত করার সাথে সাথে কুরআনে বারবার এমন ব্যাপক নৈতিক হেদায়েত দেয়া হয়েছে যার মহৎ গুণাবলী হৃদয়মন প্রভাবিত করতো এবং কোন সুস্থ প্রকৃতির লোকের পক্ষে এগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে আরো আকর্ষণীয় ছিল যে, তা শুধু বর্ণনা করাই হয়নি। বরঞ্চ এ সবের উপস্থাপনকারী রসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীগণ এসব পুরোপুরি মেনে চলতেন। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

-আল্লাহ্ ইনশাফ অনুগ্রহ ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। অনাচার-পাপাচার, নির্লজ্জতা, জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে নসিহত করছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (নহল ঃ ৯০)

-হে মুহাম্মদ (সা)! লোকদেরকে বলে দাও, এসো আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বাধানিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর খোদায়ীর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। বাপ-মার সাথে সদাচরণ করবে। নিজেদের সন্তান দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। আমরা তোমাদেরকে রিযিক ত দিচ্ছিই। তাদেরকেও দেব। নির্লজ্জতার কাজের নিকটবর্তীও হবে না তা প্রকাশ্য হোক অথবা গোপন। কোন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্মানীয় করেছেন, হত্যা করবে না। কিন্তু করলে সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা যা তিনি মেনে চলার জন্যে তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন যাতে তোমরা বুঝে শুনে কাজ করতে পার। আর এতিমের মালের নিকটবর্তী হয়ো না। তবে যদি এমন নিয়ম ও পদ্ধতিতে হলে, যা সবচেয়ে ভালো তাতে কোন দোষ

নেই, যতোদিন না সে জ্ঞানবুদ্ধি লাভের বয়সে পৌঁছেছে। আর ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ কর, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা তত পরিমাণে চাপিয়ে দেই যা বহন করার সাধ্য তার আছে। যখন কথা বলবে ইনসাফের কথা বলবে। এ ব্যাপার তার নিজের আত্মীয়ের হোক না কেন। আর খোদার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ কর।[১] এসব বিষয়ের নসিহত আল্লাহ তোমাদেরকে করেছেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (আনয়াম ঃ ১৫১-১৫২)

-তোমাদের খোদা ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, এক ঃ তোমরা কারো এবাদত করবে না। বরঞ্চ করবে শুধু তাঁরই।

দুই ঃ পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়েই যদি বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তাহলে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে। বিনয়-নম্রতার সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর দোয়া করতে থাকবে, "হে খোদা তাদের উপর রহম কর- যেভাবে তারা দয়া ও স্নেহ বাৎসল্যসহ বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" তোমাদের খোদা ভালোভাবে জানেন যে তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎ ও চরিত্রবান হয়ে থাক তাহলে তিনি এরূপ সকল মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে বন্দেগীর আচরণ অবলম্বন করে।

তিন ঃ আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে তাদের হক।

চার ঃ বাহুল্য খরচ করো না। বাহুল্য খরচকারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের অকৃতজ্ঞ।

পাঁচ ঃ আর যদি তোমাদেরকে তাদের (অর্থাৎ অভাবীদের) এজন্যে এড়িয়ে চলতে হয় যে, আল্লাহর যে রহমতের তোমরা আশাবাদী তা তালাশ করছ, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভদ্র ও নরম ভাষায় জবাব দাও।

ছয় ঃ নিজেদের হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না (কৃপণতা করো না) এবং তা করলে তোমরা তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার খোদা যার জন্যে চান রুজি বাড়িয়ে দেন। আর যার জন্যে চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তাদেরকে দেখছেন।

সাত ঃ নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। বস্তুতঃ তাদের হত্যা করা বিরাট ভুল কাজ।

আট ঃ এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। তা অত্যন্ত অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।

---

১ খোদার সাথে কৃত ওয়াদার অর্থ যা মানুষ খোদার সাথে করে। সেসব ওয়াদাও যা খোদার নাম নিয়ে মানুষের সাথে করা হয়। আর সে ওয়াদা যা মানুষ এবং খোদা, মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সে সময়ে আপনাআপনি হয়ে যায় যখন কোন মানুষ খোদার যমীনে এক মানব সমাজে পয়দা হয়। এ সর্বশেষ ও প্রাকৃতিক চুক্তি(Natural contract) যা করতে যদিও মানুষের ইচ্ছা ও অনুভূতি কোন কাজ করে না, তথাপি এ সম্মানযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে অনুভূতিসহ কৃত ওয়াদা চুক্তি অপেক্ষা কোন দিক দিয়ে কম নয় গ্রন্থাকার।

নয় ঃ এবং জীবন হত্যার অপরাধ করো না যা আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন। অবশ্য ন্যায়সঙ্গত কারণে করা যায়। আর যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অলীকে আমরা কেসাসের অধিকার দিয়েছি। তার উচিত সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। তাকে সাহায্য করা হবে।

দশ ঃ এতিমদের মালের নিকটবর্তী হয়ো না। কিন্তু উত্তম পন্থায় যতোদিন না সে যৌবনে পৌঁছে।

এগারো ঃ আর ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে। ওয়াদার ব্যাপারে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

বারো ঃ কোন পাত্র দ্বারা মাপ করলে তা ভর্তি করে দেবে। আর পাল্লা দ্বারা পরিমাপ করলে ক্রটিহীন পাল্লা দ্বারা করবে। এ হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামের দিক দিয়েও তা উত্তম।

তেরো ঃ এমন বিষয়ের পেছনে লেগে যেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রেখো যে, চোখ, কান ও মন সবকিছুর জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

চৌদ্দ ঃ যমীনে গর্ব ভরে চলো না। তোমরা না যমীনকে দীর্ণ করতে পারবে আর না পাহাড়ের মতো উঁচু হতে পারবে।

এ আদেশগুলোর প্রত্যেকটির মন্দ দিক তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়। এসব সে বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা যা তোমার খোদা তোমার প্রতি অহী করেছেন (বনী ইসরাইল ঃ ২৩-৩০)

-আল্লাহর বন্দেগী কর এবং এ বন্দেগীতে অন্য কোন কিছুকে শরীক করো না। মা বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনদের সাথে সদাচরণ কর। প্রতিবেশী আত্মীয়, অপরিচিত প্রতিবেশী, পার্শ্বস্থ সাথী, মুসাফির, দাসদাসী যা তোমাদের মালিকানাধীন, এদের সাথে দয়া অনুগ্রহসহ আচরণ কর। (নিসা ঃ ৩৬)

-এ নেক কাজ নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে করলে না পশ্চিম দিকে। বরঞ্চ নেক কাজ এটা যে মানুষ আল্লাহ, আখেরাতের দিন, ফেরেশতা, কিতাব এবং পয়গম্বরদের খাঁটি দেলে মেনে নেবে এবং আল্লাহর মহব্বতে নিজের প্রিয় মাল আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিস্‌কীন, মুসাফির এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরকে দান করবে। গোলামী যিন্দেগী থেকে মুক্ত করার জন্যে ব্যয় করবে। নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। নেক ওসব লোক যারা চুক্তি করলে তাদের প্রতিশ্রুতি পুরণ করবে, দারিদ্র্য ও বিপদ-আপদে সবর করবে এবং (হক ও বাতিলের) সংগ্রামে অবিচল থাকবে। এরাই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ ও মুত্তাকী লোক। (বাকারাহ ঃ ১৭৭)

-নিশ্চিতরূপে সাফল্য লাভ করেছে ওসব ঈমানদার যারা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে, যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে, যাকাত পদ্ধতির উপর কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যারা (নগ্নতা ও যৌন অনাচার থেকে) নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে অবশ্য আপন স্ত্রী ও মালিকাধীন দাসী ব্যতীত যাদের বেলায় (লজ্জাস্থান সংরক্ষণ না করলে) ভর্ৎসনাযোগ্য হবে না। অবশ্যি যারা এসব ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু চায় তারা বাড়াবাড়ি করে। আর সাফল্য লাভ করেছে ওসব ঈমানদার যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদাচুক্তি সংরক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। (মুমেনুন ঃ ১-৯)

-রহমানের প্রকৃত বান্দাহ তারা যারা যমীনে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং জাহেল তাদের সাথে (বিতর্কমূলক) কথা বলতে এলে তখন বলে-তোমাদেরকে সালাম। যারা

তাদের রবের সামনে সেজদা ও দাঁড়িয়ে নামাযরত অবস্থায় রাত কাটায়। যারা দোয়া করে, "হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। তার আযাব তো জীবননাশকারী হয়ে থাকে। অবস্থান ও বাসস্থান হিসাবে তা অতি জঘন্য। যারা খরচ করলে অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরঞ্চ তার খরচ দুই প্রান্ত সীমার মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। যারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডাকে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন এবং ব্যভিচার করে না। এ কাজ যে করবে সে তার গোনাহের বদলা পাবে। কিয়ামতের দিন তাকে বারবার আযাব দেয়া হবে এবং তার মধ্যে সে লাঞ্ছনাসহ পড়ে থাকবে। তবে যদি কেউ এসব গোনার পর তওবা করেছে এবং ঈমান এনে সৎ কাজ করা শুরু করেছে এ ধরনের লোকের পাপকাজগুলোকে আল্লাহ নেক কাজে পরিবর্তিত করে দেবেন। তিনি বড়োই ক্ষমাশীল। সে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমল করা শুরু করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে যেমন ফিরে আসা উচিত।

রহমানের প্রকৃত বান্দাহ তারা যারা মিথ্যা সাক্ষী হয় না এবং কোন বেহুদা কর্মকান্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত ভদ্রতা ও শালীনতাসহ পাশ কাটিয়ে যায়। যাদেরকে তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসিহত করা হলে সে বিষয়ে তারা অন্ধ ও বোবা হয়ে থাকে না। যারা এ দোয়া করে, হে আমাদের রব! আমাদের বিবি ও সন্তানাদির দ্বারা আমাদের চক্ষের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে পরহেজগারদের নেতা বানিয়ে দাও।
(ফুরকান ঃ ৬৩-৭৪)

-যা কিছুই তোমাদেরকে এখানে দেয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়াতে কিছুদিনের জীবন যাপনের সরঞ্জাম। আর যা কিছু আল্লাহর নিকটে আছে তাই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। তা সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা করে।[১] যারা বড় বড় গোনাহ এবং লজ্জাকর কাজ থেকে দূরে থাকে। কখনো রাগান্বিত হলে মাফ করে দেয়। যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে। নামায কায়েম করে। নিজেদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে করে। যে রিযিক তাদেরকে আমরা দিয়েছি তার থেকে খরচ করে।[২] তার উপর বাড়াবাড়ি করা হলে তার মুকাবিলা করে। মন্দ কাজের প্রতিদান ততোটুকু যতোটুকু মন্দ কাজ। তারপর যে মাফ করে দেবে এবং সংশোধন করে নেবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে। আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না। আর যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয় তাকে ভর্ৎসনা করা যাবে না। ভর্ৎসনার যোগ্য তো তারাই যারা অন্যের উপর জুলুম করে এবং যমীনের উপর অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এমন লোকের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। অবশ্যি যে সবর করে এবং ক্রুটি উপেক্ষা করে চলে তা বড় সাহসিকতাপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি। (শুরা ঃ ৩৬-৪৩)

---

১ অর্থাৎ নিজেদের শক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা এবং উপায়-উপাদানের উপর নয়, বরঞ্চ আল্লাহর অনুগ্রহের উপর ভরসা করে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাঁরই দেয়া হেদায়েতই সত্য ও সঠিক। এ বিশ্বাসও রাখে যে, তাঁর নিকটে কোন নেক কাজের প্রতিদান নষ্ট হবে না-গ্রন্থকার।

২. রিযিকের অর্থ হালাল রিযিক। কুরআনে কোথাও হারাম মালকে আল্লাহর রিযিক বলা হয়নি। আয়াতের অর্থ এই যে, ক. যে হালাল রিযিক আমরা তাকে দিয়েছি, তার থেকে সে খরচ করে। নিজের ব্যয়ভার বহনের জন্যে হারাম মালের উপর হাত দেয় না।

খ. সে রিযিক যে সঞ্চিত করে রাখে না বরঞ্চ খরচ করে।

গ. এর থেকে সে খোদার পথেও খরচ করে। সব কিছুই নিজের জন্যে দান করে দেয় না।

-মানুষকে সংকীর্ণমনা করে পয়দা করা হয়েছে। তাই যখন তার উপরে কোন বিপদ আপদ আসে তখন ভয়ানক ঘাবড়ে যায় এবং যখন সচ্ছলতা লাভ করে তখন কৃপণতা করতে শুরু করে। কিন্তু তারা এসব দোষ থেকে মুক্ত যারা নামায পড়ে, যারা সর্বদা নামাযের পাবন্দী করে (সঠিকভাবে নামাযের নিয়মনীতি মেনে চলে) যাদের মালের মধ্যে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট হক আছে [২] যারা বিচারের দিনকে সত্য বলে মানে এবং নিজেদের রবের আযাবকে ভয় করে। কারণ তাদের রবের আযাব এমন নয় যার থেকে নির্ভীক হওয়া যায়। যারা (নগ্নতা ও ব্যভিচার থেকে) তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখে নিজেদের বিবি ও কৃতদাসী ব্যতীত (যাদের থেকে লজ্জাস্থান সংরক্ষিত না রাখলে) তাদের ভর্ৎসনা করা হবে না। অবশ্যি যারা এসব ছাড়া অন্য কিছু চায় তারাই সীমালংঘনকারী- যারা তাদের কৃত ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, যারা তাদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠার উপর কায়েম থাকে এবং যারা নিজেদের নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে। (মায়ারেজ ঃ ১৯-৩৪)

-দৌড়ে চল সে পথে যা তোমাদের রবের মাগফিরাত এবং ঐ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় যার প্রশস্ততা যমীন ও আসমানের মতো। যা ঐ খোদাভীরু লোকদের জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে।

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় নিজেদের মাল (খোদার পথে) খরচ করে, ক্রোধ সংবরণ করে, অপরের দোষক্রুটি ক্ষমা করে। এমন নৈক লোকই আল্লাহর পছন্দনীয়। তাদের অবস্থা এই যে, যদি কোন মন্দ কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায় (অর্থাৎ কোন গোনাহের কাজ হয়ে যায়) এবং নিজের উপর জুলুম করে, তাহলে আল্লাহকে ইয়াদ করে এবং গোনাহের জন্যে মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গোনাহ মাফ করতে পারে? আর ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের কৃতকর্মের উপর জিদ ধরে না। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৫)

-জান্নাতবাসী তারা যারা নিজেদের নযর পূরণ করে [৩] এবং ঐদিনকে ভয় করে যার বিপদ চারদিকে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে। যারা আল্লাহর মহব্বতে এতিম, মিসকীন ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্যে খাওয়াচ্ছি। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা লাভের আশা করি না। আমরা ত ঐদিনের আযাবের জন্যে আল্লাহকে ভয় করি যা বিপদের ভয়ংকর দীর্ঘ দিন হবে। (দাহর ঃ ৭-১০)

দৌড়ে চল সে পথে যা তোমাদের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের মতো। আর এ জান্নাত ঐসব খোদাভীরু লোকদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থাতে আপন ধনসম্পদ ব্যয় করে, ক্রোধ প্রশমিত করে, অন্যের ক্রটি ক্ষমা করে এবং এ ধরনের সৎ লোক আল্লাহ পছন্দ করেন। যাদের অবস্থা এই যে, যদি কোন সময় কোন অশ্লীল কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায়,

---

২. অর্থাৎ তারা ফয়সালা করে রেখেছে যে, তাদের মালের মধ্য থেকে এতোটা সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে যা তারা দিতে থাকবে। সাহায্যপ্রার্থী অর্থ এমন অভাবী লোক যে তার সাহায্যপ্রার্থী। বঞ্চিত অর্থ এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে সে জানতে পারে যে, এ বেচারা তার প্রয়োজন পূরণে জীবিকা থেকে বঞ্চিত। সে চাইতে আসুক বা না আসুক। কিন্তু তার অবস্থা জানার পর সে স্বয়ং তাকে সাহায্য করে।-গ্রন্থকার।

৩. নযরের অর্থ এই যে, এমন নেক কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করার জন্যে মানুষ স্বয়ং শপথ করেছে- গ্রন্থকার।

অথবা (কোন পাপ কাজ দ্বারা) নিজেদের উপর জুলুম করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত আর কে গোনাহ মাফ করতে পারে। তারা জ্ঞাতসারে নিজেদের কৃতকর্মের উপরে জিদ ধরে থাকে না।
(আলে ইমরান ঃ ১৩৩ঃ ১৩৫)

চারিত্রিক মহত্ত্বের শিক্ষা

এসব বিস্তারিত নৈতিক হেদায়েত এমন যে কোন সংস্কারমনা মানুষ, যার মধ্যে কিছু নৈতিক অনুভূতি ও ভালো মন্দের জ্ঞান বিদ্যমান প্রভাবিত না হয়েই পারে না। কুরআন শুধু এতোটুকু যথেষ্ট মনে করেনি। বরঞ্চ নৈতিক মহত্ত্বের এক একটিকে সুস্পষ্ট করে বলে যে ইসলাম মানুষকে কোন্ কোন্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করতে চায় এবং রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কার্যতঃ দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ গুণাবলী শুধু মুখে বলার জিনিস নয় বরঞ্চ ইসলাম যে জীবনেই প্রবেশ করার পথ পেয়েছে তাকে এ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করেছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ দান সম্ভব নয় বিধায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করছি।

-নেক কাজ এবং তাকওয়া পরহেজগারীর সাথে সহযোগিতা কর। আর পাপ কাজ ও বাড়াবাড়িতে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহতায়ালা শাস্তিদানকারী। (মায়েদাহ ঃ ২)

-(হযরত মূসা আলাইহিস সালাম) বল্লেন, হে খোদা! তুমি যে অনুগ্রহ আমার প্রতি করেছ তারপর আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। (কাসাস ঃ ১৭)

-মন্দের প্রতিশোধ এমন মংগল দ্বারা কর যা সর্বোৎকৃষ্ট। তারা তোমার বিরুদ্ধে যেসব রচনা করছে তা আমাদের ভালোভাবে জানা আছে। তুমি দোয়া কর, হে আমার খোদা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং সে আমার নিকটে আসুক তার থেকেও তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। * (মুমেনুন ঃ ৯৬-৯৮)

-তারা মন্দকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করে এবং যে রিযিক আমরা দিয়েছি তার থেকে খরচ করে। যখন কোন বেহুদা কথা তারা শুনে তখন তার জবাব দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং বলে, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের জন্যে আর তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের জন্যে। তোমাদেরকে সালাম। আমরা জাহেলদের মতো পন্থা অবলম্বন করতে চাই না।
(কাসাস ঃ ৫৪-৫৫)

- সে আখেরাতের ঘর (জান্নাত) আমরা ঐসব লোকের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেব যারা যমীনে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব চায় না এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতেও চায় না। (কাসাস ঃ ৮৩)

-(ঈমানদার তারা) যাদেরকে দুনিয়ায় রাষ্ট্রশক্তি দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে। সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (হজ্ব ঃ ৪১)

-(আল্লাহর নূরের দিকে হেদায়েতপ্রাপ্ত) লোক সেসব ঘরে পাওয়া যায় যেগুলোকে উন্নত করার এবং যার মধ্যে আল্লাহ তাঁর নাম ইয়াদ করার অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে এসব লোক সকাল সন্ধ্যা তাঁর তসবিহ করে যাদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য ও কেনাবেচা

---

* অর্থাৎ খোদার কাছে আশ্রয় চাও যেন শয়তান কখনো তোমাকে গালির জবাব গালিতে, মিথ্যার জবাব মিথ্যার দ্বারা, জুলুমের জবাব জুলুম দ্বারা, বেইনসাফি ও হক নষ্ট করার জবাব বেইনসাফি ও হক নষ্ট করে দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে না পারে -গ্রন্থকার।

আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে, যাকাত দেয়া থেকে গাফেল করে রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে যেদিন দিল উল্টে যাওয়া এবং চক্ষুর পাথর হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা দেবে। (নূর ঃ ৩৬ ঃ ৩৭)

-হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের মাল ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ইয়াদ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মুনাফেকুন ঃ ৯)

-হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! ইনসাফের পতাকাবাহী এবং খোদার জন্যে সাক্ষী হয়ে যাও। তোমাদের ইনসাফ ও তোমাদের সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর, তোমাদের পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয় স্বজনদের উপরই পড়ুকনা কেন।

এ সম্পর্কিত ব্যক্তি ধনী হোক অথবা গরীব, আল্লাহ তোমাদের অপেক্ষা তাদের অধিকতর শুভাকাংখী। অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের প্রতি ইনসাফ করা থেকে বিরত থেকো না। আর তোমরা যদি তাদের মন রাখার জন্যে কথা বল অথবা সত্যবাদিতা থেকে সরে থাক, তাহলে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কিছুই করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (নিসা ঃ ১৩৫)

-হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর জন্যে সত্যের উপর কায়েম থাকো এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও এবং কোন দলের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এতোটা উত্তেজিত না করে যাতে ইনসাফ করতে না পার। ইনসাফ কর কারণ এ হচ্ছে তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (মায়েদাহ ঃ ৮)

-যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং সীমালংঘন করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (বাকারাহ ঃ ১৯৪)

-যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করলে, তার উপরেও ততোটুকু বাড়াবাড়ি কর যতোটুকু সে করেছে এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ যে, মন্দ কাজ থেকে যারা সরে থাকে আল্লাহ তাদের সাথে আছেন। (বাকারাহ ঃ ১৯৪)

-যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে সেই পরিমাণে নাও যে পরিমাণে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি সবর কর, তাহলে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। (নহলঃ ১২৬)

-তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে বড়ো দুঃখজনক কথা শুনতে পাবে। এমন (উত্তেজনাকর) কথায় তোমরা যদি সবর কর এবং খোদাভীতির উপর কায়েম থাক তাহলে এ হবে বড়ো সাহসিকতার কাজ। (আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

-আল্লাহ পছন্দ করেন না যে মানুষ মন্দ কথা বলুক। অবশ্যি যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার ব্যাপার আলাদা।[১] (নিসা ঃ ১৪৮)

-আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করছেন যে, তোমরা আমানত আমানতদারকে সুপর্দ করবে।[২] আর মানুষের মধ্যে কোন ফয়সালা করবে, ত ইনসাফের সাথে করবে। (নিসা ঃ ৫৮)

---

১. অর্থাৎ জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের আওয়াজ তোলার অধিকার আছে -গ্রন্থকার।

২. খোদার এ ইরশাদে মুসলিম সমাজের নাগরিকদের এ হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আমানত

-উপদেশ ত বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে থাকে (তাদের আচরণ এ হয় যে) আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি ভংগ করে না। যেসব সম্পর্ক সম্বন্ধ আল্লাহ স্থাপন করার হুকুম দিয়েছেন তা স্থাপন করে। নিজেদের রবকে ভয় করে এবং ভয় করে কি জানি তার কঠোরভাবে হিসাব নেয়া হয় নাকি। যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, নামায কায়েম করে, যা কিছু রিযিক তাদের আমরা দিয়েছি তার থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং মন্দ কাজকে ভালো কাজের দ্বারা প্রতিরোধ করে। (রাদ ঃ ১৯-২২)

-তোমরা নেক কাজের মর্যাদা লাভ করতে পার না যতোক্ষণ না সেসব বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ যা তোমাদের প্রিয়। আর তোমরা যা কিছুই খরচ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। (আলে ইমরান ঃ ৯২)

-হে ঈমানদারগণ! যে ধন তোমরা অর্জন করেছে এবং যা কিছু আমরা যমীন থেকে তোমাদের জন্যে বের করেছি, তার মধ্য থেকে উৎকৃষ্ট অংশ খোদার পথে ব্যয় কর এবং বেছে বেছে অতি মন্দ জিনিস দিও না। কারণ এসব জিনিস তোমরা স্বয়ং কখনো গ্রহণ করবে না। তা গ্রহণ করার ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করবে। আল্লাহ তোমাদের এমন খরচের মুখাপেক্ষী নন। তিনি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত। (বাকারাহ ঃ ২৬৭)

-যদি প্রকাশ্যে দান কর, তাহলে এ ভালো কাজ। আর তা যদি গোপন রাখ এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ কর তাহলে এ তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্টতর। এসব কাজের জন্যে তোমাদের অনেক পাপ মিটে যায় এবং তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (বাকারাহ ঃ ২৭১)

-ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর্থিক কষ্টে থাকলে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি সদকা করে দাও (অর্থাৎ কর্জ মাফ করে দাও) তাহলে এ তোমার জন্যে বেশী ভালো যদি তুমি বুঝে থাক। (বাকারাহ ঃ ২৮০)

-জাহান্নামের আগুন থেকে) সেই অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে যে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে নিজের সম্পদ দান করে। তার উপর কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার বদলা তাকে দিতে হতে পারে। সেতো মহান ও শ্রেষ্ঠ খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এ কাজ করে থাকে। (লাইল ঃ ১৭-২০)

-তোমাদেরকে যে ধন দিয়েছি তার থেকে খরচ কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে,এবং সে বলে, হায়রে আমার রব যদি আমাকে একটু অবকাশ দিতেন তাহলে আমি দান করতাম এবং সৎ লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (মুনাফেকুন ঃ ১০)

-এতিমের মাল তাদেরকে দিয়ে দাও। ভালো মাল মন্দ মালের দ্বারা বদল করো না। আর তাদের মাল নিজের মালের সাথে মিশিয়ে খেয়ে ফেলো না। এ বড় গোনাহের কাজ। (নিসা ঃ ২)

খেয়ানত না করে। বরঞ্চ যে আমানতই তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে, তা যেন ভালোভাবে পরিশোধ করে। সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজ ও তার কর্ণধারদেরকে এ হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, দায়িত্বের পদমর্যাদা (Positions of Trust) এমন লোকের উপর অর্পণ করতে হবে যারা এ দায়িত্বের বোঝা বহন করতে সক্ষম। ধর্মীয় নেতৃত্ব, জাতীয় নেতৃত্ব এবং দেশ পরিচালনার পদমর্যাদা অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, সংকীর্ণমনা এবং চরিত্রহীন লোককে দিওনা। কারণ অসৎ লোকের নেতৃত্ব গোটা সমাজকে বিনষ্ট করে দেয়-গ্রন্থকার।

-হে নবী, মুমিন পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং (নগ্নতা ও ব্যাভিচার থেকে) লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখে।...মুমেন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে। আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে শুধু ঐ সৌন্দর্য ব্যতীত যা আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাদের বুকের উপর যেন ওড়নার আঁচল ফেলে দেয় এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এ সকল লোক ব্যতীত যথা, স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, প্রভৃতি যা সূরা নূরে বলা হয়েছে। আর তারা যেন পথ চলার সময় এমন পদধ্বনি না করে যাতে তাদের অপ্রকাশিত সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। (নূর ঃ ৩০-৩১)

-যদি তোমরা খোদাকে ভয় কর তাহলে মিষ্টিমধুর স্বরে কথা বলোনা যাতে দুষ্ট প্রকৃতির কোন ব্যক্তি লালসা করতে পারে। বরঞ্চ পরিষ্কার সোজা সোজা কথা বল। নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং পুরাতন জাহেলী যুগের মতো সাজ সজ্জা ও বেশভূষা করে বেড়ায়ো না।

(আহযাব ঃ ৩২-৩৩)

-হে লোকেরা ! ওসব পাক জিনিস হারাম করো না যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন। আর সীমালংঘন করোনা, সীমালংঘনকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে পাক এবং হালাল জিনিস দিয়েছেন তা খাও। আর যে খোদার উপর তোমরা ঈমান এনেছ তাঁর নাফরমানি থেকে দূরে থাক। (মায়েদা ঃ ৮৭-৮৮)

-মুমেন পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু। ভালো কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। (তওবা ঃ ৭১)

-যারা ইজ্জত সম্মান চায় (তাদের জেনে রাখা উচিত যে) সমস্ত ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্। যে জিনিস উর্ধে উত্থিত হয় তা পবিত্র কথা। আর আমলে সালেহ্ (সৎ কাজ) তাকে উপরে উঠিয়ে দেয়। (ফাতের ঃ ১০)

-এবং আমরা তোমাদেরকে সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থার সম্মুখীন করে তোমাদের পরীক্ষা করছি।[১] (আম্বিয়া ঃ ৩৫)

সৎ ব্যক্তিবর্গই শুধু নয়, সৎ সমাজও বাঞ্ছিত

উপরোক্ত চারিত্রিক মহত্ত্বের সাথে কুরআনে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইসলামের উদ্দেশ্য শুধু সৎ লোক তৈরী করাই নয়, বরঞ্চ তাদেরকে একত্র করে একটি সৎ সমাজ গঠন করাও। কারণ এছাড়া মানব জাতির ক্ষতি থেকে বাঁচা এবং সমৃদ্ধি লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ বিষয়টি যদিও বহুস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আমরা মাত্র দুটি স্থান দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করছি।

---

১ অর্থাৎ এ বিষয়ে পরীক্ষা করি যে, সচ্ছল অবস্থায় তোমরা অহংকারী, জালেম, খোদা বিস্মরণকারী ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে যাও না ত এবং অসচ্ছল বা মন্দ অবস্থায় ইতর, হেয় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন কর নাতো। এ একজন সংকীর্ণমনা লোকের কাজ যে, ভালো অবস্থায় সে ফেরাউন হয়ে যাবে এবং দুরবস্থায় মাটিতে নাক ঘষতে থাকবে এবং অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থা অবলম্বন করবে। মুমেনের কাজ হচ্ছে সকল অবস্থায় সত্যনিষ্ঠার উপর অবিচল থাকা-গ্রন্থকার।

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّه عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وهَدَيْنهُ النَّجْدَيْنِ فَلاَ اَقْتَحَم الْعَقَبةَ وَمَا اَدْرك اَدْرك مَا الْعقَبةُ - فَكُّ رَقَبةٍ اَوْ اِطْعمُ فِىْ يوْمٍ ذِىْ مسْغَبة يتِيْمًا ذَا مَقْربةٍ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا متْربةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امنُوْا و تَوصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصوْا بِالْمرْحمَةِ - (البلد ٨ تا١٧)

-আমরা কি মানুষকে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা ও দুটি ওষ্ঠ দান করিনি? এবং (ভালো ও মন্দের) দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখায়নি? কি সে দুর্গম ঘাঁটি অতিক্রম করার সাহস করেনি এবং তুমি কি জান যে সে দুর্গম ঘাঁটি কি? কারো গলা গোলামীর শিকল থেকে মুক্ত করা, কিংবা অনাহারের দিনে কোন নিকটবর্তী এতিম ও ধূলোমলিন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। অতঃপর সেই সাথে সে লোকদের সাথে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে। যারা পরস্পরকে সবর করার ও দয়া প্রদর্শনের নসিহত করে। (বালাদ-৮-১৭)

সৎ সমাজের বৈশিষ্ট্য

এসবের মধ্যে গোলাম আযাদ করে দেয়া, অথবা নিকটবর্তী এতিম ও ধূলোমলিন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো, ব্যক্তিগত নেকীর কাজ যা অগণিত ব্যক্তিগত নেকীর অন্তর্ভুক্ত দুই একটিকে নমুনা হিসাবে পেশ করা হয়েছে যা ব্যক্তির মধ্যে হওয়া উচিত।

কিন্তু সেই সাথে এও প্রয়োজন বলে গণ্য করা হয়েছে যে, এ ধরনের সৎ ব্যক্তিবর্গ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে না। বরঞ্চ এ সব লোকের সাথে মিলিত হয়ে জামায়াতবদ্ধ হয়ে যারা ঈমান আনয়নকারী এবং পরস্পর পরস্পরকে সবর করায় খোদার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নসিহতকারী যাতে করে তাদের দ্বারা একটি ধৈর্যশীল ও দয়াবান সমাজ অস্তিত্বলাভ করতে পারে। এমন একটি সমাজ যা পবিত্র নৈতিকতার উপর অবিচল থাকবে। পাপ কাজ ও পাপের প্ররোচনা থেকে নিজেদের দূরে রাখবে, সত্য পথে চলার কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করবে। সত্য পথে দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে এবং খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচারী ও পাষান হৃদয় হবে না, বরঞ্চ দয়াশীল ও স্নেহশীল হবে এ ধরনের সমাজ খোদা ও আখেরাতের উপর ঈমান এবং তাঁর আনীত আইনের উপর অদম্য বিশ্বাস ও আস্থা ব্যতিরেকে গঠন করা যেতে পারে না। এ কারণে অবশ্যম্ভাবীরূপে এ গুণাবলী একটি মুসলিম সমাজেই এখন মজবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম হতে পারে যা দুনিয়ার জীবনে সংঘটিত কোন পরীক্ষায়ও আপন গুণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না।

وَالْعصْرِ اِنَّ الاِنْسانَ لَفِى خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ امنُوْا و عملُوا الصّلِحتِ و تَوَاصوْا بِالْحقِّ وَ تَو اصوْ بِالصَّبْرِ - (العصر)

কালের কসম। মানুষ প্রকৃতপক্ষে বড়ো ক্ষতির মধ্যে। ঐসব ব্যতীত যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করতে থাকে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ এবং সবরের নসিহত করতে থাকে।

এখানে কাল অর্থ অতীত কাল বা ইতিহাসও হতে পারে। অথবা অতিক্রমকারী কালও হতে পারে-যা প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। তার কসম খাওয়া অর্থ এই যে, সে এ বাস্তবতার সাক্ষী যা সামনে বলা হচ্ছে।

এখানে মানুষ শব্দটি তার পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্য এর অর্থ এক একজন মানুষও হতে পারে। মানব সমষ্টিও হতে পারে এবং গোটা মানবজাতিও হতে পারে।

খুসর শব্দের অর্থ ক্ষতি-লোকসান এবং ব্যর্থতা হতে পারে-যা সমৃদ্ধি, মুনাফা ও সাফল্যের বিপরীত।

সে চারটি গুণ যার উপর মানব জাতির সাফল্য সমৃদ্ধি নির্ভরশীল

এ কয়টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে কসম খেয়ে নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলা হয়েছে যে, যে ইতিহাস অতিক্রান্ত হয়েছে এবং যে অবস্থা এখন চলছে, উভয়ই এ কথার সাক্ষী যে, মানুষ ব্যক্তি হিসাবে, জাতি হিসাবে এবং প্রজাতি হিসাবে সমৃদ্ধি নয় বরঞ্চ ক্ষতির মধ্যেই নিমজ্জিত আছে। এ ক্ষতি থেকে শুধু তারাই নিরাপদ রয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নের চারটি গুণ পাওয়া যায়।

ঈমান

অর্থাৎ এ কথার উপর দৃঢ় প্রত্যয় যে, শুধুমাত্র আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীকই স্রষ্টা, মালিক, রেযকদাতা, অভাব পূরণ কারী, মাবুদ ও শাসক যার বন্দেগী, আনুগত্য ও স্তব-স্তুতি করা উচিত। আর আল্লাহর রসূল কর্তৃক আনীত হেদায়েতই সত্য যা মেনে চলা উচিত। আর জীবন বলতে শুধু এ দুনিয়ার সাময়িক জীবন নয় বরঞ্চ তারপর এক চিরন্তন জীবনও শুরু হবে যেখানে আমাদেরকে এ দুনিয়ার কৃত সকল কর্মকান্ডের হিসাব নিতে হবে। তারপর তার পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ঈমান সাফল্য ও সমৃদ্ধি লাভের প্রথম শর্ত। কারণ এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন বস্তু এমন নেই যা সীরাত, আখলাক ও আচার-আচরণের জন্য একটি মজবুত বুনিয়াদ গড়তে পারে। যার উপর এক পূণ্য পূত জীবনের প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে।

এ ব্যতিরেকে মানবজীবন দৃশ্যতঃ যতোই সুন্দর দেখাক না কেন, তার অবস্থা হয় একটি নোঙ্গরবিহীন জাহাজের মত যা স্বার্থ, অভিলাষ ও কল্পনা বিলাসের তরঙ্গের সাথে বয়ে যায়। কোথাও তটস্থ হয় না।

সৎ কাজ

ঈমানের সাথে এ গুণের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের ন্যায়। ঈমান এমন এক বীজ যার অভাবে নেক আমলের বৃক্ষ পয়দা হতে পারে না। তা কিছু লোকের জীবনে ঈমান ব্যতিরেকে কিছু প্রকাশ্য ও অস্থায়ী গুণ ও নেকী পাওয়া যাক না কেন। আর বৃক্ষ সে সব নেক আমল যা সেই মানুষের জীবনে অংকুরিত ও বিকশিত হওয়া বিবেক ও যৌক্তিকতার দাবী-যার জীবনে ঈমানের বীজ বপন করা হয়েছে। কোথাও এ বীজ বপন করা হয়েছে, কিন্তু নেক আমলের বৃক্ষ পয়দা হলো না, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মানুষের দিল এ

বীজের কবরে পরিণত হয়েছে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার আর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ ঈমানের সাথে নেক আমল হচ্ছে ক্ষতি থেকে বাঁচার দ্বিতীয় শর্ত।

উপরোক্ত দুটি গুণ ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। এবং তা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের নিশ্চয়তাদানকারী হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক সাফল্য এ ছাড়া সম্ভব নয় যে, এমন সব গুণ নিয়ে এক সমাজ গঠিত হবে এবং তার মধ্যেও ঐ অতিরিক্ত দুটি গুণ পাওয়া যাবে যাকে এ সূরাতে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য শর্ত বলা হয়েছে।

একে অপরের প্রতি হকের নসিহত

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। এ সাধারণত ঃ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক সঠিক, সত্য, সুবিচারপূর্ণ এবং বাস্তবতার সাথে সংগতিশীল বিষয় তা ঈমান আকীদাহ ও ধারণা সম্বন্ধে হোক অথবা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে। এমন হক যা সম্পাদন করা মানুষের উপর ওয়াজেব। তা সে খোদার হক হোক, মানুষের অথবা নিজের হোক না কেন। অতএব হকের নসিহত করার অর্থ এই যে, সৎ ঈমানদারদের সমাজ এমন অনুভূতিহীন হবে না যে বাতিল মস্তক উত্তোলন করে মানুষের হক(অধিকার) বিনষ্ট করছে এবং মানুষ নীরবে তামাশা দেখছে। বরঞ্চ তার সামগ্রিক বিবেক এমন জীবন্ত হবে এবং তার ব্যক্তিবর্গ এটাকে তাদের দায়িত্ব মনে করবে যে যেখানেই বাতিল তার মস্তক উত্তোলন করবে অথবা যেখানেই হক বিনষ্ট হতে দেখা যাবে, সেখানেই বাতিলের বিরোধিতা এবং হকের সমর্থনে লোক ময়দানে নেমে পড়বে। কোন ব্যক্তি শুধু নিজে হকপন্থী, সত্য নিষ্ঠ ও সুবিচারকারী হওয়া এবং হকদারদের হক আদায় করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করবে না। বরঞ্চ অপরকেও এ ধরনের কাজের নসিহত করবে। এটাই সেই বস্তু যা সমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করার গ্যারান্টি বা জামিনদার হয়। যদি কোন সমাজে এ মহৎ গুণাবলী পাওয়া না যায়, তাহলে তা ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে না। বরঞ্চ সামগ্রিক বিশৃংখলা বাড়তে থাকলে, ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকাও কঠিন হয়ে যায়।

একে অপরকে সবরের উপদেশ

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিরোধ ও বাধা অথবা নিবৃত্ত করা ও বিরত থাকা। আরবী ভাষায় এ শব্দে সহনশীলতা ধৈর্য, নিয়ন্ত্রণ অবিচলতা, ইচ্ছার দৃঢ়তা, সাহসিকতার সাথে কোন প্রতিবন্ধক শক্তির মুকাবিলায় দৃঢ়তার সাথে আত্মনিয়োগ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুরআন মজিদে এ শব্দকে এমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে মুমেনের সমগ্র জীবন সবরের জীবনে পরিণত হয়।

সবরের কুরআন সম্মত অর্থ

কুরআনে এক শতেরও অধিকস্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব স্থানের উপর চিন্তাভাবনা করলে জানতে পারা যায় যে, নিম্নলিখিত অর্থসমূহে তা ব্যবহৃত হয়েছে।

নিজের ভাবাবেগ, প্রবণতা, অভিলাষ ও ঝোঁক প্রবণতাকে আল্লাহতায়ালার সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাখা।

খোদার নাফরমানি দ্বারা যতোই লাভ ও ভোগ বিলাসের সুযোগ আসুক না কেন, তার লোভে পথভ্রষ্ট না হওয়া এবং খোদার আনুগত্য করার কারণে যে সব ক্ষতি, দুঃখ কষ্ট ও বঞ্চনার শিকার হতে হয় তা হাসিমুখে বরণ করা।

সারাজীবন প্রবৃত্তিকে বশীভূত রেখে গোনাহের প্রতি শয়তানের একটি প্ররোচনাও

প্রবৃত্তির অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। প্রতিটি প্রলোভন ও ভয়ের মুকাবেলায় হক পুরস্তির উপর কায়েম থাকা। দুনিয়ার বুকে সততা অবলম্বনের ফলে যেসব ক্ষতি ও দুঃখকষ্ট আসবে তা বরদাশত করা। অবৈধ পন্থা অবলম্বনে যে সব সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যেতে পারে তা প্রত্যাখ্যান করা।

হারামখোরদের জাঁকজমক দেখে হিংসা ও অভিলাষের ভাবাবেগে অধীর হওয়া ত দূরের কথা, তার প্রতি দৃষ্টিপাত ও না করা এবং ঠান্ডা মাথায় এ কথা উপলদ্ধি করা যে, ঐ চাকচিক্যময় নোংরামি ও পংকিলতা থেকে চাকচিক্যহীন পবিত্রতাই উৎকৃষ্ট যা আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাকে দান করেছেন।

ঈমান আসার সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করা। হকের দুশমনদের জুলুম অত্যাচার বীরত্ব সহকারে বরদাশত করা। বিরোধিতার তুফান এবং বিপদ মুসিবতের আগ্রাসনে হকের সমর্থনে অবিচল থাকা। বাতিলের কাছে নতি স্বীকার করা এবং তার সাথে আপোসকামিতার ধারণা মনে স্থান না দেয়া।

বিরোধীদের বাড়াবাড়ি, ঠাট্টাবিদ্রুপ ও অপপ্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তেজিত না হওয়া, বরঞ্চ নীরবে ভাবাবেগমুক্ত হয়ে হিকমতের সাথে তবলিগ ও সংস্কার কাজ করে যাওয়া, তা ফলপ্রসূ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দূর ভবিষ্যতে দেখা না গেলেও।

চরম উস্কানিমূলক আচরণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তড়িঘড়ি এমন কোন ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যা দাওয়াতে হকের উপযোগী কৌশলের পরিপন্থী এবং দাওয়াতের উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর।

বছরের পর বছর ধরে, বাতিলপন্থীদের মুকাবেলায় সংগ্রাম করতে থাকা যারা নীতিনৈতিকতার সকল সীমা লংঘন করে চলে এবং শক্তি ও ক্ষমতার নেশায় বুদ হয়ে থাকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেও সততা পরিহার করে তাদের মতো অন্যায় কৌশল অবলম্বন না করা।

বাতিলের মুকাবেলায় হকের দুর্বলতা ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামকারীদের ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং বাতিল নেতৃবৃন্দের সাফল্য দেখে হতাশ ও মনমরা না হওয়া। কখনো হতভম্বতা, নিরুৎসাহিতা এবং মনোবলহীনতার শিকার হয়ে এটা মনে না করা যে, হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অর্থহীন এবং এখন এটাই ঠিক যে ঐ সামান্য দ্বীনদারীতে সন্তুষ্ট থেকে বসে পড়া যা কুফরী ও ফাসেকী শাসন ব্যবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে। চরম দুরবস্থার মধ্যেও সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে হক সমুন্নত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

একজন মুমেন সবরকারী এসব কিছু এজন্য করে না যে, তার সুফল সে এ দুনিয়াতেই লাভ করবে। বরঞ্চ এ বিশ্বাসে করে যে মরণের পর যে দ্বিতীয় জীবন শুরু হবে সেখানে সে এর সুফল লাভ করবে।

সে এতোটা ছেবলাও হয়ে পড়ে না যে, যদি সুদিন আসে এবং দুনিয়াতে সে সাফল্য লাভ করে, তখন গর্ব অহংকারে ফেরাউন হয়ে পড়ে না। আর যখন দুঃসময় আসে, তখন বিলাপ করতে থাকে এবং দুঃসময় কাটাবার জন্য কোন হীনতম পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

সে সর্বাবস্থায় নিজের ভারসাম্য বজায় রাখে। সময়ের পরিবর্তনে সে তার রং পরিবর্তন করে না। বরঞ্চ হর হামেশা এক ন্যায় সংগত ও সঠিক আচরণের উপর কায়েম থাকে। অবস্থা অনুকুল হলে এবং ধন দৌলত ও সম্মান সুখ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করলেও নিজের

শ্রেষ্ঠত্বের নেশায় মত্ত হয় না। কোন সময়ে বিপদ-মুসিবত ও দুঃখকষ্টের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলে তার কারণে মানবীয় গুণ বিনষ্ট হতে দেয় না। খোদার পক্ষ থেকে পরীক্ষা কোন দানের আকারে অথবা বিপদের আকারে আসুক, তার সহনশীলতা অক্ষুন্ন থাকে।

সূরা 'আসর' এর উদ্দেশ্য এই যে মানুষ ক্ষতি থেকে শুধুমাত্র সে অবস্থায় বাঁচতে পারে যখন মানুষ ব্যক্তিগতভাবেও মুমেন, সৎ, হকপন্থী ও সবরকারী হবে এবং তাদের দ্বারা এমন এক সমাজ অস্তিত্ব লাভ করবে যেখানে প্রত্যেকে অপরকে হক ও সবরের উপদেশ দেবে।

নৈতিক শিক্ষার এ হাতিয়ার এমন এক শক্তিশালী হাতিয়ার ছিল যার কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা কুরাইশ মুশরিকদের এবং আরবের কাফেরদের ছিল না। নবী (সা) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যত প্রকারের অভিযোগ আরোপ করুকনা কেন, কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতো না যে, এমন উচ্চ মানের নৈতিক শিক্ষা কোন স্বার্থপর, পাগল অথবা কোন যাদুকর দিতে পারে।(১৪৭)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

বিশ্বজনীন উম্মতে মুসলিমার প্রতিষ্ঠা

দাওয়াতে ইসলামীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা এ ছিল যে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ প্রকৃতপক্ষে এক এবং মানুষ হিসাবে সকলে সমান। তাদের মধ্যে আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট প্রকৃতি জাতি, বংশ, গোত্র, ভাষা, আবাসভূমির যে পার্থক্য রয়েছে তা নিছক পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যাতে তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। এ পার্থক্য এ জন্য যে, তাদের মধ্যে মতবিরোধ-মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে, শত্রুতা সৃষ্টি হয়, এক দল অন্য দলকে হেয়-তুচ্ছ ও নীচ মনে করে এবং নিজেকে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মনে করে, এক দল অন্য দলকে দলিত-মথিত করতে, লুণ্ঠন করতে ও নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হবে। এ বুনিয়াদী মানবীয় সাম্যের পরিধির মধ্যে যদি কোন বস্তু লোকের মধ্যে বৈধ ও ন্যায়সংগত উপায়ে বিক্ষোভের কারণ হয় তাহলে তা হচ্ছে অধিক আকীদাহ ও চিন্তা-যার ভিত্তিতে একত্রে সম্মিলিত হয়ে একটি উম্মত হয়েছে এবং এ উম্মতের মধ্যে নায্যতঃ কোনো বস্তু যদি শ্রেষ্ঠত্বও মহত্বের কারণ হতে পারে, তা হলো তাকওয়া। অর্থাৎ খোদাকে ভয় করা, তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা এবং আখেরাতের জবাবদিহি স্মরণ করে ভ্রান্ত পথে চলা থেকে বিরত থাকা।

এ তত্ত্ব বা মতবাদের উপর ইসলাম দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শুধু একটি পার্থক্য বাকী রেখেছে এবং তা হচ্ছে ঈমান ও কুফরের পার্থক্য। যে লোকই, তা সে যে কোন দেশ, জাতি, গোত্র, বর্ণ ও বংশের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, এবং কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, আল্লাহর তৌহিদকে এমনভাবে মেনে নেয় যেভাবে মুহাম্মদ (সা) তা পেশ করেছেন, মুহাম্মদকে (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্য শেষ রসূল, কুরআনকে আল্লাহর শেষ কিতাব বলে মেনে নেয়, এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে, সে মুমেন এবং মুমেনদের ভাই, মুমেনদের জামায়াতের একজন সদস্য, উম্মতে মুসলিমার এক ব্যক্তি এবং মুসলিম সমাজে তার যাবতীয় অধিকার সকল দিক দিয়ে সমান। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবেন না সে কাফের। একজন মুমেনের বাপ, মা, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী অথবা স্বামী-যেই হোক না কোন। একই গোত্র, একই আবাসভূমি অথবা একই বর্ণ হওয়া ত পরবর্তী মর্যাদা দান করে। মুমেন তার সাথে ত মানবীয় সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সকলদিক দিয়ে তার সমাজ মুসলিম সমাজ থেকে পৃথক হবে। সে দুনিয়ার কাজকর্মে ত তার সাথে সে সব সম্পর্ক সম্বন্ধ রাখতে পারে যা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে সে তার সাথে বন্ধুত্ব ভালোবাসা রাখতে পারে না, তার সাথে মিলে এক জামায়াত ও এক সমাজ বানাতে পারে না। এমন কি তার পিতাও যদি কাফের থেকে থাকে, তাহলে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়াও করতে পারে না। দ্বীনকে কেন্দ্র করে যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এবং পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। দেশ ও জাতি যদি দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে সে ঘরবাড়ি জাতি ও দেশ সবকিছু পরিত্যাগ করে হিজরত করবে কিন্তু দ্বীনকে দেশ ও জাতির জন্য কুরবানী করবে না।

এ উম্মতের নাম হর-হামেশা উম্মতে মুসলিমা ছিল। প্রত্যেক নবীর উম্মত মুসলিম ছিল এবং নাম তাদেরও রাখা হয়েছে যারা মুহাম্মদ (সা) এর উপর ঈমান এনেছে। এর দ্বার পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তা সে যে কোন দেশের হোক না কেন, পূর্বের হোক অথবা পশ্চিমের হোক, উত্তরের হোক বা দক্ষিণের হোক। কোন জাতির জন্য এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যা অন্য জাতির ছিল। এর ভিত হঠাৎ কোন জন্মগ্রহণের উপর ছিল না, বরঞ্চ ছিল জেনে বুঝে ঈমান আনার উপর। আর এ ঈমানের যারা দুনিয়ার মানুষ শরীক হতে পারতো, তারা সমান অধিকারসহ এ উম্মতে শরীক হতে পারতো।

অতঃপর শুধু মেনে নিয়ে বসে পড়ার উম্মত এ ছিলনা। বরঞ্চ ছিল একটি দায়ী (আহ্বানকারী) ও মুবাল্লিগ উম্মত। তার প্রতিটি লোক ছিল একটি আন্দোলনের কর্মী। তার সবচেয়ে প্রিয় উদ্দেশ্য ছিল যে সত্য, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মাধ্যমে তার কাছে পৌছেছে তা অপরের কাছে পৌছিয়ে দেয়া। দুনিয়ায় গোমরাহি থেকে এবং আখেরাতে আল্লাহর আযাব থেকে যতো লোককে বাঁচানো যায় বাঁচাবার চেষ্টা করা।

এ ছিল এমন এক বিষয় যার জন্য শুধু কুরাইশ নয়, আরবের সকল গোত্র বিচলিত হয়ে পড়ে। হাজার হাজার বছর যাবত তাদের গোটা সামাজিক ব্যবস্থা গোত্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোত্র এমন বস্তু ছিল যার সাথে সম্পৃক্ত হয়েই তাদের সমাজ কায়েম ছিল। এটাই ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক। রক্তের সম্পর্কই তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধ ও সাহায্য-সহযোগিতার বুনিয়াদ। এর উপরেই তাদের আভিজাত্য ও মান-সম্ভ্রম নির্ভর করতো। প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্রের উপর এর ভিত্তিতে গৌরব প্রদর্শন করতো যে, তাদের পূর্ব পুরুষ অমুক অমুক বিষয়ে অবদান রেখেছে। এখন যে তারা দেখলো যে, তাদের মধ্যে এমন এক দাওয়াতের অভ্যুত্থান হচ্ছে যা গোত্রবাদের মূলোৎপাটন করছে, যা প্রত্যেক দল ও গোত্রের মধ্য থেকে লোক বের করে তাদেরকে নিয়ে পৃথক নামে এক স্থায়ী জামায়াত বানানো হচ্ছে-যারা না কোন কওম বুঝে, না গোত্র বরঞ্চ একটি আকীদাহ-বিশ্বাসের উপর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বুনিয়াদ রচনা করছে যারা গর্ব-আভিজাত্যের সকল প্রাচীন ধারণার অবসান ঘটিয়ে কুলীন-অকুলীন সকলকে সমান করে দিচ্ছে এবং কুফর ও ঈমানের পার্থক্যকে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার বুনিয়াদ গণ্য করে পুত্রকে পিতা থেকে, ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে পৃথক করছে, তখন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। এ বিরাট সামাজিক বিপ্লব মেনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তারা সিদ্ধান্ত করলো যে, এ কালকে অংকুরেই বিনষ্ট করতে হবে, যেন তার থেকে কখনো ফুল এবং ফুল থেকে বাগ-বাগিচার সম্ভাবনা না থাকে। কিন্তু যাদের মনমস্তিষ্কে কিছু জ্ঞানবুদ্ধি ছিল এবং যাদের মনের উপর কুসংস্কার ও গোড়ামির তালা লাগানো ছিল না তারা অনুভব করলো যে, এইটাই সেই মহৌষধ যা গোত্রীয় শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ শেষ করে সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। অতপর আরব অতিক্রম করে সারা দুনিয়ার জাতিগুলোকে একই রশিতে বাঁধতে পারে।

দাওয়াতে ইসলামী এ অংশের যে সংক্ষিপ্তসার উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তার পূর্ণ গুরুত্ব তখন উপলব্ধি করা যাবে যখন কুরআন থেকে তার বিস্তারিত বিবরণ মানুষ জানতে পারবে।(১৪৮)

সকল মানুষ মৌলিক দিক দিয়ে এক এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড শুধু তাকওয়া

এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মর্মকথা যা কুরআন বর্ণনা করেছে তা ছিল এই যে, গোটা মানবজাতি এক মা ও বাপের সন্তান এবং এর ভিত্তিতে সকল মানুষ মৌলিক দিক দিয়ে এক।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً - (النساء ١)

-হে লোকেরা! ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া পয়দা করেছেন এবং এ উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারী (দুনিয়ার বুকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (নিসা ঃ ১)

তারপর দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ মর্ম কথা কুরআন পেশ করেছে তা ছিল এই যে, মানবীয় একত্বের মধ্যে কওম ও গোত্রের যে আধিক্য পয়দা করেছেন তা শুধু পরিচয়ের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে মহত্বের মানদন্ড বংশ, বর্ণ, ভাষা ও জন্মভূমি নয়, বরঞ্চ তাকওয়ার নৈতিক গুণ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - (الحجرات ١٣)

-হে লোকেরা! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি। তারপর তোমাদের জাতি ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান তারা, যারা তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেজগার অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারী।

এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে সেই বিরাট গোমরাহী চিহ্নিত করা হয়েছে যা দুনিয়াতে সর্বদা বিশ্বজনীন ফেৎনা-ফাসাদের কারণ হয়েছে। অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, জন্মভূমি এবং জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামি। প্রাচীনতমকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণতঃ মানুষকে উপেক্ষা করে নিজের চারধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিধি রচনা করতে থাকে যার মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদেরকে আপন এবং তার বাইরে জন্মগ্রহণকারীদেরকে পর গণ্য করেছে। এ পরিধি কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বুনিয়াদের উপর নয়। বরঞ্চ হঠাৎ জন্মগ্রহণের বুনিয়াদের উপর রচনা করা হয়েছে। কোথাও এর বুনিয়াদ একটি পরিবার, গোত্র অথবা বংশে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও এক ভৌগলিক অঞ্চলে অথবা এক বিশেষ বর্ণের অথবা এক বিশেষ ভাষাভাষি জাতের মধ্য জন্মগ্রহণ করা। অতঃপর এসব বুনিয়াদের ভিত্তিতে আপন ও পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে তা শুধু এতোটুকু পর্যন্ত সীমিত নয় যে, কাকে আপন গণ্য করা হয়েছে তার সাথে অপরের তুলনায় বেশী ভালোবাসার আচরণ ও তার সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। বরঞ্চ এ পার্থক্য ঘৃণা,

শত্রুতা, অবজ্ঞা, জুলুম নিষ্পেষণের নিকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছে। এর জন্য দর্শন রচনা করা হয়েছে। ধর্ম আবিষ্কার করা হয়েছে। রচনা করা হয়েছে, নৈতিক মূলনীতি তৈরী করা হয়েছে, জাতি ও রাষ্ট্রগুলোর একে তাদের স্থায়ী মতবাদ বানিয়ে শত শত বছর যাবত এ কার্যকর করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ইহুদীরা বনী ইসরাইলকে খোদার প্রিয় সৃষ্টি বরঞ্চ খোদার পুত্র বলে গণ্য করেছে এবং নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশাবলীতে পর্যন্ত যারা বনী ইসরাইল নয় তাদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাইলীদের থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পৌঁছে রেখেছে। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার জন্ম দিয়েছে এই পার্থক্য-যার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর মুকাবিলায় সকল মানুষকে নীচ ও অপবিত্র গণ্য করা হয়েছে। শূদ্রদেরকে ত একেবারে অপমান অবমাননার গর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার পার্থক্য আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর যে নিষ্পেষণ চলেছে তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তালাশ করার প্রয়োজন নেই। এ বিংশ শতাব্দীতেও প্রত্যেকে স্বচক্ষে তা দেখতে পারে। ইউরোপবাসী আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইন্ডিয়ানদের প্রতি যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় দুর্বল জাতিগুলোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে তাদের উপর যে আচরণ করেছে, তার অভ্যন্তরে এ ধারণাই সক্রিয় ছিল যে, আপন দেশ ও জাতির সীমানার বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জানমাল-ইজ্জত-আবরু তাদের জন্য হালাল। তাদের লুণ্ঠন করার ও তাদের গোলাম বানাবার অধিকার তাদের আছে। এমন কি প্রয়োজন হলে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকারও তাদের আছে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর জাতিপূজা একটি জাতিকে অন্যান্য জাতির জন্য যেভাবে হিংস্র পশু বানিয়ে রেখেছে তার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালের যুদ্ধগুলোতে দেখা গেছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানীর বংশবাদ দর্শন এবং নাৎসী বংশের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে হিংস্রতা প্রদর্শন করেছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তা কত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক গোমরাহী যার সংস্কার সংশোধনের জন্য কুরআন মজিদের এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।

এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

এক. তোমরা সকলে মূলে এক। একই পুরুষ ও একই নারী থেকে তোমাদের গোটা প্রজন্ম অস্তিত্ব লাভ করেছে। আজ তোমাদের যতো বংশই দুনিয়াতে বিদ্যমান তা প্রকৃতপক্ষে একই প্রাথমিক বংশের শাখা-প্রশাখা যা একই বাপ ও একই মা থেকে শুরু হয়েছিল। এ জন্ম ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সে পার্থক্য ও উচ্চ-নীচের কোন ভিত্তি বিদ্যমান নেই যে ভ্রান্ত ধারণায় তোমরা লিপ্ত আছ। একই খোদা তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন খোদা পয়দা করেছেন। একই জড় পদার্থ ও উপাদান থেকে তোমাদের জন্ম। এমনও নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র ও উৎকৃষ্ট পদার্থ থেকে জন্মলাভ করেছে এবং অন্য কিছু সংখ্যক অপবিত্র ও নিকৃষ্ট পদার্থ থেকে। যার থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী পৃথক পৃথকভাবে জন্মলাভ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ মূলের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সুস্পষ্ট যে, সারা দুনিয়ার সকল মানুষের একই পরিবার তা হতে পারে না। বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে অসংখ্য পরিবার অপরিহার্য ছিল তারপর পরিবারসমূহ থেকে গোত্র ও জাতির অস্তিত্ব লাভও ছিল স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করার পর বর্ণ, আকার আকৃতি, ভাষা এবং জীবন-যাপন পদ্ধতি

অবশ্যম্ভাবীরূপে পৃথক হওয়ারই কথা। আর একই অঞ্চলে বসবাসকারীদের পরস্পর নিকটতর হওয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের অধিক দূর হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পার্থক্য ও অনৈক্যের দাবী কখনো এ ছিল না যে, এর ভিত্তিতে উঁচু-নীচু কুলীন অকুলীন এবং হীনতর উচ্চতরের পার্থক্য কায়েম করা হবে। এক বংশ অন্য বংশের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করবে। এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোককে হেয় ও তুচ্ছ মনে করবে। এক জাতি অন্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য কায়েম করবে এবং মানবীয় অধিকারে এক দল অন্য দলের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে।

স্রষ্টা যে কারণে মানব দলগুলোকে জাতি ও গোত্রের আকারে সুবিন্যস্ত করেছিলেন তা ছিল শুধু এই যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি ও সাহায্য-সহযোগিতার স্বাভাবিক পন্থা এটাই ছিল। এ পন্থায় একটি পরিবার, একটি জ্ঞাতিগোষ্ঠী, একটি গোত্র ও একটি জাতির লোক মিলে একটি সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে পারতো এবং জীবনের কর্মকান্ডে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু এ নিছক শয়তানী অজ্ঞতা ছিল যে, যে বস্তুকে আল্লাহতায়ালার তৈরী প্রকৃত পরিচয়ের মাধ্যম বানিয়েছিল, তাকে গর্ব, অহংকার ও ঘৃণা প্রদর্শনের মাধ্যম বানানো হলো এবং সবশেষে তাকে জুলুম ও নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত করা হলো।

তৃতীয়তঃ মানুষ ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থাকে এবং হতে পারে, তা শুধু নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। জন্মগত দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। কারণ তাদের স্রষ্টা এক। তাদের জন্ম উপাদান ও জন্ম পদ্ধতি এক এবং তাদের সকলের বংশ তালিকা একই মা-বাপ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। উপরন্তু কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করা এক আকস্মিক ব্যাপার। যার মধ্যে তার ইচ্ছা নির্বাচন এবং তার চেষ্টা চরিত্রের কোনই হাত নেই। কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই যে এ দিক দিয়ে কারো উপরে কারো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হবে। প্রকৃত জিনিস যার ভিত্তিতে এক ব্যক্তির অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয়-তা এই যে, সে অন্যদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খোদাকে ভয় করে। পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে এবং নেকী ও পবিত্রতার পথে চলে। এমন ব্যক্তি যে কোন বংশের, যেকোন জাতি ও দেশের হোক না কেন, আপন ব্যক্তিগত গুণাবলীর ভিত্তিতে শ্রদ্ধার যোগ্য। আর যার আস্থা এর বিপরীত সে ত নিম্নস্তরের মানুষ। তা সে কালো হোক বা সাদা, পূর্বের হোক বা পশ্চিমের।

এসব বাস্তবতা যা কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) তা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাওয়াফের পর তিনি যে ভাষণ দেন, তাতে বলেন-

الحمدُ لله الَّذى اذهب عنكم عيْبةَ الجَاهليَّةِ و تكبُّرها ـ يايُّهَا النَّاسُ الناس رجلان ، برٌّ تقى كريم على الله ، و فاجر شَقى هَيِّنٌ على الله ـ الناس كلهم بنو اٰدم و خلق الله اٰدم من تُراب ـ

(بيهقى فى شعب الايمان – ترمذى)

-প্রশংসা সেই খোদার যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষত্রুটি ও তার গর্ব অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সকল মানুষ মাত্র দুটি অংশেই বিভক্ত হতে পারে। একঃ নেক ও পরহেজগার যে আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্মানিত। দ্বিতীয়ঃ পাপী ও হতভাগ্য যে আল্লাহর দৃষ্টিতে নীচ। নতুবা সমগ্র মানবজাতি আদমের সন্তান। আর আদমকে আল্লাহ মাটি থেকে পয়দা করেছেন।

বিদায় হজ্বের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি এক ভাষণে নবী (সা) বলেন-

يـاايُّـهـا الـنَّـاس، اَلاَ اِنَّ ربـكـم واحـدٌ ، لا فـضـلَ لـعـربـى على عـجـمـى و لا لـعـجـمـى عـلـى عـربِـى، ولا لاَسْـود عـلـى احـمـر و لا لاحـمـر عـلـى اسـود الاَّ بـالـتـقـوْى ـ اِنَّ اكـرمـكـم عـنـد الـلّـه اتـقْـكـم ـ اَلاَ هَـلْ بَـلَّـغْـتُ؟ قـالـوا بـلـى يـا رسـول الـلّـه ـ قـال فَلْيُبَلِّغ الـشـاهـدُ الـغـائـب ـ (بـيـهـقـى)

-লোকেরা! সাবধান। তোমাদের সকলের খোদা এক। কোন আরবের কোন অনারবের উপর, কোন অনারবের কোন আরবের উপর, কোন সাদার কোন কালোর উপর এবং কোন কালোর কোন সাদার উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কিন্তু তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতে। আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার। বল, আমি তোমাদের নিকটে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? (সমবেত জনতা) বলে হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ (সা)। তিনি বলেন, আচ্ছা তাহলে যারা উপস্থিত তারা যেন তাদের কাছে এ বাণী পৌঁছিয়ে দেয় যারা অনুপস্থিত।

এক হাদীসে তিনি বলেন-

كُـلُّـكُـمْ بـنـو اٰدم واٰدم خُـلِـقَ مـن تـرابٍ ـ ولـيـنـتـهِـيـنَّ قَـوم يـفـخـرون بـا بـائـهـم او لـيـكـونـن اهـون عـلـى الـلّـه مـن الـجِـعْـلان ـ (بـزار)

-তোমরা সকলে আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছে। লোকেরা যেন তাদের পূর্বপুরুষদের জন্যে গর্ব করা ত্যাগ করে। নতুবা তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে তুচ্ছ কীট থেকেও অধিকতর নিকৃষ্ট হবে।

তিনি আরও বলেন-

ان الـلّـه لا يـسـئـلـكـم عـن احـسـابـكـم و لا انـسـا بـكـم يـوم الـقـيـامـة ، ان اكـرمـكـم عـنـد الـلّـه اتـقـكـم ـ (ابـن جـريـر)

-আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের বংশকুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার।

আরও বলেন-

ان اللّٰه لا ينظر الى صُورِكم و اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم - (مسلم-ابن ماجه)

-আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা সূরত ও ধনদৌলত দেখেন না। দেখেন তোমাদের দিল ও আমলের দিকে।

এসব শিক্ষা শুধু শব্দমালায় সীমিত ছিল না। বরঞ্চ ইসলাম তদনুযায়ী আহলে ঈমানদের এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছে যার মধ্যে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন পার্থক্য নেই। যার মধ্যে উঁচু-নীচু, ছুঁৎমার্গ এবং পার্থক্যবোধ ভেদাভেদ ও গোঁড়ামির ধারণা নেই। যাতে শরীক হতে ইচ্ছুক সকল মানুষ, একেবারে সমান অধিকারসহ হতে পারে এবং হয়েছেও - তা তারা যে কোন বংশ, জাতি ও দেশের হোক না কেন। ইসলাম বিরোধীগণকে পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবীয় সাম্য ও ঐক্যে নীতি যে সাফল্যসহ মুসলিম সমাজে বাস্তবে রূপদান করা হয়েছে - তার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন ধর্ম ও কোন ব্যবস্থাতে পাওয়া যায় না। আর না কখনো পাওয়া গেছে। শুধু ইসলামই সেই দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা যা দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বংশ ও জাতিকে একত্রে মিলিত করে এক আকীদার ভিত্তিতে এক উম্মত বানিয়ে দিয়েছে। (১৪৯)

এ চিরন্তন নিয়ম আখেরাতেও কার্যকর করা হবে

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর কুরআন মানুষকে এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করে যে, বংশ, জাতি ও দেশের পরিবর্তে আকীদাহ ও আমলের ভিত্তিতে মতানৈক্য ও মিলিত হওয়ার এ নিয়ম পদ্ধতি বর্তমান দুনিয়া শেষ হওয়ার পর আখেরাতের দ্বিতীয় জীবনেও এভাবে কার্যকর হবে। অন্যান্য ভিত্তির উপর এ দুনিয়ায় যেসব দল কায়েম আছে তা সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

و يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ -(الرُّوم :١٤)

-যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সকল মানুষ সেদিন ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। (রূম ঃ ১৪)

দুনিয়ার যেসব দল জাতি, বংশ, জন্মভূমি, ভাষা, গোত্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, তা সব সেদিন ভেঙ্গে যাবে এবং বিশুদ্ধ আকীদাহ, চরিত্র ও আচার আচরণের ভিত্তিতে নতুন করে এক দ্বিতীয় দলবদ্ধকরণ হবে। একদিকে মানব জাতির পূর্ববর্তী পরবর্তী জাতিসমূহের মধ্য থেকে মুমেন ও সৎ মানুষ পৃথক করে বেছে নেয়া হবে এবং তাদের একটি দল হবে। অপরদিকে, এক এক ধরনের বিপথগামী মতবাদ ও বিশ্বাসপোষণকারী এবং এক এক প্রকারের অন্যায় কর্ম ও অপরাধকারীদেরকে ঐ বিরাট জনসমুদ্র থেকে বেছে পৃথক করা হবে এবং তাদের পৃথক পৃথক দল হবে। অন্য কথায় এমন মনে করা হবে যে, ইসলাম যে জিনিসকে এ দুনিয়ায় পৃথক করণ ও একত্রে মিলনের প্রকৃত বুনিয়াদ গণ্য করে এবং যাকে জাহেলিয়াতের পূজারীগণ ইহজগতে মানতে অস্বীকার করে, আখেরাতে সে বুনিয়াদের উপরেই পৃথক

পৃথকও হবে এবং একত্রে মিলিতও হবে। ইসলাম বলে যে, মানুষকে ছিন্নকারী ও যুক্তকারী প্রকৃত জিনিস হলো আকীদাহ ও আখলাক। ঈমান আনয়নকারী এবং খোদার হেদায়েতের উপর জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপনকারী এক উম্মত, তা তারা দুনিয়ার যে কোন অঞ্চলের হোক না কেন। আর কুফর ও পাপাচারের পথ অবলম্বনকারী এক ভিন্ন উম্মত, তারা যে কোন দেশ ও বংশের হোক না কেন। এ উভয়ের জাতীয়তা এক হতে পারে না। না এরা দুনিয়ায় এক সার্বজনীন জীবনপথ গঠন করে এক সাথে চলতে পারে, আর না আখেরাতে তাদের পরিণাম এক হতে পারে। দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত তাদের পথ ও গন্তব্য একে অপর থেকে পৃথক। জাহেলিয়াতের পূজারীগণ এর বিপরীত সর্বকালে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে থাকে এবং আজও এ কথার উপর অবিচল যে, দলবদ্ধতা বংশ, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এসব বুনিয়াদের দিক দিয়ে যারা এক, তাদের ধর্ম ও আকীদাহ উপেক্ষা করেও এক জাতি হয়ে অন্যান্য এ ধরনের জাতির মুকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আর এ জাতীয়তার এক এমন জীবন বিধান হওয়া উচিত যার মধ্যে তৌহিদ, শির্ক, ও নাস্তিক্যের অনুসারীগণ সকলে এক সাথে মিলে চলতে পারে। এ ধারণা আবু জেহেল, আবু লাহাব এবং দায়িত্বশীল কুরাইশদের ছিল। তারা বার বার মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি এ অভিযোগ আরোপ করতো এ ব্যক্তির আগমনে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণার বিরুদ্ধে কুরআন এখানে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, তোমাদের এ সব দলবদ্ধতা যা তোমরা এ দুনিয়ায় প্রাপ্ত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে রেখেছো, অবশেষে ভেঙ্গে যাবে। মানব জাতির মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সেই আকীদাহ, জীবন দর্শন, চরিত্র ও আচার আচরণের বুনিয়াদের উপরেই হবে যার উপর ইসলাম দুনিয়ার এ জীবনে করতে চায়। যাদের গন্তব্য এক নয়। তাদের জীবনের পথ এক হতে পারে কিভাবে?(১৫০)

উম্মতে মুসলিমা

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী সকল মানুষকে এক গণ্য করার পর ইসলাম তাদের মধ্যে শুধু তাকওয়াকে পার্থক্যের কারণ বলেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে তাকওয়ার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবে বর্ণিত আকীদাহ ও নির্দেশাবলী মেনে চলা। সেই সাথে আখেরাতের জবাবদিহিকে সামনে রেখে নাফরমানির আচরণ পরিহার করে হুকুম মেনে চলার আচরণ অবলম্বন করা। এ কারণে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে। একঃ যারা ঈমান এনেছে এবং দ্বিতীয়ঃ যারা ঈমান আনেনি। ঈমান আনয়নকারীদেরকে সে এক উম্মত বানায় এবং তার নাম রাখে উম্মতে মুসলিমা যার মধ্যে দুনিয়ার সকল মুমেন শরীক হতে পারে। আর এ কোন নতুন নাম নয় যা শুধু মুহাম্মদ (সা) তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারীদের জন্য রেখেছেন। বরঞ্চ প্রাচীনতম যুগ থেকে সকল নবীর উম্মতের এ নামই আল্লাহ রেখেছেন।

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا -

(الحج ٢٨)

-আল্লাহ প্রথমেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলমান এবং এ কুরআনেও। (হজ্ব ঃ ২৮)

'তোমাদের' সম্বোধন বিশেষ করে শুধু সেসব আহলে ঈমানের প্রতিই করা হয়নি যারা এ আয়াত নাযিলের সময় বিদ্যমান ছিলেন। অথবা তারপর আহলে ঈমানের কাতারে শামিল হয়েছেন। বরঞ্চ এ সম্বোধনের দ্বিতীয় পুরুষ সে সকল লোক যারা মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই তৌহিদ. আখেরাত, রেসালাত ও আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। মোদ্দাকথা এই যে, এ মিল্লাতে হক যারা মানতেন তাঁরা অতীতেও 'নূহী,' 'ইব্রাহীমী', মূসাবী, 'মসিহী' প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিলেন না, বরঞ্চ তাঁদের নাম 'মুসলিম' (আল্লাহর অনুগত) ছিল। আর আজও তাঁরা 'মুহাম্মদী' নন বরঞ্চ মুসলিম। এ কথা না বুঝার কারণে লোকের জন্য এ প্রশ্ন প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) এর অনুসারীদের নাম কুরআনের পূর্বে কোন কিতাবে রাখা হয়েছে। জরুরী নয় যে, প্রত্যেক ভাষায় এই আরবী শব্দ 'মুসলিম' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নবীগণকে যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁদের যে নামই কোন ভাষায় রাখা হয়েছে তা মুসলিমেরই সমার্থক। (১৫১)

উম্মতে মুসলিমার বিশ্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা

اَلَّذِيْنَ اتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ـ وَ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ـ (القصص :٥٢-٥٣)

-যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এ (কুরআনের) উপর ঈমান আনছে। আর যখন এ তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এ প্রকৃতপক্ষে হক আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আমরা ত প্রথম থেকেই মুসলিম। (কাসাসঃ ৫২-৫৩)

অর্থাৎ এর আগেও আমরা আম্বিয়া ও আসমানি কেতাবের প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম। এজন্য সে সময়েও ইসলাম ব্যতীত আমাদের আর কোন দ্বীন ছিল না। তারপর এখন যে নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নিয়ে এসেছেন, তাও আমরা মেনে নিয়েছি। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমাদের দ্বীনের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ যেমন আমরা প্রথমে মুসলমান ছিলাম সেরূপ এখনো মুসলমান।

ঈমান আনয়নকারী আহলে কিতাবের এ উক্তি যা কুরআনে উদ্ধৃত করা হয়েছে এ কথার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে যে, ইসলাম শুধু ঐ দ্বীনের নাম নয় যা নবী মুহাম্মদ (সা) নিয়ে এসেছেন এবং 'মুসলিম' শব্দের পরিভাষার প্রয়োগ নিছক হুযুর (সা) এর অনুসারী পর্যন্তই সীমিত নয়। বরঞ্চ সর্বকাল থেকে সকল নবীর দ্বীনই এই ইসলাম ছিল এবং সর্বকালেই তাঁদের অনুসারী মুসলমানই ছিলেন। এ মুসলমান যদি কখনো কাফের হয়ে থাকে তা শুধু সে সময়ে যখন পরবর্তীকালে আগত কোন সত্য নবী মানতে তারা অস্বীকার করেছে। কিন্তু যারা প্রথমে নবীকে মানতো এবং পরবর্তীকালে আগমনকারী নবীর উপর ঈমান এনেছে তাদের ইসলামে কোন ছেদ ঘটেনি তারা যেমন মুসলমান পূর্বে ছিল, তেমনি পরেও রয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, কতিপয় বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তিও এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি এ সুস্পষ্ট আয়াত দেখার পরও তাঁদের পরিতৃপ্তি হয়নি। আল্লামা সিউতি

এ বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন, 'মুসলিম' পরিভাষা শুধু উম্মতে মুহাম্মদ (সা) এর জন্য নির্দিষ্ট। অতঃপর এ আয়াত যখন তাঁর সামনে এলো, তখন স্বয়ং বলেন, আমার যুক্তি প্রমাণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বলেন, আমি আবার খোদার কাছে দোয়া করলাম যেন এ ব্যাপারে তিনি আমাকে শরহে সদর প্রত্যয় দান করেন। অবশেষে আপন মত পরিবর্তন করার পরিবর্তে তিনি তার উপরই অবিচল রইলেন এবং এ 'আয়াতের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করেন যার একটি থেকে আরেকটি অধিকতর গুরুত্বহীন। যেমন তাঁর একটি ব্যাখ্যা এই যে, انا كنا من قبله مسلمين এর অর্থ আমরা কুরআন আগমনের পূর্বেই মুসলমান হওয়ার সংকল্প পোষণ করতাম। কারণ আমাদের কিতাব থেকে তার আগমনের খবর আমরা পেয়েছিলাম এবং আমাদের ইচ্ছাও ছিল যে যখন তা আসবে তখন আমরা ইসলাম কবুল করবো।

তাঁর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, এ বাক্যে مسلمين এর পর به শব্দ উহ্য আছে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমরা কুরআনকে মানতাম। কারণ তার আসার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী ছিলাম এবং আগাম তার উপর ঈমান এনেছিলাম। এজন্য তওরাত ও ইঞ্জিল মেনে নেয়ার ভিত্তিতে নয় বরঞ্চ কুরআনকে তার নাযিল হওয়ার পূর্বে মেনে নেয়ার ভিত্তিতে আমরা মুসলিম ছিলাম।

তৃতীয় ব্যাখ্যা তাঁর এই ছিল যে, প্রথম থেকে আমাদের তকদীরে এ লেখা ছিল যে, মুহাম্মদ (সা) এবং কুরআন আগমনের পর আমরা ইসলাম কবুল করবো। এজন্য আমরা আসলে প্রথমেই মুসলিম ছিলাম। এসব ব্যাখ্যার কোনটি দেখেও মনে হয় না যে খোদা প্রদত্ত 'শরহে সদরের' কোন প্রভাব তার মধ্যে আছে।

ব্যাপার এইযে, কুরআনে শুধু এই একস্থানেই নয়, বরঞ্চ বহুস্থানে এ মৌলিক সত্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত দ্বীন শুধু ইসলাম (আল্লাহর আনুগত্য)। আর খোদার সৃষ্ট রাজ্যে খোদার বান্দাহদের জন্য এছাড়া অন্য কোন দ্বীন হতেই পারে না। মানব জাতির সূচনা থেকে যে নবীই মানুষের হেদায়েতের জন্য এসেছেন তিনি এই দ্বীন নিয়েই এসেছেন। আর আম্বিয়া (আঃ) সর্বদা স্বয়ং মুসলিম ছিলেন। নিজেদের অনুসারীদেরকে তাঁরা মুসলিম হয়ে থাকারই তাকীদ করেছেন। তাঁদের সেসব অনুসারী যারা নবুওয়তের মাধ্যমে ঘোষিত খোদার ফরমানের সামনে নতশির হয়েছেন তাঁরা সকল যুগে মুসলিমই ছিলেন। এ সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলোঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ - (ال عمران ۹)

-প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটে 'দ্বীন' তো একমাত্র ইসলামই।

و مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ - (ال عمران ۸۵)

-আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন চায়, তা তার থেকে কখনোই কবুল করা হবে না। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

হযরত নূহ (আঃ) বলেন-

اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (يُونس ۷۲)

-আমার প্রতিদান তো আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে আমি যেন মুসলিমের মধ্যে শামিল হয়ে থাকি। (ইউনুস ঃ ৭২)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ

وَاِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - و وَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ و يَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ و اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ و اِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ و اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - (البقره ١٣١ تا ١٣٣)

-যখন তার প্রভু তাকে বল্লেন, মুসলিম হয়ে যাও, তখন সে বল্লো আমি রাব্বুল আলামীনের মুসলিম (অনুগত) হয়ে গেলাম। আর এ বিষয়ের অসিয়ত ইব্রাহীম (আঃ) তার সন্তানদের করে এবং ইয়াকুবও (আঃ) ঃ হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন পছন্দ করেছেন। অতএব তোমাদের মৃত্যু যেন না আসে, কিন্তু এ অবস্থায় যে তোমরা 'মুসলিম'।

(হে ইহুদীগণ) তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় এসেছিল? যখন সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরে তোমরা কার বন্দেগী করবে? তারা জবাব দেয় আমরা বন্দেগী করব আপনার মা'বুদের এবং আপনার বাপদাদা ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বুদের তাঁকে এক মাবুদ মেনে নিয়ে এবং আমরা তাঁরই মুসলিম। (বাকারাহ ঃ ১৩১-১৩৩)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لاَ نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا - (ال عمران ٦٧)

-ইব্রাহীম না ইহুদী ছিল, না নাসরানী, বরঞ্চ একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। (সহল ইমরান ঃ ৬৭)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) স্বয়ং দোয়া করছেন-

رَبَّنَا و اَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ و مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ - (البقرة ١٢٨)

-হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে তোমার মুসলিম বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এক উম্মত পয়দা কর যে তোমার মুসলিম হবে। (বাকারাহ ঃ ১২৮)

হযরত লূতের (আঃ) কাহিনীতে বলা হয়েছে ঃ

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (الذّاريات ٣٦)

-আমরা কওমে লূতের বস্তিতে একটি ঘর ব্যতীত মুসলমানদের কোন ঘর পেলাম না (স্বয়ং হযরত লূতের (আঃ) ঘর)। (যারিয়াত ঃ ৩৬)

হযরত ইউসুফ খোদার দরবারে দোয়া করছেন-

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ - (يُوسف ١٠١)

-আমাকে মুসলিম থাকা অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে সালেহীনের মধ্যে শামিল কর। (ইউসুফ ঃ ১০১)

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলছেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ - (يُونس ٨٤)

-হে আমার জাতির লোকেরা! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো তাহলে তাঁর উপরেই ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হও। (ইউনুস ঃ ৮৪)

বনী ইসরাইলের প্রকৃত ধর্ম ইহুদীবাদ নয়, বরঞ্চ ইসলাম ছিল। দোস্ত-দুশমন সকলেই এ কথা জানতো। বস্তুতঃ ফেরাউন সমুদ্রে ডুবে মরার সময় শেষ কথা যা বলে তা এই ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّه لاَ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنْتُ بِهِ بَنُوْا اِسْرَا ئِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (يونس ٩٠)

-আমি মেনে নিলাম যে, কোন মাবুদ তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যাঁর উপর বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (ইউনুস ঃ ৯০)

বনী ইসরাইলের সকল নবীর দ্বীনও ছিল এই ইসলাম।

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ - يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا - (المائده ٤٤)

-আমরা তাওরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। তদনুযায়ী সে নবী যে মুসলিম ছিল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে ফয়সালা করতো যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল। (মায়েদাহ ঃ ৪৪)

এই ছিল সুলায়মান (আঃ) এর দ্বীন। বস্তুতঃ রাণী সাবা তার উপর ঈমান আনতে গিয়ে বলে ঃ

اَسْلَمْتُ مع سُلَيْمنَ لِلّهِ رب الْعلَمِيْنَ ـ
(النمل ٤٤)

-আমি সুলায়মানের সাথে রাব্বুল আলামীনের মুসলিম হয়ে গেলাম। (নমল ঃ ৪৪)

এই ছিল হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর হাওয়ারীদের দ্বীন ঃ

وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّنَ اَنْ امِنُوْا بِىْ و بِرسُوْ لِىْ قَالُوْا أمنَّا وَ اشْهدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ـ(المائده ١١١)

-যখন আমি হাওয়ারীদের অহী করলাম যে ঈমান আন আমার উপর ও আমার রসূলের উপর, তখন তারা বল্লো আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলিম। (মায়েদাহ ঃ ১১১)

এ ব্যাপারে কেউ যদি এর ভিত্তিতে সন্দেহ পোষণ করে যে, আরবী ভাষায়র শব্দ 'ইসলাম' ও মুসলিম' বিভিন্ন দেশ ও ভাষায় ব্যবহার করা কিভাবে সম্ভব ছিল, তাহলে এ এক সুস্পষ্ট অজ্ঞতাপূর্ণ উক্তি হবে। কারণ আসল ধর্তব্য বিষয় এ আরবী শব্দগুলোর নয় বরঞ্চ ঐ অর্থের- যার জন্য এ শব্দগুলো আরবীতে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে কথা এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তা এই যে, খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রকৃত 'দ্বীন' খৃষ্টবাদ অথবা মুসাবাদ অথবা মহাম্মদীয়তাবাদ নয়, বরঞ্চ নবী ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে যে খোদার ফরমান এসেছে তার প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করা এবং এ আচরণ যেখানেই যে খোদার বান্দাই যে কালেই অবলম্বন করেছে সে একই বিশ্বজনীন সর্বকালীন দ্বীনের হকের অনুসারী হয়েছে। এ দ্বীন যারাই যথার্থ অনুভূতি ও নিষ্ঠার সাথে অবলম্বন করেছে তাদের জন্য মূসার (আঃ) পর ঈসাকে (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) পর মুহাম্মদ (সা) মেনে নেয়া ধর্ম পরিবর্তন করা নয় বরঞ্চ সত্যিকার দ্বীনের অনুসরণের প্রাকৃতিক ও যুক্তিসংগত দাবী। এর বিপরীত যারা নবীগণের দলে কোন চিন্তাভাবনা না করেই ঢুকে পড়েছে অথবা জন্মগ্রহণ করেছে এবং জাতীয় বংশীয় ও দলীয় গোঁড়ামি যাদের জন্য প্রকৃত ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছে তারা ইহুদী ও খৃস্টান হয়ে রয়ে গেছে এবং মুহাম্মদ (সা) এর আগমনের পর তাদের অজ্ঞতার গুমর ফাঁক হয়ে গেল। কারণ শেষ নবীকে অস্বীকার করে শুধু এই নয় যে, ভবিষ্যতে মুসলিম থাকা কবুল করলো না বরঞ্চ তাদের এ আচরণে এ কথা প্রমাণ করলো যে তারা পূর্বেও মুসলিম ছিল না। নিছক এক নবী অথবা কোন কোন নবীর ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরক্ত ছিল। অথবা পূর্ব পুরুষদের অন্ধ আনুগত্যকে দ্বীন বানিয়ে রেখেছিল।(১৫২)

উম্মতে মুসলিমার গঠন প্রক্রিয়া

এভাবে রসূলুল্লাহ (সা) না শুধু আসল দ্বীনকে সজীব করেন যা পূর্ব থেকে চলে আসছিল। বরঞ্চ সে উম্মতকেও নতুন করে কায়েম করেন যা সকল নবীর যমানা থেকে উম্মতে মুসলিমা নামে অভিহিত হয়ে আসছিল। এ উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র, পরিবার ও অঞ্চল থেকে বের হয়ে যারা শামিল হয়ে চলেছিল, তিনি তাদের সকলকে একে অপরের সহযোগী ও সাহায্যদাতা, একে অপরের ভাই, একে অপরের সহানুভূতিশীল ও দুঃখকাতর

বানিয়ে দেন। সকলের জানমাল, ইজ্জত-আবরু সমভাবে নিষিদ্ধ করে দেন, সকলের অধিকার ও দায়িত্ব একইরূপ গণ্য করেন এবং কারো জন্য এমন কোন স্বাতন্ত্র রাখেন না যা অন্যের নেই। এ আরবের গোত্র পূজারী ও গোঁড়ামি পীড়িত পরিবেশের জন্য এক বিস্ময়কর বস্তু ছিল যা মেনে নিতে তাদের মন-মস্তিষ্ক কিছুতেই প্রস্তুত ছিল না।(১৫৩)

ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলের (সা) চাচা আবু লাহাব একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার দ্বীন মেনে নিলে আমার কি লাভ হবে? হুযুর (সা) বল্লেন, যা অন্যান্য ঈমান আনয়নকারী লাভ করবে। তিনি বল্লেন, আমার জন্যও (রসূলের চাচার জন্য) কোন বিশেষ মর্যাদা নেই? হুযুর (সা) বলেন, আপনি আর কি চান?

আবু লাহাব বলে

تَبًّا لِهٰذَا الدِينِ تَبًّا اَنْ اكونَ و هٰؤلاَءِ سواء ـ

-এ দ্বীনের সর্বনাশ হোক যার মধ্যে আমি এবং অন্যান্য লোক সমান। (ইবনে জারীর)(১৫৪)

এ গোঁড়ামির ধারণার বিপরীত কুরআন পরিষ্কার বলে দিল,

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ و لاَ اَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيمة

-কিয়ামতের দিন না তোমাদের আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে, না সন্তানাদি। (মুমতাহেনা ঃ ৩)

এ রক্তের সম্পর্ক এখানে পুরাপুরি রয়ে যাবে এবং ওখানে তার দ্বারা কোন লাভ হবে না। আসল বস্তু ঈমান যা কেয়ামতে কাজে লাগবে। এ জন্য দুনিয়াতেও তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ঈমানের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَ الَّذِيْنَ امَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلوٰةَ و يُؤْتُوْنَ الزَّكوٰةَ و هُمْ رٰكِعُوْنَ ـ (المائده ٥٥)

-তোমদের বন্ধু ত সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং ওসব আহলে ঈমান যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং খোদার সামনে মস্তক অবনতকারী। (মায়েদাহ ঃ ৫৫).

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ـ (اَلْحُجُرات ١٠)

-মুমেন ত একে অপরের ভাই। অতএব নিজের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো কর। (হুজরাত ঃ ১০)

এ এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত দুনিয়ার সকল মুসলমানের এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃসংঘ কায়েম করে দিয়েছে। এ শিক্ষায় এই বরকত যে, অন্য কোন ধর্ম অথবা মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে সে ভ্রাতৃত্ব পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তা পাওয়া যায়। এর গুরুত্ব ও দাবী নবী পাক (সা) তাঁর বহু ভাষণে

বয়ান করেছেন যার থেকে তার গোটা প্রাণ শক্তি অধিকতর জাগ্রত হয়েছে।

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) তিনটি বিষয়ে আমার বয়আত গ্রহণ করেন। এক, যেন নামায কায়েম করি, দ্বিতীয়, যেন যাকাত দিতে থাকি এবং তৃতীয়, যেন প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাংখী হয়ে থাকি-(বোখারী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেয়া ফিসক (পাপ কাজ) এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী (বোখারী-কিতাবুল ঈমান)। মুসনাদে আহমদে এ বিষয়টি বর্ণনা করছেন-হযরত বিন মালেক (রা) তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সা) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম -(মুসলিম-কিতাবুল বিরর ওয়াস সিলাহ)।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, হুযুর (সা) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার উপর জুলুম করে না, তার হাত ছাড়ে না, তাকে হেয় করে না। একজন লোকের জন্য এ অনিষ্ট অনেক বেশী যে সে তার মুসলমান ভাইকে হেয় করবে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত সহিল বিন সাদ সায়েদী (রা) নবী (সা) এর উক্তি উদ্ধৃতি করে বলেন, আহলে ঈমান দলের সাথে একজন মুমেনের সম্পর্ক, মাথার সাথে দেহের সম্পর্কের মতো। সে আহলে ঈমানের একটি দুঃখকষ্ট ঠিক তেমনি অনুভব করে যেন মাথা দেহের প্রত্যেক অংশের কষ্ট অনুভব করে -মুসনাদে আহমদ।(১৫৫)

হযরত নু'মান বিন বশীর (রা) নবীর (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেন।

مَثَلُ الْمُؤمِنِين فى تَوادِّهِم و تَراحُمِهِم و تَعَاطُفِهِم كمثل الجسدِ اذا اشتكى منه عضو تداعىٰ له سائرُ الجسدِ بالسَّهر و الحُمّى - (بخارى و مسلم)

-মুমেনদের দৃষ্টান্ত পরস্পর দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের ন্যায়। যদি দেহের কোন অংশে কষ্ট হয়, তাহলে সমস্ত দেহ তার জন্য অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) বলেন যে নবী (সা) বলেছেন,

المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يشدُّ بعْضُه بعضاً- (بخارى - مُسلم - تِرمذى)

-মুমেন অন্য মুমেনের জন্য ঐ দেয়ালের মতো যার প্রত্যেক অংশ অন্য অংশকে সুদৃঢ় করে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা) হুযুরের এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেন

المسلمُ اَخُوا المُسلمِ لا يظْلِمُه ولا يُسْلِمُه. و منْ كان فى حاجةِ اخيهِ كان اللّه فى حاجتِهِ و من

فرّج عن مُّسلمٍ كربةً فرّج اللّه عنه كُربة من كُرُباتِ يوم القيامةِ و من ستر مسلمًا سترة اللّهُ يوم القيمةِ ۔(بخاری و مُسلم)

-মুসলমান মুসলমানের ভাই, না তার উপর জুলুম করে, আর না তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন অভাব পূরণ করার জন্য লেগে থাকে। আল্লাহ্ তার অভাব পূরণের জন্য লেগে যান। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে বাঁচাবে, আল্লাহ্ তাকে কেয়ামতের দিনের বিপদ থেকে বাঁচাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার দোষক্রটি গোপন রাখবেন।(১৫৬)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) এবং আবু তালহা বিন সাহল আনসারী (রা) হুযুরের (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেন।

ما من امرئٍ يخذل امراً مُسْلِمًا فى موضع تُنْتَهكُ فيه حرمتُه و ينتقصُ فيه من عِرضه الاّ خذله اللّه فى موطنٍ يُحبّ فيه نُصْرَتَهُ ومَا من امرئٍ ينْصُرُ مُسْلمًا فى موضعٍ يُنْتقصُ فيه من عرضه و يُنْتهكُ من حُرْمتِه الاّنصره اللّهُ فى موطنٍ يُحبُّ فيه نُصْرَتَهُ ۔(ابو داؤد)

-যখন কোন মুসলমানকে হেয় অপদস্থ করা হচ্ছে, তার সম্মানের উপর আঘাত করা হচ্ছে, তখন তার সাহায্যে যদি কেউ এগিয়ে না আসে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাও তাকে এমন অবস্থায় সাহায্য করবেন না, যখন সে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। আর যদি কেউ কোন মুসলমানকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে যখন তার সম্মানের উপর আঘাত করা হচ্ছে এবং তাকে হেয় করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালাও তাকে এমন অবস্থায় সাহায্য করবেন যখন সে চাইবে যে আল্লাহ্ তার মদদ করুন। (১৫৭)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন যে, নবী (সা) বলেছেন,

المسلمُ منْ سَلِم المُسلمُون مِن لِسَانه ويدِه ۔ (بخاری و مُسلم)

-মুসলমান সে ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

হযরত আবু বকরা নুফাই বিন আল হারেস (রা) বলেন যে, বিদায় হজ্বের সময় কুরবানীর দিনের ভাষণে নবী (সা) বলেন,

الا فلا ترجعوا بعدى كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ – (بخاری و مسلم)

-সাবধান! আমার পরে কাফেরদের মতো হয়ো না যে একজন আর একজনের গর্দান মারতে থাকবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, হুযুর (সা) একবার বলেন,

أُنْصُر اخاك ظالمًا او مظلومًا -

তোমার ভাই জালেম হোক আর মজলুম, তার সাহায্য কর। একজন প্রশ্ন করে মজলুম হলে তার সাহায্য ত আমি করব কিন্তু জালেম হলে কিভাবে তার সাহায্য করব?

নবী বলেন,

تجزه او تمنعه من الظلم فان ذٰلك نصره -

-তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত কর এবং দূরে রাখ। কারণ এটাই তার সাহায্য করা হবে। (বোখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন-

المؤمنون تكافأ دماءهم وهم يدٌ عَلى من سواهم -
(مسند ابو داؤد طَيَاسِى - حديث ٢٢٥٨)

-মুমেনদের খুন সমান মূল্যের। আর দুশমনের মুকাবিলায় তারা সকলে একটি হাতের ন্যায়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) নবীর (সা) এ হাদীস উদ্ধৃত করেন-

أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَاس حتّى يشهدوا اَنْ لاَّ اِلهَ الاَّ اللّه و اَنَّ محمدًا رسولُ اللّه - فاذا شهِدوا واستقبلوا قبلتَنا واكلوا ذبيحتَنا وصلّوا صلوتَنا فقد حرُمت علينا دماؤهم و اموالهم الابحقّها - لهم ما للمُسلمين و عليهم ما عليهم -(نَسائى، كتاب الايمان - مُسند احمد، مرديات انس رضـ بن مالك)

-লোকের সাথে লড়াই করার হুকুম আমাকে দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রসূল। তারপর যখন তারা এ সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবেহ করা খায়, আমাদের মতো নামায পড়ে তখন তাদের খুন এবং মাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যায়। অবশ্য তাদের উপর কোন হক থাকলে আলাদা কথা। তাদের জন্য সেই অধিকার যা মুসলমানদের জন্য। আর তাদের উপর সেই দায়িত্ব যা মুসলমানদের-

একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের পতাকাবাহী উম্মত

কিন্তু এ উম্মত সে ধরনের নয় যে কিছু লোক ঈমান আনার পর ব্যস নিজের জায়গায় 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করবে, নেক কাজ করবে, পরস্পর একে অপরের সমর্থক, সাহায্যকারী, শুভাকাংখী ও সহানুভুতি সম্পন্ন হবে। কিন্তু এর থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এ উম্মতের কাজ এ ছিল যে, তারা প্রতিটি ব্যক্তি লোকের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ছড়াবে। ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এ গোটা উম্মত সকল জাতি ও গোত্রের মধ্য থেকে বেছে এ জন্য বের করা হয়েছে যে, এ খোদার বান্দাহদের সংস্কার সংশোধন করবে। সকল জাতির সাথে এর সম্পর্ক হবে হক ও ইনসাফের সম্পর্ক এবং কারো সাথে নাহক ও বেইনসাফীর সম্পর্ক হবে না। ব্যাপার যদি প্রথম অবস্থাটির মধ্যে সীমিত থাকতো, তাহলে আরবের কুরাইশ ও মুশরিকরা কোন না কোন পরিমাণে তা বরদাশত করতে প্রস্তুত থাকতো। কিন্তু এ দ্বিতীয় অবস্থা এমন ছিল যে, তারা দেখছিল যে এ উম্মত বর্ধিত ও প্রসারিত হওয়ার ইচ্ছাই পোষণ করতো না, বরঞ্চ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগতভাবে এ গোটা জামায়াত নিজেদের আন্দোলন ছড়াবার কাজে খুবই সক্রিয়। এতে তাদের (কুরাইশদের) আশংকা ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে। কারণ তারা দেখছিল যে, প্রতিদিন তাদের লোক দল ত্যাগ করে নতুন দলে শামিল হচ্ছিল।(১৫৮)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (حم السجده ٣٣)

-এবং ঐ ব্যক্তির কথা থেকে ভালো কথা আর কার হতে পারে যে, আল্লাহর দিকে ডাকলো, নেক আমল করলো এবং বল্লো, আমি মুসলমান। (হামীম আসসাজদা ঃ ৩৩)

ইতিপূর্বে ৩০-৩২ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বন্দেগীর উপর অবিচল থাকা এবং এ পথ অবলম্বন করার পর তার থেকে মুখ না ফেরানো স্বয়ং সেই দুনিয়াবী নেকী যা মানুষকে ফেরেশতাদের বন্ধু এবং জান্নাতের হকদার বানিয়ে দেয়। তারপর এ আয়াতে তাদেরকে বলা হলো যে আমলের মর্যাদা যার থেকে উচ্চতর মর্যাদা আর কিছু হতে পারে না- তা এই যে, তোমরা স্বয়ং নেক আমল কর এবং অন্যকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে ডাক। চরম বিরোধিতার পরিবেশেও নির্ভয়ে বল আমি মুসলমান, যে পরিবেশে ইসলামের ঘোষণা ও তা প্রকাশ করার অর্থ নিজের জন্য বিপদের আহ্বান জানানো। এ এরশাদের পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সেই পরিবেশ চোখের সামনে রাখা প্রয়োজন যখন এ কথা বলা হয়েছিল। সে সময় অবস্থা এই ছিল যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করতো, সে অনুভব করতো যে সে যেন হিংস্র পশুর বনে পদার্পণ করছে যেখানে প্রত্যেকে তাকে ফেঁড়ে খাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। এর থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে যে ব্যক্তি ইসলামের তবলিগের জন্য মুখ খুললো সে যেন হিংস্র পশুদেরকে ডেকে বল্লো - এসো আমাকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে ফেলো। এ অবস্থায় বলা হলো যে, কোন লোকের আল্লাহকে রব মেনে নিয়ে সোজা পথ অবলম্বন করা এবং তার থেকে সরে না পড়া বড়ো এবং বুনিয়াদী নেকী। কিন্তু উচ্চস্তরের নেকী এই যে, সে দাঁড়িয়ে বলবে, আমি মুসলমান। আর পরিণামের পরোয়া না করে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকবে। এ কাজ করার সময় নিজের আমল এতো পাক পবিত্র রাখবে যে, কারো যেন ইসলাম ও তার পতাকাবাহীর উপর কোন অভিযোগ করার অবকাশ না থাকে।(১৫৯)

বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ (البقرة ١٤٣)

-এবং এভাবে আমরা তোমাদেরকে একটি সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা বিশ্ববাসীর প্রতি সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের সাক্ষী হন। (বাকারাহ্ ঃ ১৪৩)

এ ছিল উম্মতে মুহাম্মদের (সা) বিশ্ব নেতৃত্বের ঘোষণা। 'এভাবে' এর ইংগিত আল্লাহর সেই পথ নির্দেশনার দিকেও ছিল যার থেকে নবী মুহাম্মদের (সা) অনুসরণকারীদের সোজা পথ লাভ করা সম্ভব হয় এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন মর্যাদা লাভ করে যে, তাদেরকে 'উম্মতে ওয়াসাত' বলে গণ্য করা হয়। এ ইংগিত কেবলা পরিবর্তনের দিকেও করা হয়েছে যাকে অজ্ঞ লোকেরা একদিক থেকে আর এক দিকে মুখ ফেরানো মনে করে থাকে। বস্তুত বায়তুল মাকদেস থেকে কাবার দিকে কেবলা পরিবর্তনের অর্থ এই ছিল যে আল্লাহ্ বনী ইসরাইলকে দুনিয়ার নেতৃত্বের মর্যাদাকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অপসারিত করেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে উক্ত পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

'উম্মতে উয়াসাত' শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থবোধক যে কোন দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা তার তরজমার হক আদায় করা সম্ভব নয়। এর অর্থ এমন এক মহান ও সম্ভ্রান্ত দল যে ইনসাফ ও সুবিচার এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করত। দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সভাপতির মর্যাদা লাভ করবে। সকলের সাথে তার সম্পর্ক হবে একই রকম এবং সে সম্পর্ক হবে সততার, অসত্য ও অন্যায়ের নয়।

তার এই যে বলা হলো 'তোমাদেরকে উম্মতে ওয়াসাত' এ জন্যে বানানো হলো যে, তোমরা লোকদের সাক্ষী হবে এবং রসূল হবেন তোমাদের সাক্ষী - ত এর অর্থ এই ছিল এবং এখনো আছে যে, আখেরাতে যখন গোটা মানব জাতির একত্রে হিসাব নেয়া হবে তখন রসূল (সা) আল্লাহর দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসাবে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্য দেবেন যে, সঠিক চিন্তা, সৎ কাজ এবং সুবিচারমূলক ব্যবস্থার যে শিক্ষা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন তা তিনি তোমাদের কাছে অবিকল পুরোপুরি পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং কার্যতঃ তদনুযায়ী কাজ করে দেখিয়েছেন। তারপর রসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তোমাদেরকে সাধারণ মানুষের জন্য সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াতে হবে এবং এ সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল যা কিছু তোমাদের নিকটে পৌছিয়েছেন তা তোমরা তাদের কাছে পৌছাতে এবং যা কিছু রসূল তোমাদেরকে দেখিয়েছেন তা তাদেরকে দেখাতে নিজেদের সাধ্যমত কোন ক্রটি করনি।

এভাবে কোন ব্যক্তি অথবা দলের এ দুনিয়াতে খোদার পক্ষ থেকে সাক্ষ্যের পদমর্যাদায় ভূষিত হওয়া প্রকৃত পক্ষে তার নেতৃত্বের পদমর্যাদায় ভূষিত হওয়াই বুঝায়। এর মধ্যে একদিকে রয়েছে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব, অপরদিকে দায়িত্বের গুরুভার। এর অর্থ এই যে, যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ উম্মতের জন্য খোদাভীতি , সত্যনিষ্ঠা, সুবিচার ও হকপরস্তির জীবন্ত সাক্ষী হলেন, তেমনি এ উম্মতকেও সমগ্র দুনিয়ার জন্য জীবন্ত সাক্ষী হতে হবে। এমনকি তার কথা ও কাজ, চরিত্র ও আচার আচরণ সব কিছু দেখে দুনিয়া জানতে পারে

যে, খোদা ভীতি এর নাম, সত্য নিষ্ঠা হচ্ছে এই। সুবিচার একেই বলে, হক পরস্তি এমনি হয় এবং ইসলাম দুনিয়ার মানুষকে এমন কিছু বানাবার জন্য এসেছে।(১৬০)

উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

ط - (ال عمران ١١٠)

তোমরা ত দুনিয়ার সর্বোত্তম উম্মত যাদের অভ্যুদয় হয়েছে (মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার সংশোধনের জন্য)। তোমরা নেক কাজের হুকুম দাও এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর উপর ঈমান আন। (আলে-ইমরান ঃ ১১০)

এ আয়াতে নবীর (সা) অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের যে পদমর্যাদা থেকে বনী ইসরাইলকে তাদের অযোগ্যতার কারণে অপসারিত করা হয়েছে, যে পদমর্যাদায়, এখন তোমাদেরকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ জন্য যে আখলাক ও আমলের দিক দিয়ে এখন তোমরা দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট দল হয়ে পড়েছ এবং তোমাদের মধ্যে সে গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে যা সুবিচারপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য জরুরী। অর্থাৎ সৎকর্ম প্রতিষ্ঠার এবং দুষ্কর্ম নির্মূল করার প্রেরণা ও কাজ এবং আল্লাহ লাশারীকালাহুকে বিশ্বাস ও আমলের দিক দিয়ে নিজের ইলাহ ও রব মেনে নেয়া। অতএব বিশ্ব নেতৃত্বের এ কাজ তোমাদের উপর সোপর্দ করা হলো।(১৬১)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه

-(التوبه ٧١)

-মুমেন পুরুষ ও মুমেন নারী একে অপরের সাথী। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম করে যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। (তওবা ঃ ৭১)

অর্থাৎ মুমেন নারীপুরুষ এমন দলে পরিণত হয়েছে যার সদস্যদের মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্য সমভাবে বিদ্যমান যে সৎ কর্মের প্রতি তারা এতোটা অনুরাগ রাখে যে, দুনিয়াবাসীকে তা করার আদেশ দেয়। দুষ্কর্মকে তারা এতোটা ঘৃণা করে যে, দুনিয়াকে তার থেকে নিবৃত্ত করে। খোদার ইয়াদ বা স্মরণ তাদের জন্য সাহাবায়ের ন্যায় জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলোর শামিল। রাহে খোদায় মাল খরচ করার জন্য তাদের মন ও হাত উন্মুক্ত। খোদা ও রসূলের আনুগত্য তাদের জীবনের স্বভাব। এ সার্বজনীন নৈতিক স্বভাব প্রকৃতি ও জীবন পদ্ধতি তাদের পরস্পরকে যুক্ত করে দিয়েছে। (১৬২)

জীবন বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা

এ উম্মতের লোকেদের মধ্যে এ প্রেরণাও সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে সকল বস্তুর উপর অগ্রাধিকার দেবে। প্রতিটি বস্তু তার (দ্বীনের) জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু কোন কিছুর জন্য তাকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হবে না।

যদি আপন দেশ, পরিবার ও ঘরবাড়িতে থেকে খোদার বন্দেগী করা সম্ভব হয় ত কোন কথাই নেই। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তার পরীক্ষা এ বিষয়ে হবে যে, সে তার ঘরবাড়ি, সন্তানাদি, পরিবার ও দেশপ্রেমে খোদার বন্দেগী পরিহার করছে, না খোদার বন্দেগীর জন্য এসব ছেড়ে হিজরত ও নির্বাসনের ঝুঁকি গ্রহণ করছে।

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَ لاَجْرُ الاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ(النحل ٤١)

যারা অত্যাচার সহ্য করার পর হিজরত করে চলে গেছে তাদেরকে আমরা দুনিয়াতেই উত্তম বসবাসের স্থান দেব এবং আখেরাতের প্রতিদান ত অনেক বড়ো। (নহল ঃ ৪১)

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ ـ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ، نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ـ وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا ـ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُم ، وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ(العنكبوت ٥٦ تا ٦٠)

-হে আমার বান্দাহগণ যারা ঈমান এনেছো। আমার যমীন প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই বন্দেগী কর। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আমার দিকে ফিরে আনা হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানায় রাখবো যার নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবহমান হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কিন্তু সুন্দর প্রতিদান আমলকারীদের জন্য। এসব তাদের জন্য যারা সবর করেছে এবং নিজেদের রবের উপর ভরসা করেছে। এমন বহু প্রাণী আছে যারা তাদের জীবিকা নিয়ে চলাফেরা করে না। আল্লাহ তাদেরকে রিযিক দেন এবং তোমাদের রিযিকদাতাও তিনি। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। (আনকাবুত ঃ ৫৬-৬০)

সুরায়ে আনকাবুত থেকে এ কথা জানতে পারা যায় যে, তা কোন্ প্রেরণা ছিল যা সে সময়ে উম্মতে মুসলিমার মধ্যে ফুৎকারিত হয়েছিল।

প্রথম আয়াতে ইংগিত ছিল হিজরতের প্রতি অর্থাৎ যদি মক্কায় খোদার বন্দেগী করা কষ্টকর হয়ে থাকে, তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যাও। খোদার যমীন সংকীর্ণ নয়। যেখানেই তোমরা খোদার বান্দা হয়ে থাকতে পারবে সেখানে চলে যাও। তোমাদের জাতি ও দেশের নয় বরঞ্চ নিজেদের খোদার বন্দেগী করা উচিত। এর থেকে জানা গেল যে, আসল বস্তু জাতি, জন্মভূমি ও দেশ নয়। বরঞ্চ আল্লাহর বন্দেগী। যদি কখনো জাতি, জন্মভূমি ও দেশের ভালোবাসার দাবী খোদার বন্দেগীর দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সে সময় মুমেনের ঈমানের অগ্নি পরীক্ষার সময়। যে সাচ্চা মুমেন সে খোদার বন্দেগীই করবে এবং দেশ ও জাতি প্রত্যাখ্যান করবে। যারা ঈমানের মিথ্যা দাবীদার তারা ঈমান পরিত্যাগ করবে এবং আপন দেশ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে। এ আয়াত এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট যে, একজন সাচ্চা খোদাপুরস্ত মানুষ দেশপ্রেমিক ও জাতি প্রেমিক ত হতে পারে, কিন্তু জাতি পুজারী ও দেশ পুজারী হতে পারে না, তার কাছে খোদার বন্দেগী প্রত্যেক বস্তু থেকে অধিক প্রিয় এবং তার জন্য সে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তু কুরবান করে দেবে কিন্তু তাকে দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য কুরবান করবে না।

দ্বিতীয় আয়াতটির অর্থ এই যে, জীবনের চিন্তা করো না। কারণ এ ত যে কোন সময়ে যাবেই। চিরকাল থাকার জন্য দুনিয়ায় কেউ আসে না। অতএব তোমাদের জন্য চিন্তার বিষয় এ নয় যে, কিভাবে জীবন বাঁচানো যাবে। কিন্তু প্রকৃত চিন্তার বিষয় এই যে, ঈমান কিভাবে বাঁচানো যায়। এবং খোদা পুরস্তির দাবী কিভাবে মেটানো যায়। অবশেষে তোমাদেরকে ফিরে আমার কাছেই আসতে হবে। যদি দুনিয়াতে জান বাঁচানোর জন্য ঈমান হারিয়ে আস, তাহলে তার পিরণাম অন্য কিছু হবে। আর ঈমান বাঁচাবার জন্য জীবন হারিয়ে আস তাহলে তার পরিণাম ভিন্ন কিছু হবে। অতএব চিন্তা যা কিছু করার তা এ বিষয়ে কর যে, আমার কাছে যখন ফিরে আসবে তখন কি নিয়ে ফিরে আসবে। জানের উপর কুরবান করা ঈমান নিয়ে, না ঈমানের উপর কুরবান করা জান নিয়ে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি ঈমান ও নেকীর পথে চলার কারণে তোমরা দুনিয়ার সকল নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়ে যাও এবং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যর্থতাসহ মৃত্যুবরণ করলে, তাহলে বিশ্বাস কর যে, তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই হবে। শুধু ক্ষতিপূরণই নয়, বরঞ্চ সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদানও পাবে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, আখেরাতে এ উৎকৃষ্টতম প্রতিদান তাদের জন্য যারা সকল প্রকার বিপদ মুসিবত, দুঃখকষ্ট ও উৎপীড়নের মুকাবিলা করে ঈমানের উপর অটল থাকে, যারা ঈমানের ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরায় না, ঈমান পরিহার করার সুযোগ-সুবিধা ও লাভ স্বচক্ষে দেখেও তার প্রতি দৃকপাত করলো না, কাফের ও ফাসেক ফাজেরদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখেও তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করলো না, যারা নিজেদের ধনদৌলত, ব্যবসা বাণিজ্য ও গোত্র পরিবারের উপর ভরসা না করলো নিজের রবের উপর ভরসা করোনা; যারা পার্থিব উপায়-উপাদান উপেক্ষা করে নিছক আপন রবের উপর ভরসা করে ঈমানের জন্য সকল বিপদ সহ্য করতে এবং সকল শক্তির সংঘাত-সংঘর্ষের মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল এবং প্রয়োজনে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো; যারা তাদের রবের উপর এ বিশ্বাস স্থাপন করলো যে, ঈমান ও নেকীর উপর কায়েম থাকার প্রতিদান কখনো বিনষ্ট হবে না। আর এ আস্থাও পোষণ করলো যে তিনি তাঁর

মুমেন ও নেক বান্দাহদেরকে এ দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন এবং আখেরাতেও তাদের কাজের উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হিজরত করার পর তোমাদের জানের চিন্তার সাথে জীবিকার চিন্তা করাও উচিত নয়। এই যে অসংখ্য পশু-পাখী, জলচর জীব তোমাদের চোখের সামনে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে চলাফেরা করছে। এ সবের মধ্যে কে জীবিকা বহন করে চলছে? আল্লাহ-ই ত এসবকে প্রতিপালন করছে। তারা যেখানেই যাক, আল্লাহর ফজলে তারা কোন না কোন জীবিকা পেয়ে যাচ্ছে। এ জন্যে তোমরা এ বিষয়ে চিন্তা করে করে সাহস হারিয়ে ফেলনা যে, ঈমানের খাতিরে যদি ঘরদোর ছেড়ে চলে যাই ত কোথা থেকে খেতে পাব। যেখান থেকে আল্লাহ তাঁর অসংখ্য সৃষ্ট জীবকে রিযিক দিচ্ছেন, তোমাদেরকেও দিবেন। (১৬৩)

ঈমানদারদের সাথে কাফেরদের সম্পর্কের ধরন

একদিকে উম্মতে মুসলিমার মধ্যকার লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দ্বীন ও ঈমানের সাথে তাদের ওতপ্রোত জড়িত হওয়ার কথা পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কোন ধরনের হওয়া উচিত।

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكفِرِيْنَ اَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (الِ عمران ٢٨)

-মুমেন ঈমানদারদের ছেড়ে কাফেরদেরকে তাদের বন্ধু কখনো বানাবে না। (আলে ইমরান-২৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْكفِرِيْنَ اَوْ لِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (النّساء ١٤٤)

-হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! মুমেনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানায়ো না। (নিসা ঃ১৪৪)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا و لَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِيْنَ جهدُوْا مِنْكُمْ و لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلاَرَسُوْلِه وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ و لِيجَةً ـ (التوبه ١٦)

-তোমরা কি মনে করে রেখেছো যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে কে সেই লোক যাঁরা তাঁর পথে সংগ্রাম করেছে এবং আল্লাহ-রসূল ও মুমেনীন ছাড়া কাউকে পরম বন্ধু বানায়নি। (তওবা ঃ ১৬)

সুরা তওবার এ আয়াতে সম্বোধন সে সব লোককে করা হয়েছে, যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিল। তাদেরকে বলা হলো যে, যতোক্ষণ না তোমরা এ অগ্নি পরীক্ষা অতিক্রম করে প্রমাণ করেছ যে সত্যিকার অর্থে তোমরা খোদা ও তার দ্বীনকে নিজের

জানমাল ও ভাই-বন্ধু থেকে অধিক প্রিয় মনে কর ততোক্ষণ তোমরা সাচ্চা মুমেন বলে গণ্য হবে না। এখন পর্যন্ত ত প্রকাশ্যতঃ। তোমাদের অবস্থা এই যে, ইসলাম যেহেতু সত্যিকার মুমেনীন ও সাবেকুনাল আওয়ালুন এর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় বিজয়ী হয়েছে এবং সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে, তাই তোমরা মুসলমান হয়েছ।(১৬৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا ابَاءَكُمْ و اِخْوانَكُمْ اَوْلِيَاء اِنِ اسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلَى الايْمَانِ ط و مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُوْلئِك هُمُ الظّلِمُوْنَ ـ قُلْ اِنْ كَانَ ابَاؤُكُمْ و اَبْنَاؤُكُمْ و اِخْوَانُكُمْ و اَزْوَا جُكُمْ و عَشِيْرَتُكُمْ و اَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا و تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا و مسكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّه و رَسُوْلِه و جِهَادٍ فِى سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّى يَاتِىَ اللّهُ بِاَمْرِه ط وَ اللّهُ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الفسِقِيْنَ ـ(التوبه ٢٣-٢٤)

-হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, নিজেদের বাপ-ভাইকেও আপন বন্ধু বানায়ো না, যদি তারা ঈমানের উপর কুফরকে অগ্রাধিকার দেয়। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে তারাই জালেম হবে। হে নবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের বাপ, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব এবং তোমাদের সেসব ধন যা তোমরা উপার্জিত করেছ আর তোমাদের সে ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হওয়া তোমরা ভয় কর এবং তোমাদের সে ঘরদোর যা তোমাদের ভালো লাগে, তোমাদের নিকটে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে অপেক্ষা কর যতোক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত তোমাদের জন্য গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ ফাসেক লোকদের পথ প্রদর্শন করেন না।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حسنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْم وَالَّذِيْنَ معه ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرءؤُا مِنْكُمْ و مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بدَا بَيْنَنَا و بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبغْضَاءُ اَبَدًا حَتّى تُؤْمِنُوْا بِاللّه وحْدَه ـ(الممتحنه ٤)

-তোমাদের জন্য ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে যে তারা নিজেদের জাতিকে স্পষ্ট বলে দিল, আমরা তোমাদের এবং তোমাদের ঐ সব

মাবুদ যাদের তোমরা খোদাকে ছেড়ে পূজা কর–তাদের থেকে বিরাগভাজন হয়ে পড়েছি। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছি এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরদিনের শত্রুতা কায়েম হয়ে গেছে এবং বিরোধ শুরু হয়ে গেছে, যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (মুমতাহেনা ঃ৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاء تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ و قَدْ كَفَرُوْا بِمَاجَاءَ كُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ و اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِى وَ ابْتِغَاء مَرْضَاتِىْ ـ(الممتحنه ١)

-হে ঈমানদার লোকেরা! যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে (ঘরবাড়ী ছেড়ে) বের হয়ে পড়েছ, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানায়ো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ আচরণ কর। অথচ যে হক তোমাদের নিকট এসেছে তা মানতে তারা অস্বীকার করেছে। তারা রসূলকে এবং তোমাদেরকে এ জন্য ঘর থেকে বহিষ্কার করে দেয় যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ । (মুমতাহেনা ঃ ১)

لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُّوْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّهَ و رسُوْلَه و لَوْ كَانُوْا ابَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عشِيْرَتَهُمْ ط اُولئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ـ (المُجادله ـ٢٢)

-তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবেনা যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে, তা তারা তার বাপ হোক, পুত্র হোক, ভাই হোক, পরিবারের লোকজন হোক। এ এমন সব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান অংকিত করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক রুহ দান করে তাকে শক্তি ও সাহায্য দানে ধন্য করেছেন। (মুজাদিলা ঃ ২২)

সূরায়ে মুজাদিলার এ আয়াতে দুটি কথা বলা হয়েছে। একটি নীতিগত এবং অপরটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ।

নীতিগতভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দ্বীনে হকের প্রতি ঈমান এবং দ্বীনের দুশমনের সাথে ভালোবাসা দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দুটির একত্রীকরণ কিছুতেই চিন্তা করা যায় না। এ একেবারে অসম্ভব যে, ঈমান এবং খোদা ও রসূলের দুশমনদের ভালোবাসা এক হৃদয়ে একত্র হতে পারে না। যেমন ধারা এক ব্যক্তির মনে আপন ব্যক্তিসত্তার প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের দুশমনদের প্রতি ভালোবাসা উভয়ই একই সময়ে একত্রে মিলিত হতে পারে না। অতএব তোমরা যদি কাউকে এমন দেখ যে, সে ঈমানের দাবীও করছে

এবং সেই সাথে সে এমন সব লোকের সাথে ভালোবাসার সম্পর্কও রাখে যারা ইসলাম বিরোধী, তাহলে তোমাদের এ বিভ্রান্তির শিকার হওয়া উচিত হবে না যে, সম্ভবতঃ সে তার এমন আচরণ সত্ত্বেও ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। এভাবে যেসব লোক ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে একই সাথে একই সম্পর্ক স্থাপন করে রেখেছে, তারা স্বয়ং নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে যেন ভালোভাবে চিন্তা করে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি। মুমেন, না মুনাফিক? যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র সততাও থাকে এবং নিজেদের মধ্যে কিছুটা এ অনুভূতিও রাখে যে, নৈতিক দিক দিয়ে মুনাফেকী মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম আচরণ তাহলে তাদের এক সাথে দুই নৌকায় আরোহণ করার চেষ্টা পরিহার করা উচিত। ঈমান ত তাদের কাছে স্থির সিদ্ধান্ত চায়। মুমেন থাকতে চায় ত সে প্রত্যেক আত্মীয়তা ও সম্পর্ক পরিহার করতে হবে-যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। ইসলামের সম্পর্ক থেকে অন্য সম্পর্ক অধিকতর প্রিয় বলে গ্রহণ করলে, ঈমানের মিথ্যা দাবী পরিহার করতে হবে।

এত হলো নীতিগত কথা। কিন্তু আল্লাহতায়ালা এখানে শুধু নীতি বয়ান করাই যথেষ্ট মনে করেননি। বরঞ্চ এ প্রকৃত ঘটনাও ঈমানের দাবীদারদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন যে, যারা সত্যিকার মুমেন ছিলেন-তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সকলের চোখের সামনে সকল ওসব সম্পর্ক ছিন্ন করেন যা আল্লাহর দ্বীনের সাথে প্রতিবন্ধক ছিল। এ এমন এক বাস্তব ঘটনা যা বদর ও ওহোদের যুদ্ধে সমগ্র আরব দেখতে পেয়েছিল। মক্কা থেকে যেসব সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, তাঁরা শুধু খোদা ও তাঁর দ্বীনের খাতিরে স্বয়ং আপন আপন গোত্র ও নিকট আত্মীয়দের সাথে লড়াই করেন।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন জাররাহকে কতল করেন। হযরত মাসয়াব বিন ওমাইর (রা) আপন ভাই ওবাইদ বিন ওমাইরকে কতল করেন। হযরত ওমর (রা) তাঁর মামু আস বিন হিশাম বিন মুগীরাকে কতল করেন। হযরত আবু বকর (রা) আপন পুত্র আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৈরী হন। হযরত আলী (রা) হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত ওবায়দাহ বিন আল হারেস ওতবা, শায়বা ও অলীদ বিন ওকবাকে হত্যা করেন, যারা তাঁদের নিকট আত্মীয় ছিল। হযরত ওমর (রা) বদর যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে নবীর (সা) কাছে আবেদন জানান যে, এ সকলকে হত্যা করা হোক এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তার আত্মীয়কে হত্যা করবে। এ বদর যুদ্ধে হযরত মাসয়াব বিন উমাইরের সহোদর ভাই আবু আযীয বিন উমাইরকে একজন আনসারী ধরে বাঁধছিলেন। হযরত মাসয়াব তা দেখে চিৎকার করে বল্লেন, তাকে শক্ত করে বাঁধ। তার মা বড়ো মালদার। মুক্তির জন্য তোমাকে প্রচুর মুক্তিপণ দেবে। আবু আযীয বলে, তুমি ভাই হয়ে এমন কথা বলছ? হযরত মাসয়াব জবাবে বলেন, এ সময়ে তুমি আমার ভাই নও। বরঞ্চ এ আনসারী আমার ভাই যে তোমাকে গ্রেফতার করছে। এ বদর যুদ্ধেই স্বয়ং নবী (সা)-এর চাচা আব্বাস এবং জামাই আবুল আস (নবীকন্যা হযরত যয়নবের (রা) স্বামী) বন্দী হন। কিন্তু তাদের সাথে রসূলের (সা) আত্মীয়তার ভিত্তিতে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি যা অন্যান্য বন্দীদের থেকে কিছুটা ভিন্নরূপ হতো। এভাবে বাস্তব ঘটনার জগতে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, খাঁটি মুসলমান কেমন হয়ে থাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন হয়ে থাকে।

দায়লামী হযরত মুয়ায (রা) থেকে রসূলুল্লাহ (সা) এর এ দোয়াটি উধৃত করেছেন-

-হে খোদা! কোন ফাজেরকে (অন্য এক বর্ণনায় কোন ফাসেককে) আমার উপর দয়া প্রদর্শন করতে দিওনা-যাতে আমার মনে তার জন্য কোন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কারণ

তোমার নাযিল করা অহীতে আমি একথা পেয়েছি যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের দ্বীনের উপর ঈমান রাখে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে পাবে না। (১৬৫)

কারো খাতিরে ঈমান পরিত্যাগ করা যায় না

و وَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُه فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْك ط اِلَىَّ الْمَسِيْرُ - و اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِك بِىْ مَا لَيْس لَك بِه عِلْمٌ لا فَلاَ تُطِعْهُمَا و صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا - (لقمان ١٤-١٥)

-আমরা মানুষকে পিতা-মাতার হক জানার জন্য স্বয়ং তাকীদ করেছি। তার মা বহু কষ্ট স্বীকার করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। দু'বছর তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে। (এ জন্য আমরা তাকে নসিহত করেছি যে) আমার এবং পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যদি তারা তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে যে, আমার সাথে এমন কাউকে শরীক বানাবে-যাকে তুমি আমার শরীক জাননা, তাহলে তাদের কথা কখনো মানবে না। অবশ্যি দুনিয়ায় তাদের সাথে সদাচরণ করবে।
(লোকমান ঃ ১৪-১৫)

ووَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدك لِتُشْرِك بِىْ مَا لَيْس لَك بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ط - (العنكبوت ٨)

-আমরা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের হেদায়েত দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করার জন্য যাকে আমার শরীক হিসাবে তুমি জান না, তাহলে তাদের কথা মেনে নিও না।
(আন কাবুত ঃ ৮)

সূরায়ে আনকাবুতের এ আয়াত সম্পর্কে মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ীর বর্ণনা এই যে, এ হযরত সাদ' বিন আবি ওক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি ১৮/১৯ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মা হামনা বিনতে সুফিয়ান বিন উমায়্যা। (আবু সুফিয়ানের ভাতিজি) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর পুত্র মুসলমান হয়েছে, তখন তিনি বল্লেন, যতোক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে (সা) অস্বীকার না করেছ, আমি পানাহার করব না। ছায়াতে গিয়েও বসবো না। মায়ের হক আদায় করা ত আল্লাহর হুকুম। আমার কথা না মানলে ত আল্লাহরও নাফরমানী করা হবে।

হযরত সা'দ এতে ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েন এবং রসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে সব কথা বল্লেন, এ ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হলো। সম্ভবতঃ এ অবস্থার সম্মুখীন

অন্যান্য যুবকরাও হয়েছিলেন যারা মক্কায় প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন। এ জন্য এ বিষয়টি সূরা লোকমানের ঐ আয়াতেও অত্যন্ত জোরালোভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যা আমরা উপরে উধৃত করেছি।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টিকূলের মধ্যে মানুষের উপর যদি কারো সবচেয়ে বড়ো হক থাকে, তাহলে তো মা বাপের কিন্তু মা বাপও যদি শির্ক করতে বাধ্য করে তাহলে তাদের কথা মেনে নেয়া চলবে না। অন্য কারো কথায় এমনটি করাত দূরের কথা। নির্দেশের শব্দগুলো ছিল وان جاهدك অর্থাৎ তারা উভয়ে যদি তোমাকে বাধ্য করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এর থেকে জানা গেল যে, অপেক্ষাকৃত কমস্তরের চাপ সৃষ্টি অথবা মা বাপের মধ্যে কোন এক জনে চাপ সৃষ্টি ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এই সাথে ما ليس لك به علم প্রণিধানযোগ্য। এর অর্থ যাকে তুমি আমার শরীক হিসাবে জান না। মা বাপের কথা না মানার এক ন্যায়সংগত যুক্তি দেয়া হয়েছে। মা বাপের এ হকও অবশ্যই রয়েছে যে,সন্তান তাদের খেদমত করবে। তাদের সম্মান শ্রদ্ধা করবে। তাদের জায়েয কথা মেনে চলবে। কিন্তু এ অধিকার কারো নেই যে, তার জ্ঞানের পরিপন্থী মা বাপের অন্ধ অনুসরণ করবে। পুত্র অথবা কন্যা শুধু এ কারণে একটি ধর্মের অনুসরণ করবে যে, এ তাদের পিতার ধর্ম এ কখনো সংগত হতে পারে না। সন্তানেরা যদি জানতে পারে যে, মা বাপের ধর্ম ভ্রান্ত, তাহলে সে ধর্ম পরিত্যাগ করে কোন সঠিক ধর্ম গ্রহণ করা তাদের উচিত। পিতামাতার চাপ সৃষ্টির পরও সে পদ্ধতি মেনে চলা উচিত নয়- যার পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট। আর এ আচরণ যখন পিতামাতার সাথে, তখন দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই হতে পারে। কোন ব্যক্তিরই অন্ধ অনুসরণ ঠিক নয়। যতোক্ষণ না জানা যায় যে, সে ব্যক্তি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১৬৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ امَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ط وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ - وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ - (العنكبوت ١٢-١٣)

এ কাফেরেরা ঈমানদারদেরকে বলে, তোমরা আমাদের তরিকা অনুসরণ কর এবং তোমাদের ভুলত্রুটির বোঝা আমরা বহন করব। অথচ তাদের ভুল-ত্রুটির কোন কিছুই তারা বহন করবে না। তারা একেবারে মিথ্যা কথা বলছে। হ্যাঁ, অবশ্যই তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যান্য বহু বোঝাও। আর কিয়ামতের দিন তারা যেসব মিথ্যাপ্রচারণা চালাচ্ছে তার জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। (আনকাবুত ঃ ১২-১৩)

কাফেরদের এ উক্তির অর্থ এ ছিল যে, মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর, হিসাব দান, পুরস্কার প্রভৃতি কথাগুলো ধোকা, প্রতারণা, কিন্তু যদি কোন মরনোত্তর জীবন থেকেই থাকে এবং সেখানে যদি কোন জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়, তাহলে আমরা এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, খোদার সামনে সকল শাস্তি আমরা নিজের কাঁধে গ্রহণ করছি। আমরা বলছি

তোমরা এ নতুন ধর্ম ছেড়ে দাও এবং পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে আস।

বিভিন্ন কুরাইশ সর্দার সম্পর্কে এ কথা বর্ণিত আছে যে, প্রথমদিকে যারা ইসলাম কবুল করতেন। তাদের সাথে দেখা করে এসব লোক এ ধরনের কথাই বলতো। হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি ঈমান আনেন, আবু সুফিয়ান ও হারব বিন উমায়্যা বিন খালাফ তাঁর সাথে দেখা করে এমন কথাই বলেছিল।

এ কারণেই বলা হয়েছে যে, প্রথমতঃ এ ত সম্ভবই নয় যে, কোন ব্যক্তি খোদার সামনে অন্য কারো দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করবে এবং কারো বলার দরুন গোনাহগার ব্যক্তি স্বয়ং নিজের গোনাহের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। কারণ ওখানে ত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কর্মের জন্য নিজে দায়ী হবে।

لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى-

কিন্তু যদি এমন হয়ও তথাপি যখন কুফর ও শির্কের পরিণাম একটি প্রজ্জ্বলিত জাহান্নামের আকারে সামনে আসবে, তখন কার এ সাহস হবে যে দুনিয়াতে যে ওয়াদা করেছিল তার জন্য চক্ষুলজ্জার খাতিরে এ কথা বলবে, হুজুর! আমার কথায় যে ব্যক্তি ঈমান পরিত্যাগ করে ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের পথ অবলম্বন করেছিল আপনি তাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতে পাঠিয়ে দিন। আর আমি আমার কুফরের সাথে তার কুফরের শাস্তিও ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। (১৬৭)

কাফেরদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা নিষিদ্ধ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ-(التوبه :١١٣)

-নবী ও ঈমানদারদের এ কাজ নয় যে তারা মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া করবে। তা তারা তাদের আত্মীয় হোন না কেন, যখন তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য। (তওবা ঃ ১১৩)

কোন ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আবেদন করার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ তার প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা পোষণ করা হয়। দ্বিতীয়ত ঃ তাঁর ক্রটি ক্ষমার যোগ্য মনে করা হয়না। একথাগুলোত সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু শুধু গোনাহগার। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্য বিদ্রোহী, তার প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার অপরাধ ক্ষমারযোগ্য মনে করা শুধু নীতিগতভাবেই ভুল নয়, বরঞ্চ এর থেকে আমাদের (ক্ষমা প্রার্থনাকারী) আনুগত্যই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। আমরা যদি শুধু আত্মীয়তার কারণে এটা চাই যে, তাকে মাফ করে দেয়া হোক, তাহলে তার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আমাদের নিকটে আত্মীয়তার সম্পর্ক খোদার আনুগত্যের দাবীর তুলনায় অধিক মূল্যবান। তার অর্থ এটাও যে, খোদাও তাঁর দ্বীনের সাথে আমাদের ভালোবাসা নিঃস্বার্থ ও পক্ষপাতশূন্য নয়। আর যে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক আমরা খোদাদ্রোহীদের সাথে রাখি আমরা চাই যে, খোদা স্বয়ং সে সম্পর্ক কবুল করে নিন এবং আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে অবশ্যই যেন ক্ষমা করে দেন, তা সে একই অপরাধে অপরাধী অন্যান্যদেরকে

তিনি জাহান্নামে ঠেলে দিন না কেন। এ সব কিছুই ভ্রান্ত। নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরিপন্থী। আর সে ঈমানেরও পরিপন্থী যার দাবী এই যে, খোদা ও তাঁর দ্বীনের সাথে আমাদের ভালোবাসা হবে একেবারে পক্ষপাতহীন। খোদার বন্ধু আমাদের বন্ধু এবং তাঁর দুশমন আমাদের দুশমন। এ জন্যই আল্লাহতায়ালা এ কথা বলেননি, "মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো না"- বরঞ্চ এভাবে বলেছেন, "তোমাদের জন্য এ শোভনীয় নয়, তোমাদের এ কাজ নয় যে, তোমরা তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে। অর্থাৎ আমার নিষেধ করার পর তোমরা যদি বিরত থাক, তাহলে তা কোন কাজের কাজ হলো না। তোমাদের মধ্যে আনুগত্যের অনুভূতি এতো তীব্র হওয়া উচিত যে, যারা আমার বিদ্রোহী তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা এবং তার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য মনে করা তোমাদের কাছে স্বয়ং নিজের জন্যই অশোভনীয় মনে হবে।

এখানে এতোটুকু আরও বুঝে নেয়া উচিত যে, খোদাদ্রোহীদের সাথে সহানুভূতি পোষণ যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সেই সহানুভূতি যা শুধু দ্বীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু মানবিক সহানুভূতি, পার্থিব সম্পর্কে ঘনিষ্ট আত্মীয়ের প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন, দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহপূর্ণ আচরণ নিষিদ্ধ নয়। বরঞ্চ প্রশংসনীয়। আত্মীয় কাফের হোন অথবা মুমেন, তার পার্থিব অধিকার অবশ্যই পূরণ করতে হবে। বিপন্ন লোককে সাহায্য করতে হবে। অভাবগ্রস্তদের জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। রোগী ও আহতদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতির কোন ত্রুটি করা চলবে না। এতিমদের কথায় স্নেহ বাৎসল্যের হাত রাখতে হবে। এসব ব্যাপারে কখনো এ পার্থক্য রাখা যাবে না যে কে মুসলিম এবং কে অমুসলিম।

তাদের সাথে বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কও নিষিদ্ধ

لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ و لاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ - (الْمُمتَحِنه ١٠)

-না মুসলিম নারী কাফেরদের জন্য হালাল, আর না কাফের তাদের জন্য হালাল। (মুমতাহেনা ঃ ১০)

و لاَ تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - (الممتحنه : ١٠)

-আর (তোমরাও স্বয়ং কাফের নারীদেরকে নিজেদের বিবাহ বন্ধনে বেঁধে রেখো না। (মুমতাহেনা ঃ ১০)

অবশ্য এ নির্দেশে এ পার্থক্য রয়েছে যে, আহলে কিতাবের নারীদেরকে মুসলমান পুরুষ বিয়ে করতে পারে, যেমন সূরায়ে মায়েদার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে এখন মুসলিম নারীদের ব্যাপারে কথা এই যে, তারা মুসলমান পুরুষ ব্যতীত কারো জন্যেই হালাল বা জায়েয নয়।

و لاَ تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَت حَتّى يُؤْمِنَّ ط وَلاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّى يُؤْمِنُوْا ط و لَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ - (البقره ٢٢١)

-তোমরা মুশরিক নারীকে কখনো বিয়ে করবে না। যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মুমেন বাঁদী, একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক বংশের নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাকে তোমাদের খুব ভালো লাগে। মুশরিক পুরুষের নিকট নিজেদের মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে দিও না যতোক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন মুমেন গোলাম একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক থেকে শ্রেয় যদি তাকে তোমাদের খুব পছন্দ হয়। (বাকারাহ ঃ ২২১)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-

لاَيَرِثُ المسلمُ الكافر ولا الكافرُ المُسلِم -

(بخارى ، مُسلِم، نَسَائِى ، احمد، تِرمِذى، ابن ماجه ، ابو داؤد)

-না মুসলমান কাফেরের ৫ ধিকারী হতে পারে আর না কাফের মুসলমানের উত্তরাধিকারী হতে পারে। (বোখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ)।

কাফের দু ধরনের এবং তাদের সাথে আচরণে পার্থক্য

এভাবে উম্মতে মুসলেমাকে কাফেরদের থেকে পুরোপুরি পৃথক করে দেয়ার পর শুধু একদিক দিয়ে দু ধরনের কাফেরদের মধ্যে মুসলমানদের আচরণে পার্থক্য করা হয়েছে। তাহলো এই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এ কাজে বাধা দেয় না যে, তোমরা ঐ সব লোকের সাথে সদাচার ও সুবিচার করবে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং সে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়নি। যারা ইনসাফ করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন। তিনি তোমাদেরকে যে কাজ করতে বাধা দেন তাহলো এই যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে-যারা দ্বীনের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে একে অপরের সাহায্য করেছে, এদের সাথে যারা বন্ধত্ব করবে তারা জালেম। (মুমতাহেনা ঃ ৮-৯)

অন্য কথায় মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শত্রু কাফের এবং অশত্রু কাফেরের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতে আচরণ করতে হবে। ঐসব কাফেরের সাথে সদাচরণ করতে হবে যারা তাদের সাথে কখনো মন্দ আচরণ করেনি। এর উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ একটি ঘটনায় পাওয়া যায়। তা এই যে, হযরত আবু বকরের (রাঃ) এক স্ত্রী ছিলেন কাফের যাঁর গর্ভে হযরত আসমা বিনতে আবি বকর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মক্কাতেই রয়ে যান। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন মক্কা মদীনার লোকদের মধ্যে যাতায়াত শুরু হয় তখন হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাফের স্ত্রী মেয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। সাথে কিছু উপঢৌকনও নিয়ে আসেন।

স্বয়ং হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, তারপর আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহকে (সা) গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমার মায়ের সাথে দেখা করতে পারি কিনা এবং আত্মীয়তাসুলভ আচরণ করতে পারি কিনা। হুযুর (সা) বল্লেন, হ্যাঁ, দেখাও কর এবং আত্মীয়সুলভ আচরণও কর (মুসনদে আহমদ, বোখারী, মুসলিম) এর থেকে এ সিদ্ধান্তই হয় যে, একজন মুসলমানের জন্য তার কাফের মা বাপ, ভাইবোন ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করা জায়েয যদি তারা ইসলামের দুশমন না হয়। এভাবে একজন যিম্মী মিসকিনকে সদকা দান করাও যেতে পারে (আহকামুল কুরআন, রুহুল মায়ানী)।(১৬৯)

উম্মতে মুসলিমার সত্যিকার মর্যাদা

এভাবে যে জামায়াত (দল) অস্তিত্ব লাভ করেছিল তা কোন অর্থেই জাতি ছিল না। তার প্রকৃত মর্যাদা সেসব শব্দ ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় যা কুরআন ও হাদীসে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিযব

একটি শব্দ 'হিযব' যা দুটি স্থানে মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (মায়েদা আয়াত ৫৬, মুজাদালা আয়াত ২২)। এ শব্দটি যথার্থই পার্টি বা দলের সমার্থক। উভয় স্থানেই মুসলমানদেরকে 'হিযবুল্লা' (আল্লাহর দলের লোক) বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেইদলের লোক যারা নিজেদেরকে আল্লাহর কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। জাতি গঠিত হয় বংশ ও পরিবারের ভিত্তিতে এবং দল গঠিত হয় নীতি ও মতাদর্শের ভিত্তিতে। এ দিক দিয়ে মুসলমান প্রকৃতপক্ষে কোন জাতি নয়, বরঞ্চ একটি দল। কারণ তাদেরকে সমগ্র দুনিয়া থেকে পৃথক করে একে অপরের সাথে শুধু এ জন্য সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, এ একটি নীতি ও মতবাদের বিশ্বাসীও তার অনুসারী। আর যেসব লোকের সাথে তাদের নীতি ও মতবাদের মিল নেই, তারা এদের অতি নিকট আত্মীয় হলেও তাদের সাথে এদের কোন মিল নেই।

কুরআন পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র দুটি দলই দেখে। একটি আল্লাহর দল (হিযবুল্লাহ), অপরটি শয়তানের দল (হিয্বুশ শয়তান)। শয়তানের দলে নীতি ও মতবাদের দিক দিয়ে যতোই মতপার্থক্য থাক না কেন, কুরআন তাদের সকলকে একই বলে গণ্য করে। কারণ, তাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামী নয় এবং ছোটখাটো মতপার্থক্য সত্ত্বেও সকলে শয়তানের আনুগত্যে একমত। কুরআন বলে

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ - اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ - اَلاَ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (الْمُجَادله ١٩)

-শয়তান তাদের উপর কর্তৃত্বশীল হয়েছে এবং সে তাদের দিল থেকে খোদার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা হলো শয়তানের দলের লোক। সাবধান থেকো। শয়তানের দলের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। (মুজাদালা ঃ ১৯)

ঠিক এর বিপরীত আল্লাহর দলের লোক বংশ, জন্মভূমি, বর্ণ, ভাষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক দিয়ে পরস্পর যতোই ভিন্ন হোক না কেন, বরঞ্চ তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে পারস্পরিক খুনাখুনির শত্রুতা থাক না কেন, যখন তারা খোদা বর্ণিত চিন্তা ও জীবন পদ্ধতিতে একমত হয়ে গেল, তখন তারা যেন খোদায়ী সূত্রে (হাবলুল্লাহ) একত্রে আবদ্ধ হয়ে গেল এবং এ নতুন দলে শামিল হওয়ার সাথে সাথে তাদের সকল সম্পর্ক শয়তানের দলওয়ালাদের সাথে ছিন্ন হয়ে গেল।

উম্মত

দ্বিতীয় শব্দ যা দলের অর্থে কুরআনের চার স্থানে (বাকারা ঃ ১২৮, ১৪৩, আলে ইমরান ঃ ১০৪, ১১০) ব্যবহৃত হয়েছে, সে শব্দটি হচ্ছে 'উম্মত'। হাদীসেও এ শব্দটি বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'উম্মত' ঐ দলকে বলে যাকে কোন ব্যাপক বিষয়াদি একত্রে মিলিত

করেছে। যেমন এক সময়কালের লোককে 'উম্মত' বলা হতো। এক বংশ বা এক দেশের লোককেও উম্মত বলা হতো। কিন্তু মুসলমানদেরকে যে প্রকৃত সার্বজনীনতার ভিত্তিতে উম্মত বলা হয়, তা বংশ, জন্মভূমি অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, বরঞ্চ তা হচ্ছে তাদের 'জীবনের মিশন, তাদের দলের মূলনীতি এবং জীবনের চলার পথ। বস্তুত কুরআন বলে-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - (اٰلِ عمران ١١٠)

-তোমরা সেই উৎকৃষ্ট 'উম্মত' যাকে মানবজাতির জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের হুকুম কর এবং অসৎ কাজে বাধা দাও এবং খোদার উপর ঈমান রাখ।
(আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا - (بقرة ١٤٣)

-এবং এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যবর্তী উম্মত বানিয়েছি- যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য তত্ত্বাবধায়ক হতে পার এবং রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হোন।
(বাকারা ঃ ১৪৩)

এ আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, 'মুসলমান' প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক দল। দুনিয়ার সকল জাতি থেকে সেসব লোক বেছে বের করা হয়েছে যারা এক বিশেষ নীতি মেনে চলতে, এক বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়নে এবং একটি মিশন আঞ্জাম দেয়ার জন্য তৈরী। এসব লোক যেহেতু প্রত্যেক জাতি থেকে বের হয়ে এসেছে এবং একটি দলে পরিণত হওয়ার পর কোন জাতির সাথে সম্পর্ক থাকে না, সে জন্য এসব মধ্যকার উম্মত। কিন্তু সকল জাতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সকল জাতির সাথে এদের এক দ্বিতীয় সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। তা এই যে, এরা দুনিয়ায় খোদায়ী সিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করবে। "তোমরা মানব জাতির তত্ত্বাবধায়ক" শব্দগুলো এ কথা বলে যে, মুসলমানকে খোদার পক্ষ থেকে দুনিয়ায় সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং "মানবজাতির জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে" শব্দগুলো স্পষ্ট এ কথা বলছে যে, মুসলমানদের মিশন এক আন্তর্জাতিক মিশন। এ মিশনের সার কথা এই যে, 'হিযবুল্লাহর' নেতা সাইয়েদুনা মুহাম্মদকে (সা) চিন্তা ও কাজের যে বিধান খোদা দিয়েছিলেন- তাকে সমগ্র মানসিক, নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি যেন দুনিয়ায় কার্যকর করতে পারেন এবং তার মুকাবেলায় অন্যান্য সকল বিধান ও পদ্ধতি পরাভূত করতে পারেন- ليظهره على الدين كله এ হচ্ছে সেই বস্তু, যার ভিত্তিতে মুসলমানকে এক উম্মত বানানো হয়েছে।

জামায়াত

তৃতীয় পারিভাষিক শব্দ যা মুসলমানদের সামষ্টিক পদমর্যাদা তুলে ধরার জন্য নবী (সা) বহু স্থানে ব্যবহার করেছেন, সে শব্দটি হচ্ছে 'জামায়াত' আর এ শব্দটিও 'হিয্‌ব' এর মতো দলের সমার্থক। يد الله على الجماعة এবং عليكم بالجماعة এবং এ ধরনের বহু হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করলে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) 'কওম' অথবা শা'ব شعب অথবা তার সমার্থক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা থেকে দূরে থেকেছেন এবং তার পরিবর্তে জামায়াত পরিভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো এ কথা বলেননি যে, হামেশা কওমের সাথে থাক। অথবা কওমের উপর খোদার হাত রয়েছে। বরঞ্চ এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে তিনি "জামায়াত" শব্দই ব্যবহার করতেন। তার কারণ শুধু এই যে, এবং এই হতে পারে যে, মুসলমানদের একত্রে মিলিত হওয়ার ধরন প্রকাশ করার জন্য অধিকতর ন্যায়সঙ্গত; 'কওম' শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে দিক দিয়ে এক ব্যক্তি যে কোন মতবাদ ও যে কোন নীতির অনুসারী হোক না কেন, একটি জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে যদি সে ঐ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং নিজের নাম, জীবন পদ্ধতি এবং সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে সে জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়।

আদর্শিক দল ও জাতীয় দলের মধ্যে পার্থক্য

এখন এক দল ত এমন যার দৃষ্টিতে একটি জাতি অথবা দেশের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কর্মকৌশলের এক বিশেষ মতবাদ ও কর্মসূচী থাকে। এ ধরনের দল নিছক একটি রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে। এ জন্য সে জাতির অংগ অংশ হয়ে কাজ করতে পারে এবং করে যার মাধ্যমে সে জন্মগ্রহণ করে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে এমন, যে বিশ্বজনীন মতবাদ ও ধারণা নিয়ে আবির্ভূত হয়। যার কাছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে জাতি ও জন্মভূমি নির্বিশেষে থাকে এক বিশ্বজনীন মতবাদ। যে গোটা জীবনকে এক বিশেষ ধরনের গড়ে তুলতে চায়। যার মতবাদ ও জীবনপদ্ধতি, আকীদাহ ও চিন্তাধারা এবং নীতি-নৈতিকতা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও সামাজিক-সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার বিশদ বিবরণ, পর্যন্ত প্রতিটিকে নিজস্ব ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চায়। যে একটি স্থায়ী সংস্কৃতি এবং এক বিশেষ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করে। এটাও যদিও একটি দল, কিন্তু এ ধরনের দল নয় যা কোন জাতির অঙ্গ হিসাবে কাজ করতে পারে। এ সীমিত জাতীয়তার উর্ধে হয়ে থাকে। এর মিশনই এ হয় যে, সে ঐসব অন্ধ গোঁড়ামি উৎখাত করবে যার দরুন দুনিয়ায় বংশ, বর্ণ, ভাষা, জন্মভূমি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এ দল নিজেকে ওসব জাতির সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করতে পারে? এত বংশজাত ও ঐতিহাসিক জাতীয়তার পরিবর্তে একটি বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন জাতীয়তা (Rational nationality) স্থবির করে। সৃষ্টির জাতীয়তার স্থলে এ এক সম্প্রসারণশীল (Expanding Nationality) সৃষ্টি করে। এ স্বয়ং এমন এক জাতীয়তায় রূপান্তরিত হয় যা চিন্তা ও সংস্কৃতির ঐক্যের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল জনশক্তিকে আপন পরিবেষ্টনে আনতে তৈরী হয়। কিন্তু এ অর্থে একটি জাতীয়তা হওয়া সত্ত্বেও এ একটি দলই রয়ে যায়। কারণ এতে শামিল হওয়াটা আকস্মিক জন্মগ্রহণের উপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ নির্ভর করে সেই মতবাদ ও জীবনপদ্ধতি জ্ঞাতসারে অনুসরণের উপর যার ভিত্তিতে এ দল গঠিত হয়।

মুসলমান প্রকৃতপক্ষে এ দ্বিতীয় প্রকার দলের নাম। এ ঐ ধরনের দল নয় যেমন একটি জাতির মধ্যে গঠিত হয়ে থাকে। বরঞ্চ এ এমন এক ধরনের দল যা একটি সার্বিক জীবন ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তাগুলোর সংকীর্ণ সীমান্ত অতিক্রম করে বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন বুনিয়াদের উপর একটি বৃহৎ বিশ্বজনীন জাতীয়তা (World Nationality) গঠন করতে চায়। একে জাতি বলা এ দিক দিয়ে ঠিক হবে যে, সে নিজেকে দুনিয়ার বংশগত ও ইতিহাস-ঐতিহ্যগত জাতিগুলোর মধ্যে কোন একটির সাথে ভাবাবেগবশতঃ সম্পৃক্ত হতে তৈরী নয়। বরঞ্চ আপন জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজদর্শন অনুযায়ী স্বয়ং আপন সাংস্কৃতিক প্রাসাদ পৃথকভাবে নির্মাণ করে। কিন্তু এ অর্থে একটি পৃথক জাতি হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে এ একটি দলই রয়ে যায়। কারণ নিছক আকস্মিক জন্মগ্রহণ (Mere Accident of Birth) কোন ব্যক্তিকে এ দলের সদস্য বানাতে পারে না, যতোক্ষণ না সে এর মতবাদে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হয়। এভাবে কোন ব্যক্তির অন্য কোন জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয় না যে, সে আপন জাতি থেকে বেরিয়ে এসে এ দলে যোগদান করবে যদি এর মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে প্রস্তুত হয়। অতএব, আমরা যা কিছু বল্লাম, প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ এই যে, মুসলমানদের জাতীয়তা তাদের একটি দল হওয়ার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। দলীয় মর্যাদা হলো মূল এবং জাতীয়তার মর্যাদা তার শাখা, দলীয় মর্যাদা তার থেকে পৃথক করা হলে এ নিছক একটি জাতি হয়ে থাকে এবং সেটা হয় তার অধঃপতন। বরঞ্চ এ প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে তার অস্তিত্বের অস্বীকৃতি।(১৭০)

আলোচনার সারসংক্ষেপ

রসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে উম্মতে মুসলেমার এ পৃথক সংগঠন এবং অমুসলিম সমাজ থেকে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সমাজ গঠন যদিও রাতারাতি না হয়ে ক্রমশঃ কয়েক বছরে সম্ভব হয়, তথাপি ইসলামী দাওয়াতের রচনা যে ধরনের হয়েছিল, তাতে লোক ধরে নিয়েছিল যে, এ আন্দোলন কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং অবশেষে এ কোন্ বিপ্লব আনয়ন করবে। এ জন্য প্রাচীন জাহেলী সমাজকে যারা সংরক্ষিত করতে চাইছিল, তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং নিজেদের মধ্য থেকে এ নতুন উম্মতের আবির্ভাব প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করলো।(১৭১)

সপ্তম অনুচ্ছেদ

নবী ও অনবীর কাজের পার্থক্য

এ আলোচনার শেষে আমরা প্রয়োজনবোধ করছি যে, যা কিছু এ পর্যন্ত বলা হলো, তার উপর একজন নবী এবং একজন অনবীর নেতৃত্ব ও কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সা) যখন আরবে ইসলামী দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট হন, তখন সমগ্র জগতের এবং তাঁর আপন দেশেও অগণিত নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ছিল যার সমাধান ছিল অপরিহার্য। রোম ও ইরান সাম্রাজ্যদ্বয় স্বৈরাচারের শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল। বংশীয় ও শ্রেণী বৈষম্য চরম পর্যায়ে ছিল। দুর্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার ছিল অসহনীয়। বিভিন্ন ধরনের অবৈধ অর্থনৈতিক শোষণও চলছিল পুরোদমে। নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক অনাচার ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কি এবাদতখানা পর্যন্ত অশ্লীল ক্রিয়াকর্মের আড্ডায় পরিণত হয়ে পড়েছিল। আরব এসব দেশের তুলনায় অধিকতর সমস্যায় জর্জরিত ছিল। একই দেশে বসবাসকারী এবং একই ভাষাভাষী জাতি অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত ছিল যদিও তাদের মধ্যে কুল ও বংশের দিক দিয়ে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। তাদের মধ্যে 'আরব জাতির' ধারণাও ছিল না। লোক নিজের গোত্রকেই আপন জাতি মনে করতো। চারিদিকে বিশৃংখলা, গৃহযুদ্ধ, নিরাপত্তাহীনতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধঃপতন, অত্যাচার-নিপীড়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য প্রকট ছিল। বিদেশী শক্তিসমূহ আরবের এ সব দুর্বলতার সুযোগে দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে চলছিল। উত্তর দিকে হেজাজের সীমান্ত পর্যন্ত রোমের দখলদারি পৌঁছে গিয়েছিল। রোম সরকার আরবের অভ্যন্তরে অর্থ ও মিশনারী ছড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করছিল। পশ্চিম তীরের বিপরীত দিকে অবস্থিত আবিসিনিয়ার খৃস্টান রাজ্য বহুকাল যাবত ইয়ামেনের উপর আক্রমণ ও তা হস্তগত করতে থাকে। এমনকি একবার মক্কা পর্যন্ত তার সৈন্যবাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল। ইরান আরবের পূর্ব তীর এবং ভেতরের কিছু অঞ্চলের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে ইয়ামেন পর্যন্ত তার আধিপত্য পৌঁছে গিয়েছিল। হেজাজের অধিকাংশ উর্বর ক্ষেত্রসমূহে বাইর থেকে আগত ইহুদীগণ কয়েক শতাব্দী যাবত তাদের দখলদারি কায়েম করে রেখেছিল। তারা তাদের সুদখুরির জালে আরববাসীদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

এহেন অবস্থায় যদি কোন সংস্কারক ধরনের নেতার আরবে আবির্ভাব ঘটতো, তাহলে সে তার কাজের সূচনা হয়তো জাহেলী রেসম ও রেওয়াজ, নৈতিক অনাচার এবং পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করার চেষ্টার দ্বারা করতো। অথবা ধনী ও দরিদ্রের ধুয়া তুলে ধনীদের বিরুদ্ধে গরীবদের ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করে দিত যাতে করে সাধারণ মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় এবং দারিদ্র দূর হয়। আর যদি কোন রাজনৈতিক ধরনের নেতার আবির্ভাব হতো, তাহলে সে আরববাসীদেরকে এই বলে প্রলুব্ধ করে তার অনুগামী করার চেষ্টা করতো "আমি তোমাদেরকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করব, বাইরের

লুটেরাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব, আরব দেশকে একটি বিরাট রাজ্যে পরিণত করে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলার উন্নয়ন সাধন করব। তোমাদের অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান বর্ধিত করব, তোমাদের ক্ষুধা দূর করব এবং শক্তি অর্জন করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উপর আগ্রাসন চালাব যাতে তোমাদের ধনদৌলত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।"

এ সমুদয় কাজে চরিত্রের কোন প্রশ্নই উঠতো না এবং সে তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব সফলকাম করার জন্যে কোন প্রতারণা, কোন ষড়যন্ত্র, ছলচাতুরী, বলপ্রয়োগ এবং গণহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে কণামাত্র দ্বিধাবোধ করতো না। তারপর উভয় ধরনের নেতৃত্ব একটি জাতীয়তাবদী নেতৃত্বই হতো। স্বীয় গোত্রের গোঁড়ামির উর্ধে উঠলেও বড়জোর আরব গোঁড়ামি পর্যন্ত পৌঁছে যেতো। অন্য জাতি ও দেশের প্রতি তার দৃষ্টি প্রসারিত হলেও তা আরবের স্বার্থের জন্যই হতো। মানবতার বিশাল ও বিস্তৃত ধারণা পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারতো না।

ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি

প্রথমে একটু খোদাপ্রেরিত রসূলুল্লাহকে (সা) দেখুন। পরিস্থিতি ও সমস্যাদি তখন তেমনই ছিল যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর সবই ছিল গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটাই উপেক্ষা করার মত ছিল না। নবীও (সা) সেসব উপেক্ষার বিষয় মনে করেননি। সময়মত ওসবের এক একটি করে শুধু সমাধানই করেননি, বরঞ্চ সে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত করিয়ে দেখিয়ে দেন যার ধারণা কোন অনবী সংস্কারক অথবা রাজনৈতিক নেতা করতেও পারতো না। কিন্তু তিনি তাঁর কাজের সূচনায় এসব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু একটি বুনিয়াদী সংস্কারের প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেন। যা সমুদয় সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি ছিল। যদিও তিনি একটি গোত্রে ও একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তথাপি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল গোটা মানবতার প্রতি যাকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে আহ্বান করার জন্য তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আর সকল সমস্যা পরিহার করে যে বুনিয়াদী সংস্কারের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র চেষ্টা সাধনা কেন্দ্রীভূত করেন তা ছিল এইঃ-

১) লোক যেন তৌহীদের উপর ঈমান আনে। সকলের বন্দেগী পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর বন্দেগী অবলম্বন করে এবং তাঁর হুকুমকে অবশ্য পালনীয় মনে করে।

২) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর রসূল বলে মেনে নেয় এবং ওসব হেদায়েত, শিক্ষা ও আইন-কানুন মেনে চলে যা আল্লাহর পথ থেকে তাঁর মাধ্যমে পৌঁছেছে।

৩) কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসাবে মেনে নেবে এবং তার ফরমান সর্ব সময়ের জন্যে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

৪) আখেরাতের উপর ঈমান আনবে এবং এটা মনে করে দুনিয়ার কাজকর্ম করবে যে, অবশেষে মৃত্যুর পর খোদার সামনে হাজির হয়ে আপন ক্রিয়াকান্ডের জবাবদিহি করতে হবে।

৫) চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিকগুলোর ঐসব অপরিবর্তনীয় নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে যা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব পেশ করেছে।

৬) মানুষের মধ্যে যারা এ দাওয়াত কবুল করবে তারা এমন এক উম্মত হয়ে যাবে যে এ দাওয়াতের পতাকাবাহী হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তাকে বিজয়ী করার জন্য জান ও মালের বিরাট ঝুঁকি নেয়ার জন্য তৈরী হতে হবে। পরস্পর পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হবে এবং নিজস্ব

এক ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন করতঃ কুফর ও কাফেরদের সাথে দুস্তি-মহব্বত ও বাস্তব সামাজিকতার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (১৭২)

এ কর্মপদ্ধতির গুরুত্ব

প্রথমে সকলদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, শুধুমাত্র এই একটি বুনিয়াদী সংস্কারের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করার কারণ ত প্রথমতঃ এ ছিল যে, এই হলো সঠিক ও হক কাজ। আর রসূলের প্রকৃত কাজই হলো হক পেশ করা। দ্বিতীয় কারণ এ ছিল যে, ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনে যতো অনিষ্ট-অনাচারই পয়দা হয় সে সবের প্রকৃত কারণ মানুষের নিজেকে স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মনে করা। নিজেকে নিজের ইলাহ্ মনে করা এবং বিশ্ব জগতের ইলাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যান্যকে খোদায়ী গুণাবলী, এখতিয়ার ও অধিকারের হকদার মনে করা। তা তারা কোন মানুষ হোক অথবা অন্য কোন সত্তা হোক। মূলে যদি এ অনিষ্ট-অনাচার বিদ্যমান থাকে, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে উপর উপর বা ভাসা ভাসা কোন সংস্কার ব্যক্তিগত অবনতি অথবা সামষ্টিক অনিষ্ট-অনাচার দূর করতে পারবে না। একদিক থেকে অনিষ্ট দূর করা হলে অন্যদিক থেকে তা মস্তক উত্তোলন করে দাঁড়াবে। অতএব, সংস্কারের সূচনা হতে হলে শুধু এভাবেই হতে পারে যে, একদিকে ত মানুষের মন থেকে স্বাধীনতা ও জবাবাদিহিহীনতার অলীক ধারণা দূর করতে হবে এবং তাকে বলতে হবে যে, সে যে দুনিয়ায় বাস করে তা প্রকৃতপক্ষে কোন শাসকহীন রাজ্য নয়। বরঞ্চ বাস্তবে তার এক সার্বভৌম বাদশাহ্ রয়েছেন এবং সে তার জন্মগত প্রজা। তাঁর সে বাদশাহী তার মেনে নেয়ার মুখাপেক্ষী নয়। সে তাঁর বাদশাহীর অবসানও ঘটাতে পারবে না, আর না সে তাঁর রাজ্য থেকে বের হয়ে অন্যত্র যেতে পারবে। এ অটল বাস্তবতা বিদ্যমান থাকতে তার স্বাধীনতার অলীক ধারণা এক নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছু নয় যার পরিণাম তাকেই বহন করতে হবে। বাস্তবতার দাবী এই যে, সে যেন সোজাসুজি তাঁর আগে মস্তক অবনত করে এবং একজন অনুগত বান্দাহ বা দাস হয়ে থাকে। অপরদিকে তাকে বাস্তবতার এ দিকটাও তুলে ধরতে হবে যে, এ সমগ্র সৃষ্টি জগতে একমাত্র বাদশাহ, একমাত্র মালিক এবং একমাত্র কর্তৃত্ব প্রভুত্বের অধিকারী বলে একজন রয়েছেন। এখানে অন্য কারো হুকুম করার অধিকার নেই আর না প্রকৃত পক্ষে কারো হুকুম এখানে চলে। এ জন্যে সে যেন তিনি ছাড়া আর কারো বান্দাহ্ না হয়, কারো হুকুম যেন না মানে, কারো সামনে মস্তক অবনত না করে। এখানে কোন হিজ ম্যাজেস্টী (His majisty) নেই, ম্যাজেস্টীত একমাত্র ঐ এক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। এখানে কোন His Highness নেই। Highness ত শুধু তাঁরই শোভা পায়। এখানে কোন His Holiness নেই। Holiness সবটাই তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। এখানে কোন His Lordship নেই। Lordship সমুদয় তাঁরই একটি অংশ। এখানে কোন আইন প্রণেতা নেই। আইন একমাত্র তাঁরই, আইন, প্রণয়নের এবং আইন অমান্য করার অপরাধে শাস্তি দেয়ার অধিকার তাঁরই। এখানে কোন সরকার কোন দাতা-দয়ালু, কোন শাহ্ ও শাহানশাহ, কোন অলী ও কর্মকর্তা কোন বিপদ-মুসিবত দূরকারী, কোন দোয়া শ্রবণকারী কাতর প্রার্থনার কোন প্রতিবিধানকারী নেই। কারো নিকটে শাসন ক্ষমতার চাবি নেই। কেউ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত সবই দাস ও গোলাম ও আজ্ঞাবহের দল। প্রভু ও মনিব শুধু একজন। অতএব, সকল প্রকার গোলামী, আনুগত্য, বশ্যতাস্বীকার পরিহার করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই গোলাম ও অনুগত হতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই হুকুম শাসন মেনে চলতে হবে।

এ সকল সংস্কারের মূল এবং ভিত্তি। এর ভিত্তিতেই ব্যক্তিচরিত্র ও সামষ্টিক ব্যবস্থার গোটা প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার করে নতুন করে এক বিশেষ নক্‌শায় তৈরী হয়। আর মানব জীবনে সকল সমস্যা যা আদম (আঃ) থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে এবং এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হবে। এর ভিত্তিতেই এক নতুন পন্থায় তার সমাধান করা হবে।

নবীর (সা) দাওয়াতের সূচনা পদ্ধতি

মুহাম্মদ (সা) এ বুনিয়াদী সংস্কারের দাওয়াত কোনপ্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ও ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি পেশ করেন। দাওয়াতকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছাবার জন্য কোন হেরফের করার পথ অবলম্বন করেননি যে প্রথমে রাজনৈতিক এবং সামাজিক ধরনের কিছু কাজ কাম করে লোকের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করবেন। তারপর সেই প্রভাব কাজে লাগিয়ে কিছু শাসকসুলভ এখতিয়ার হাসিল করা এবং সে এখতিয়ার কাজে লাগিয়ে লোক পরিচালনা করিয়ে এ পর্যায়ে তাদের টেনে আনবেন। এসব কিছুই না। আমরা দেখি যে, ওখানে একজন শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঘোষণা করছেন। এর কম কোন কিছুর উপর তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। এর কারণ শুধু পরয়গম্বরসুলভ সাহসিকতা এবং তাবলিগি আবেগই নয়, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থাই এই। সে প্রভাব ও ক্ষমতা যা অন্যকিছুর মাধ্যমে পয়দা করা যায় তা এ সংস্কার কাজের মোটেই সহায়ক নয়। যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ছাড়া অন্য কোন কিছুরই ভিত্তিতে লোকের সহযোগিতা করে, তারা এ বুনিয়াদের উপর পুনর্গঠন কাজে নবীর (সা) কোন কাজে লাগবে না। এ কাজেত তাদের যোগদান বেশী ফলপ্রসূ হবে যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনা মাত্রই আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে। এ কাজেই তাদের আকর্ষণ থাকবে। এ বাস্তবতাকেই তারা তাদের যিন্দেগীর বুনিয়াদ বানাবে এবং এর ভিত্তিতেই তারা কাজ করতে অগ্রসর হবে। অতএব ইসলামী আন্দোলন চালাবার জন্য যে বিশেষ কৌশল ও কর্মসূচীর প্রয়োজন তার দাবীই এই যে, কোন ভূমিকা ব্যতিরেকেই কাজের সূচনা তৌহীদের দাওয়াত থেকেই করতে হবে।

তৌহীদের ধারণার ব্যাপকতা

তৌহীদের এ ধারণা শুধু একটা ধর্মীয় বিশ্বাসই নয়। এর থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গোটা ব্যবস্থা যা মানুষের স্বাধীনতা ও গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের বুনিয়াদের উপর গঠিত, তার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। আর এক দ্বিতীয় বুনিয়াদের উপর এক নতুন প্রাসাদ নির্মিত হয়। আজ দুনিয়ার মুয়াজ্জেনকে 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আওয়াজ বুলন্দ করতে দেখে তা ঠান্ডা মাথায় শুনে যায়। না আহ্বানকারী জানে যে সে কি বলছে আর না শ্রবণকারীগণ তার মধ্যে কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য দেখতে পায়। কিন্তু যদি তারা জানতে পারে যে, এ ঘোষণার উদ্দেশ্য বর্তমানে প্রচলিত গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং তার স্থলে এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা, তাহলে বিশ্বাস করুন যে, এ আওয়াজ ঠান্ডা দিলে কোথাও বরদাশত করা হবে না। আপনি কারো সাথে লড়তে যান বা না যান, স্বয়ং দুনিয়া আপনার বিরুদ্ধে লড়তে আসবে। এ আওয়াজ বুলন্দ করার সাথে সাথে এমন মনে হবে যে, হঠাৎ যমীন ও আসমান আপনার দুশমন হয়ে গেছে এবং চারদিকে দেখতে পাবেন সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র পশু।

এ কর্মপন্থার সাফল্যের কারণ

এ অবস্থাই সে সময়ে দেখা গেল যখন নবী মুহাম্মদ (সা) প্রকাশ্যে এ আওয়াজ বুলন্দ করেন। আহ্বানকারী জেনে বুঝেই আহ্বান জানান, শ্রোতাগণও বুঝতে পারছিল যে, কি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ জন্য যার যার উপরের যেদিক দিয়েই আঘাত পড়ছিল, তারা এ আওয়াজ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। পূজারী ও পুরোহিতগণ তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্রের জন্য এতে বিপদ দেখতে পেলো, ধনীদের ধনদৌলতের সুদখোরদের তাদের সুদী ব্যবসার, বংশপূজারীদের তাদের বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের, রেসম পূজারীদের তাদের রেসম ও রেওয়াজের, জাতি পূজারীদের তাদের জাতীয়তাবাদের, পূর্ব পুরুষ পূজারীদের তাদের বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পন্থা পদ্ধতির অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিমার পূজারীদের আপন আপন প্রতিমা ধ্বংসের আশংকা দেখা দিল এ একটি আওয়াজের মধ্যে। এ জন্য আল্‌কুফরো মিল্লাতুন ওয়াহেদাতুন্‌ الكفر ملة واحدة অনুযায়ী যারা পরস্পর বিবদমান ছিল তারা এ নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এক হয়ে গেল। এ অবস্থায় শুধুমাত্র তারাই নবী মুহাম্মদের (সা) দিকে এলো যাদের চিন্তাধারা স্বচ্ছ ছিল, যারা বাস্তবতা উপলব্ধি করার ও মেনে নেয়ার যোগ্যতা রাখতো, যাদের মধ্যে এতোটা সততার অনুরাগ বিদ্যমান ছিল যে, যখন একটি বিষয় সম্পর্কে তারা জেনে ফেল্লো যে, তা সত্য, তখন তার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে এবং মৃত্যুর সাথে খেলা করতে তারা তৈরী হয়ে গেল। এ আন্দোলনের জন্য এমন সব লোকেরই প্রয়োজন ছিল। তারা একজন, দুজন, চারজন করে আসতে থাকে এবং সংঘাত-সংঘর্ষও বাড়তে থাকে। কারো জীবিকা বন্ধ হয়ে গেল, বাড়ির লোক কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দিল, কারো বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন সম্পর্ক ছিন্ন করলো। কাউকে বন্দী করা হলো, কাউকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিকে টেনে হিচড়ে নেয়া হতে থাকলো, কাউকে প্রকাশ্যে পাথর ও গালি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হলো, কারো চক্ষু উৎপাটিত করা হলো, কারো মস্তক চূর্ণ করা হলো, কাউকে নারী, ধনদৌলত, বাদশাহী তথা সম্ভাব্য সকল বস্তুর প্রলোভন দিয়ে খরিদ করার চেষ্টা করা হলো। এ সব এলো এবং আসারও প্রয়োজন ছিল। এসব ব্যতীত ইসলামী আন্দোলন না মজবুত হতে পারতো আর না সামনে অগ্রসর হতে পারতো।

কাজের লোক বাছাই করার এবং তাদের তরবিয়াতের স্বাভাবিক পন্থা

এর অনিবার্য সুফল এ ছিল যে, নিকৃষ্ট ধরনের দুর্বল চরিত্রের এবং দুর্বল ইচ্ছাশক্তির লোক এদিকে আসতেই পারতো না। যারা এসেছিলেন তারা ছিলেন আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন এবং প্রকৃতপক্ষে যাঁদের প্রয়োজন ছিল। কাজের লোক অকর্মন্য লোক থেকে বাছাই করে নেয়ার এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না যে যারাই এলো, অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়েই এলো। তারপর যারাই এলো তাদেরকে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে, কোন বংশীয় অথবা জাতীয় উদ্দেশ্যে বিপদের মুকাবেলা করতে হয়নি। বরঞ্চ তাদেরকে যা কিছুই বরদাশত করতে হয়েছে তা শুধু সত্য ও সততার জন্যে, খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বরদাশত করতে হয়েছে। এর জন্যই তারা মার খেয়েছে, ক্ষুৎ পিপাসায় মরেছে। সারা দুনিয়ার অত্যাচার-উৎপীড়নের শিকার হয়েছে। তার ফল এই হয়েছে যে, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সঠিক ইসলামী মন-মানসিকতা তৈরী হতে থাকে। তাদের মধ্যে মজবুত ও নির্ভরযোগ্য ইসলামী চরিত্র তৈরী হলো। তাদের খোদাপুরস্তির মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়ে তা বাড়তে থাকলো। বিপদ মুসিবতের এ শক্তিশালী প্রশিক্ষণ

ক্ষেত্রে ইসলামী হাল-হকিকত বিকশিত হওয়া ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার। যখন কোন ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং তার জন্য সংঘাত-সংঘর্ষ, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা, জেলজুলুম, ক্ষুৎপিপাসা, নির্বাসন দন্ড প্রভৃতি অতিক্রম করে সে অগ্রসর হয়, তখন তাঁর এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বদৌলত তার সে উদ্দেশ্যের সকল হাল-হকিকত তার অন্তররাজ্যে ছেয়ে যায়। তারপর তার সমগ্র ব্যক্তিত্ব সে উদ্দেশ্যেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক হিসাবে সর্বপ্রথম নামায তার উপর ফরয করা হয়েছে যাতে দৃষ্টিভ্রম বা দৃষ্টির অস্পষ্টতার সকল আশংকা দূর হয়। আপন লক্ষ্যের প্রতি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। যাকে সে তার শাসক মেনে নিয়েছে, তার শাসন-ক্ষমতার বার বার স্বীকৃতি দিয়ে আপন আকীদায় যেন সুদৃঢ় হয়ে যায়। যার হুকুম অনুযায়ী তাকে দুনিয়ায় কাজ করতে হয়, তাঁর 'আলেমুল গায়বে ওয়াশশাহাদাহ্' হওয়া, তাঁর 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' হওয়া তাঁর সমুদয় সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বশীল হওয়া, পরিপূর্ণরূপে তার হৃদয়ে যেন দৃঢ়মূল হয়ে যায়, কোন অবস্থাতেই যেন তিনি ছাড়া আর কারো আনুগত্য করার ধারণা তার হৃদয়ে স্থান না পায়।

ইসলামী দাওয়াতের প্রসার লাভ করার কারণ

একদিকে আগতদের তরবিয়ত এভাবে হচ্ছিল এবং অপরদিকে এ সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে ইসলামী আন্দোলন প্রসার লাভ করছিল। লোক যখন দেখতো যে মুষ্টিমেয় লোক মার খাচ্ছে, বন্দী হচ্ছে, বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে, তখন তাদের মধ্যে নিশ্চিতরূপে এ অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হতো এবং তারা জানবার চেষ্টা করতো যে এতোসব হাংগামা কিসের জন্য। যখন তারা জানতে পারতো যে, নারী, অর্থ, ভূসম্পত্তি কোনটার জন্যই নয়, কোন ব্যক্তিস্বার্থ তাদের নেই, এ আল্লাহর বান্দাহগণ শুধু এ জন্য মার খাচ্ছে যে, একটি বিষয়ের সত্যতা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মনে এ কথা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হতো যে, আসলে সে বস্তুটি কি যার জন্য এসব লোক এমন এমন বিপদ মুসিবত বরদাশত করে চলেছে। তারপর যখন তারা জানতে পারতো যে, সে বস্তুটি হলো 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং এর ফলে মানব জীবনে এমন ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়; এবং এ দাওয়াত নিয়ে এমন সব লোক মাঠে নামছে যারা নিছক সত্যের খাতিরে দুনিয়ার সকল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করছে, জান-মাল, সন্তানাদি সব কিছু কুরবান করছে, তখন তাদের চোখ খুলে যেতো, তাদের মনকে যতো আবরণ আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, তা উন্মোচিত হতে থাকে। এ পটভূমিতে এ সত্যতা তীরের মতো তার লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতো। এটাই ছিল কারণ যে, যাদেরকে ব্যক্তি মর্যাদার অহংকার, বাপ-দাদার অন্ধ আনুগত্যের অজ্ঞতা অথবা পার্থিব স্বার্থের মোহ অন্ধ বানিয়ে রেখেছিল তারা ব্যতীত আর সকলে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকলো। কেউ তড়িঘড়ি আকৃষ্ট হলো, কেউ বা এ আকর্ষণকে বহু দিন ধরে প্রতিহত করতে থাকলো। কিন্তু বিলম্বে হোক বা শীঘ্রই হোক, প্রত্যেক সত্যপ্রিয় ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিকে এ সত্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে হলো।

হুযুর (সা)এর চরিত্রের অসাধারণ প্রভাব

এ সময়ের মধ্যে আন্দোলনের নেতা নবী (সা) তাঁর ব্যক্তি জীবন থেকে আন্দোলনের মূলনীতিগুলো এবং যার জন্য এ আন্দোলন তার প্রতিটি বিষয়কে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি তৎপরতা থেকে ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি উচ্ছলিত হচ্ছিল এবং মানুষ উপলব্ধি করতো ইসলাম কাকে বলে।

তাঁর বিবি হযরত খাদিজা (রাঃ) হেজাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা ছিলেন। নবী (সা) তাঁর মাল নিয়ে ব্যবসা করতেন। যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হলো, তখন তাঁর যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। কারণ পুরোপুরি আপন দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এবং সমগ্র আরবকে নিজের দুশমন বানাবার পর ব্যবসার কাজ আর চলতে পারতো না। আগের দিনগুলোর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তার সবটুকু স্বামী-স্ত্রী মিলে এ আন্দোলন ছড়াবার কাজে কয়েক বছরে নিঃশেষ করে ফেল্লেন। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, নবুওয়তের দশম বর্ষে যখন নবী (সা) তবলীগের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন, তখন যে ব্যক্তি এক সময় হেজাজের ব্যবসায়ী প্রধান ছিলেন, তিনি তাঁর বাহনের জন্য একটি গাধাও সংগ্রহ করতে পারেননি।

কুরাইশগণ নবী করিমকে (সা) হেজাজ সরকারের সিংহাসন পেশ করে। তারা বলে, আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেব, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে দিয়ে আপনার বিয়ে দেব, ধন সম্পদের পাহাড় আপনার পদতলে লুটিয়ে দেব, শর্ত এই যে, আপনি এ আন্দোলন থেকে বিরত থাকুন, কিন্তু যে ব্যক্তি মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি এসব প্রস্তাবাদি প্রত্যাখ্যান করে গালি ও পাথর খাওয়ার জন্য রাজী হলেন।

কুরাইশ ও আরব সর্দারগণ বল্লো, মুহাম্মদ (সা) আমরা কি করে তোমার কাছে এসে বসতে পারি এবং তোমার কথা কি করে শুনতে পারি, যখন তোমার মজলিসে সর্বদা গোলাম, বিত্তহীন ও (মায়াযাল্লাহ) নিম্ন জাতের লোক বসে? আমাদের নিকটে যারা সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোক তাদেরকে তুমি তোমার চারপাশে একত্র করে রেখেছ। এদেরকে দূর করে দাও যাতে তোমার সাথে আমরা মিলিত হতে পারি। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষের উঁচু -নীচুকে সমান করতে এসেছিলেন, তিনি ধনীদের খাতিরে গরীবদের তাড়িয়ে দিতে অস্বীকার করেন।

আন্দোলনের স্বার্থে নবী (সা) আপন দেশ, জাতি, গোত্র, পরিবার কারো স্বার্থের কোন পরোয়া করেননি। ঈমান আনয়নকারী পর ছিল তাঁর আপন। ঈমান যারা আনেনি তারাই ছিল তাঁর পর। এ জিনিসই দুনিয়াবাসীর মনে এ দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, তিনি ছিলেন সত্যের উপর অটল অবিচল। এ জিনিসই দুনিয়াকে এ প্রত্যয় দান করে যে, তিনি মানুষ হয়ে মানুষের কল্যাণের জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন, আর এ জিনিসই তাঁর দাওয়াতের প্রতি প্রতিটি দেশ ও জাতিকে আকৃষ্ট করে। যদি তিনি তাঁর পরিবারের জন্য চিন্তা করতেন, তাহলে এ চিন্তার প্রতি যারা হাশেমী নয়, তাদের কি অনুরাগ থাকতো? যদি তিনি এ জন্য অধীর হতেন যে, কোন প্রকারে কুরাইশদের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখা হোক, তাহলে অকুরাইশীদের কোন মাথা ব্যথা হয়েছিল এ কাজে শরীক হওয়ার? যদি তিনি আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কাজ করতেন, তাহলে আবিসিনিয়ার বেলাল (রাঃ) রোমের সুহাইব (রাঃ) এবং ইরানের সালমানের (রাঃ) কি প্রয়োজন ছিল তাঁর কাজে সহযোগিতা করার? প্রকৃতপক্ষে যে বস্তু সকলকে আকৃষ্ট করেছিল, তা ছিল খালেস খোদাপুরস্তি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধে অবস্থান। (১৭৩)

- o -

নির্দেশিকা

১. গ্রন্থাকার কর্তৃক সংযোজন
২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-৯২
৩. তাফহীমুল কুরআনঃ ৪র্থ খন্ড, যুমার, টীকা-৬৪
৪. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৫. তাফহীমুল কুরআনঃ ১ম খন্ড, আন্‌আম, টীকা-২৯
৬. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, যুমার, টীকা-২৭
৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, শূরা, টীকা-৩৮
৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, তওবা, টীকা-৩১
১০. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, কাসাস, টীকা-৮০-৮৫
১২. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আম্বিয়া, টীকা-৫
১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, ফুরকান, টীকা-১৪-১৭
১৫. গ্রন্থাকার কর্তৃক সংযোজন
১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আম্বিয়া, টীকা-১০
১৭ তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, তাগাবুন, টীকা-১১-১৩
১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-১০৮
১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, ইউসুফ, টীকা-৭৯
২০. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
২১. তাফহীমুল কুরআনঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাইল, টীকা-৬৩
২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, আহকাফ, টীকা-১২
২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, যুখরুফ, টীকা-৩০-৩২
২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, মু'মিন টীকা-৭৫-৭৬
২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, নহল, টীকা-৪
২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, আহকাফ, টীকা-১৫-১৬
২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, শুআরা, টীকা-৮১
২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সোয়াদ, টীকা-৮
২৯. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, মু'মিনূন, টীকা-২৭
৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, মু'মিনূন, টীকা-৩৬
৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, তূর, টীকা-২২
৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ষষ্ঠ খন্ড, তাকভীর, টীকা-২১

৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, শুআরা, টীকা-১৩০-১৩৩
৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, দুখান, টীকা-১২
৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, নহল, টীকা-৭০
৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, কাসাস, টীকা-৬৪
৩৮. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, ফুরকান, টীকা-১৮
৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাবা, টীকা-৬৬-৬৭
৪১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, মু'মিনূন, টীকা-৬৭
৪২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ষষ্ঠ খন্ড, কালাম, টীকা-২-৪
৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, আ'রাফ, টীকা-১৪৩
৪৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, শুআরা, টীকা-১৪২
৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, শুআরা, টীকা-১৪৩
৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, শুআরা, টীকা-১৪৪
৪৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, তূর, টীকা-২৫
৪৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-৫৪
৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, ক্বাফ, টীকা-৫
৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, ফুরকান, টীকা-৫৫
৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-১০৬
৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আনকাবূত, টীকা-৯১
৫৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ষষ্ঠ খন্ড, মুদ্দাসসির, টীকা-৩৯
৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খন্ড, আন্‌আম, টীকা-৫-৭
৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খন্ড, আন্‌আম, টীকা-২৬-২৭
৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, রা'আদ, টীকা-৪৭
৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আনকাবূত, টীকা-৮৮
৫৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, ইউনুস, টীকা-২১
৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, কাসাস, টীকা-১০৯
৬০. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাজদা, টীকা-১
৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাজদা, টীকা-২-৪
৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, ইউনুস, টীকা-৪৫
৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-১০৫
৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, হূদ, টীকা-১৪
৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, ইউনুস, টীকা-৪৬
৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, তুর, টীকা-২৬-২৭
৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, ফুরকান, টীকা-৪৪-৪৬
৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, নহল, টীকা-১০২-১০৬
৭০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, ফুরকান, টীকা-১২
৭১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, হামীম সাজদা, টীকা-৫৪

৭২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, হামীম সাজদা, টীকা-১
৭৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৭৪. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৭৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, জাসিয়া, টীকা-৪৪
৭৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, জাসিয়া, টীকা-৩৪
৭৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, রা'আদ, টীকা-১২
৭৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাবা, টীকা-১০
৭৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, নাযিয়াত, টীকা-৪
৮০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, ইয়াসীন, টীকা-৬৪-৬৭
৮১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, বনী ইসরাঈল, টীকা-৫৬
৮২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, হজ্জ, টীকা-৫-৬
৮৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাজদা, টীকা ২০-২১
৮৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাফফাত, টীকা-৮-৯
৮৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, মু'মিন, টীকা-৭৯
৮৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, নাযিয়াত, টীকা-১৪
৮৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সাফফাত, টীকা-৮-১২
৮৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, গাশিয়া, টীকা-৭
৮৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ টীকা-২৫
৯০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, তারিক, টীকা-২-৪
৯১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, ক্বাফ, টীকা-৪
৯২ তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, ক্বাফ, টীকা-১৮
৯৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
৯৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ, টীকা-২৪
৯৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ, টীকা-২
৯৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, সোয়াদ, টীকা, ২৯-৩০
৯৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, তাগাবুন, টীকা ১৫-১৭
৯৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, দুখান, টীকা-৩১-৩২
৯৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, জাসিয়া, টীকা-২৭-২৮
১০০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, জাসিয়া, টীকা-৩৩
১০১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কালাম, টীকা-১৯-২৩
১০২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, তাকভীর, টীকা-৯
১০৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১০৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ, টীকা-৩-৫
১০৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ, টীকা-১৫
১০৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, দাহার, টীকা-২১
১০৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, তাকাসুর, টীকা-১-৩
১০৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, মুতাফফিফীন, টীকা-১
১০৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ফাজর, টীকা-১১-১৪

১১০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, মাউন, টীকা-৭
১১১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, মুলক, টীকা-৪,
১১২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, দাহার, টীকা-৩-৫
১১৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, যুমার, টীকা-৪৫
১১৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, মু'মিন, টীকা-২৮
১১৫. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১১৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, ক্বাফ, টীকা-২১
১১৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ইনফিতার, টীকা-৭
১১৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, যিলযাল, টীকা-২-৪
১১৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, কাহাফ, টীকা-৪৬
১২০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, কামার, টীকা-২৮
১২১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, মুজাদালা, টীকা-১৭
১২২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, ইয়াসীন, টীকা-৫৫
১২৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, ইয়াসীন, টীকা-৫৫
১২৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড হামীম সাজদা, টীকা-২৫
১২৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, ইয়াসীন, টীকা-৯
১২৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, জাসিয়া, টীকা-৪২
১২৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, মুরসালাত, টীকা-৬
১২৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, যুমার, টীকা-৮০
১২৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, আদিয়াত, টীকা-৮
১৩০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, তারিক, টীকা-৫-৭
১৩১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, কিয়ামাহ, টীকা-৯-১০
১৩২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, নাযিয়াত, টীকা-২০
১৩৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ফাজর, টীকা-১৭
১৩৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ইনফিতার, টীকা-৩
১৩৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, যিলযাল, টীকা-৫-৭
১৩৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, ফাতির, টীকা-৩৯-৪০
১৩৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, আবাসা, টীকা-২২
১৩৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, মাআরিজ, টীকা-১১
১৩৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, মু'মিন, টীকা-৩১-৩২
১৪০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, নাবা, টীকা-২৩-২৪
১৪১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৪২. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৪৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, শামস, টীকা-৪-৬
১৪৪. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৪৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, বালাদ, টীকা-৯-১০
১৪৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, তীন, টীকা-২-৪
১৪৭. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন

১৪৮. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৪৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, হুজরাত, টীকা-২৮
১৫০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, রূম, টীকা-১৮
১৫১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, হজ্জ, টীকা-১৩২
১৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, কাসাস, টীকা-৭৩
১৫৩. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৫৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, লাহাব, ভূমিকা
১৫৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, হুজরাত, টীকা-১৮
১৫৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, বালাদ, টীকা-১৪
১৫৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, হুজরাত, টীকা-২৬
১৫৮. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৫৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৪র্থ খন্ড, হামীম সাজদা, টীকা-১৩৬
১৬০. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খন্ড, বাকারা, টীকা-১৪৪
১৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ ১ম খন্ড, আলে ইমরান, টীকা-৮৮
১৬২. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, তওবা, টীকা-৮০
১৬৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আনকাবূত, টীকা-৯৪-৯৯
১৬৪. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, তওবা, টীকা-১৮
১৬৫. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, মুজাদালা, টীকা-৩৭
১৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আনকাবূত, টীকা-১১
১৬৭. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৩য় খন্ড, আনকাবূত, টীকা-১৭-১৮
১৬৮. তাফহীমুল কুরআন ঃ ২য় খন্ড, তওবা, টীকা-১১১
১৬৯. তাফহীমুল কুরআন ঃ ৫ম খন্ড, মুমতাহিনা, টীকা-১৩
১৭০. 'ইসলামী রিয়াসত' থেকে গৃহীতঃ পৃষ্ঠা ১৫৯-১৭৬
১৭১. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৭২. গ্রন্থকার কর্তৃক সংযোজন
১৭৩. 'ইসলামী বিপ্লবের পথ' থেকে গৃহীত

সীরাতে সরওয়ারে আলম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী